হিমালয়

(৪র্থ খণ্ড)

(ধৌলিগঙ্গা, চন্দ্রভাগা নদী ও তমসা পব)

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

ভূমিকা

১

শতার্ধ গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্কু মহারাজ বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের সমাবেশে একটি সফল নাম, একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে তাঁর 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী-যমুনা' প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তাঁর বয়স সদ্য তিরিশ অতিক্রম করেছে। তখনও তিনি নিছক পর্যটকই ছিলেন। হিমালয় তাঁর আকর্ষণের ক্ষেত্র হলেও তখনও তিনি নিছক যাত্রী, অভিযাত্রী হননি। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স থেকে পর্বতাভিযানের নেশায় তাঁর শৃঙ্গারোহণ-পর্ব শুরু হয়। মাউন্টেনিয়ারিং-এর পাঠগ্রহণ, অভিজ্ঞতাসঞ্চয়, সতীর্থসাহচর্যে সফরসূচি রচনার পালা থেকে শুরু করে অজ্ঞাতবন্ধুর রহস্যসুদূর পর্বত-শিখরের ভয়ালসুন্দর পথে পা বাড়িয়ে সাফল্যে ব্যর্থতায় বহু অভিজ্ঞতার পুঁজি সংগ্রহ করেছেন একাদিক্রমে প্রায় আরও তিন দশক। তাঁর সেই হিমালয়চারিতার ইতিহাসই 'হিমালয়' সংকলনে খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে অবশেষে চতুর্থ খণ্ডে উপনীত হল। প্রথম খণ্ড 'হিমালয়' শুরু হয়েছিল, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে সংগঠিত সতপথ শিখর-বিজয়ের বৃত্তান্ত দিয়ে, 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' গ্রন্থের দ্বারা। আর বর্তমানে প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ডের কালানুক্রমিক শেষ গ্রন্থ 'ধৌলির ধারে ধারে'। আশির দশকের শেষ সোপানে সংগঠিত ধৌলি উপত্যকা-অভিযানে আপাতত এর সমাপ্তি।

তবু বিপুলা এ পার্বতী-পৃথিবীর কতটুকু জানি! প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও পুরাণে হিমালয়ের যে পরিচয়ই থাকুক, ইংরেজ-আমলেই প্রথম বিজ্ঞানী ও সন্ধানী নজরে হিমালয়ের সমগ্র পরিচয়, তার ভূতাত্ত্বিক-পুরাতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক বিবরণ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হতে শুরু করেছে। হিমালয়ের রহস্যস্তম্ভিত তুষারমৌলিতে জিগীষা-লাঞ্ছিত পতাকা রেখে আসার সর্বাধিক কৃতিত্ব বিদেশীদেরই। বহু সহস্র মাইল পূর্ব-পশ্চিমে-পরিব্যাপ্ত হিমালয়কে দুই শতক যাবৎ আমরা দেখতে শিখেছি সিকিম-হিমালয় আসাম-হিমালয় নেপাল-হিমালয় পঞ্জাব-হিমালয় গাড়োয়াল-কুমায়ুন-হিমালয় কাশ্মীর-হিমালয় এইজাতীয় ভৌগোলিক সংজ্ঞায়। রাষ্ট্রীয় কারণেই সমগ্র হিমালয় ভারতের ভূখণ্ডলগ্ন নয়, তাই ভারতীয়ের ভ্রমণাধিকারেরও অন্তর্বর্তী নয়। তবু ভারতের চতুর্দিকপ্রান্তের মানুষ দুর্গম পথের অভিজ্ঞতার আকর্ষণে, রহস্যঘন পর্বত-অরণ্য-তুষার-প্রপাতের আকর্ষণে, ধর্মস্থান-তীর্থ-পুণ্যক্ষেত্রের আকর্ষণে, হিমালয়ের গহন নিভৃতে তুষারস্তব্ধতার দেশে গন্ধর্ব-কিন্নরদের রাজ্যে ছুটে এসেছেন। কত শত পথযাত্রীর দেহ হিমালয়েই শেষ ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছে। হিমালয়ের দুর্গমতার উপর ক্রমশ নগরনির্ভর সভ্যতার ক্ষমতাবিস্তার ঘটেছে। তবু আজও সে হিমালয় দুঃসাধ্যসুদূর দুর্গমদুশ্চর ত্রাসদুর্বোধ ও দুর্জয়সুন্দর। আরও বহু গণনাতীত শতাব্দী নগাধিপতি হিমালয় এমনি করেই আমাদের আকর্ষণ করবে।

২

গত প্রায় একশ বছর ধরে হিমালয়ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থের বহু খ্যাত-অখ্যাত লেখক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। শঙ্কু মহারাজকে হিমালয়-বিহারীদের মধ্যে কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় এই নিয়ে বর্তমান ভূমিকা-লেখকের মনে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। 'হিমালয়' নামক সংকলনগুলির পূর্বতন তিন খণ্ডে শঙ্কু মহারাজের হিমালয়-ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে আমি যে পরিতৃপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছি এই খণ্ডেও তারই পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। আমার মতে, শঙ্কু মহারাজের হিমালয়ভ্রমণ-কাহিনীগুলির জনপ্রিয়তার বিশেষ কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, এগুলি নিছক অভিযান-বিবরণী নয়, এগুলি নিছক ট্রাভেল-ডায়েরি নয়, এগুলি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষেরও কথা, তাই সৎ সাহিত্যের গুণে সমৃদ্ধ। দ্বিতীয়ত, তিনি কেবল হিমালয়ের অঞ্চল বিশেষের ভৌগোলিক পরিচয়ের বার্তাজীবী নন। তাঁর সংকলনের নাম 'হিমালয়' হলেও তা শুধুই পার্বত্য নয়। তা অনিঃশেষ সৌন্দর্যের আধার। শঙ্কু মহারাজের হিমালয়-সংকলনের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থের নাম 'সুন্দরের অভিসারে', ১৯৫৩ সালে সংগঠিত সিকিমের সিনিয়লচু-অভিযানের বিবরণে ভরা সেই বই। কিন্তু অন্যভাবে বলতে ইচ্ছে করে, শঙ্কু মহারাজের লেখা হিমালয়-বিষয়ক প্রতিটি গ্রন্থেরই উপনাম হতে পারত সুন্দরের অভিসারে। তৃতীয় কারণ, শঙ্কু মহারাজের গ্রন্থে ভ্রমণ-ব্যাকরণের তিনটি কালেরই ক্রিয়াপদ আছে। তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় ভ্রমণের 'বর্তমান' এবং পাঠক-অভিজ্ঞতায় ভ্রমণের 'অতীত', এই দুই কাল মিশে একটি আখ্যানপূর্ণতা ঘটে। তারই প্রেরণায় নতুন করে সেইসব অঞ্চলে যাত্রা করার জন্যে গৃহবন্দি মন উন্মুখ হয়ে পড়ে। সেখান থেকে তৈরি হয়, ভ্রমণের 'ভবিষ্যৎ' কাল। 'তমসার তীরে তীরে' বইটির পরিশিষ্টেই পাঠকরা জানতে পারবেন কত তরুণ অভিযাত্রী শঙ্কু মহারাজের গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণে অনুপ্রেরিত হয়ে হর-কি-দুন ও যমদ্বার হিমবাহ পর্যটন করে এসেছেন। পর্বতাভিযাত্রীরা জানেন, দুর্গম হিমালয়ে অভিজ্ঞ সহচরের প্রয়োজনীয়তা কী অপরিসীম। শঙ্কু মহারাজের প্রতিটিগ্রন্থ অভিযাত্রীদের কাছে সেই মানব-সহচরের দাবি বহুলাংশে পূরণ করে—যে-কোনো ভ্রমণ সাহিত্যলেখকের পক্ষে এটি কম গৌরবের কথা নয়। বিশালহৃদয় হিমালয়ের অতি সামান্য অংশই তিন দশকের পরিক্রমায় তিনি স্পর্শ করেছেন যার কিছুটা গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা, কিছুটা হিমাচল-হিমালয় ও কিছুটা কুমায়ুন-গাড়োয়াল উপত্যকা, কিছুটা সিকিম-সংলগ্ন হিমালয় ও আংশিক কাশ্মীর-সংলগ্ন হিমালয়। তবু তাঁর পরিক্রমায় ঔদাসীন্য নেই, সন্ধানে অসম্পূর্ণতা যথাসম্ভব কম, দৃষ্টিতে বিস্ময়ের অভাব নেই। 'তমসার তীরে তীরে' গ্রন্থে কোনো অপরাজেয় ধবলগিরি-আরোহণের কথা নেই। কিন্তু পার্বতী যমুনার এই শাখানদীর অতিদুশ্চর পথ, পুরৌলা থেকে জারমোলা হয়ে মোরি পর্যন্ত পায়ে-হাঁটা পথের কঠিন শ্রম ওসলা বিশ্রামকেন্দ্র পৌঁছনো পর্যন্ত কী কঠোর ব্রত, সব সার্থক হয় চিরশোভাময়ী হর-কি-দুন উপত্যকায় পৌঁছিয়ে। স্বর্গারোহিণী শিখরের প্রান্ত ছুঁয়ে অবশ্য শেষ পর্যন্ত অভিযাত্রীরা ধুমধারকান্দি পাস অতিক্রম করতে পারেননি। তবে হিমালয়ের পথে-চলায় দুপাশেই রয়েছে সুন্দরের অভিনন্দন। হিমবাহে-নদীতে বিবর্ণশুভ্র শৃঙ্গে-শৃঙ্গে সেখানে যে মায়াবিস্তার তাঁরা নশ্বর ইন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করেছেন, সেদিনের যাবতীয় ক্লেশস্মৃতিকে পরিলুপ্ত করে তাই হয়ে আছে এখানকার সবচেয়ে আনন্দমধুর স্মৃতি—পাঠকরাও সেই রুদ্ধশ্বাস মহানন্দের স্পর্শ পান। সম্ভবত

আর কোনো অভিযানে অনিশ্চিত প্রকৃতির হিমশীতল আঙুল ধরে হাঁটার অভিজ্ঞতায় তাদের এত রোমাঞ্চ হয়নি! আমি শুনেছি, ১৯৫৩ সালের সেই ভয়ার্ত হিমাঙ্কশীতল বাতের বিবরণ দিতে পঁচিশ বছর পরেও স্নায়ুর উপর লেখক তুষারের নিশ্বাসবায়ু অনুভব করেন।

৩

ভ্রমণসাহিত্য-পাঠকের একটি সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা আছে। কোনো সাময়িক দুর্ঘটনায় বা রাজনৈতিক কারণে, অথবা যে-কোনো অপ্রত্যাশিত দুর্দৈবের ফলে, কোনো আকর্ষক ভ্রমণস্থানের প্রবেশপথ যদি শফরকারীদের কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়, তবে সেইস্থানে ভ্রমণের প্রাক্তন স্মৃতিকথাগুলি বারবার পড়তে ভালো লাগে। রাজনৈতিক অপদেবতার কোন অভিশাপে এক দশকেরও বেশি সময় আগে থেকে ভূস্বর্গ কাশ্মীর হয়ে উঠেছে দুঃস্বপ্ন কাশ্মীর। ১৯২০ সালে লেখক জম্মুকাশ্মীরের ডোডা থেকে বিশতিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন, লক্ষ্য ব্রহ্মা ১ শৃঙ্গারোহণ। কাশ্মীর উপত্যকার এই অঞ্চলের শিখরে-শিখরে আকাশের নীল আর গিরিমুকুটের হিমশুভ্রতা মর্তচারীর দৃষ্টিকে বিহ্বল করে। অন্তত অর্ধশতাব্দী পূর্ব থেকে এই হিমবাহ-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদেশী পর্যটকদের আনাগোনার বৃত্তান্ত জানা যায়। তাই এখানকার অনেক অজানা শৃঙ্গ বা হিমবাহ ক্যাথিড্রাল, সিক্‌ল মনু, ক্রুকেড ফিঙ্গার, ফ্ল্যাট টপ ইত্যাদি নামে পরিচিত। কিন্তু তারই মাঝখানে রয়েছে ব্রহ্মা ১ ও ২ শৃঙ্গ, উচ্চতায় যথাক্রমে একুশ ও উনিশ হাজার ফিটের বেশি, যাকে বেষ্টন করে আছে ভয়ংকর ব্রহ্মা হিমবাহ ও ব্রহ্মাণী শৃঙ্গ। পুরো অঞ্চলটিকে লেখক বলেছেন ব্রহ্মালোক। সাম্প্রদায়িক জাতিসংঘর্ষে, সন্ত্রাসবাদে ও রাজনৈতিক হঠকারিতায় এইসব অঞ্চলের পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হয়ে পড়েছে, অভিযাত্রীদের ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তবু এই সুলিখিত গ্রন্থখানি পড়ে এখনো কিছু মানুষ ব্রহ্মালোক-সন্ধানে ছুটে যান, লেখক হিসেবে শঙ্কু মহারাজ এই আত্মশ্লাঘা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারেন। শুধু অঞ্চল-প্রকৃতির বর্ণনাই নয়, এই আদিম পার্বত্য অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের জনসংখ্যা প্রায় সমান-সমান, অথচ তিনি লক্ষ্য করেছেন উভয় ধর্মের মোটবাহকদের কাছেই দেবতারূপে ব্রহ্মা উপাসিত হন।

হিমালয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অসাম্প্রদায়িক পর্বতমালা।

'ধৌলির ধারে ধারে' শঙ্কু মহারাজের হিমালয়-অভিজ্ঞতার শস্যক্ষেত্রের সর্বশেষ ফসল। 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' দিয়ে ছত্রিশ বছর বয়সে যার সূচনা হয়েছিল, আটান্ন বছর বয়সে ধৌলিগঙ্গা উপত্যকায় পরিভ্রমণে ও হাতি পর্বতারোহণে এবং গাড়োয়াল-হিমালয়ের আরও দু-একটি নামহীন শিখরাভিযানে সেই পরিক্রমণের পর্বান্ত। পর্বতারোহীদের কাছে তারই আকর্ষণ অপ্রতিরোধনীয়, যার তুষারস্তূপে জীবন রেখে এসেছেন বহু নামী অজানা অভিযাত্রী। চৌখাম্বা নন্দাদেবী কামেট মানা হাতি প্রভৃতি তুষারকুন্তলা মোহিনী মায়ারহস্য শিখরিণীদের লীলাক্ষেত্র এই উপত্যকায় লেখক ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা যখন ত্রস্তশঙ্কিত দিনরাত্রি অতিবাহিত করছিলেন, তারই সামান্য পূর্বে বেহালা সুরশুনার ছজন তরুণ পদযাত্রী ওখানকার তুহিনশীতল ক্রোড়ে তাদের অন্তিমশয়ন পেতেছিলেন। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে প্রথম বেসরকারি পর্বতাভিযান হয়েছিল এখানকারই নন্দাঘুন্টিকে ঘিরে, তারও কয়েক বছর পরে হয়েছিল নানা শৃঙ্গবিজয়, সেই

ধৌলির ধারে-ধারে পরিক্রমা করে লেখক শঙ্কু মহারাজ তাঁর হিমালয়চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাটি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

পথে পথে সুন্দরের অভ্যর্থনা, পদে পদে ভয়ংকরের নিমন্ত্রণ, হিমালয়ভ্রমণের এই নীললাল সুতো দিয়েই ভ্রমণসাহিত্যের লেখকরা তাঁদের কাহিনী বুনে তোলেন। অঞ্চল বিশেষের দুর্গমতাকে যাঁরা তুচ্ছ করেন, শিখরের দুরারোহতাকে যাঁরা অগ্রাহ্য করেন, হিমবাহের দুর্ভেদ্যতাকে যাঁরা উপেক্ষা করেন, তাঁরা শুধু আমাদের মুহূর্তগুলিকেই রুদ্ধশ্বাস করেন না, তাঁরা আমাদের সুখাসীন গৃহী জীবনের নিরুত্তেজ সংকীর্ণতাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেন, তৃপ্ত দিনরাত্রিগুলিকে বিচলিত করেন, দেওয়ালে ফাটল ধরিয়ে পথের আহ্বান শোনান, বর্ণ-শ্রেণী-সংস্কার-ধর্মমোহের ঊর্ধ্বে মানুষকে চিনতে শেখান। শঙ্কু মহারাজ তাঁদেরই একজন।

তাই তাঁর কাছে পাঠক হিসেবে আমরা কৃতজ্ঞ।

ধৌলির ধারে ধারে

কেউ বলেন শিবালয়, কেউ বলেন দেবালয়, কেউবা বলেন দেবতাত্মা হিমালয়। কেউ বলেন হিমালয় একটা বিষয়, যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ, আবার কেউবা বলেন হিমালয় অনন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, যে ঐশ্বর্য যথাযথভাবে আহরণ করতে পারলে, ভারতের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এঁদের কারও সঙ্গে আমার কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু আমি বলি—এ সংসারে অনেক নেশা। সোনার নেশা, সুরার নেশা, সাকীর নেশা ; ক্ষমতার নেশা, খ্যাতির নেশা, ড্রাগের নেশা। এবং এত সব নেশার পরেও আরেকটা নেশা আছে, হিমালয়ের নেশা।

বড়ই বিচিত্র এ নেশা। কারণ এ নেশার কোন চিকিৎসা নেই। একবার যিনি এই নেশায় আক্রান্ত হয়েছেন, তিনি আর মুক্তি পান নি।

আর্ভিন-ম্যালোরি থেকে হার্মান বুহল, অণিমা সেন থেকে অসিত মৈত্র, শত শত যুবক-যুবতী এই নেশায় আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়েছেন এবং হয়ে চলেছেন। স্বামী প্রণবানন্দ থেকে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বহু মানুষ এই নেশার কবলে পড়ে সংসার ছেড়েছেন এবং আমার মতো হাজার হাজার ছা-পোষা সংসারীও পথে বের হয়েছে।

আমরা আর্ভিন ও ম্যালোরির মতো শহীদ হতে পারি নি, উমাপ্রসাদের মতো সংসারে বাস করেও সংসারের বন্ধনমুক্ত হতে পারি নি, কিন্তু প্রায় চার দশক ধরে হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করে চলেছি এবং এই আটান্ন বছর বয়সেও প্রায় পুত্রসম তরুণ পর্বতারোহীদের সঙ্গে আবার পর্বতাভিযানে চলেছি।

॥ এক ॥

জ্যোতির্মঠ—শঙ্করাচার্য—তোটকাচার্য

এসেছি জোশীমঠ, গতকাল বিকেলে। চলেছি হাতি পর্বত (২২,০৭৪´/৬৭২৮ মিটার) ও তার প্রতিবেশী অনামি শৃঙ্গ (২০,৩০০´/৬১৮৯ মিঃ) অভিযানে। কালীঘাটের ইনস্টিটিউট অব্ মাউন্টেনিয়ারিং এক্সপ্লোরেশান এই অভিযানের আয়োজক, নেতা প্রখ্যাত পর্বতারোহী অমূল্য সেন।

দলের অন্যান্য পর্বতারোহী সদস্যরা হল—গৌতম, জগদীশ, শ্রীকৃষ্ণ, শিবু, তপন, বুবেন ও দুজন শেরপা। আর আমরা, যারা ওদের সাহায্য করতে আর হাতি পর্বতকে প্রণাম জানাতে এসেছি তারা হলাম—বিনয়, গোরা, শৈলেশ, রঞ্জু, অর্ধেন্দু, দুই শঙ্কর ও আমি এবং ডাক্তার। অর্থাৎ আঠেরোজন সদস্যের বেশ বড় দল।

গতকাল ভোর চারটে ঋষিকেশ থেকে বাস ধরে বিকেল পাঁচটায় পৌঁচেছি জোশীমঠ। একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। আজ সারাদিন ছুটোছুটি করে ইনার লাইন এবং ক্যামেরা পারমিট সংগ্রহ করেছি, পেয়েছি সরকারি দরে এক শ' লিটার কেরোসিন তেল।

কাজগুলো কিন্তু একদিনে হবার মতো নয়। কারণ আগেই বলেছি, আঠেরোজনের দল। তার ওপরে আবার তিনজন ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। প্রত্যেক সদস্য ও প্রতিটি ক্যামেরার জন্য পৃথক পারমিট নিতে হয়েছে। এবং এখন শঙ্করাচার্যের জোশীমঠেও কেরোসিনের কালোবাজার হয়েছে। কারণ যে পথ দিয়ে সমতলের আলো হিমালয়ে আসছে, সেই একই পথ ধরে এসে সমতলের অন্ধকারও হিমালয়কে গ্রাস করেছে। সুতরাং স্বজনহীন অপরিচিত সরকারি দপ্তর থেকে একদিনে এতগুলো পারমিট সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব।

অথচ সেই অসম্ভব ব্যাপারটাই আজ অক্লেশে সুসম্পন্ন করা গিয়েছে। এবং এর সবটুকু কৃতিত্বই রসগোল্লার। গতকাল সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন একটিন রসগোল্লা নিয়ে এস. ডি. ও. সাহেবের বাংলোয় সৌজন্য-সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। কলকাত্তাকা রসগুল্লা পেয়ে মেমসাহেব খুবই খুশি হয়েছেন। আর তারই ফলে বিনা দক্ষিণায় আজ একদিনেই আমরা সব পারমিট পেয়ে গিয়েছি। জয়, রসগুল্লার জয়।

গতকাল এস. ডি. ও. বাংলোয় যাবার পথে এবং আজ এস. ডি. ও. অফিসে যাতায়াতের সময় আমরা বেশ কিছুক্ষণ জোশীমঠের পথে কাটিয়েছি। পাঁচ ও ছয়ের দশকেও বদ্রীনাথ যেতে হলে যাবার পথে অন্তত একটা রাত জোশীমঠে থাকতেই হত। কিন্তু আজকাল তার আর প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং একালের যাত্রীরা আর বড় একটা জোশীমঠ দর্শনের সুযোগ পান না। তাঁরা বড়জোর জোশীমঠ বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে পায়চারি করতে করতে এক গ্লাস চা পান করেন। তারপরে সেই বাসে উঠেই সোজা চলে যান বদ্রীনাথ। তাই বহুবছর বাদে জোশীমঠে রাত্রিবাসের সুযোগ পেয়ে মনের আনন্দে ঘুরে

জোশীমঠ এ অঞ্চলের সবচেয়ে সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ। অবস্থানই জোশীমঠের উন্নতির কারণ। চীনের তিব্বত অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত জোশীমঠ ভারত-তিব্বত সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক বিনিময়ের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল।

গাড়োয়াল থেকে তিব্বতে যাবার প্রধান দুটি পথ মানা ও নিতি গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে। দুটি পথই তিব্বত থেকে এসে মিলিত হয়েছে এখানে। এখান থেকে নেমে গিয়েছে সমতল ভারতে। সুতরাং বাষট্টি সালে চীনের ভারত আক্রমণের পর থেকে জোশীমঠ আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার একটি প্রধান সীমান্তঘাঁটি।

ঋষিকেশ থেকে বাসপথে জোশীমঠ ২৫১ কিলোমিটার আর এখান থেকে বদ্রীনাথ প্রায় ৫০ কিলোমিটার।

বালক শঙ্কর এগারো বছর বয়সে কেরালা থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছিলেন। তখন এখানে ছিল একটি ক্ষুদ্র জনপদ, নাম রবিগ্রাম। জনবসতি থেকে কিছুদূরে একটি গুহায় তিনি পাঁচ বছর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন।

সিদ্ধিলাভের অনতিকাল পরে অর্থাৎ ষোল/সতেরো বছর বয়সেই শঙ্কর জ্যোতির্মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। জ্যোতির্মঠ থেকেই রবিগ্রামের নতুন নাম হয় জোশীমঠ।

জোশীমঠে বসে তরুণ শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র গীতা ও উপনিষদের ভাষ্য সহ ষোলখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তখন রবিগ্রামের একটি মন্দিরে নিয়মিত নরবলি দেওয়া হত। শঙ্কর সেই পৈশাচিক প্রথা বন্ধ করে দেন।

গতকাল আমরা আবার জ্যোতির্মঠ দর্শন করেছি। আমাদের হোটেল থেকে অনেক উঁচুতে, অনেকখানি এলাকা নিয়ে মঠ, সাধুদের বাসগৃহ ও যাত্রীনিবাস। চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ এখনও রমণীয়।

মঠের সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ফুল ফল ও সবজির বাগান। সামনে চওড়া বারান্দাযুক্ত একটি বেশ বড় দোতলা বাড়ি ও কয়েকটি ছোট বাড়ি নিয়ে মঠ। বড় বাড়ির দোতলায় শঙ্করাচার্যের গদি। কার্পেটে ঢাকা বেদির ওপরে আদি শঙ্করাচার্যের চিত্রিত মূর্তি। আমরা প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি।

গদি দর্শনের সময়েই দেখা হয়ে যায় আমার এক পরিচিত স্বামীজি মহারাজের সঙ্গে। দুজনেই খুশি হলাম। তারপরে আমাদের সব খবরাখবর নিয়ে অভিমানের স্বরে তিনি বললেন—হোটেলে না উঠে, আপনারা তো এখানে চলে এলেই পারতেন। আমাদের যাত্রীনিবাসের ঘর খালি পড়ে রয়েছে। এবং সেই ঘর বোধহয় আপনাদের হোটেলের ঘরের চেয়ে খারাপ নয়।

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলি—মাফ করবেন, সারাদিন বাসের ধকল সহ্য করার পরে এখানে আসার কথাটা ঠিক মনে পড়ে নি। হোটেল ঠিক করে ফেলেছি। কি করব, এতগুলো মানুষ আর প্রচুর মালপত্র। অনুগ্রহ করে আপনি কিছু মনে করবেন না।

—বেশ, মনে করব না, যদি আপনারা আমার একটা শর্ত মেনে নেন?

—আদেশ করুন!

—ফেরার পথে এখানে উঠবেন।

আমরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। স্বামীজি খুশি হন। তিনি আমাদের নিয়ে আসেন আদি শঙ্করের তপস্যাধন্য তোটকাচার্য গুম্ফায়।

আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে পুণ্যভূমি দর্শন করি।

গুম্ফা থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীজি বলেন—জোশীমঠ এখন তার পবিত্র তপস্যাস্নিগ্ধ রূপ হারিয়ে একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত। তাই এখান থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে লোকালয়ের বাইরে আমরা একটি বেশ বড় গুহা খুঁজে বের করেছি। নাগরিক জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই সেখানে চলে যাই, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি। সময় হলে আপনারাও সেখানে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতে পারেন। থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থাই করে দিতে পারব।

কি বলব ? ওকে কেমন করে বোঝাই। আমরা সংসারের কীট। ঈশ্বর-সন্নিধানের অবকাশ নেই আমাদের জীবনে। তাহলেও তাঁকে অদূর ভবিষ্যতে সেই গুহায় যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিয়েছি সেই অতিথিপরায়ণ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে। সদলবলে এগিয়ে চলেছি এস. ডি. ও. বাংলোর দিকে।

চলতে চলতে ভেবেছি...। না, প্রবীণ সন্ন্যাসীর কথা নয়, শঙ্করাচার্য ও তোটকাচার্যের কথা। ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি।

শঙ্করাচার্য যখন আবির্ভূত হন, তখন বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে হিন্দুধর্ম ভেসে যেতে বসেছে। বৌদ্ধরা কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের মন্দির অধিকার করে বৌদ্ধতীর্থে রূপান্তরিত করেছেন। বদ্রীবিশালের মূর্তিকে বুদ্ধাবতার বলে প্রচার চালাচ্ছেন। প্রতিবাদ জানালেন আচার্য শঙ্কর। যুক্তি প্রদান করে তিনি প্রমাণ করলেন, কেদারনাথ শৈবতীর্থ আর বদ্রীনাথ বিষ্ণুতীর্থ। এবং সেকথা সোচ্চার স্বরে সারা ভারতবর্ষে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। অনতিকালের মধ্যে তীর্থযাত্রা শুরু হয়ে গেল। দলে দলে হিন্দু তীর্থযাত্রী ছুটে আসতে থাকলেন।

শঙ্করাচার্য তখন কেদার-বদ্রীর মন্দিরকে কলুষমুক্ত করবার জন্য দুটি মন্দিরেই দু-জন উপযুক্ত রাওয়াল বা প্রধান পুরোহিত নির্বাচিত করলেন। পরবর্তীকালে তিনি হিন্দুজাতিকে সংঘবদ্ধ করতে ভারতের পাঁচপ্রান্তে পাঁচটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরীতে গোবর্ধন মঠ, বিষ্ণুকাঞ্চীতে কামকোটি মঠ, শ্রীরঙ্গমে শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকায় সারদামঠ ও বদ্রীক্ষেত্রে জ্যোতির্মঠ।

জ্যোতির্মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য তিনি অথর্ব বেদের ওপরে এক তর্কসভার আয়োজন করেন। অথর্ববেদ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জনক এবং ওষধির জনক হল হিমালয়। আর তাই শঙ্করাচার্য প্রথম তিনটি বেদকে বাদ দিয়ে চতুর্থ বেদকেই পরীক্ষার বিষয় স্থির করেছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে জোশীমঠের অধ্যক্ষ কেবল দেবার্চনা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন না, সেই সঙ্গে তিনি হিমালয়ের ওষধি নিয়ে গবেষণা করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলে মানুষের মঙ্গল সাধন করবেন।

পরীক্ষায় প্রথম হলেন তোটকাচার্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ। তাঁরই নামাঙ্কিত গুম্ফা দর্শন করেছি গতকাল। অথর্ব বেদের ওপরে পরীক্ষার মাধ্যমে অধ্যক্ষ নির্বাচনের নিয়ম এখানে প্রায় চারশ' বছর ধরে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ জ্যোতির্মঠের অধ্যক্ষ সেই সুদীর্ঘকাল শুধু নারায়ণ-সেবা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নি, সেই সঙ্গে নরনারায়ণের সেবাও করেছেন। তিনি ছিলেন সেকালে এ অঞ্চলে হার্বাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টার।

॥ দুই ॥

জোশীমঠ থেকে তপোবন

সকালে ঘুম ভাঙল বৃষ্টির শব্দে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। অতএব বর্ষাকাল নয়। এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি এটি গাড়োয়াল-কুমায়ুনে পর্বতারোহণের খুবই নিরাপদ সময়।

কিন্তু হিমালয়ের খেয়ালী-প্রকৃতি পঞ্জিকা কিংবা অভিজ্ঞতার পরোয়া করে না। তাই হিমালয়ের যাত্রীকে অবিরত প্রকৃতির করুণা প্রার্থনা করতে হয়। প্রকৃতির প্রসন্নতা ছাড়া কোন হিমালয় অভিযান সফল হয় নি।

সুতরাং বৃষ্টির শব্দ শুনে মনটা ভারি হয়ে ওঠে। আমরা পরশু ভোররাতে ঋষিকেশ থেকে বাস ধরেছি। প্রায় সারাদিনের বাসযাত্রায় পথে কোথাও বৃষ্টি পাই নি। গতকাল জোশীমঠেও ঝকঝকে রোদ পেয়েছি। অতএব বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। আর আজ সকালেই প্রকৃতি এমন নির্দয়া হলেন!

আজই আমরা হিমালয়ের অন্তর্লোকে যাত্রা শুরু করব। বাসযাত্রা, তাহলেও আবহাওয়া ভাল থাকা প্রয়োজন। অবশ্য 'মর্নিং সোজ্ দা ডে' কথাটা হিমালয়ের বেলায় সত্য নাও হতে পারে। কিছুক্ষণ বাদেই হয়তো মেঘভাঙা রোদে জোশীমঠ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে। আবার...। হ্যাঁ, আবার এ অকাল-বর্ষণ অবিশ্রান্ত ধারায় দিনের পর দিন ধরে চলতে পারে। না, না, প্রকৃতি আমাদের প্রতি অকারণে এমন অকরুণ হবেন না।

সে আশা বিফল হয় না। কিছুক্ষণ বাদে সত্যই বৃষ্টি বন্ধ হল। আমরা আনন্দিত হয়ে উঠলাম।

রুটি ও সবজি এবং চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে সহনেতা গৌতম চক্রবর্তী ও সদস্য শঙ্কর ভট্টাচার্য বাসস্ট্যান্ডে চলে গেল। মেট মানে মালবাহকদের সর্দার শের সিং ওদের সঙ্গে গেল। শের সিং লতা গ্রামের যুবক। সে উত্তরকাশী থেকে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়েছে। সে আমাদের গাইড-কাম-ট্রানসপোর্ট এজেন্ট-ও বটে। নেতা অমূল্যের পূর্ব পরিচিত। তাই চিঠি পেয়ে গতকালই জোশীমঠে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

শের সিং-কে নিয়ে আমরা এখন দলে উনিশজন। তাই বাস ড্রাইভার বাসটাকে আমাদের হোটেলের সামনে নিয়ে আসতে সম্মত হয়েছেন। মালপত্র নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে যাবার ঝামেলা পোহাতে হবে না। গৌতমরা বাস নিয়ে আসার জন্য তাই তাড়াতাড়ি স্ট্যান্ডে চলে গেল।

আমরাও জলখাবার খেয়ে নিয়ে মালপত্র বয়ে আনি রাস্তায়। বাস আসার অপেক্ষায় থাকি।

কিন্তু কোথায় বাস? ওঁরা বলেছিলেন, সকাল আটটা নাগাদ বাস এখানে আসবে। তারপরে ফিরে যাবে বাসস্ট্যান্ডে। অন্যান্য যাত্রীদের তুলে নিয়ে ঠিক ন'টায় রওনা হবে মালারির পথে।

এদিকে যে ন'টা বেজে গেল। বাস আসে নি। গৌতমরাও ফিরে আসছে না। কি ব্যাপার?

ব্যাপার যাই ঘটে থাকুক, আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। হিমালয়

ধৈর্যহীনের জন্য নয়।

আর এ কথাটা আজ আরেকবার প্রমাণিত হয়ে গেল। বেলা দশটার সময় হেলে-দুলে বাসটা এসে হাজির হল হোটেলের সামনে। কন্ডাক্টার সেই পুরনো গল্প শোনালো—ইঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছিল, সারানো হয়ে গেছে। এখন আমরা নির্ভয়ে যাত্রা করতে পারি।

সকাল ন'টার জায়গায় বেলা পৌনে এগারোটায় বাস রওনা হল মালারির পথে। জোশীমঠ থেকে উচ্চ-হিমালয়ের দুটি মোটরপথ—বদ্রীনাথ ও মালারি। প্রথমটি অলকানন্দার তীরপথ ধরে উত্তর-পশ্চিমে মানা গিরিপথের দিকে আর দ্বিতীয়টি ধৌলিগঙ্গার তীরে তীরে উত্তর-পুবে নিতি গিরিদ্বারের পথে। ধৌলিগঙ্গার অপর নাম বিষ্ণুগঙ্গা। সে বদ্রীনাথের পথে বিষ্ণুপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে।

একটা পুলের ওপর দিয়ে ধৌলি পার হয়ে তার বাঁ তীরে এলাম। তারপরে ধৌলির ধারে ধারে এগিয়ে চললাম উত্তর-পুবে। এখান থেকে পাহাড়ের ওপরে জোশীমঠকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমরা আজ হাতি পর্বত ও তার প্রতিবেশি এক নামহীন শৃঙ্গ অভিযানে চলেছি। বিশ্ববিখ্যাত সুসাহিত্যিক ও পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ হাতি পর্বতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'Kamat Conqured' এবং 'Valley of Flowers' গ্রন্থ দু'খানিতে বেশ কয়েকবার এই অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গটির বিবরণ দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ছিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ছিলেন আলোকচিত্রকর দার্শনিক সুসাহিত্যিক ও পর্বতারোহী। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৩১ সালে গাড়োয়ালের উচ্চতম পর্বতশিখর কামেট (২৫,৪৪৭ফুট/৭,৭৫৬ মিঃ) শৃঙ্গ বিজিত হয় এবং তিনি নিজে শিখরে আরোহণ করেন। সেই সাফল্য বিশ্ব-পর্বতারোহণের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কারণ তার আগে আর কোন অভিযাত্রীদল পঁচিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি।

ভাবলে অবাক হতে হয়, সেকালের অভিযাত্রীরা কত সময় অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে হিমালয়ে আসতেন। তখন এইসব মোটরপথ ছিল না। তাই অভিযাত্রীদের পদযাত্রা শুরু করতে হত রাণীক্ষেত থেকে। কুয়ারি গিরিবর্ত্ম (১২,৪০০'/৩৮৭৫ মিঃ) অতিক্রম করে তাঁদের উপনীত হতে হত, ধৌলিগঙ্গা উপত্যকায়। স্মাইথ সেই গিরিবর্ত্মের ওপর থেকেই প্রথম হাতি পর্বতকে দেখতে পান। তাঁর ভাষায়—'...to the west, the square topped summits of Gouri Parbat and Hathi Parbat rose like fabulous monsters from a sea of lesser ridges.'

কিন্তু হাতি পর্বত ও ফ্রাঙ্ক স্মাইথের কথা আবার পরে ভাবা যাবে, এখন একটু ধৌলিগঙ্গা উপত্যকাটিকে দেখে নেওয়া যাক। শুনেছি এই উপত্যকার নিম্নাঞ্চল অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে তপোবন পর্যন্ত ভূতাত্ত্বিক বিচারে খুবই আকর্ষণীয়। এখানে ধৌলির দু-ধারেই পাহাড়। ধৌলি যেন পাহাড় কেটে নিজের পথ করে নিয়েছে। তাহলেও কিন্তু দু-ধারের পাহাড়ী প্রকৃতিতে প্রচুর পার্থক্য। এপারে অর্থাৎ ধৌলির এই উত্তর-তীরে পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে গিয়েছে। তাদের গায়ে যেখানেই মাটি পেয়েছে, হিমালয়ের পরিশ্রমী মানুষ সেখানে ফসল ফলিয়েছেন। যেখানে চাষ করা যায় নি, সেখানে ছোট-বড় গাছের ঘন জঙ্গল। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন, তুষার যুগে বরফের চাপ বা Glaciation-এর জন্যই এ তীরে পাহাড়গুলোর এমন গড়ন হয়েছে।

দক্ষিণতীরে পাহাড়গুলির গড়ন কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। তারা ধৌলির গা ঘেঁষে প্রায় সোজা ওপরে উঠে গিয়েছে। তাদের গায়ে গাছপালা আছে কিন্তু জমি তৈরির জায়গা নেই। আর তাই এখানে ধৌলি উপত্যকা বলতে এই উত্তরপার। এবং মোটর পথটিও এ তীর দিয়েই প্রসারিত। আমরাও বাসে বাসে বার বার এপারকেই দেখছি। দেখছি পাহাড়ের বুকে ধাপে ধাপে ক্ষেত-খামার। ক্ষেত নয়, যেন স্বর্গের সবুজ সিঁড়ি।

আবার একটু ফ্রাঙ্ক স্মাইথের স্মৃতি চারণ করা যাক। আগেই বলেছি স্মাইথ বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও পর্বতারোহী। তিনি এভারেস্ট অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমার কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স বা নন্দনকানন আবিষ্কার। আকস্মিক ভাবে জগতে বহু আবিষ্কার হয়েছে। পথ হারিয়ে এক পথিক পিরামিড আবিষ্কার করেছেন, সিংহ খুঁজতে-খুঁজতে এক বৃটিশ শিকারী অজন্তা আবিষ্কার করেছিলেন। হিমালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। ভেড়া খুঁজতে গিয়ে জনৈক মুসলমান মেষপালক হিন্দুব পরমতীর্থ অমরনাথ গুহা আবিষ্কার করেন। তেমনি কামেট শৃঙ্গ আরোহণের পরে ফিরে আসার পথে স্মাইথ ও তাঁর সহযাত্রী আর. এল. হোল্ডসওয়ার্থ নিতান্তই আকস্মিক ভাবে নন্দন-কাননে উপনীত হন। তাঁরা দুজনে মালবাহকদের নিয়ে গামশালি গ্রাম থেকে ফিরে আসছিলেন। সহসা প্রবল তুষারঝড় শুরু হয়ে গেল। স্মাইথ ও হোল্ড্সওয়ার্থ দিশেহারা হয়ে অন্ধের মতো ছুটতে থাকেন। তাঁরা দুজনে দলছাড়া হয়ে যান। ছুটতে ছুটতে একটা গিরিপথ বেয়ে আরেকটা উপত্যকায় উপনীত হন।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড় অদৃশ্য হল, আঁধার অপসৃত হয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। সহসা হোল্ডসওয়ার্থ উপলব্ধি করলেন—'I was simply surrounded by Primulas.'

আর স্মাইথ বলেছেন—'In all my mountain wanderings I had not seen a more beautiful flower than this Primula '

এবং সেই স্বর্গীয় কাননে সেই পারিজাততুল্য ফুলের এতই সমারোহ যে—'it was impossible to take a step without crushing a flower.'

কারণ যতদূর দেখা যায় শুধুই ফুল আর ফুল। হলদে Saxifraga, নীল Gentiana, সাদা Anaphalis, হলদে Tanacetum, হলদে Cerijdalis, বেগুনি Potentilla আর অসংখ্য ব্রহ্মকমল (Saussurea obvallata), হেমকমল (Saussurea Grandiflora) ও ফেন কমল (Saussurea Gossypiphora)—স্বর্গের পারিজাত। জগতে যত রূপ আছে, যত রস আছে, যত গন্ধ আছে, যত রঙ আছে, সব একই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে তাঁদের সামনে।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হয়েও অনিবার্য কারণে স্মাইথ সেবারে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। নন্দন-কাননের অক্ষয় স্মৃতি নিয়ে ফিরে গেলেন দেশে। ছ'বছর বাদে ১৯৩৭ সালে আবার ফিরে এলেন সেই ভুইন্দার উপত্যকায়—নন্দন-কাননে, তাঁর ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্সে। দীর্ঘদিন বাস করে বহু প্রজাতি সংগ্রহ করলেন আর চারিপাশের শৃঙ্গগুলির কয়েকটিতে আরোহণ করলেন।

সেবারে স্মাইথ একাই এসেছিলেন। কারণ তিনি পর্বতারোহণ করতে আসেন নি, এসেছিলেন হিমালয়ের অন্তরলোকে ছুটি কাটাতে আর উদ্ভিদ সমীক্ষা করতে।

দেশে ফিরে গিয়ে তিনি রচনা করলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ The Valley of Flowers (1938)। বইখানিতে তিনি হাতি পর্বত প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তাঁর শিবির থেকে

মাত্র মাইলদুয়েক দূরে ছিল—

'a side valley ascending towards Hathi Parbat. Seen against a brilliant morning light this great mountain appeared magnificent and its massive, wall-sided precipices support a remote little snow-field tapering languidly into snowy summit...but it appears totally inaccessible from west (নন্দন-কাননের দিক থেকে) owing to steep icefalls exposed to ice avalanches from hanging glaciers.'

তার মানে নন্দনকাননের দিক থেকে হাতি পর্বতে আরোহণ করা সম্ভব নয়। আর আমরাও তাই নন্দনকানন অর্থাৎ বদ্রীনাথের পথে না গিয়ে মালারীব বাসে উঠেছি।

কিন্তু পর্বতারোহণের কথা পরে হবে, তার আগে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স'-এর আরও কিছু কথা ভেবে নেওয়া যাক। স্মাইথ তাঁর শিবির থেকে গৌরী পর্বত, হাতি পর্বত, দুনাগিরি, নন্দাদেবী এমন কি নীলকণ্ঠ শিখরকে পর্যন্ত দেখতে পেতেন। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত শৃঙ্গমালা ক্লান্ত পর্বতাভিযাত্রীর রাতের ঘুম কেড়ে নিত। নন্দনকানন ও হাতি পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—'gazing on the stupendous panorama of mist swathed ridges, deep blue valleys and the remote snows of Hathi Parbat shining...in slow-moving columns of thundercloud.'

আর বইখানির প্রস্তাবনায় স্মাইথ লিখেছেন—'The Valley of Flowers, a valley of peace and perfect beauty where human spirit may find repose.'

এই বই পড়ে ছাব্বিশ বছর আগে আমরা নীলগিরি পর্বত (২১,২৪০'/৬,৪৪০মিঃ) অভিযানের আয়োজন করেছি। আজ চলেছি হাতি পর্বতে।

কিন্তু তাঁর কথা ভাবলে আমাদের ছাব্বিশ বছরের সব প্রচেষ্টা মূল্যহীন হয়ে যায়। তাঁর নাম জোয়ান মার্গারেট লেগি (Joan Margaret Leggi) লন্ডনের জনৈকা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। স্মাইথের 'ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স' পড়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন নন্দন-কাননে, ১৯৩৯ সালে। তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বছর। স্বামী ও সংসার ফেলে একাই চলে এসেছিলেন। তখনকার দিনে বিলেত থেকে বারো ঘন্টায় ভারতে উড়ে আসার রেওয়াজ ছিল না। আসতে হত জাহাজে। তারপর বম্বে থেকে রেলে হরিদ্বার। সেখান থেকে ঘোড়ার পিঠে কিংবা পায়ে হেঁটে। কিন্তু বইখানি পড়ে তিনি এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে এই দীর্ঘ এবং দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে একাই চলে এলেন।

তাঁবু টাঙিয়ে বাস করতে শুরু করলেন। সঙ্গে জন দুয়েক গাড়োয়ালি মালবাহক। স্বর্গীয় উদ্যান ও চারিপাশের তুষারাবৃত পর্বতমালার শোভা দেখে আর প্রজাতি সংগ্রহ করে মহানন্দে দিন অতিবাহিত করতে থাকলেন। লন্ডন শহরের প্রাচুর্যময় জীবনকে বিস্মৃত হয়ে তিনি রামদানার রুটি আলুর সবজি আর ঝরণার জল খেয়ে জীবনধারণ করে চললেন। ফেলে আসা সংসারের আকর্ষণ কিংবা হিমালয়ের হিমেল হাওয়া তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে তুলতে পারল না।

কিন্তু নিষ্ঠুর জীবনদেবতা বোধকরি তাঁর সেই আনন্দময় একাকী জীবনকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। একদিন যখন তিনি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আর ফুল দেখছিলেন, তখন একটি ফুল দেখে আকৃষ্ট হলেন। ফুলটা ফুটেছিল অনেক ওপরে।

তপোবনে। তারিখটা ছিল ১৯৩১ সালের ২৯শে মে। যে তারিখটি বিশ্ব-পর্বতারোহণের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কারণ ঠিক তার বাইশ বছর বাদে ঐ তারিখে আরেক বৃটিশ অভিযাত্রীদল বিশ্বের উচ্চতম শিখরে মানুষের পদচিহ্ন এঁকে দেন। ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে কর্ণেল জন হান্ট্-এর নেতৃত্বে তেনজিং এবং হিলারি এভারেস্ট শিখরে (২৯,০২৮'/৮,৮৪৭ মিঃ) আরোহণ করেছেন।

স্মাইথ ও তাঁর সহযাত্রীরা একদিন তপোবনে বিশ্রাম করে আবার তাঁদের পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁরা চারদিন ধরে চড়াই ভেঙে মালারি পৌঁছতে পেরেছিলেন। সেই পথটুকু যেতে আজ আমাদের চারঘন্টাও লাগে না। আমাদের অবশ্য মালারি পর্যন্ত যেতে হবে না। তার আগেই এই বাস-যাত্রার যতি পড়বে।

কিন্তু সেকথা এখন থাক। এখন একালের পথের দিকে তাকানো যাক। তপোবন বাসস্ট্যান্ড থেকে চলা শুরু করে একটু বাদেই পথের পাশে উষ্ণকুন্ড আর দেবী পার্বতীর মন্দির। সেকালে পর্বতারোহীরা প্রায় প্রত্যেকেই কুন্ডস্নান করে পথকষ্টের গ্লানিমুক্ত হতেন। একালে সে প্রয়োজন পড়ে না, সুযোগও নেই। সুতরাং চলমান যন্ত্রযানে বসেই প্রণাম জানাই হিমালয় দুহিতা দেবী ভগবতীকে আর লুব্ধ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিই উষ্ণকুন্ডটিকে। বাস এগিয়ে চলে। জনপদটি যায় হারিয়ে।

পাইন বনের ভেতর দিয়ে পথ। ডাইনে পাহাড। কোথাও কাছে কোথাও দূরে। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আর ছোট-বড ক্ষেত—ভুট্টা রামদানা আলু এবং শাক-সবজি। বাঁয়ে বয়ে চলেছে ধৌলি। তার ধবলধারা ছুটে চলেছে গৈরিক অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হতে, গঙ্গা আর পদ্মাকে সমৃদ্ধ করতে।

দুপুর সওয়া বারোটায় আমরা রিনি (৬০০০') গ্রামে এলাম। ঋষিগঙ্গা ও ধৌলিগঙ্গার সঙ্গমে রিনি। পাহাড়ে ঘেরা একটি রমণীয় গ্রাম। একটা পুলের ওপর দিয়ে ঋষিগঙ্গা পার হয়ে বাস ছুটে চলে মালারির পথে। এই ঋষিগঙ্গার প্রবাহ ধরেই নন্দাঘুন্টির পথ।

মাত্র মিনিট পনেরো পরেই বাস নিশ্চল হল। শের সিং উঠে দাঁড়িয়ে বলে—লতা এসে গেছে।

খুবই তাড়াতাড়ি চলে এলো বলতে হবে। তপোবন থেকে লতা ১০ কিলোমিটার। ওর সঙ্গে আমরাও নেমে আসি বাস থেকে। এপথের বৃহত্তম জনপদ এই লতাগ্রাম। এখানেই শের সিং-য়ের বাড়ি। এখান থেকেই অভিযানের মালবাহকরা বাসে উঠবে।

বাস থেকে নামতেই দেখা হয়ে যায় তাদের সঙ্গে। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল আমাদেরই প্রতীক্ষায়। সংখ্যায় ছ'জন। প্রত্যেকের পিঠে রুকস্যাক, পরনে কম্বলের কোট-প্যান্ট, পায়ে হান্টার। সবাই বেশ সপ্রতিভ ও স্বাস্থ্যবান যুবক। দেখে পছন্দ হয় নেতা ও সহনেতার।

সেকথা বলতেই শের সিং শুনিয়ে দেয়—পছন্দ যে হতেই হবে লীডারসাব্। এরা তো সাধারণ 'পোর্টার' নয়, এরা হল গিয়ে 'হ্যাপ্'।

'HAP' মানে 'High Altitude Porter.' পর্বতারোহণের অভিধানে তাদের স্থান শেরপাদের পরেই। মজুরিও সাধারণ মালবাহকদের চেয়ে বেশি। কারণ তারা তুষারাবৃত উচ্চ-হিমালয়ে মাল বয়, পথ তৈরি করে, 'ফিক্সড্ রোপ' লাগায়। এরা পারবে কিনা জানা নেই আমাদের। তাহলেও স্বাগত জানাতে হয় ওদের। কারণ আমাদের মেট এদের নিয়োগ করেছে।

মালবাহকদের প্রসঙ্গ শেষ হতেই শের সিং বলে—সাব, এখান থেকে আলু কিং
নিতে হবে।

—কেন ওপরে পাওয়া যাবে না? লীডার বিস্মিত! কারণ ওপরে আলু শস্তা হবে বলে শের জোশীমঠে আলু কিনতে দেয় নি।

—আমাদের যে অনেক আলু দরকার।

—হ্যাঁ। ষাট কেজি। গোরা বলে।

—অত আলু ওপরে পাওয়া মুশকিল। শের সিং-য়ের স্বরে হতাশা।

অতএব আমরাও ঝুঁকি নিতে সাহস পাই না। শের এবং তার ছ'জন মালবাহক নিয়ে এখন আমরা দলে পঁচিশজন। আলু উচ্চহিমালয়ে একমাত্র আনাজ। তাই ক্যাশিয়ার শঙ্কর মুখার্জিকে নেতা বলে—ওর সঙ্গে দোকানে যাও। দুটো বস্তায় ষাট কেজি আলু কিনে নিয়ে এসো।

কোয়ার্টার মাস্টার গোরাচাঁদ পাল ওদের সঙ্গী হয়। খাবারের হাঙ্গামা তো তাকেই সামলাতে হবে। তাই সে আলুটা দেখে নিতে গেল।

ওরা চলে যাবার পরে রঞ্জু (অমিতাভ দেওয়ানজি) মন্তব্য করে—ওপরে গিয়ে আলু কিনলে শের কোন কমিশন পেত না। এটা ওর নিজের গ্রাম, এখানে পাবে।

—সর্বত্রই বফর্সের ব্যাপার। পর্বতারোহী জগদীশ (নস্কর) যোগ করে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলু এসে যায়। শঙ্কর জানায়—দোকানি দুটো বস্তায় বোঝাই করেই রেখে দিয়েছিলেন, এখন শুধু ওজন দেখিয়ে দিলেন।

—তার মানে শের আগেই সব ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। পর্বতারোহী বুবেন রায়চৌধুরী কানে কানে বলে।

আমি মাথা নাড়ি। কিন্তু তারপরেই শের সিং আমাদের ম্যাজিক দেখায়। তার হ্যাপরা বস্তা দুটিকে বাসের ছাদে তুলে দিতে পারে না। কারণ দুহাতে সিঁড়ি না ধরে বাসের ছাদে ওঠা যায় না। তাই শের সিং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে দুবারে বস্তা দুটিকে ছাদে তুলে দিল। না, ছেলেটার এলেম আছে বলতে হবে।

পায়লট বাস ছাড়েন। লতা গ্রাম পড়ে থাকে পেছনে। আমরা এগিয়ে চলি।

একটু বাদেই আরেকটা গ্রাম, টোলমা—ছোট গ্রাম। কিন্তু সেটি ছাড়িয়েই একটা বেশ বড় গ্রাম। নাম সুরাইতোটা।

শের বলে—নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলো আছে।

কথাটা মনে পড়ে যায়। ষাট বছর আগেও এটি বেশ সমৃদ্ধ ও সুন্দর গ্রাম ছিল। স্মাইথ ও তাঁর সহযাত্রীরা সেদিন তপোবন থেকে চলা শুরু করে এখানে পৌঁছে প্রথম রাতটি অতিবাহিত করেন। তিনি সুরাইতোটার এই তৃণাচ্ছাদিত সমতলকে 'dreamland' আখ্যা দিয়েছেন। সত্যি তাই।

গ্রাম পেরিয়েই পথটা নেমে চলল ধৌলির ধারে। নামতে নামতে আমরা একেবারে বেলাভূমিতে উপস্থিত হলাম। না, এখানে নদীর ওপরে কোন পুল নেই, রয়েছে নিরেট পাথর। সেই পাথরের মাঝে কয়েকটা সরু নালা। তাদেরই ভেতর দিয়ে উচ্ছ্বসিত ধারায় ধৌলি গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাস সেই নিরেট পাথরগুলির ওপর দিয়েই ওপার থেকে এপারে চলে এলো। নদীর ওপর দিয়েই আমরা নদী পার হয়ে এলাম।

পাহাড়ের গা বেয়ে বাস উঠে এলো অনেকটা ওপরে। তারপরে আবার ধৌলির

ধারে ধারে চলল এগিয়ে। এখন আমরা ধৌলির পশ্চিম পারে।

শের ঘড়ি দেখে। বলে—বেলা একটা বেজে পাঁচ। দুটো নাগাদ আমরা কোসা পুলের কাছে পৌঁছে যাবো।

কিন্তু হিমালয়ের ছেলে হয়ে সময়ের এমন হিসেব করা উচিত হয় নি ওর। হিমালয়ের পথ দুরত্ব দিয়ে মাপা হয় না, মাপা হয় দুর্গমতা দিয়ে। আর তাই হিমালয়ের পথ হিসাবের ধার ধারে না, সে যে প্রকৃতির খেয়ালের খেলনা।

তাছাড়া পথের পাশের গিলা বা কাচা পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আর হাওয়ার বেগ দেখে ওর বোঝা উচিত ছিল, যেকোন মুহূর্তে আমরা ধসের সামনে পড়ে যেতে পারি।

তাই পড়ে গেলাম। পথে ধস নেমেছে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বাস থেমে গেল। সামনে আরও তিনখানি গাড়ি। একখানি ট্রাক ও দুখানি জিপ। জিপের আরোহীরা জওয়ান। তাঁরাই খালি হাতে ধস পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে হাত লাগাই।

পর্বতারোহী শ্রীকৃষ্ণ (দাশগুপ্ত) ও তপনকে (ঘোষ) নেতা নির্দেশ দেয়—বাসের ছাদে উঠে ছ' নম্বর বস্তাটা খুলে দুখানি গাঁইতি আর খানকয়েক আইস অ্যাক্স নামাও। খালি হাতে এ ধস পরিষ্কার করতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

গাঁইতি ও আইস অ্যাক্স পেয়ে জওয়ানরা ভারি খুশি। সকলের সমবেত চেষ্টায় পথটি গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত করে তোলা সম্ভব হল। কিন্তু ইতিমধ্যে বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। মানুষ প্রস্তাব করে, ভগবান বাদ সাধেন! না ভগবান নন, প্রকৃতি। হিমালয়ের পথে প্রকৃতিই ভগবান।

ধস পার হবার পরে পথটা কিছু ভাল হয়েছে। বাস বেশ জোরে ছুটে চলেছে। আগে খেয়াল করি নি, এখন দেখতে পাই পথের পাশে টেলিফোন লাইন। কিন্তু তার চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য দুনাগিরি। ওপারে, অনেক দূরে, তবু এখান থেকে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে।

জুমা ও জেলাম গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম। জুমাতে নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলো ও জেলামে পোস্টাপিস রয়েছে। স্মাইথ এই পাইন বনে ঘেরা জেলাম গাঁয়ে পরের রাতটি অতিবাহিত করেছেন।

জেলাম ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে একটা লোহার পুল পার হয়ে বাস আবার ধৌলির পুবপারে চলে এলো।

একটু বাদেই একটা ছোট গ্রাম।

শের বলে—বাপনকুণ্ড। এখানেও একটা উষ্ণকুণ্ড আছে। আমরা লতা থেকে ২৬কিলোমিটার অর্থাৎ জোশিমঠ থেকে ৫১ কিলোমিটার পথ এসে গেলাম।

একবার থামে সে। কিন্তু আমরা কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারার আগেই সে আবার বলে—এই বাপনকুণ্ড গাঁও থেকেই কাল সকালে আমাদের খচ্চর যাবে।

উষ্ণকুণ্ডের সঙ্গে খচ্চর তথা আমাদের মাল পরিবহনের ঘোড়াগুলোর কি সম্পর্ক জানা নেই আমার। বাপনকুণ্ড খচ্চর সরবরাহের জন্য বিখ্যত কিনা, তাও জানি না। তাই আমি ওকে অন্য প্রশ্ন করি—কোসাপুল আর কতদূর?

—দো কিলোমিটার সাব্। স্রেপ দো কিলোমিটার।

তাহলেও উল্লসিত হয়ে ওঠা উচিত হবে না। হিমালয়ের পথ। এ পথে দুর্ভোগের জন্য দু-কিলোমিটার খুব কম দূরত্ব নয়। পথটিকে অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ বলেই মনে হচ্ছে। সুন্দরও বটে। পথের দু-পাশেই পাইন আর দেওদারের সারি। ডানদিকের পাহাড়, পথ থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেছে। আর বাঁদিকটা ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে ধৌলির ধারে। পাহাড়ের গায়ে আর ধৌলির ধারেও গাছের সারি। মনে হচ্ছে আমরা ছায়া সুনিবিড় বনপথ ধরে চলেছি এগিয়ে।

এই বন সম্পর্কে স্মাইথের মন্তব্যটি মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন—এই গাছগুলি সম্ভবত 'survivors of a forest felled before the advent of British Rule and the forest conservation laws. Among them are many lordly trees, hundred and possibly thousnads of years old. What inscrutable process of nature decreed their growth in this particular spot, far from their fellows of the lower valleys?'

বনভূমির রূপ দর্শন করে মোহিত স্মাইথ কেন ধৌলির দিকে নজর দেন নি, বুঝতে পারছি না। বোধকরি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বলে। আমার মনে হচ্ছে বনভূমি যদি রূপ হয়ে থাকে, ধৌলি তাহলে রস। সে আছে বলেই বন এমন সুন্দর। আমি তাই তাকিয়ে তাকিয়ে তাকেও দেখি—অলকানন্দার শ্রান্তিহীনা সখী। তার পদসঞ্চারে মূক বনভূমি সর্বদা মুখর হয়ে রয়েছে।

তবে সেই সঙ্গীতসুধা কলের গাড়িতে বসে পান করার যন্ত্রণা বেশিক্ষণ ভোগ করতে হল না। বাস থেমে গেল। শেষ হল বাস ভ্রমণ। নেমে এলাম পথে, হিমালয়ের কোলে।

সামনে, সামান্য দূরে, বাঁদিক থেকে একটা ছোট নদী এসে ধৌলিতে মিশেছে। শের বলে—কোসা নদী।

ঘড়ির দিকে তাকাই, পৌনে তিনটে। তার মানে ৫৩ কিলোমিটার পথ আসতে চার ঘণ্টা লাগল।

হ্যাপ এবং শেরপারা বাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামিয়ে নেয়। বাস চলে যায় মালারির পথে। আরও ৬ কিলোমিটার, উচ্চতা ১০,০১৪ ফুট।

আমরা যেখানে বাস থেকে নেমেছি, তার খানিকটা নিচে ধৌলির তীরে একফালি সুন্দর সমতল। পাইন আর দেওদারের ছায়ায় ঘেরা রমণীয় স্থান। তারই একপ্রান্তে একটি কাঠের পুল। পুলের ওপারে কোসা গ্রামের চড়াই পথ। কেবল কোসা গ্রামের পথ বলছি কেন, হাতি পর্বতের পথও বটে।

শের সিং বলে—এখান থেকে কোসাগাঁও চড়াই পথে এক কিলোমিটার। ছ'জন হ্যাপ এত মাল সন্ধ্যের আগে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া খচ্চরওলারা খুব সকালে এখানে চলে আসবে। কথা হয়েছে এখান থেকেই তারা মাল তুলবে।

নেতা মেটের অনুক্ত প্রস্তাব বুঝতে পারে। বলে—তাহলে আজকের রাতটা এখানেই তাঁবু ফেলে কাটিয়ে দেওয়া যাক, কি বলো?

—জী সাব্। শের মাথা নাড়ে। আমরাও খুশি হই। গাঁয়ে গিয়ে কোন ঘরে ঢুকতে হল না, আজ থেকেই হিমালয়ের কোলে আশ্রয় পাওয়া গেল।

পথ থেকে সব মালপত্র নামিয়ে আনা হল ধৌলির ধারে, সেই সুন্দর সমতলে। জায়গাটাকে পরিষ্কার করে মেস-টেন্ট্ ও দুটি ছোট তাঁবু খাটানো গেল। এখানে

মেষপালকদের একটা পরিত্যক্ত পাথরের ঝুপড়ি রয়েছে। সেটা পরিষ্কার করে রান্নাঘর করা হল। রান্নার পরে দু-জন হ্যাপ ঘুমোতেও পারবে।

চানাচুর ও চিঁড়েভাজা দিয়ে চা-পর্ব শেষ করার মধ্যেই দিনের আলো মিলিয়ে গেল। নেমে এলো গোধূলি—এপারের বনে, ওপারের পাহাড়ে আর ধৌলির ধবলধারায়। আধো আলো আধো ছায়ায় বসে আমরা হিমালয়ের রূপ বদলের পালা প্রত্যক্ষ করি আর আমরা স্বর্গীয় শান্তির মাঝে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাই।

এপারে বসতি নেই, ওপারের গ্রাম অনেকটা দূরে। এখানে কেবল আমরা কয়েকজন হিমালয়-পথিক একটি রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছি। প্রাণহীন প্রান্তরে জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছি। বনের মর্মর, ধৌলির কলগান আর আমাদের হাসির হিল্লোল মাঝে মাঝে মৌন হিমালয়ের ধ্যান ভঙ্গ করছে।

আকাশে নবমীর চাঁদ উঠল। তার কোমল কিরণে ভাসমান মেঘদল সুনীল সাগরের শ্বেত-বলাকায় রূপান্তরিত।

তবে তাদের চেয়েও ভাল লাগছে ওপারের ঐ কালো পাহাড়টাকে। এতক্ষণ সে যেন কালাপাহাড়ের মতো শিয়রে শমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন তার কালো রূপে অপরূপের ছোঁয়া, তার শিরে শত শত আকাশ-প্রদীপের দীপ্তি—দেবতাত্মা হিমালয়ের আশীর্বাদী শিখা।

আমি চাঁদের আলোয় হিমালয়ের বেশ কয়েকটি তুষারাবৃত শৃঙ্গের অপার্থিব রূপ দর্শন করেছি। কিন্তু চাঁদের আলোয় যে একটি তুষারহীন কালো পাহাড় এমন স্বর্গীয় জ্যোতির উৎস হয়ে উঠতে পারে, তা জানা ছিল না আমার।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম করি দেবালয় হিমালয়কে, আর মনে মনে বলি—তোমার অকৃপণ করুণায় আজ আমার জীবন পুনরায় ধন্য হল।

॥ চার ॥

কোসাপুল থেকে রাড়ু (অন্তর্বর্তী শিবির)

ঘুম ভেঙে যায়। ধৌলিগঙ্গার কলতান কানে আসে। ধৌলির ধারে প্রথম রাতটি অতিবাহিত হয়েছে। ঘড়ি দেখি—ছ'টা বেজে দশ।

স্লিপিং ব্যাগ খুলে উঠে বসি। জুতো আর সোয়েটার পরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি। কিচেনে এসে 'ল্যাপ' দুজনের ঘুম, ভাঙাই। তাদের চা বানাতে বলি। গরম চায়ের মগ হাতে না পেলে আমার সহযাত্রীরা স্লিপিং ব্যাগের মায়া ছাড়বে না।

ঠিক কথা, গতকাল রাতে ডিনারের পরে নেতা শের সিং-য়ের হ্যাপদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এবং তারপরে সাব্যস্ত করেছে যে ছ'জনের চারজন HAP আর দু-জন LAP মানে Low Altitude Porter এরা দুজন কিচেনে কাজ করবে এবং মূল শিবির পর্যন্ত মাল বইবে। কারণ এদের বরফে মাল বইবার অভিজ্ঞতা নেই। প্রথম দিকে প্রতিবাদ করলেও শেষ পর্যন্ত শের নেতার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে।

সাতটায় চা পরিবেশন করা গেল। একে একে উঠে বসল সবাই। চায়ের মগ হাতে নিয়েই বেরিয়ে আসে বাইরে। তারপরেই মন খারাপ হয়ে যায় ওদের। মেঘে ঢাকা আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

হেসে বলি—গতকাল সকালে জোশীমঠে ঘুম ভাঙার পরে তো বৃষ্টির শব্দ শুনেছিলে। তারপরে রোদ উঠল। সারাদিন চমৎকার আবহাওয়া পেয়েছো। আজও তাই পাবে।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক শঙ্কুদা! নেতা খুশি হয়। তার পরেই ডাক দেয়—শের সিং!

—জী।

—একজন হ্যাপাকে বাপনকুণ্ড পাঠাও, সে ঘোড়াগুলোকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুক। আর তোমরা শিবির গুটিয়ে ফেল। গোরা তুমি ব্রেক-ফাস্ট ও প্যাক-লাঞ্চের ব্যবস্থা করো।

আজ পদযাত্রা শুরু হচ্ছে, হিমালয়ের দুর্গম পথে অজানা যাত্রা। সুতরাং সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল।

আটটার মধ্যেই শিবির গোটানো এবং বাঁধা-ছাঁদা শেষ হয়ে যায়। সওয়া আটটায় রুটি ও সুজির ব্রেক-ফাস্ট। সাড়ে আটটায় আরেক মগ চা এবং চিনি মেশানো ছাতুর প্যাকেট পাওয়া গেল—আজকের প্যাক-লাঞ্চ। চা শেষ করে শৈলেশের কাছ থেকে শুকনো ফল ও টক-লজেন্সের ঠোঙ্গাটাও নিয়ে নিই। অর্থাৎ আমরা তৈরি।

কিন্তু কোথায় ঘোড়া! নেতার নির্দেশে শের তার ভাই সায়নকে বাপনকুণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে যাবার সময় বলে গিয়েছে আটটার মধ্যে ঘোড়া নিয়ে আসবে। এদিকে যে ন'টা বাজে! তাহলে কি ঘোড়াওয়ালারা কোন গোলমাল বাধিয়েছে।

পর্বতাভিযানের সবচেয়ে বড় সমস্যা মালপত্রের পরিবহন। এবং এটিকে চিরকালের সমস্যা বলা যেতে পারে। কারণ ষাট বছর আগে যখন হিমালয়ের মানুষ অনেক বেশি সহজ সরল ও পরিশ্রমী ছিলেন, তখনও এ সমস্যা ছিল। তাই ১৯৩১ সালে কামেট অভিযানের সময় সুদীর্ঘ পদযাত্রার পরে নিতি গ্রামে পৌঁছে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ খুশি হয়ে লিখেছেন—'Everything had gone well so far. Proterage had worked without a hitch and we had not lost a load;'

না, আমাদেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ঐ তো সায়ন আসছে। তার পেছনে ঘোড়ার সারি। শিবিরে সাড়া পড়ে যায়। ঘোড়া এসে গেছে, খচ্চর আ গিয়া।

নেতা উঠে দাঁড়ায়। সে সহনেতাকে বলে—তোমরা ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে রওনা হয়ে এসো। আমি ডাক্তার ও রঞ্জুকে নিয়ে কোসাগাঁয়ে যাচ্ছি। শঙ্কুদা আর অর্ধেন্দুদাও আমার সঙ্গে যাবে।

নেতা আমাকে ও অর্ধেন্দুকে সঙ্গী করছে কারণ আমরা দুজন দলের দুর্বলতম সদস্য। আর ডাক্তার তমাল রায় ও রঞ্জুকে সঙ্গে নিচ্ছে কারণ সহনেতা মালপত্র নিয়ে গ্রামে পৌঁছবার মধ্যে ওরা গ্রামের কিছু অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা করতে পারবে। হিমালয় অভিযানকালে এটি অভিযাত্রীদের একটা বাড়তি কাজ। কারণ উচ্চ-হিমালয়ের এইসব গ্রামে রোগ আছে কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। রঞ্জুকে সঙ্গে নেবার কারণ সে ডাক্তার না হলেও অনেকখানি ডাক্তারী জানে। সে তমালকে সক্রিয় সাহায্য করতে পারবে।

অতএব নেতার সঙ্গে এগিয়ে চলি। পুলের ওপরে আসি। কাঠের পুল। এটি কোসাপুল নামে পরিচিত। পুলটা ধৌলিগঙ্গার ওপরে হলেও এটা যে কোসাগাঁয়ে যাবার জন্য। হ্যাঁ, কোসানদীর তীরে গ্রামটির নামও কোসাগ্রাম।

পুল পার হয়ে আসি। শুরু হয় চড়াই পায়ে-চলা পথ। চড়াই হলেও ধাপে ধাপে আঁকাবাঁকা পথ, ইংরেজিতে যাকে বলে 'Zig-Zag'. ফলে রুকস্যাক পিঠে নিয়েও খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। কেবল কষ্ট পাচ্ছি আকাশের দিকে তাকিয়ে। এখনো সে তেমনি মেঘে ঢাকা। সূর্যের দেখা নেই। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

প্রায় হাজার খানেক ফুট চড়াই ভেঙে সমতল পাওয়া গেল। আর তখুনি দেখতে পেলাম ঘরের সারি—কোসাগাঁও।

পথের ডানদিকে প্রথমেই গাঁয়ের মন্দির। একটু এগিয়ে বাঁদিকে পঞ্চায়েত-ঘর, পাশেই মণ্ডপ-কাম-পাঠশালা, সামনে একফালি উঠান। তার একদিক জুড়ে পাথর-বাঁধানো বসবার জায়গা। সেখানেই বসে পড়ি আমরা।

মাস্টারজি বেরিয়ে আসেন বাইরে। নেতা পরিচয় দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। খুশি হন মাস্টারজি। বলেন—এতো খুবই ভাল কথা। আমি এখুনি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠিয়ে গাঁয়ের ঘরে ঘরে খবর দিচ্ছি। আপনারা একটু বসুন, রোগীরা এখানেই এসে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীরাও খুশি। পড়ার মাঝে ছুটোছুটি করার এমন একটা সুযোগ বড় একটা পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, আমরা আবার ওদের প্রত্যেককে একটি করে লজেন্স দিই। সেটি মুখে পুরে তারা ছুটতে শুরু করে দেয়।

যুবক মাস্টারজি আমাদের পাশে বসে গ্রামের কথা বলেন। এটি গ্রীষ্মকালীন গ্রাম। নন্দপ্রয়াগের গুটি পঞ্চাশ পরিবারের সম্পত্তি। তাঁরা গরম পড়লেই গরু ভেড়া ঘোড়া ও কুকুর নিয়ে শতাধিক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে চলে আসেন এখানে। চাষাবাদ করেন। তারপরে শীত শুরু হলে ফসলসহ তেমনি শোভাযাত্রা করে ফিরে যান নন্দপ্রয়াগ। নন্দপ্রয়াগের উচ্চতা মাত্র ৩০০০ ফুট আর এই কোসাগাঁও ৯০০০ফুট উঁচু এবং এটি স্থায়ী তুষাররেখার খুবই কাছে। শীতকালে এখানকার ঘরগুলো সবই বরফে তলিয়ে যায়। আর তাই এটি গ্রীষ্মকালীন গ্রাম।

ছোট গ্রাম। খান পঞ্চাশেক ঘর শ'দেড়েক লোকের বাস। তাহলেও রোগীর অভাব নেই। এবং 'ডগদারসাব' আসার খবর পেয়ে তাঁরা প্রায় ছুটে এসে হাজির হলেন—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী ও শিশুর দল। ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করে দেয়।

মাস্টারজির সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগে। তিনি একজন সরকারী প্রাইমারি শিক্ষক। তাঁরও স্থায়ী ঠিকানা নন্দপ্রয়াগ। তিনিও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আসা-যাওয়া করেন। গ্রীষ্মকালে এখানে আর শীতকালে নন্দপ্রয়াগে একই ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া শেখান। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াতে হয় তাঁকে।

ঘোড়া ও মালবাহকদের নিয়ে ওরা সবাই এসে যায়। আর তাদের দেখেই উপস্থিত গ্রামবাসীরা ডাক্তারের চিকিৎসার কথা বিস্মৃত হয়ে আমাদের ওপরে চড়াও হলেন। জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলে উঠলেন—আপনারা আমাদের গ্রাম থেকে খচ্চর আর কুলি নেন নি কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আমাদের। অতএব নেতা শের সিং-কে দেখিয়ে দেয়। গ্রামবাসীরা ঘিরে ধরে তাকে। তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়।

তাহলে 'Work for Sons of the Soil' সমস্যাটা এখানেও এসে হাজির হয়েছে।

ডাক্তার ও রঞ্জু রীতিমত বিভ্রান্ত। এখনো কয়েকজন রোগী রয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁদের চিকিৎসা করা উচিত হবে কিনা, ওরা বুঝে উঠতে পারছে না।

নেতা ধমক লাগায়—তোমরা হাত গুটিয়ে বসে আছো কেন ? মাথা ঠাণ্ডা করে বাকি লোকগুলোকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে দাও। ওদিকের গোলমাল শেরকেই মেটাতে হবে।

নেতার কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়। প্রচুর তর্ক-বিতর্ক এবং কিছু ধস্তাধস্তির পরে ভিড় ঠেলে শের বেরিয়ে আসে। নেতাকে বলে—লীডারসাব, আমাকে দু'শ রুপিয়া দিন।

নেতা তার মুখের দিকে তাকায়। শের আবার বলে—ইয়ে আদমিকো দস্তুরি দেনে পড়েগি।

ইতিমধ্যে ডাক্তার চিকিৎসা শেষ করে ফেলেছে। সুতরাং ফাইন দিয়ে মুক্তিলাভ করি, এগিয়ে চলি গ্রামের ভেতর দিয়ে। ঘরগুলো দেখছি সবই এক জায়গায়, একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে। তারই ভেতর দিয়ে পথ। কোথাও কোথাও খুবই সঙ্কীর্ণ, মাল বাঁচিয়ে ঘোড়ার পথচলা কষ্টকর।

কিন্তু গ্রামের কথা নয়, ভাবছি গ্রামবাসীদের কথা। এতকাল হিমালয়ের যে সহজ সরল প্রাণময় মানুষগুলোর কষ্টসহিষ্ণুতা আন্তরিকতা আর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি, বিদায় বেলায় যাদের জন্য প্রতিবার চোখের জল ফেলেছি, এঁরা কি তাঁরাই!

এবং এখন তাহলে এঁদের সঙ্গে মহানগরীর শিল্পাঞ্চলের অর্থসর্বস্ব মানুষগুলোর বিশেষ পার্থক্য নেই!

কি করার আছে ? আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ! মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটিয়ে স্বার্থ-সচেতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন আর হিমালয়কে ব্যবসার হাতিয়ারে পরিণত করে হিমালয়ের মানুষদের প্রতি বঞ্চনার জরিমানা।

ঘরগুলো ছাড়িয়েই গ্রামের ক্ষেত। আলু রামদানা ও শাকসবজির ক্ষেত। কিছু ফলের গাছও রয়েছে। এই ক্ষেতের মায়াতেই মানুষগুলো শতাধিক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে এখানে আসেন। কেন তাঁরা দু'শ টাকা পাবার জন্য ঝগড়া করবেন না!

ক্ষেতের মাঝখানে সামান্য চড়াই, পায়ে-চলা পথ। পথটা গিয়ে সামনের বনময় পাহাড়ে উঠেছে। বাঁদিকে ক্ষেতের শেষে বেশ খানিকটা দূরে একটা সবুজ পাহাড় আর ডানদিকে কোসা নদী, অপেক্ষাকৃত কাছে।

সেই সঙ্গম থেকে রওনা হবার পরে এই প্রথম কোসার সঙ্গে দেখা হল। এতক্ষণ সে ছিল গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে, অনেক নিচে। এবারে সে চলে এসেছে পথের পাশে, প্রায় গাঁয়ের সমান্তরালে।

নদীখাতটাও এখানে দেখছি অনেকখানি চওড়া। নানা রঙের একফালি প্রশস্ত পাথুরে প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে কোসা। কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সে নাচতে নাচতে নিচে নামছে। নিচে নেমে আবার একধারায় রূপান্তরিত।

গাঁয়ের মেয়েরা কাজ করছে নদীর ঘাটে। কেউ কাপড় কাচছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ স্নান করছে কেউবা জল নিয়ে যাচ্ছে। জলের অপর নাম জীবন।

আমরা এগিয়ে চলি। ক্ষেত শেষ হয়ে যায়, শুরু হয় খাড়া চড়াই।

পাহাড়টার ওপরে পৌঁছবার পরে চড়াই কমে এলো। পায়েচলা পথটা নদীর

সমান্তরাল হয়ে চলল এগিয়ে। নদী অবশ্য আবার নিচে চলে গিয়েছে, অনেক নিচে। তবু তার কলতান কানে ভেসে আসে।

এখানে দেখছি বনের মাঝে একফালি সমতল। এখন দুপুর বারোটা। ঘণ্টাখানেক একটানা চড়াই ভেঙেছি। ক্লান্ত লাগছে। ক্লান্তির কি অপরাধ? বয়সটাকে কি অস্বীকার করা যায়?

রঞ্জু ওয়াটারবটলে গ্লুকন-সি মিশিয়ে দেয়। পান করে আরাম বোধ করি। কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করি পথ চলা।

পথের দুদিকেই জঙ্গল। এটা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। তাই পথের পাশে পাথরের ওপরে পাথর বসিয়ে কোমর সমান ঘেরা।

না। আজ আর আবহাওয়া ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। রোদ তো দূরের কথা, আকাশ যেন আরও ভারি হয়ে উঠছে। ক্রমেই বাতাসের বেগ বাড়ছে। ঝড় উঠবে কি? শুধু ঝড় কেন, ঝড়-বৃষ্টি দুই-ই শুরু হয়ে যেতে পারে। এতক্ষণে আমরা নিশ্চয় কোসাগাঁও থেকে হাজার খানেক ফুট ওপরে উঠে এসেছি। তার মানে আনুমানিক দশ হাজার ফুট ওপরে পদচারণা করছি। এই উচ্চতায় কি ঝড় ওঠার কিম্বা বৃষ্টি নামার কোন সময়-অসময় আছে?

পথটি কিন্তু পদযাত্রীর আদর্শপথ। পাইনবনের ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে গেছে, কেবলি ওপরে। কোথাও খাড়া চড়াই, কোথাও কিছু কম। রোদ উঠলেও এসব জায়গায় সামান্যই আলো আসতে পারে। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে পথ। কোথাও শেওলা, কোথাও ঘাস, কোথাও বা মস। ফুল রয়েছে প্রায় সর্বত্রই, নানা রঙের নানা রকমের বনফুল আর জুনিপারের ঝোপ। মিষ্টিগন্ধ নাকে ভেসে আসছে। হাঁটতে ভারি ভাল লাগছে।

একটা জলের ধারা পাওয়া গেল। তারই সামনে বসে ছাতু ও চিনি দিয়ে লাঞ্চ সেরে নেওয়া হল। নেতা তাগিদ দেয়—যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে। তার আগে যতটা পারা যায় এগিয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু খুব বেশি দূর এগুনো গেল না। বেলা দুটো নাগাদ বৃষ্টি শুরু হল। কয়েক মিনিট ফোঁটা ফোঁটা, তারপরেই মুষলধারায়। বাতাসের বেগ বাড়ল, তবে ঠিক ঝড় উঠল না। মন্দের ভাল। ঝড় উঠলে গাছ-পালা ভেঙে পড়তে পারে।

আজকাল আমি আর ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে পাহাড়ে আসি না। কারণ ঐ আজানুলম্বিত ভারি বস্তুটি গায়ে চাপিয়ে চড়াই-উৎরাই করতে বড্ড কষ্ট হয়। উইন্ড-প্রুফ জ্যাকেট দিয়ে বাতাস, বরফ ও বর্ষা তিনেরই মোকাবিলা করি। কিন্তু বর্ষার পক্ষে জ্যাকেট বড়ই কম কার্যকরী। একে তো প্যান্টটা পুরো ভিজে যায়, তার ওপরে গলা বেয়েও জল গায়ে গড়ায়। এই উচ্চতায় জল বরফের চেয়ে কিছু কম ঠাণ্ডা নয়।

পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠছে। পাথরের পরে পাথর পার হয়ে চলতে হচ্ছে। ঝোপঝাড় আর কাঁটাবনের ভেতর দিয়ে পথ। পথ বেয়ে বৃষ্টির জল নিচে নামছে। মাঝে মাঝে ধস। বৃষ্টির জলে কাদার পাহাড় হয়ে উঠেছে।

বড্ড পিপাসা, কিন্তু কারও ওয়াটারবটলে জল নেই। আকাশ থেকে জল ঝরছে, কিন্তু মাটিতে জল নেই। বুকভরা তৃষ্ণা বুকে বয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। কোথায়? কেবল শের সিং বলতে পারে। কিন্তু সে যে এগিয়ে গিয়েছে!

গোটা তিনেক ঘোড়া বড্ড গোলমাল করছে। খাড়া চড়াই দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ছে।

সহিসরা চাবুক মারলে গা-ঝাড়া দিয়ে পিঠের মাল ফেলে দিতে চাইছে। গায়ে হাত বুলিয়ে ছোলা ঘুষ দিয়ে আবার চলা শুরু করাতে হচ্ছে।

এইভাবে আরও প্রায় ঘন্টাখানেক পথচলার পরে বেলা সাড়ে চারটের সময় একটি শিবিরক্ষেত্র চোখে পড়ল। শের সিং তারই সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জায়গাটা নেতারও পছন্দ। আমার পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন আসে না। কারণ আমার এখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা।

সুতরাং নেতার সিদ্ধান্ত শোনা মাত্র একখানি পাথরের ওপর ধপ করে বসে পড়ি। আর তারপরেই দেখতে পাই জলধারাটিকে। বাঁদিকের উচুঁ-পাথরটা বেয়ে নেমে আসছে নিচে। শিবিরক্ষেত্রটির ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে কোসায় পড়ছে। আর সে আছে বলেই নেতা জায়গাটাকে পছন্দ করেছে। জল না থাকলে তো শিবির করা যায় না।

তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে রুকস্যাক্‌টা খুলে ফেলি। ইতিমধ্যে বিনয় (ভট্টাচার্য) পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাচ্ছেন ?

—একটু জল। বড্ড পিপাসা। কোনমতে বলি।

—আপনি বসুন। আমি জল এনে দিচ্ছি।

জল পেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। তবে বড্ড ঠাণ্ডা। সোজাসুজি গলায় ঢেলে দিতে হল।

আকাশের জল কিন্তু কিছুই কমে নি। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। তারই মাঝে সদস্য শেরপা ও মালবাহকরা মালপত্র নামিয়ে শিবির প্রতিষ্ঠায় লেগে গিয়েছে।

অর্ধেন্দু ও নেতার সঙ্গে আমিও বসে বসে ওদের কাজ দেখতে থাকি। দূর থেকে সমতল মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, জায়গাটা অনেকটা অববাহিকার মতো। মাঝখান ঢালু, চারিদিক উঁচু। তার ওপরে ছোট ছোট গাছ আর বড় বড় ঘাসে বোঝাই। তাই পরিষ্কার করে তাঁবু ফেলতে হচ্ছে।

মেস-টেন্ট টাঙাবার পরে বড় সমতলটায় আর তাঁবু ফেলবার জায়গা রইল না। একটা ফোর-মেন ও একটা টু-মেন টেন্ট লাগানো হল পাশের উঁচু জমিটায়। ওদিক দিয়েই বয়ে যাচ্ছে কোসা। কোসার ওপারে সেই উঁচু কালো পাহাড়।

উল্টোদিকে অর্থাৎ আমরা যেখানে বসে আছি, এদিকেও খানিকটা দূরে একটা পাহাড়। এবং এখানেও একটা প্রকাণ্ড পাথর। এরই সঙ্গে ত্রিপল লাগিয়ে কিচেন তৈরি করা হবে। পাথরটা বেশ উঁচু, আমাদের মেস-টেন্টের মাথা ছাড়িয়ে। আর সামনেও রয়েছে একটা মাটি আর পাথরের ঢিবি। অর্থাৎ শিবিরক্ষেত্রটির তিনদিকে পাথর মাটি কিংবা পাহাড়ের আড়াল আর একদিকে কোসা উপত্যকা অর্থাৎ আমাদের ফেলে আসা পথ।

শের বলে—সামনের ঐ টিবিটার ওপর দিয়েই মূল-শিবিরের পথ।

কিন্তু মূল-শিবিরের কথা কাল ভাবা যাবে। আজ এই অন্তর্বর্তী শিবিরের কথা হক। জায়গাটা খুব ভাল না হলেও, একটি দিক থেকে নিশ্চিন্ত। এখানে হাওয়া কম লাগবে। এই উচ্চতায় হাওয়া মানেই হিম-প্রবাহ।

বৃষ্টির বিরাম নেই। তাই তাঁবু টাঙানো শেষ হতেই ভেতরে চলে আসি। শের সিং জানায়—ঐ টিবিটার ওপারে মেষপালকদের একটা ঘর রয়েছে, এখন খালি। সেখানে খচ্চরওয়ালারা থাকতে পারবে। ওস্তাদ অর্থাৎ শেরপারা থাকবে ওপরে, টু-মেন টেন্টে। আর সে ও তার ছয় 'হ্যাপ' থাকবে কিচেন ও ফোর-মেন টেন্টে।

—তার মানে তো আমাদের ষোলজনকে থাকতে হবে মেস-টেন্টে ?

—জী।

—কিন্তু মেস-টেন্ট তো দশজনের জন্য।

—কেয়া করে গা সাব্! একঠো রাত।

মাঝখান থেকে শৈলেশ (চক্রবর্তী) বলে ওঠে—তা তো বটেই! একটা রাত বই তো নয়। অতএব দশজনের তাঁবুতে ষোলজন থাকা যেতে পারে। তবে কষ্ট হলেও আনন্দ কিছু কম হবে না। দুর্গম হিমালয়ে এসে এক তাঁবুতে সবাই থাকা। হিমালয় যা করেন, ভালর জন্যই।

—আচ্ছা, এ জায়গাটা কত উঁচু হবে ?

অর্ধেন্দু মুখার্জির প্রশ্নেব উত্তরে পর্বতারোহী শিবু দাস জানায়—এখানে যখন বরফ না পড়ে বৃষ্টি হচ্ছে, তখন উচ্চতা এগারো থেকে বারো হাজার ফুট।

—কোসাগাঁও থেকে আমরা কতটা হেঁটেছি ?

—বেশি নয়, আট-দশ কিলোমিটার। ভট্টাচার্য (শঙ্কর) উত্তর দেয়। আর শের বলছে, এ জায়গাটার নাম নাকি রাড়ু।

প্রথমে চা-বিস্কুট ও চানাচুর এবং অবশেষে খিচুড়ি। গোরা আজ খিচুড়িতে আলু দিয়েছে আর পাঁপড় পুড়িয়েছে। আচার তো রয়েছেই। অতএব বেশ ভাল ডিনার হল।

ডিনারের পরে শুরু হল আড্ডা। কিন্তু জমল না। বৃষ্টি পড়েই চলেছে।

তার ওপরে সারদিনের ক্লান্তি। একে একে সবাই স্লীপিংব্যাগের জঠরে প্রবেশ করি। দেবতাত্মা হিমালয়ের কাছে আগামীকালের জন্য একটি রৌদ্রদীপ্ত দিন কামনা করে নিদ্রাদেবীর শরণ নিই।

॥ পাঁচ ॥

রাড়ু শিবিরে

সকালে ঘুম ভাঙে। বৃষ্টির শব্দ। সেকি এখনো বৃষ্টি! তাড়াতাড়ি উঠে বসি। দরজার পর্দাটা সরিয়ে বাইরে দেখতে চাই।

—শুধু বাইরে নয়, তাঁবুর ভেতরেও বৃষ্টি পড়ছে। জগদীশ বলে ওঠে।

আমি তার দিকে তাকাই। সে বসে আছে। তার পাশে গোরা। সে যোগ করে—আপনার দিকটায় জল পড়ছে না, তাই আপনার ঘুম ভেঙে যায় নি। আমরা সারারাত ঘুমোতে পারি নি।

'আমরা' মানে ওরা দুজন এবং ওদের সঙ্গে বিনয় শৈলেশ রঞ্জু গৌতম ও শ্রীকৃষ্ণ। এবারে নজর পড়ে। ওরা সবাই স্লীপিং ব্যাগে শরীর ঢুকিয়ে গুটিশুটি মেরে বসে রয়েছে। কি করবে ওদের দিকটাতে তাঁবু চুঁইয়ে ফোঁটাফোঁটা জল পড়ছে। ওরা শুতে পারে নি, কিন্তু আমাদের ঘুম ভাঙায় নি।

লজ্জা পাই। একে তো দশজনের তাঁবুতে ষোলজন। তার মধ্যে আবার জল

পড়ছে। এ উচ্চতায় তো জলের আরেক নাম বরফ।

—গুড মর্নিং সাব্! বেড-টি। পর্দা ঠেলে সায়ন সিং তাঁবুতে ঢোকে। তার হাতে কেট্‌লি।

—সাবাস সায়ন! নেতা উঠে বসে।

সাবাস দেবার মতই কাজ। এই উচ্চতায় এমন আবহাওয়ায় সকাল ছ'টায় বেড-টি!

বেড-টিয়ের পরে বাথরুম। এখানে বাথরুম হল পাথরের আড়াল আর ঝরণার জল। শহুরে বাথরুমের চেয়ে খুব খারাপ কিছু নয়। কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে বের হওয়া মুশকিল।

ডাক্তার মুশকিল আসান করে—আমার রুকস্যাকে একটা ছাতা রয়েছে। ডাক্তার এই প্রথম পাহাড়ে এসেছে। অনভিজ্ঞ বলে, সে ছাতা নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই ছাতা আজ আমাদের মুশকিল আসান করল। ডাক্তারকেও তাই সাবাস জানাতে হয়।

ন'টার সময় চিঁড়েভাজা, বাদাম ও চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করা গেল। কিন্তু এর পরে। এই আবহাওয়ায় আমরা কি আজ এগিয়ে যাবো?

—কি লাভ হবে? সেখানে তো বরফ পড়ছে। কোন কাজই করা যাবে না। তার চেয়ে আজকের দিনটা এখানেই কাটিয়ে দেওয়া যাক। কাল আবহাওয়া ভাল হলে মূল শিবির প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

শের সিং তাঁবুতে আসে। সব শুনে সে বলে—কিন্তু খচ্চরওয়ালারা তো খচ্চর বসিয়ে রাখার জন্য ভাড়া চাইবে।

—তাদের ডেকে পাঠাও। আমি বুঝিয়ে বলছি। ঘোড়া বসিয়ে রাখার জন্য ওরা দৈনিক ঘোড়াপ্রতি পঁচিশ টাকা করে বাড়তি মজুরি পাবে।

—ঠিক হ্যায় সাব্। আমি ওদের বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করাবো। কিন্তু এরকম মৌসুম চলতে থাকতে আমরা কতদিন থাকতে পারব এখানে?

—খুব বেশি হলে সাতদিন। সাতদিনের মধ্যে আবহাওয়া ভাল হলে ওপরে যাবো, না হলে এবারের মতো শূন্যহাতেই বিদায় নিতে হবে হিমালয়ের কাছ থেকে।

—এ্যায়সা নহী হোগা সাব্। শের ভরসা দেয়। তারপরে আবার বলে—লেকিন দো আদমিকো আজ কোসা ভেজনে পড়ে গা।

—কিঁউ?

—পূজা দেনে হোগী।

—কিস্‌কী পূজা?

—পরবত দেওতাকো।

—পর্বত দেবতা?

—জী! শের বলে—তাঁর পুজো না দিয়ে এসব পাহাড়ে আসতে নেই। কাল ওরা ঝামেলা করায়, কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছি।

—আজ যারা পুজো দিতে গাঁয়ে যাবে, তাদের ওপরে ওরা যদি হামলা করে?

—না, না। পূজার্থীদের ওপর হামলা করার সাহস হবে না ওদের।

পথের খাবার ও সওয়া পাঁচ টাকা দিয়ে একজন ল্যাপ ও একজন ঘোড়াওয়ালাকে কোসা পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিগত ছাব্বিশ বছরে এই নিয়ে বার দশেক পর্বতাভিযানে

এলাম। প্রতিবারই মেট কিংবা মালবাহকদের পরামর্শে এ কর্মটি করতে হয়েছে। কয়েকবার তো ভেড়া ভেট দিতে হয়েছে। এ অঞ্চলের পর্বতদেবতার দাবি দেখতে পাচ্ছি খুবই সামান্য— মাত্র সওয়া পাঁচ টাকা। দেখা যাক উদার দেবতা আমাদের কতখানি কৃপা করেন।

দুই শেরপা শিবিরে আসে। তারা নেতার সিদ্ধান্তের কথা শুনেছে। তবু বলে— আমরা দুজন এগিয়ে গিয়ে একবার মূল শিবিরের জায়গাটা দেখে আসি।

শেরপাদের সাহস ও আন্তরিকতা অসামান্য। বসে-থেকে সময় নষ্ট করতে রাজী নয় ওরা। তাই এই বৃষ্টি মাথায় করেই দুর্গম পথটা দেখে আসতে চাইছে।

নেতা ওদের প্রস্তাবে সম্মত হয়। সহনেতা বলে—প্যাক-লাঞ্চ নিয়ে যাও।

—না সাব্। আমরা ফিরে এসে লাঞ্চ করব।

ওরা বিদায় নেয়। অদৃশ্য হয়ে যায় টিবিটার আড়ালে। তবু আমি ওদের কথাই ভাবতে থাকি। শেরপা না নিয়ে পর্বতাভিযানে আসা আর নাবিক ছাড়া সাগব পাড়ি দেবার চেষ্টা করা, একই কথা।

ওরা বিদায় নেবার পরেই বৃষ্টি কমে যায়। আমরা বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। তাঁবুটা মেরামত করা দরকার। দড়িগুলো টেনে নিয়ে ওপরটাকে আরও টান-টান করে দিতে হবে। তাছাড়া শিবিরক্ষেত্রটি ঢালু হওয়ায় চারদিকের জল গিয়ে তাঁবুর তলায় জমে যাচ্ছে। তাঁবুর চারিদিকে নালা কেটে ঐ জল সবিয়ে দেওয়া দরকার।

কয়েকজন মালবাহককে সঙ্গে নিয়ে তরুণ সদস্যরা কাজে লেগে যায়। আর আমি পায়চারি করতে করতে চারিদিকটা ভাল করে দেখতে থাকি। তাড়াহুড়া ও বৃষ্টির জন্য গতকাল ঠিক দেখা হয়ে ওঠে নি।

যে ভুজগাছে ছাওয়া পাথুরে পাহাড়টার পাশে পাশে পথ চলে আমরা গতকাল এই প্রায় সমতল প্রান্তরে উঠে এসেছিলাম, সেটি সহসা বাঁদিকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছে। তারই গা বেয়ে নেমে এসেছে একটি স্ফটিক স্বচ্ছ ঝরণাধারা, প্রান্তরটির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গিয়েছে ডানদিকে, কোসার সঙ্গে মিলিত হতে।

ভুজে ছাওয়া কালোপাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রান্তরটি প্রসারিত হয়ে কোসার তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে। কোসা অবশ্য বয়ে যাচ্ছে বহু নিচে। তাই এখান থেকে তার গম্ভীর গর্জনের সামান্যই কানে আসছে।

কোসার ওপারে অর্থাৎ সারা উত্তর দিক জুড়ে সেই উঁচু কালাপাহাড়, যার সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা ধৌলির ধারে। এখানেও তার গায়ে বরফ নেই। বরং তলার দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘাস আর কাঁটাবন। ওরই ওপাশে কামেট শৃঙ্গ, এ অঞ্চলের উচ্চতম পর্বতশিখর।

শের সিং বলে—আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে মালারি গাঁও দেখা যেত।

ধৌলি উপত্যকার বৃহত্তম জনপদ মালারি। মালারি হয়েই কামেটের পথ—ঐ কালাপাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে।

কিন্তু কামেটের ভাবনা থাক। তার চেয়ে আমাদের এই অন্তর্বর্তী শিবিরের জায়গাটাকেই ভাল করে দেখা যাক। জুনিপার সহ নানা রঙের নানা ফুল আর ঘাস ও কাঁটাবনে ছাওয়া প্রান্তর। কিছু রডোডেনড্রন গাছও রয়েছে। অতএব এর উচ্চতা বারো হাজার ফুটের চেয়ে কিছু কম বলেই মনে হচ্ছে।

সারা জায়গাটা জুড়েই পাথর। ছোটবড় নানা আকারের পাথর। এখানে তো প্রায়

দশ ফুট উঁচু আর ফুট তিরিশেক লম্বা প্রকাণ্ড একটা কালো পাথর মাথা উঁচু করে রয়েছে। সে আমাদের মেস-টেন্টটিকে আড়াল করে রেখেছে আর তারই গায়ে ত্রিপল টাঙিয়ে তৈরি হয়েছে কিচেন। আজ অবশ্য জল জমে রান্নাঘরের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। মেস-টেন্ট মেরামত করে ওরা এখন রান্নাঘরকে প্লাবনমুক্ত করার চেষ্টায় লেগেছে।

সহসা শের সিং কাছে এসে বলে—সাব্ উধার দেখো! সে ওপারের কালাপাহাড়টির দিকে ইশারা করে।

আমি দেখি। সত্যই অপূর্ব দৃশ্য। শত শত ভেড়া-ছাগল বনভূমিতে বনভোজন করতে করতে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠছে। বলা বাহুল্য কয়েকজন মেষপালকও সঙ্গে রয়েছে। কি কঠিন বৃত্তি! এই আবহাওয়ায় অতগুলো চতুষ্পদকে পাহারা দিয়ে পেটের ভাত যোগাড় করতে হচ্ছে। এরই নাম জীবন-সংগ্রাম।

বেলা তিনটে নাগাদ আবার বৃষ্টি নামল। শেরপারা ফিরে এলো আরও ঘণ্টাখানেক বাদে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে মূল শিবিরের জায়গায় চলে গিয়েছিল। ঘণ্টা চারেকের পথ। জায়গাটা নাকি এর চেয়ে অনেক বড় ও সমতল, ভারী সুন্দর। তবে পথটা খুব সুবিধের নয়। বেশ কয়েকটা জায়গায় ধস নেমেছে। একটা ধস তো বেশ বড়। খানিকটা পরিষ্কার না করে ঘোড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না।

নেতা আবহাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করে। নিমার মুখখানি গম্ভীর হয়ে যায়। সে হতাশ কণ্ঠে বলে—খুবই খারাপ। চারিদিক সাদা হয়ে আছে। হাতি পর্বত কিংবা অনামি শিখরটিকে দেখতেই পেলাম না। যতক্ষণ ছিলাম, শুধু থেকে থেকে তুষারধসের ভয়ঙ্কর শব্দে বার বার চমকে উঠেছি।

ওরা বেরিয়ে যায় তাঁবু থেকে। কেউ কোন কথা বলি না কিছুক্ষণ। তার পরে নেতা নীরবতা ভঙ্গ করে। বলে—আবহাওয়া ভাল না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করাই উচিত হবে। এই অবস্থায় এত মালপত্র নিয়ে আরও ওপরে গেলে অসুবিধায় পড়ব।

কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু এখানে এভাবে কতদিনই বা থাকা যাবে। শরীর সইলেও পকেট 'পারমিট' করবে কি?

জানি না প্রকৃতি কি চাইছেন? হিমালয়ের মনে কি লুকিয়ে আছে?

পরদিন সকালেই প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে যাই। গতকাল বিকেলে সেই যে বৃষ্টি নেমেছে, এখন পর্যন্ত থামার কোন লক্ষণ নেই। বরং আজ বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের বেগ বেড়েছে। ভাগ্যিস উত্তর ও দক্ষিণে দুটি খাড়া পাহাড় আর পশ্চিমে সেই মাটির ঢিবি, ফলে বাতাস কিছু কম লাগছে। নইলে কাল রাতেই বোধকরি তাঁবুগুলো উড়ে যেত।

আজ আবার কিচেনে জল জমেছে। তারই মধ্যে ওরা কোনমতে চা ও দু-খানি করে রুটি দিতে পারল। জনপ্রতি দু-খানি মানে ওদের মোট পঞ্চাশখানা রুটি বানাতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কাজটা খুবই কঠিন। কারণ তুষার-শীতল জলে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হচ্ছে। রুটির পরে তিনটে প্রেসার-কুকারে খিচুড়ি চড়েছে। অর্থাৎ দুপুরে দু-হাতা খিচুড়ি পাবার আশাও রয়েছে। তবে গোরা বলে দিয়েছে, রাতে আর রান্না করা সম্ভব নয়। প্রথম কারণ আবহাওয়া আর রান্নাঘরের দুরবস্থা। দ্বিতীয় কারণ শের সিং আমাদের পেট্রোম্যাক্সটি ভেঙে ফেলেছে।

বিনয় জানিয়েছে, চিঁড়েভাজা আর ছাতু দিয়ে আজকের ডিনার। আমরা ওর সিদ্ধান্ত

সমর্থন করেছি। তবে তার জন্যও গরম জলের দরকার হবে। কারণ ঠাণ্ডাজলে ছাতু ভেজালে তা মুখে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কিন্তু আসল সমস্যাটা তো খাবার নয়, থাকার। দু-দিনের বৃষ্টিতেই স্লীপিং-ব্যাগ আর রুকস্যাক ভিজে গিয়েছে। বিছানা থেকে জামাকাপড় পর্যন্ত সবই জলসিক্ত। শুকনো বলতে কিছু নেই। এ অবস্থায় এই বয়সে আমি আর কতদিন যুঝতে পারব ? নিমোনিয়া হয়ে যাবে যে ! উচ্চ-হিমালয়ে নিমোনিয়া মারাত্মক ব্যাধি। মেজর নান্দু জয়ালের মতো প্রখ্যাত পর্বতারোহী পর্যন্ত নিমোনিয়ায় মারা গিয়েছেন।

ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে নান্দু জয়াল এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। পাঁচ ও ছয়ের দশকের প্রখ্যাত পর্বতারোহীরা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর ছাত্র। তিনি ১৯৫১ সালে ত্রিশূল (২৩,৩৬০'/৭১২০মিঃ) শিখরে আরোহণ করেন। এটি ভারতীয় পর্বতারোহণের প্রথম শিখর। তারপরে তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে আবিগামিন (২৪,১৩০'/৭৫৩৩মিঃ) ও ১৯৫৫ সালে কামেট শৃঙ্গ বিজিত হয়। বলা বাহুল্য, তাঁর কামেট জয় ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কারণ তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় পঁচিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি।

কিন্তু হিমালয়ের নিষ্ঠুর নিমোনিয়া ভারতের এই বরেণ্য পর্বতারোহীকে বেশিদিন বেঁচে থাকতে দেয় নি। নিমোনিয়ার প্রসঙ্গে আজ তাই তাঁর কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছে।

ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে ১৯৫৮ সালে নেপালের চো-উ (২৬,৭৫০'/ ৮,১০২মিঃ) শৃঙ্গে অভিযান আয়োজিত হয়। কে. এফ. বুনশাহ অভিযানের নেতৃত্ব করেন। মেজর জয়াল যখন অভিযানে অংশ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেলেন, তখন অভিযাত্রীরা মূল-শিবিরের পথে। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে মূল-শিবিরে পৌঁছলেন। তখন আঠারো হাজার ফুটে অভিযানের প্রথম শিবির স্থাপিত হয়ে গেছে এবং দলের পর্বতারোহীরা সবাই সেখানে চলে গিয়েছেন। তাই মেজর মাত্র একদিন মূল শিবিরে বিশ্রাম করে, অর্থাৎ উচ্চ-হিমালয়ের আবহাওয়া সহ্য হবার আগেই, রওনা হলেন এক নম্বরে। বেপরোয়া না হতে পারলে পর্বতারোহী হওয়া যায় না। সেদিক থেকে তিনি হয়তো অন্যায় কিছু করেন নি। কিন্তু হিমালয়ের নিষ্ঠুরা প্রকৃতি এই বেপরোয়া বীরকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। এক নম্বর শিবিরে পৌঁছেই জয়াল নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। তখন তাঁকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসাই প্রাথমিক চিকিৎসা। কিন্তু তা করতে হলে পর্বতারোহীদের প্রত্যেককেই তাঁকে নিয়ে নিচে নেমে যেতে হয়। এবং ততদিননে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যেতে পারে। ফলে অভিযান হতে পারে ব্যর্থ।

তাই নান্দু তাঁদের বাধা দিলেন। বললেন—আমার জন্য অভিযান বন্ধ ক'রো না তোমরা ! আমাকে এখানেই রেখে দাও। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ প্রাণভরে ঐ অনিন্দ্যসুন্দর চো-উ শিখরকে দেখে নিই। তারপরে তোমরা এখানেই আমাকে সমাধিস্থ করে ঐ শিখরে গিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করে এসো। তাহলেই আমার আত্মা শান্তিলাভ করবে।

তাই করেছিলেন তাঁর সহযাত্রীরা। মেজর জয়ালের মহাপ্রয়াণের পরে ১৬ই মে তারিখে সোনাম গিয়াৎসো এবং পাসাং দাওয়া লামা চো-উ শিখরে ভারতের জাতীয়

পতাকা প্রোথিত করেছেন। এবং সেটি ভারতীয় পর্বতারোহণের প্রথম আট হাজার মিটার শিখর।

কিন্তু শহীদ হবার এমন সৌভাগ্য আমার হবে কি ? হলে অবশ্য সে সৌভাগ্যকে সাদরে বরণ করে নেবো। একদিন তো সবাইকেই যেতে হবে। সুতরাং সে যাওয়া যদি হয় হিমালয়ের বুকে, মহাপ্রস্থানের পথে, তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ?

অতএব দেখা যাক প্রকৃতি আরো কত আঘাত করতে পারে, এবং আমরা আর কতদিন তা সইতে পারি। যে সয় সে রয়। সুতরাং নির্ভয়ে লড়াই করে যেতে হবে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। জনমে কিংবা মরণে এ লড়াই জিততেই হবে। মানুষ অমৃতের সন্তান।

॥ ছয় ॥

রাড়ু থেকে আবার কোসাগাঁয়ে

গায়ে শীত, পেটে খিদে আর মনে দুশ্চিন্তা। দিন বড়, রাত আরও বড়—কিছুতেই কাটতে চায় না। কেমন করে চাইবে ? আশার চেয়ে হতাশা যেখানে বড়, জীবনের চেয়ে মৃত্যু যেখানে কাছে, সেখানে কি দিন কাটতে চায় ?

না চাইলেও শেষ পর্যন্ত কেটে যায় কোনমতে। আমাদেরও কেটে গেল পাঁচ দিন আর ছয় রাত। এখনও দুটি দিন হাতে আছে, আজ আর কাল। ঘোড়াওয়ালারা এখানে সাতদিন অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছে। অতএব এখনও কিছু আশা রয়েছে। কারণ হিমালয়ের অস্থিরা-প্রকৃতি যেকোন সময় কান্না থামিয়ে মুক্তোঝরা হাসিতে চারিদিক ভরে দিতে পারে।

এতো নিরাশার মাঝেও মনে তাই আশার আলোটি রেখেছি জ্বালিয়ে। হাসিমুখে যে যার কাজ করে যাচ্ছি। ম্যাপ দেখা, চিঠি লেখা, হিসেব রাখা, হিমশীতল হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে রান্না করা, বৃষ্টিতে ভিজে তাঁবু সারানো, জল সরানো—সমানেই চলেছে। সেইসঙ্গে তাস ও দাবার আসর। সঙ্গীতচর্চারও বিরাম নেই—কীর্তন ও ভজন থেকে আধুনিক হিন্দি গান—কোন গানই বাদ যাচ্ছে না। গান যে সুখ ও দুখের সমান অংশীদার, তা এখানে এসে আবার প্রত্যক্ষ করে গেলাম, এবং আমাদের গান মোটেই বাজনবিহীন নয়। চামচ ও মগ আর থালা-বাটির সঙ্গে রঞ্জুর মাউথ-অরগ্যান এবং নেতার হুইসিল সমানে সঙ্গত করে চলে।

নিমোনিয়ার আশঙ্কা কিন্তু এখন পর্যন্ত সত্য হয় নি। বরং সবারই শরীর মোটামুটি ফিট। সর্দি-কাশি মাথাধরা পেট খারাপ অরুচি অথবা অল্প জ্বরের শিকার হয়েছে কেউ কেউ। কিন্তু ডাক্তার কাউকেই কাহিল হয়ে পড়তে দেয় নি। কারণ আমাদের খাবারে টান পড়লেও ওষুধে টান পড়বে না। অতএব ডাক্তার সবাইকে সমানে ওষুধ খাইয়ে চলেছে আর বলছে—আমি কাউকে 'আনফিট' হয়ে পড়তে দেব না।

আরেকটা মজার ব্যাপার, দিনের কোন সময় প্রায় প্রতিদিনই কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি

বন্ধ হয়ে যায়, আকাশটাও খানিকটা হাল্কা হয়। এই রকম একটা সময়ে গতকাল আমরা কয়েকমিনিট ধরে হাতি ও ঘোড়ি পর্বতকে দর্শন করেছি। শিবিরে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছে। সবাই সব কাজ ফেলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। নতজানু হয়ে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে করজোড়ে কামনা করেছি—করুণা করে তোমরা একটিবার আমাদের পায়ে ঠাঁই দাও! আমরা যে বহুদূর থেকে বহু কষ্ট করে তোমাদের পূজো দিতে এসেছি। তোমরা আমাদের প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করে আমাদের এই তীর্থযাত্রাকে সার্থক করে তোলো।

জানি না, তাঁরা আমাদের আকুল প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন কিনা? বোধ করি পান নি। কারণ শুনতে পেলে আজ নিশ্চয়ই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় নি। আজও সকাল থেকে একই ভাবে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। প্রকৃতি তেমনি অকরুণ, তেমনি নিষ্ঠুরা, তেমনি ভয়ঙ্করী।

কিন্তু কেন? শের সিং থেকে শুরু করে শেরপারা পর্যন্ত বলছে, এ অঞ্চলে এটা বর্ষার সময় নয়। জানি না, প্রকৃতির মনে কি আছে?

জানতে পারলাম কিছুক্ষণ বাদেই। এবং তা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই মাথার ওপরে ভেঙে পড়ল। সহসা ঝড়ের বেগে ঘোড়াওয়ালারা এসে তাঁবুতে ঢুকল। তারা শের সিং ও শেরপাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝেও, সাদরে তাদের বসবার জায়গা করে দিই।

সহাস্যে নেতা জিজ্ঞেস করে—ক্যায়া খবর? ক্যায়সা হ্যায়?

—আচ্ছা নহী সাব্! বহুৎ বুরা।

—কাহেকো?

—এ্যায়সা মৌসম।

—ইয়ে বাত তো সহি হ্যায়। লেকিন হমলোগ আউর দো রোজ দেখেঙ্গে।

—নহী সাব্! হমলোগ ইধর আউর নহী ঠ্যায়রেঙ্গে। আজহি ওয়াপস্ যায়েঙ্গে।

আমরা শিউরে উঠি। নেতা সবিনয়ে বলে—কিন্তু তোমরা তো সাতদিন এখানে অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছো, তার জন্য তোমরা দৈনিক আড়াই শ'টাকা করে বাড়তি মজুরি পাচ্ছ।

—হমে নহী চাহিয়ে। ওরা সবাই একসঙ্গে প্রায় গর্জে ওঠে। তারপরে একজন বলে—হমলোগ আপকা উয়ো ঢাইশো রুপেয়া কি চক্করমে অওর নহী রহেঙ্গে।

আরেকজন যোগ করে—মৌসম অচ্ছা হোনেকা কোই আশা নহী হ্যায়। পরন্তু আভিই বরফ গিরনা শুরু হোগা। তব খচ্চরকো নিচে উতারনা মুশকিল হো যায়গা। এক খচ্চর গির জানেসে আট হাজার রুপেয়া ঘাটা হোগা। হমলোগ ঢাইশো রুপেয়া লেকে ক্যায়া করেঙ্গে।

প্রথমজন শেষ কথা বলে—হমলোগ আভি খচ্চর লেকর ওয়াপস্ যায়েঙ্গে। রুপেয়া দো আউর নহী দো, হমলোগ আভি চলতে হ্যায়।

গত কয়েকদিন ধরে অবশ্য ঘোড়াগুলোর দুরবস্থা দেখে খুবই কষ্ট পেয়েছি। আমরা তবু ছেঁড়া তাঁবুতে খানিকটা মাথা বাঁচাতে পারছি, কিছু গরম খাবারও খেতে পাচ্ছি। কিন্তু ওরা দিন-রাত বৃষ্টিতে ভিজছে। খাবারের সমস্যাটা অবশ্য ওরা নিজেরাই সমাধান করে নিয়েছে। শিবিরের চারিদিকে এখানে-ওখানে যেসব ফুল ও কাঁটাগাছ এখনো জেগে আছে, সেগুলোই ক্রমাগত চিবিয়ে যাচ্ছে। পিপাসা পেলে জমে থাকা জলে মুখ দিচ্ছে।

কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই কষ্টসহিষ্ণু প্রাণীদের মাঝে এখন পর্যন্ত কোন দৌর্বল্য দেখতে পাচ্ছি না। এবং মনে হয় ওরা দু-তিন দিন পরেও নিরাপদে নিচে নেমে যেতে পারবে।

কিন্তু আমাদের মনে হবার সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক। ওদের মালিকরা বলছে, আজই নিচে নেমে যাবে। ভাড়া দিলেও যাবে, না দিলেও যাবে।

নেতা শের সিং-য়ের দিকে তাকায়। সে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

সহনেতা দাওয়াকে জিজ্ঞেস করে—কি করবে ?

সে-ও অসহায় স্বরে বলে—কি বলব সাব্ ! বহুবছর ধরে নিয়মিত গাড়োয়াল-হিমালয়ে আসছি। কিন্তু এসময় এ অঞ্চলে এমন মৌসম আর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

অর্থাৎ মেট সাহায্য করতে অপারগ এবং শেরপারাও কোন ভরসা দিতে পারছে না। অথচ ঘোড়াওয়ালাদের ছেড়ে দিয়ে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে এত মালপত্র নিয়ে এখান থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেতা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হিমালয় অভিযাত্রীদের কাছে চরম শোচনীয় সিদ্ধান্ত।

রুটি, ওমলেট ও চা খেয়ে সজলচোখে বিদায় নিলাম বিগত পাঁচদিনের আশ্রয়-শিবির থেকে। আজও সেই একই ব্যবস্থা। নেতার সঙ্গে আমরা বয়স্করা রওনা হলাম প্রথমে। বলা বাহুল্য তরুণ ডাক্তারও চলেছে আমাদের সঙ্গে। সহনেতা তার পর্বতারোহী সদস্যদের নিয়ে রয়ে গেল শিবিরে। মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে ঘোড়া ও মালবাহকদের রওনা করে দিয়ে রওনা হবে ওরা।

ওরাও কাঁদতে কাঁদতে কাজ করছে, আমরাও কাঁদতে কাঁদতে পথ চলেছি। চলছি আর ভাবছি নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা—ছ'মাসের সব চেষ্টা ছ'দিনের বৃষ্টিতে ভেসে গেল। কিন্তু কেন ? কেন প্রকৃতি আমাদের প্রতি এমন নির্দয়া হলেন ? আমরা তো তার কোন ক্ষতি করি নি। খেয়ালি প্রকৃতি যে লাভ-লোকসানের হিসেব রাখে না।

কাঁদতে কাঁদতেই সান্ত্বনা দেয় নেতা। বলে—ভেবো না, এই চলে যাওয়া মানেই ফিরে যাওয়া অর্থাৎ অভিযান পরিত্যক্ত হওয়া। দু-একদিনের মধ্যে আবহাওয়ার উন্নতি হলে, আমরা আবার আসব ফিরে, ফিরে আসব হাতি পর্বতের পদতলে।

পারব কি ? আমরা যে দিন পনেরোর রেশন আর কুলিভাড়া নিয়ে পদযাত্রা শুরু করেছিলাম। তার মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা দিন বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেল। রেশন অবশ্য মালারি ও জোশিমঠ থেকে যোগাড় করা যাবে। কিন্তু তার জন্য তো টাকা চাই। শেরপাদের মাইনে এবং কুলি ও ঘোড়া ভাড়ার টাকা কোথা থেকে আসবে ? আমরা যে সামান্য সম্বল নিয়ে হিমালয়ে আসি।

যাক্ গে, এখুনি এসব ভেবে কি হবে ? তার চাইতে আশায় বুক বেঁধে ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের জন্যই তুলে রাখা যাক। তাছাড়া এখন অন্যমনস্ক না হয়ে পায়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত হবে। এবড়োখেবড়ো দুর্গম উৎরাই পথ। তার ওপর বৃষ্টির জলে পিচ্ছিল। একটু এদিক-ওদিক হলেই আছাড় খাবার সম্ভাবনা।

ঘণ্টাখানেক চলার পরেই নিচের উপত্যকাটি দেখতে পাওয়া গেল। ভারি সুন্দর সবুজ উপত্যকা, তারই বুক চিরে বয়ে চলেছে স্ফটিক-স্বচ্ছ কোসানদী, এখান থেকে অঞ্চল একটি রুপোলি রেখা। ছ'দিন বাদে আজ এই প্রথম অতদূরে দৃষ্টি যাচ্ছে। তার মানে নিচের উপত্যকায় এখন আর অত মেঘ নেই। তাহলে কি আবহাওয়া ভাল হচ্ছে ?

কিছুক্ষণ ধরেই ইলশেগুঁড়ির মতো হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। এবারে তাও বন্ধ হয়ে গেল। আমরা জোরে পা ফেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

কিন্তু একটু বাদেই থমকে দাঁড়াতে হয়। মাউথঅরগ্যানের শব্দ কানে ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই রঞ্জু। তার মানে ওরাও এসে গিয়েছে।

ওরা এসে যায়। আমরা আবার একসঙ্গে সারি বেঁধে চলা শুরু করি। চলতে চলতে গৌতম বলে—ঘোড়া ও পোর্টাররা পেছনে আসছে। কিন্তু দশটা বোঝা বেশি হয়ে গেছে। কাল ঘোড়া ও পোর্টার পাঠিয়ে আনিয়ে নিতে হবে।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর। যে মাল ওরা একবারে নিচের থেকে ওপরে বয়ে আনল, যার থেকে খাবার ও জ্বালানী খরচ করে আমরা তিরিশজন মানুষ পাঁচ দিন খাওয়া-দাওয়া করলাম, সেই বাকি মাল নিয়ে নামাতে গিয়ে দেখা গেল দশটা বোঝা বেড়ে গিয়েছে! বৃষ্টির কি অপার মহিমা! মালের ওজন দ্বিগুণ করে দিয়েছে।

জোর কদমে এগিয়ে চলেছি। এখন কোসাগাঁও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোসা নদী আর ধৌলিগঙ্গার সঙ্গমে ভারি সুন্দর গ্রামখানি। বোধকরি আর আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

কিন্তু সেখানে আশ্রয় পাওয়া যাবে কি? যাবার সময় তো গ্রামবাসীরা খুবই হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। ডাক্তারের সাহায্যের জন্য কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে দু-শ' টাকা দস্তুরি আদায় করেছে।

আজ আশ্রয় না পেলে যে ভারি বিপদে পড়ে যাবো। বৃষ্টিতে ভিজে তাঁবুগুলোর যা অবস্থা, তাতে সেগুলো রোদে না শুকিয়ে টাঙানো সম্ভব নয়। সুতরাং গ্রামে আশ্রয় না পেলে ধৌলির ওপারে গিয়ে আকাশতলে রাত্রিবাস করতে হবে। বৃষ্টি নামলে মাথা বাঁচাবার উপায় থাকবে না। তবে সেদিন ওদের দেখে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় লোকগুলো খুবই অর্থলোভী। কিছু টাকা পেলে হয়তো ঐ মণ্ডপটা একরাতের জন্য ছেড়ে দিতেও বা পারে।

শেষ পাহাড়টার গা বেয়ে নেমে আসি সেই ক্ষেতের সীমান্তে। আর তখুনি দেখতে পাই ওদের, গাঁয়ের মানুষদের। কিন্তু ওরা অমনভাবে ওখানে জড়ো হয়েছে কেন? আমাদের পথ অবরোধ করেছে? তার মানে আশ্রয় তো দূরের কথা, আজ আমাদের গাঁয়েই ঢুকতে দেবে না! এবং আজকের অবরোধে দেখছি, পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও রয়েছে, এমন কি শিশুরা পর্যন্ত সামিল হয়েছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে হিমালয়ের যে সহজ সরল প্রাণময় মানুষগুলোকে এত ভালোবেসে এসেছি, আজ তাদের এ কি বিস্ময়কর আচরণ!

. কিন্তু ওদের মতলব যা-ই হয়ে থাক, আমাদের তো চলা বন্ধ করলে চলবে না। অতএব সেই পায়ে চলা পথ ধরে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলি। নেমে আসি বাড়ি-ঘরের উপকণ্ঠে, ওরা যেখানে জড়ো হয়েছে।

না। ওরা পথ অবরোধ করে না, বরং পথের দু-পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের পথ করে দেয। সামনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক বৃদ্ধ হাতজোড় করে বলে ওঠেন—নমস্তে লীডারসাব, নমস্তে!

সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ ও শিশুদের সম্বোধন—সমস্তে সাব, নমস্তে!

আমরাও হাতজোড় করে বলে উঠি—নমস্তে।

—সব খবর ভাল ? আপনারা সবাই সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন আশা করি। বৃদ্ধের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

নেতা হাসিমুখে উত্তর দেয়—আপনাদের মেহেরবাণীতে আমরা সবাই বহাল তবিয়তে আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি।

—আমাদের নয় সাব, উপারওয়ালাকা মেহেরবাণী। তিনি চোখ বুজে হাত জোড় করে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তারপরে শুরু হয় হাতে হাত মেলানোর পালা। কেউ কেউ আবার বুকে জড়িয়ে ধরেন। হারিয়ে যাওয়া ঘরের ছেলে হঠাৎ ঘরে ফিরে এলে যেমন আনন্দের জোয়ার আসে, তেমনি জোয়ারে যেন ভেসে যাচ্ছে কোসাগাঁও।

একটি যুবক পঞ্চায়েত প্রধানকে কি যেন জিজ্ঞেস করে। তিনি মাথা নাড়েন। সঙ্গে সঙ্গে সে আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যেন ছুটে চলে যায়।

প্রধান আমাদের বলেন—সাব, আপনারা ক্লান্ত। চলুন, এবারে বিশ্রাম নেবেন।

আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি হাঁটতে শুরু করেন। অন্য বৃদ্ধরাও পাশে পাশে পথ চলেন। মেয়ে এবং শিশুরাও পেছনে আসছে। মনে হচ্ছে যেন গাঁয়ের মানুষ শোভাযাত্রা করে আমাদের গাঁয়ে নিয়ে চলেছেন।

বয়স্করাই কেবল কথাবার্তা বলেন। একজন জানান—সাব, আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই গাঁয়ে আসা-যাওয়া করছি। কিন্তু এ সময়ে এক নাগাড়ে এমন একটানা বৃষ্টি আর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

—তাহলে এখানেও বৃষ্টি হয়েছে ?

—হয় নি আবার। সেই আপনারা যেদিন চলে গেলেন, সেদিন দুপুর থেকে। আজই কিছুক্ষণ আগে মৌসম ভাল হয়ে গেল।

তার মানে ওপরেও হয়তো এতক্ষণে আবহাওয়া ভাল হয়ে গিয়েছে। ইস, আজকের দিনটা ওখানে থাকলে আর এভাবে নিচে নেমে আসতে হত না।

হঠাৎ আরেকজন বৃদ্ধ বলে বসেন—সাব, আপনারা লাল কামিজ পরে পাহাড়ে গিয়েছেন বলেই পর্বতদেবতা এত রেগে গেছেন।

লাল কামিজ মানে আমার এবং আরও কয়েকজনের লাল উইণ্ডপ্রুফ-জ্যাকেট। পর্বতারোহণের পোশাক সাজ-সরঞ্জাম সবই একটু বেশি রঙচঙে হয়, যাতে কালো পাথর সবুজ গাছপালা কিংবা সাদা বরফের ওপর বহুদূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। তাই লাল নীল বেগুনি হলুদ ইত্যাদি হচ্ছে সবচেয়ে প্রচলিত রঙ। অতএব স্বাভাবিক কারণেই আমরা লাল জ্যাকেট গায়ে দিয়ে ওপরে গিয়েছি। ওদের ধারণা এই লাল রঙ দেখেই পর্বতদেবতা এতো ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

অন্ধ বিশ্বাসও এক প্রকারের বিশ্বাস। এ অবস্থায় ওঁদের সেই বিশ্বাস ভেঙে দেবার চেষ্টা করা বৃথা। অতএব নীরব থেকে আমরা অভিযোগটা মেনে নিই। আর মনে মনে স্থির করি, আবার যদি ওপরে যাওয়া হয়, তাহলে অন্তত এখান থেকে কেউ লাল উইণ্ডপ্রুফ পরে রওনা হবো না।

কথা বলতে বলতে আমরা ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে সেই পাঠশালা-কাম-মণ্ডপের সামনে আসি। যারা তখন ছুটতে ছুটতে আগে চলে এসেছিল, তারা সবাই দেখছি এখানে। ওরা পঞ্চায়েত ঘর পরিষ্কার করছে।

প্রধান বলেন—এখানে একটু বিশ্রাম করুন। চা এসে যাচ্ছে। ঘরটা পরিষ্কার হয়ে গেলে চাটাই আর শতরঞ্জি পেতে দেবে, আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না।

একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন—আপনাদের মালপত্র এলে এই মণ্ডপে রেখে দেবেন। এখানেই রান্না হবে এবং মালবাহকরা শোবে।

—কিন্তু পাঠাশালা চলবে কেমন করে? নেতা জিজ্ঞেস করে।

মাস্টারজি একটু হেসে বলেন—সে একটা ব্যবস্থা আমি করে নেব।

প্রধানজিও সমর্থন করেন তাঁকে। তারপরে বলেন—আপনারা কিন্তু গ্যাসবাত্তিটা জ্বালিয়ে নেবেন।

বিনয় বলে—আমাদের বাতিটা খারাপ। ভেঙে গেছে।

—কেমন করে?

—জ্বালতে গিয়ে শের সিং ভেঙে ফেলেছে। শৈলেশ উত্তর দেয়।

—উজবুক। প্রধান বলে ওঠেন। তারপরে প্রশ্ন করেন—ঐ দালালটাকে কেন আপনারা মেট করেছেন? সেদিন তো ওরই জন্য আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে হল। আমরা আজও সেজন্য লজ্জিত।

আমরাও লজ্জা পাই। ছি ছি, আমরা এঁদের ভুল বুঝেছি, মনে মনে কত কটূক্তি করেছি।

কিন্তু সেকথা স্বীকার করার সময় পাই না। তার আগেই হঠাৎ প্রধান ডাক দেন—লক্ষ্মণ!

—জী! একটি তরুণ তাঁর সামনে আসে।

প্রধান তাকে বলেন—আমার ঘরে গিয়ে পঞ্চায়েতের গ্যাসবাত্তিটা নিয়ে আয় তো! সাব্‌দের কাছ থেকে তেল আর মেন্টাল নিয়ে বাত্তিটা জ্বেলে দে!

লক্ষ্মণ পা চালিয়ে চলে যায়।

সন্ধ্যার সময়ে ঘোড়া ও মালবাহকরা এসে পৌঁছায়। ততক্ষণে গ্রামবাসীরা নুন আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মাখা আলুসেদ্ধ সহযোগে চা খাইয়েছেন এবং পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

গাঁয়ের কয়েকটি যুবক এখনও আমাদের সাহায্য করে চলেছে। মালপত্র গোছানো থেকে রান্নার আয়োজন পর্যন্ত—সব কাজেই। এদের মধ্যে একটি ছেলে গ্রাজুয়েট, নাম বৈজনাথ। আরেকটি এম. এ. পড়ছে নাম শিবকুমার। এই গ্রীষ্মকালীন গ্রামের গরীব মানুষদের মধ্যেও এমন বিদ্যাচর্চার পরিচয় পেয়ে পুলকিত হলাম।

নেতার নির্দেশে নিমা চা বানায়। ওরাও আমাদের সঙ্গে চা-বিস্কুট খায়। তারপরে, 'কল ফির মিলেঙ্গে' বলে একে একে বিদায় নেয়।

আর আশ্চর্য! ওরা বিদায় নেবার পরেই আবার সেই যন্ত্রণাটা জেগে ওঠে—হাতি পর্বতকে প্রণাম না করে পালিয়ে আসার যন্ত্রণা।

পর্বতাভিযানে সাফল্য ও ব্যর্থতার সমান গৌরব। উচ্চতাও বিচার্য নয়। আসল হচ্ছে সাহসিকতার সঙ্গে প্রকৃতির মোকাবিলা করে সাধ্যমত আরোহণের চেষ্টা করা। এবারে আমরা প্রকৃতির মোকাবিলা করতেই পারলাম না। যন্ত্রণাটা সেই জন্যই। মানুষ যে আজও প্রকৃতির কাছে কত অসহায়, আমাদের এই ব্যর্থতা তারই প্রমাণ হয়ে থাকল।

মনে পড়ছে তমসা উপত্যকা অভিযানের কথা। সেবারেও অমূল্য আমাদের নেতৃত্ব

করেছে। বন্দরপুঁছ পর্বতশ্রেণী থেকে নির্গত বুঁইসারাগাড ও স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গ-নিঃসৃত হর-কি-দুন নালার মিলিতধারা গাড়োয়ালের তমসা। ওসলা গ্রামের কাছে এসে দুটি ধারা এক হয়েছে। তারপরে নেমে এসে দেরাদুনের কাছে যমুনায় মিশেছে।

আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম বুঁইসারাগাডের উৎসের ওপরে অবস্থিত ১৮,৪০০ ফুট উঁচু ধুমধার-কান্দি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তমসা উপত্যকা থেকে ভাগীরথী উপত্যকার হরশিলে পৌঁছব।

কিন্তু প্রকৃতির অকরুণ আচরণে আমাদের সে পরিকল্পনা সফল হয় নি। অভিযানকালে এক নাগাড়ে বারোদিন বিরামহীন তুষারপাতের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। ফলে আমাদের গতিবেগ কমে গিয়েছে কিন্তু চলা বন্ধ হয় নি। এবং আমরা ধুমধার-কান্দির কয়েক শ' ফুটের মধ্যে উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। কিন্তু অসংখ্য ফাটলের জন্য গিরিবর্ত্মটি অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি।*

আর এবারে বৃষ্টির জন্য তাঁবুর মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকতে হল। হাতি পর্বতের পাদদেশে পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম না। এর চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর কি হতে পারে?

যন্ত্রণাটা আমার চেয়ে ওদের বেশি, তরুণ পর্বতারোহী বন্ধুদের। তারা নেতাকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না বলে আমার কাছে দরবার করছে। বলছে—আপনি একটু লিডারকে বুঝিয়ে বলুন না, কেবল কালকের দিনটাকে টার্গেট রাখা ঠিক হবে না। কাল আবহাওয়া ভাল না হলেও, আমরা আরও অন্তত দুটি দিন এখানে অপেক্ষা করব।

প্রস্তাবটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। তবু ওরা বলতে সাহসী হচ্ছে না। ওদের ধারণা আমি বললে নেতা সম্মত হবে। কিন্তু ওদের ধারণা ভুল। ব্যক্তিগত ভাবে অমূল্য আমাকে বড ভাইয়ের মতো সম্মান করে। কিন্তু পর্বতাভিযানে এসে তার কথাই শেষ সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে সে একেবারেই 'ডিক্টেটর'। আর তাই বোধ করি তার 'রেকর্ড' এত ভাল। প্রায় বিশটি পর্বতাভিযান পরিচালনা করেও সে কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে দেয় নি।

তাছাড়া কথাটা বলা আমার পক্ষে ঠিক সমীচীন নয়। কারণ অমূল্য অনুজপ্রতিম হলেও এখানে সে আমার নেতা। নেতার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা পর্বতাভিযানে অমার্জনীয় অপরাধ।

ওরা অবশ্য বলে—আপনি তো লিডারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন না, আপনি একটা প্রস্তাব রাখছেন মাত্র।

তাই করি। কিন্তু নেতা সে প্রস্তাব মেনে নিতে চায় না। বলে—আরও তিন দিন অপেক্ষা করে জনসাধারণের অর্থে এখানে বসে বসে পিক্‌নিক করা উচিত হবে না। তাতে টাকা পয়সা ও রসদেরও অভাব হয়ে যাবে। তাছাড়া, তুমি তো জানো আমি পাহাড়ে এসে কখনও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি না।

কথাটা আমার অজানা নয়, অতএব আমাকে নীরব হতে হয়। একটু বাদে নেতা আবার আমাকে বলে—কাল সকাল পাঁচটায় চারজন পোর্টার ও দুটো ঘোড়া ওপরে চলে যাবে, সন্ধ্যের আগেই ফেলে আসা মালগুলো এখানে নিয়ে আসবে। আর সকালের বাস ধরে ভটচাজ জোশীমঠ চলে যাবে। সেখানে আমাদের আশ্রয় ও ঋষিকেশে ফিরে যাবার

* লেখকের 'তমসার তীরে তীরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

বাস-টিকেটের ব্যবস্থা করবে। পরশু সকালের বাস ধরে আমরা জোশীমঠ চলে যাবো।

তার মানে নেতা ওপর থেকে ফিরে আসার সময় যা-ই বলে থাকুক, ইতিমধ্যে মনে মনে সে অভিযান বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সদস্যরা সবাই নীরব। আমারও আর কিছু বলার নেই। সেই যন্ত্রণাটাই আবার প্রকট হয়ে ওঠে। সদস্যদের সবার চোখে জল। নেতারও তাই। তবু সে নিশ্চল, নিথর ও নিস্পন্দ।

তবে গৌতম শিবু শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ কিংবা তপনের মতো তার কান্নার শব্দ শুনতে পাই না, সে নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছে।

মানুষ গৃহপ্রিয় প্রাণী। সাত দিন পরে আজ আমরা ঘর পেয়েছি। এখানে বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই, শীত সামান্য। গত রাতেও আজ এমন আরামের আশা করি নি। তবু ওদের কান্না থামে নি। ওরা শুয়ে শুয়ে এখনও তেমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমি কিন্তু কাঁদছি না। কেন কাঁদব ? আমি যে এখনও আশা ছাড়ি নি। প্রকৃতির ওপরে আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি নি।

আমি তাই ভাবছি, কেবল ভেবে চলেছি আগামীকালের কথা। কাল সকালে নিশ্চয়ই সূর্যের সোনালী মুখখানি দেখতে পাবো। দেখতে পাবো হিমালয়ের ঘন নীল আকাশ।

আশায় বুক বেঁধে আমি চোখ বুজি। আমার এ আশা কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না। অতএব দেব দিবাকরকে প্রণাম জানিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি।

॥ সাত ॥

কোসাগাঁয়ে

ঘুম ভেঙে যায়। এ কি, ঘরে এত আলো কেন ? পাথরের দেওয়াল আর চালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঘরে প্রচুর আলো এসে পড়েছে। সে কি ! সকাল হয়ে গেছে নাকি ! নিশ্চয়ই তাই। নইলে এত আলো কোথা থেকে আসবে ? ছিঃ ছিঃ নেতা বলেছিল সকাল পাঁচটার মধ্যে ঘোড়া ও পোর্টারদের ওপরে পাঠিয়ে দিতে। ভটচাজ সকালের বাসে জোশীমঠ যাবে।

তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালাই, ঘড়ি দেখি। কিন্তু একি ! এ যে দেখছি সাড়ে তিনটে ! ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায় নি তো ? না, ঘড়ি চলছে। তাহলে ? বাইরে আলো, ঘড়িতে রাত সাড়ে তিনটে ! কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

উঠে বসি। উইন্ড-চিটারটা পরে নিয়ে জুতোটা পায়ে দিই। টর্চ জ্বেলে শায়িত সহযাত্রীদের সাবধানে ডিঙ্গিয়ে দরজার কাছে আসি। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলি ! শব্দ হলে ওদের ঘুম ভেঙে যাবে। কান্নাকাটির পরে ওরা হয়তো সবে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাইরে আসি। হ্যাঁ, চারিদিক আলোময়। সূর্য নয়, চাঁদের আলো। আকাশে

পূর্ণচন্দ্র—পূর্ণিমার চাঁদ। তার স্নিগ্ধ ও মধুর আলোয় ভেসে যাচ্ছে কোসাগাঁও। চন্দ্রিমার কোমল কিরণে কোসা অবিরত অবগাহন করছে, তার ঘর-বাড়ি পথ ও প্রান্তর আর গাছপালা ও ক্ষেত-খামার। এ কি মাটির পৃথিবী কিংবা অলকাপুরী?

আকাশ সম্পূর্ণ মেঘশূন্য নয়। তাহলেও তারাদের লুকোচুরি চোখে পড়ছে। অবশেষে সেই কালাপাহাড়ের দিকে তাকাই। সেদিনের মতই আজও সে আর শুধুই কালো নয়। তার কালো রূপে আলোর জোয়ার। আজও সে আলোর উৎস হয়ে আমাকে অভিনন্দিত করছে। কিন্তু এ কেমন অভিনন্দন? আগামীকাল আবার সেদিনের মতো বৃষ্টি নামবে না তো?

ছিঃ ছিঃ তা হবে কেন? প্রকৃতির পরীক্ষা নেওয়া শেষ হয়েছে। আমরা সে পরীক্ষায় পাশ করেছি। অতএব এবার প্রকৃতি রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন দিয়ে আমাদের পুরস্কৃত করবেন। এবং নেতা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে।

আনন্দিত চিত্তে ফিরে আসি ঘরে। তেমনি নিঃশব্দে দোর বন্ধ করে নিজের ম্যাট্রেসে এসে শুয়ে পড়ি। প্রভাতের প্রতীক্ষা শুরু করি।

নেতার নির্দেশ মতো ভোর পাঁচটায় পাঁচজন মালবাহক ও দুটো ঘোড়া ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করছি আবহাওয়া ভাল থাকলে ওরা রেখে আসা মালপত্রগুলো নিয়ে সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে পারবে।

সকাল ছ'টায় সবাইকে বেড-টি পরিবেশন করে ভটচাজকে ব্রেক-ফাস্ট করিয়ে দিলাম। সে সকালের বাস ধরে জোশীমঠে চলে যাচ্ছে। হতাশা এখনও সবাইকে অসার করে রেখেছে। তাই ওরা বেড-টি শেষ করে আবার শুয়ে পড়ল। রাতে চাঁদ দেখার ব্যাপারটা কাউকে বলি নি। কারণ চাঁদ নয়, সবাই সূর্যকে চাইছে। রোদ না ওঠা পর্যন্ত হিমালয়ের সূর্যকে বিশ্বাস নেই।

আর তাই ভটচাজকে জোশীমঠ যেতে দিচ্ছি। আজ রোদ উঠলে আগামীকাল আমাদের জোশীমঠ যাওয়া বাতিল হবে। কিন্তু এখন ওকে আটকানো মানে নেতার নির্দেশ অমান্য করা।

আমি ওকে এগিয়ে দিই। ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের মন্দির ছাড়িয়ে আসি। সমতলের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়াই। ভটচাজ উৎরাই রাস্তা বেয়ে নামতে শুরু করে। এ জায়গাটা থেকে নিচের রাস্তার অনেকখানি চোখে পড়ে। দেখা যায় কোসাপুল আর ওপারের বাসপথ।

ভটচাজ বেশ তাড়াতাড়ি উৎরাই ভাঙছে। ওকে যে সবসময় দেখতে পাচ্ছি, তা নয়। মাঝে মাঝেই সে বাঁকের মুখে কিংবা পাথরের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।

একসময় সে পুলের ওপর পৌঁছল। ধৌলিগঙ্গা পার হল। আমাদের সেই শিবির ক্ষেত্রটি ছাড়িয়ে বাসপথে উঠে গেল। আর তারপরেই এদিকে তাকিয়ে দেখতে পায় আমাকে। সে হাত নাড়ে, আমিও হাত নাড়ি।

অকস্মাৎ এপার-ওপার কাঁপিয়ে একটা যান্ত্রিক শব্দ জেগে ওঠে। একটু বাদেই বাস আসে। বাস থেমে যায়। ভটচাজ বাসে ওঠে। বাস চলতে শুরু করে।

আমি আস্তানায় ফিরে চলি। জনহীন পথ। সাতটা বেজে গেছে। এখনো কোসাগাঁও সুপ্তির কোলে। বোধকরি সূর্য না উঠলে তার ঘুম ভাঙবে না। সূর্যই যে এখানে জীবনের

জীয়নকাঠি। তার পরশ না পেলে রূপকথার রাজকন্যার মতই কোসাগাঁও থাকবে ঘুমিয়ে।

মণ্ডপের সামনে এসে বসি। জীবন-দেবতা দিবাকরের প্রতীক্ষায় বসে থাকি। জানি না, আমার এ প্রতীক্ষা সার্থক হবে কিনা?

প্রকৃতি পরম-চঞ্চলা। হিমালয়ের প্রকৃতি সেই সঙ্গে অস্থিরা। যখন তখন কারণে অকারণে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। সে যুক্তিতর্ক আবেদন-নিবেদনের ধার ধারে না। এবং মাঝে মাঝেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

তাই বলে তার বুকে মায়া নেই, তার মনে মমতা নেই, এমন কথা বলা উচিত নয়। কারণ আজ আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল না।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, কালাপাহাড়ের মাথায় সোনালী রোদের আলপনা। আনন্দে চিৎকার করে উঠি—রোদ! রোদ উঠেছে।

পঞ্চায়েত ঘরের সামনে ছুটে আসি। আবার বলি—ওরে তোরা এখনও শুয়ে রয়েছিস। বাইরে বেরিয়ে দেখ রোদ, রোদ উঠেছে।

—রোদ! ওরা ধড়মড় করে উঠে বসে। সমস্বরে বলে ওঠে—রোদ উঠেছে! সত্যি?

আমি মাথা নাড়ি।

আর কিছু বলতে হয না। তাড়াতাড়ি পায়ে জুতো গলিয়ে হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে সকালের সোনালী রোদ মণ্ডপের উঠোনে এসে হাজির হয়েছে।

আর তাই দেখতে পেয়ে নেতার সব গাম্ভীর্য খসে পড়ে। সে-ও সবার সঙ্গে সমানে নাচ-গান শুরু করে দেয়।

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হবার পরে নেতাকে প্রশ্ন করি—এখন কি করবি তাহলে?

নেতা নাচ থামায়। আমার দিকে তাকিযে থাকে একটুকাল। তারপরে উত্তর দেয়—কি আবার করব? আগামীকাল সকালেই যাতে আবার অভিযান শুরু করা যায়, তার চেষ্টা শুরু করে দাও!

—থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার লিডার অমূল্য সেন!

—হিপ্ হিপ্ হুররে! হিপ্ হিপ্...

আমিও গলা মেলাই। কিন্তু নেতা শান্ত ও অবিচলিত। একটু বাদে ডাক দেয়—গৌতম! একবার একটু আমার কাছে এসো তো!

সহনেতা নাচ থামিয়ে নেতার সামনে আসে। নেতা বলে—তোমরা কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ছ!

—কোথায়?

—হাতি পর্বতের পথে।

—থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার লিডার অমূল্য সেন!

—হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্...

আমরা আবার নেতার জয়ধ্বনি করে উঠি। কেবল আকাশের নয়, আমাদের মনের মেঘও কেটে গিয়েছে।

জয়ধ্বনি থামলে গৌতম অমূল্যকে জিজ্ঞেস করে—কিন্তু তুমি 'তোমরা' বলছ কেন, তুমি যাবে না?

—না। নেতা উত্তর দেয়—সাতদিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রচুর কুলিভাড়া ও রসদ বাড়তি খরচ হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের 'রাশ-ট্যাক্‌টিস' নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি 'ক্লাইম্ব' করতে হবে। তাই 'নন-ক্লাইম্বিং মেম্বার'রা কেউ ওপরে যাবে না। এখানেই অপেক্ষা করবে। আমিও তাদের সঙ্গে থাকব। এতে যেমন প্রচুর কুলিভাড়া বাঁচবে, তেমনি খাবারের অসুবিধেও কমে যাবে। তোমরা সমস্ত টিন-ফুড এবং প্রয়োজনীয় রেশন ও কেরোসিন ওপরে নিয়ে যাবে। তবে তোমাদের আমি সময় বেঁধে দেব।

—কত দিন ? শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন করে।

নেতা উত্তর দেয়—দশ দিন। এই দশ দিনের মধ্যে তোমাদের হাতি পর্বত কিংবা অনামি শৃঙ্গটিতে আরোহণ করে এখানে ফিরে আসতে হবে। পারবে ?

—নিশ্চয়ই। ওরা সমস্বরে বলে ওঠে।

—সাবাস ! এই তো চাই। নেতা খুশি হয়। তারপরে বলে—কেবল আমি নয়, ডাক্তারও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। তবে সে ওষুধপত্র সব বুঝিয়ে দেবে।

—ঠিক আছে। জগদীশ বলে—আপনার আশীর্বাদে আমরা সুস্থ শরীরে সফলকাম হয়ে ফিরে আসব।

সময়ের সঙ্গে চুক্তি করে পর্বতারোহণ পরিকল্পনা সমীচীন নয়। কারণ পর্বতারোহণ মানেই অজানা দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পথ এবং অস্থিরা প্রকৃতি। প্রতি পদক্ষেপে যেখানে জীবনের ঝুঁকি, সেখানে এমন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া !

কিন্তু আমরা যে নিরুপায়। মানুষ অবস্থার দাস। আমাদের সীমিত শক্তির কথা বিবেচনা করেই নেতার এই বিচিত্র শর্ত। এবং গৌতম সহ সব পর্বতারোহী সদস্য সানন্দে শর্তটি মেনে নিল। কিন্তু সেকথা প্রকাশ করল কেবল কনিষ্ঠতম পর্বতারোহী বুবেন। সে বলে—তোমাদের ছেড়ে যেতে মন চাইছে না লিডার ! তবু তোমার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। আদেশ পালন করে আমরা সবাই নিরাপদে তোমাদের কাছে ফিরে আসব দশ দিন বাদে।

—কিন্তু আর কথা নয়, এবারে কাজ শুরু করে দাও। নেতা বলে ওঠে। সে কাজ ভাগ করে দেয়—গোরা তুমি চা ও জলখাবারের আয়োজন করো, একজন ল্যাপকে নিয়ে কিচেনে চলে যাও।

একটু থেমে নেতা আবার বলে—ট্রেন্‌ড মাউন্টেনিয়ারররা সবাই অর্থাৎ গৌতম জগদীশ শ্রীকৃষ্ণ শিবু তপন ও বুবেন, ওপরে যাবে। দু-জন শেরপা, চারজন হ্যাপ ও শের সিং তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে তোমরা তেরোজন।

গৌতম মাথা নাড়ে।

নেতা বলে চলে—দশ দিনে তোমাদের কত রেশন ও জ্বালানি লাগবে হিসেব করে ফেল। কি কি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন তারও একটা তালিকা তৈরি করো।

গৌতম আবার মাথা নাড়ে। সে কাগজ কলম নিয়ে বসে।

নেতা আবার কাজের কথায় ফিরে আসে—ভিজে তাঁবু স্লিপিং ব্যাগ, কিট-ব্যাগ ও পোশাক-পরিচ্ছদ শুকোতে দাও। গৌতমের হিসেব হয়ে গেলে মালপত্র প্যাকিং শুরু করতে হবে। পাঁচ জন পোর্টার ও চারটে 'মিউল' পাবে। মাল বেশি হলে তোমাদের বইতে হবে।

একবার থামে নেতা। তারপরে বলে—শঙ্কুদা শৈলেশকে সঙ্গে নিয়ে তুমি আজ সহ

এই সাত দিনের একটা রিপোর্ট লিখে ফেলো, ইংরেজি ও বাংলায়। বিকেলের বাসে বিনয় সেটা নিয়ে জোশীমঠ যাবে। কাল সকালেই কলকাতা ও দিল্লীতে ফ্যাক্স পাঠাবে। তারপরে ভটচাজকে নিয়ে বিকেলের বাসে এখানে ফিরে আসবে। শঙ্কর, বিনয়কে কিছু টাকা দিয়ে দাও। ওরা প্রয়োজনীয় বাজার করে আনবে।

—কি আনতে হবে? বিনয় জিজ্ঞেস করে।

নেতা উত্তর দেয়—গোরার কাছ থেকে জেনে নাও। তবে পোর্টারদের জন্য বিড়ি ও গ্রামের ছেলে-মেয়েদের জন্য লজেন্স অবশ্যই আনবে। চাল, আটা, আলু ও কেরোসিন তেল আনার দরকার নেই। ওগুলো আমরা মালারি থেকে নিয়ে আসব।

ব্যস, যে যার কাজ শুরু করে দিলাম। এবং এতসব কাজের মাঝে আজ আমরা আরও একটা কাজ করে ফেললাম। দুপুরে দল বেঁধে নদীতে গিয়ে স্নান সেরে নিলাম, একেবারে অবগাহন স্নান। জোশীমঠ ছাড়ার পরে প্রথম স্নান।

আজকের খাওয়াটাও বেশ ভাল হল—ডাল ভাত ও ডিমের ঝোল। অর্ধেন্দু নিরামিষাশী বলে নিজের তরকারি নিজেই রেঁধে নিয়েছে। সে বিয়ে করে নি, সুতরাং তাকে রান্না শিখতে হয়েছে। এবং সে বেশ ভাল রান্না করে। আগামীকাল সকালে গৌতমরা ওপরে চলে যাচ্ছে বলে, আজ রাতে সে ঘুগনি ও আলুরদম রান্না করবে। বুটির সঙ্গে বেশ জমবে।

দুপুরের খাবার পরে নেতা ও সহনেতা ম্যাপ নিয়ে বসে। জগদীশ, শ্রীকৃষ্ণ ও বুবেন ওদের সঙ্গে রয়েছে। নেতার কাছ থেকে সম্ভাব্য পথনির্দেশ নিয়ে নিচ্ছে।

আমরা প্যাকিং নিয়ে বসেছি। একদিনে একটা অভিযানে সকল প্রস্তুতি পূর্ণ করে ফেলতে হবে। সুতরাং সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। আরও আনন্দের কথা গ্রামের কয়েকজন যুবকও এসে আমাদের সঙ্গে সমানে কাজ করে চলেছে। মোড়ল নিজেও একবার ঘুরে গিয়েছেন। তিনিই ঘোড়া ঠিক করে দিয়েছেন এবং কম ভাড়ায়। তিনি তো শের সিংয়ের মতো ঘোড়াওয়ালার কাছ থেকে কমিশন নেবেন না।

সকালে ভটচাজকে আমি একা বিদায় দিয়েছিলাম। বিকেলে বিনয়কে বিদায় জানাতে কিন্তু সবাই সেই উঁচু জায়গাটা পর্যন্ত আসে। আর গৌতম ও শৈলেশ তো ওকে বাসে তুলে দেবার জন্য নেমে গেল ধৌলির ধারে। বিদায় বেলায় অর্ধেন্দু আশ্বস্ত করে বিনয়কে—আমার মশলাপাতিগুলো নিয়ে এসো! নিশ্চিন্তে চলে যাও, কাল ভটচাজকে নিয়ে ফিরে এসে তোমাদের ভাগের ঘুগনি ও আলুরদম পেয়ে যাবে।

বিনয়কে বিদায় দিয়ে ফিরে আসবার আগেই অর্থাৎ বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ রোদ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো শীতের পরশ। কিন্তু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ ঘণ্টা ন'য়েকের রোদ ছ'দিনের প্রায় সব ভিজে জিনিস শুকিয়ে দিয়ে গেল। আবার অভিযাত্রীদের সেঁতসেঁতে মনগুলিকেও খট্‌খটে করে দিল। নিরাশার অন্ধকার থেকে আমরা আবার আশার আলোয় প্রত্যাবর্তন করলাম। হিমালয়ের সূর্য সত্যই দিনমণি। তিনি অর্কদেব ও আদিত্য, ভানু ও ভাস্কর, মিত্র ও মিহির, তিনি তপন দিবাকর ও প্রভাকর, তাঁকে প্রণাম করি। প্রার্থনা করি—আগামীকাল ও তারপরে আরও ন'টি দিন তুমি এমনি অকৃপণ করুণায় আমাদের জীবনকে ধন্য করে তোলো!

॥ আট ॥

কোসাগাঁও থেকে মূল শিবির

আজ ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। জুতো-জামা পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি বাইরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অকারণ আশঙ্কা দূর হয়। আজও মেঘশূন্য সুনীল আকাশ। মালবাহকদের ডেকে তুলি। চা বানাতে বলি।

সকাল ছ'টায় সবাইকে বেড-টি পরিবেশন করা গেল। আজ কিন্তু চা শেষ হতেই সবাই শয্যাত্যাগ করে। আজ যে অনেক কাজ। আজ আমার পর্বতারোহী ভাইরা দ্বিতীয়বার যাত্রা করবে দুর্গম ও দুস্তরের পথে।

নেতার নির্দেশে আজ সবাই একসঙ্গে জলখাবার খেতে বসলাম। ওদের সঙ্গে আবার খেতে বসব দশ দিন বাদে। এই দশ দিন ওরা অবিরত সংগ্রাম করবে আর আমরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে ওদের ফিরে আসবার দিন গুণবো।

ব্রেক-ফাস্ট করে ওরা রুক্স্যাকে প্যাক-লাঞ্চ্ ভরে নেয়। তারপরে নেতা, অর্ধেন্দু ও আমাকে প্রণাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে করমর্দন করে। এক এক করে আমি ওদের বুকে জড়িয়ে ধরি। শেষবারের মতো সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলাম—পর্বতারোহণে কিছু ঝুঁকি নিতেই হয় কিন্তু সে ঝুঁকি যেন অবিমৃষ্যকারিতার পর্যায়ে না চলে যায়। মনে রেখো, হিমালয় কখনও অবিমৃষ্যকারীকে ক্ষমা করেন না। আর পর্বতাভিযান মানে শুধুই শিখরারোহণ নয়। ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে শিখরারোহণের প্রচেষ্টা এবং নিরাপদ প্রত্যাবর্তনই প্রকৃত পর্বতাভিযান। হিমালয় থাকবে সুতরাং আমাদেরও সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে যেতে হবে। নইলে আমরা বার বার তাঁর কাছে ফিরে আসব কেমন করে?

আজ আর ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই করার জন্য গৌতমদের অপেক্ষা করার দরকার নেই। শঙ্কর শৈলেশ গোরা ও রঞ্জু সে কাজটা করে দিচ্ছে। তাছাড়া শেরপা ও হ্যাপ্‌রাও রয়েছে। গৌতমরা তাই আগেই রওনা হয়ে গেল। আমি অমূল্য অর্ধেন্দু ও কয়েকজন গ্রামবাসী ওদের এগিয়ে দিলাম সেই ক্ষেতের শেষে, পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত। ওরা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠছে, আমরা অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি ওদের দিকে। শুধু আমরা নই, নদীর ঘাটে কর্মরতা গ্রামের কয়েকজন মহিলাও তাঁদের হাতের কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। আমাদেরই মতো তাঁরাও তাঁদের পর্বতদেবতার কাছে মনে মনে গৌতমদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করছেন।

ফিরে আসি আস্তানায়। ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপানো হয়ে গিয়েছে। হ্যাপ এবং শেরপারাও প্রস্তুত। শের সিংও তৈরি হয়ে নিয়েছে! নেতা শেরপাদের সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলে নেয়। তারপরে ওরা করমর্দন করে বিদায় নেয় আমাদের কাছে। ওরা পথচলা শুরু করে। গাঁয়ের ঘর-বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ডাক্তারও তৈরি হয়ে নিয়েছে। সে গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে অসুস্থদের চিকিৎসা করবে। ভিজিট নেবে না, ওষুধের দামও চাইবে না। কিন্তু কেউ সবুজ শাক-সবজি কিংবা ফল উপহার দিলে তার রুকস্যাকে ভরে নিয়ে আসবে। এবং নেতার আশা ডাক্তার তার সেবার বিনিময়ে রোজই কিছু শাক-সবজি রোজগার করে আনতে পারবে। অতএব গ্রামের দুটি যুবকের সঙ্গে ডাক্তারও বেরিয়ে পড়ে পথে।

আজও বেশ কড়া রোদ উঠেছে। জায়গার অভাবে কাল যেসব মালপত্র শুকোতে দেওয়া হয় নি, আজ সেগুলো রোদে ফেলে রাখা হয়েছে। জায়গা মানে মণ্ডপের উঠান, পাশের পাথুরে স্তূপ আর পথ। ফেলে রাখলেই হল, পাহারার প্রয়োজন নেই। প্রধানজি জানিয়েছেন, এখানে কেউ অন্যের জিনিসে হাত দেয় না। বলেছেন—টাকা ভর্তি একটা থলি ঐ পথের ওপরে সকালে ফেলে রাখুন, সারাদিন কোন পথচারী সেটি একবার ধরেও দেখবে না।

তার মানে গরীব গাঁয়ের গরীব মানুষরা মনের দিক থেকে সবাই ধনী। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' কথাটা হিমালয়ের ক্ষেত্রে আজও সত্য নয়।

তেল মেখে স্নান করতে চলি। কিছু কাচাকাচিও করতে হবে। ঘর-বাড়ির মাঝখান দিয়ে পথ। চলতে চলতে গ্রামের ঘরগুলোকে চেয়ে চেয়ে দেখি—সবই দোতলা। পাথরের দেয়াল আর কাঠ ও স্লেট-পাথরের চাল। কাঠের পাটাতন দিয়ে দোতলার মেঝে। সেখানে থাকা-খাওয়া আর রান্না। নিচের তলা গরু-ঘোড়া আর মুরগির জন্য। এ গ্রামে ভেড়া-ছাগল দেখছি না। তবে বেশ কয়েকটা বাঘের মতো কুকুর রয়েছে।

কোসানদী এখানেও খানিকটা নিচু দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তাই ঘাটে আসতে খানিকটা উৎরাই বেয়ে নেমে আসতে হল। ঘাটটি কিন্তু ভারি সুন্দর। এখানে নদীখাতটা অনেকখানি চওড়া আর রঙ্গীন নিরেট পাথরে পরিপূর্ণ। তারই ওপর দিয়ে কয়েকটি ধারায় বয়ে চলেছে কোসাগাঁয়ের কোসা নদী। নদীর ওপারে সেই কালাপাহাড়ের পাদদেশে কিছু ক্ষেত—আলু বিন্‌স শাকসবজি ও রামদানার ক্ষেত। এ গ্রামের মানুষরাই চাষ করেন। ওপারে যাবার জন্য একটা কাঠের সাঁকো রয়েছে।

গাঁয়ের মেয়েরা সারাদিন এখানে জলের কাজ করেন—স্নান করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাচা। ঠাণ্ডা জল, একটু গরম না করলে কাপড় পরিষ্কার হয় না। তাই পাথরের আড়ালে কাপড় সেদ্ধ করবার ব্যবস্থাও রয়েছে। আর রয়েছে একটা পানি-চাক্কি। গাঁয়ের মেয়েরা স্নান শেষে গম কিংবা রামদানা পিষে নিয়ে যান। হিমালয়ের মেয়েরা ছেলেদের চাইতে বেশি কাজ করেন। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই যেন এক একজন দশভূজা।

কাচাকাচি ও স্নান সেরে খাবার জল নিয়ে ফিরে চলি আস্তানায়। কোসানদী কোসাগাঁয়ে জলের একমাত্র উৎস। প্রাতঃকৃত্য থেকে পিপাসা নিবারণ, সবই এই নদীর জল দিয়ে। জন-স্বাস্থ্যের কথা ছেড়েই দিলাম। এই উৎরাই আর চড়াই ভেঙে জল নিয়ে আসা রীতিমত শ্রমসাপেক্ষ। তাই সামনের পাহাড়ের একটা ঝরণা থেকে পাইপ দিয়ে জল আনার চেষ্টা করছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু সরকারী সাহায্যের অভাবে সে চেষ্টা আজও সফল হতে পারে নি। কবে হবে তা বোধকরি পর্বতদেবতারও জানা নেই। কারণ এই জনগণতান্ত্রিক দেশের রঙ্গমঞ্চে যে জনগণকে আজও ছাগলের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

ফিরে এসে খেতে বসা গেল। না ঘরে নয়, মণ্ডপের উঠোনে, শুকোনে দেওয়া স্লিপিং-ব্যাগ অথবা ম্যাট্রেসের ওপরে। গৌতমদের রেশন ও কেরোসিন দিয়ে দেবার পরে আমাদের অবশ্য খাবার ও জ্বালানী সামান্যই রয়েছে। দু-তিনদিন চলতে পারে কোনমতে। তার মধ্যে মালারি থেকে চাল ডাল ও আটা আলু এবং কেরোসিন নিয়ে আসতে হবে।

একটা ব্যাপারে আজ অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গ্রামবাসীদের চিকিৎসার

বিনিময়ে ডাক্তার কিছু শাক-সবজি রোজগার করে আনতে পারবে। আজও কিছু নিয়ে এসেছে। সেগুলো কাল রান্না করা যাবে। জয়, ডাক্তারের জয়!

ডাক্তার কিন্তু প্রতিবাদ করে। বলে—আমি উপলক্ষ মাত্র। পরিকল্পনাটা করেছেন লিডার। অতএব আসুন আমরা তাঁর জয়ধ্বনি করি। জয়, লিডার অমূল্য সেনের জয়।

আমরাও ডাক্তারের সঙ্গে গলা মেলাই। এবং শেষপর্যন্ত অমূল্য নিজেই নিজের জয়ধ্বনির সামিল হয়।

পরদিন। দুপুরে ঘোড়াওয়ালা ফিরে এলো। গৌতম চিঠি দিয়েছে—

সকালে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুরু হল পুরানো পথে নতুন করে পথ-চলা। এখানে-ওখানে একটু-আধটু কাদা ছাড়া পথে আর কোন অসুবিধে নেই। ছোট দল বলে আজ আমাদের গতিবেগ বেড়েছে। আমরা তোমাদের স্মৃতিচারণ করতে করতেই পথ চলেছি। আর সেইসঙ্গে জায়গাগুলো খুঁজে বের করছিলাম—কোথায় শঙ্কুদা তার মশলার কৌটো বের করেছিল, কোথায় লিডার তার চন্দ্রপর্বত আরোহণের কথা বলেছিল, কোথায় শৈলেশ একটু জিরিয়ে নিতে চেয়েছিল।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমরা যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে এসেছি। বেলা সাড়ে বারোটার সময় পৌঁচেছি রাড়ু—আমাদের সেই অন্তর্বর্তী শিবিরের জায়গায়।

পৌঁছে ভারি লজ্জা পেলাম। জায়গাটাকে আমরা বড্ড নোংরা করে রেখে গিয়েছি। চারদিকে ছড়িয়ে আছে প্রচুর প্লাস্টিক, বহু খালি কৌটো, কাগজপত্র আর ভাঙা প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি। তাড়াহুড়ার জন্য পরশু এগুলো মাটিচাপা দিয়ে যাওয়া হয় নি।

আইস-এ্যাক্স ও বেলচা দিয়ে একটা বেশ বড় গর্ত খোঁড়া হল। নোংরাগুলোকে কবর দিয়ে পর্বতারোহীর কর্তব্য পালন করলাম।

ঝরণার জলে হাত-পা ধুয়ে নিয়ে সেই বড় পাথরখানির পাশে বসে একটু বিশ্রাম করে নিলাম। ভাবছিলাম তোমাদের কথা। তোমাদের ত্যাগের কথা, আমাদের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা আর বিশ্বাসের কথা। হাতি পর্বত অভিযানে এসে তোমরা হাতি পর্বত দর্শন না করে বসে রইলে কোসাগাঁয়ের বদ্ধ ঘরে। নিজেদের ভাগের খাবার দিযে আমাদের পাঠিয়ে দিলে অভিযানে। আমরা যেন এই ত্যাগ আর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারি।

চিনি মেশানো চিঁড়ে ও ছাতু খেয়ে লাঞ্চ সেরে বেলা দেড়টা নাগাদ আবার শুরু হল পথচলা। এবারে নতুন পথ। দক্ষিণমুখী আঁকা-বাঁকা চড়াই পথ। ক্রমশ চড়াই বাড়ছে। আমরা সারি বেঁধে একসঙ্গে সাবধানে চড়াই ভাঙতে থাকলাম।

বুনোফুল ঘাস আর কাঁটাগাছের ছাওয়া একটা ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছি। ঢালের শেষে ভারি সুন্দর ভুজবন। ভুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অসংখ্য ফুল। নানারঙের প্রচুর জানা-অজানা ফুল। দেখে আমরা দিশেহারা হয়ে গেলাম। শ্রীকৃষ্ণ তো পথচলার কথা ভুলে ফুলের ছবি তুলতে লেগে গেল।

বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি। সবুজ সরস বনভূমির পরেই প্রস্তরাকীর্ণ নীরস প্রান্তর। অনেকখানি জায়গা জুড়ে। পাথর ডিঙ্গিয়ে পথ চলতে হচ্ছিল। ভারসাম্য রক্ষা করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। প্রান্তরটির ডানদিক দিয়ে বয়ে গিয়েছে কোসানদী। নদীর ধারে পাথরগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট বলে আমরা সেদিক দিয়েই এগিয়ে এসেছি। তাহলেও প্রান্তরটি পার হতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছে।

পাথরের জন্য পথচলার গতিবেগ কমে যাওয়ায় রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কারণ হিমালয়ের সূর্য ততক্ষণে পশ্চিমাকাশের কোলে ঢলে পড়তে শুরু করেছে।

পাথুরে প্রান্তর পার হয়ে আবার সবুজের দেখা পাওয়া গেল। কেবল তৃণাচ্ছাদিত প্রায় সমতল প্রান্তর নয়, সেইসঙ্গে একটি স্বপ্নের ঝরণা। প্রান্তরের বুক বেয়ে নূপুর-কলিত-ছন্দে বয়ে চলেছে কোসার সঙ্গে মিলিত হতে।

কিন্তু প্রাকৃতিক শোভা দর্শনের অবসর ছিল না। আমরা এগিয়ে চললাম। অবশ্য সারাদিনের ক্লান্তি ও উচ্চতাজনিত অবসাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি চলতেও পারছিলাম না।

তাড়াতাড়ি পথ চলতে না পারার আরও একটি কারণ ছিল। কয়েকজন রাখালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁরা গরু চরাচ্ছিলেন। ওঁরা আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় জানালেন—সামনে পাথর বোঝাই দুর্গম আরেকটা প্রান্তর। মাল পিঠে নিয়ে আপনাদের ঘোড়াগুলির সেখানে পথ চলতে খুবই অসুবিধে হবে।

ওঁরা মিথ্যে বলেন নি। গোচারণ ক্ষেত্র পার হয়ে আমাদের বাঁয়ে বাঁক নিয়ে খানিকটা পুবদিকে এগোতে হল। এবং তারপরেই শুরু হল সেই পাথুরে প্রান্তর—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। ঘোড়াগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শের সিং, শেরপা ও মালবাহকরা ঘোড়াওয়ালাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। আমরাও হাত লাগালাম। সকলের সমবেত চেষ্টায় ঘোড়াগুলোকে প্রান্তরটি পার করে আনা সম্ভব হল।

রাড়ু থেকে ঘণ্টা তিনেক পথ চলার পরে হঠাৎ সামনে দেখতে পেলাম রতবন শৃঙ্গ (২০,০৯৬'/৬১২৭মিঃ) —যেন বাজপাখির মতো পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটিকে বাদ দিলে তার সারা গায়েই কালো পাথর। এবারে এই আমাদের প্রথম তুষারমৌলি হিমালয় দর্শন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আর মনে মনে তাঁকে প্রণাম করি।

তারপরে এগিয়ে চলি। কিন্তু পথ কোথায় ? মানচিত্রে দেখেছি বাঁদিকে একটা পথরেখা। কিন্তু এখানে তো তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। তবে রয়েছে কোসা—কোসা নদী। এখানে সে খুবই শীর্ণকায়া। তাহলেও সে এগিয়ে এসেছে আমাদের পাশে। তারই তীর ধরে সারি বেঁধে পথ চলতে থাকি। রতবনের দিকেই এগিয়ে চলেছি।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমরা রতবন হিমবাহের গ্রাবরেখায় উপস্থিত হলাম। আর সেখানেই কোসা নদী গেল হারিয়ে।

না, না, হারিয়ে যাবে কেন ? এখান থেকে যে কোসা তার চলা শুরু করেছে। আমরা তার উৎসে উপস্থিত হয়েছি। এখন ওকে এখানে রেখে আমাদের যেতে হবে আরো এগিয়ে।

তার আগে শেষবারের মতো কোসার কোলে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে সবাই গ্রাবরেখার ওপরে বসে পড়ি। বসে বসে কোসাকে দেখি, রতবনকে দেখি আর চারিদিকে তাকাই।

হিমবাহের শেষে রতবনের সারা শরীরটাই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। হিমবাহ থেকে খাড়া পাথরের দেয়ালের মতো সে ওপরে উঠে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই সেই দেয়াল বেয়ে তুষারধস গড়িয়ে পড়ছে হিমবাহে। তার মানে এদিক থেকে রতবন শৃঙ্গে আরোহণ করা সম্ভব নয়। ১৯৩৭ সালে ফ্রাঙ্ক্ স্মাইথ রতবন শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স থেকে, অর্থাৎ আমাদের বিপরীত দিক থেকে। রতবনের ওপাশেই ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স বা নন্দন-কানন।

এবারে রতবন থেকে দৃষ্টি ফেরাই হিমবাহের দিকে। খানিকটা দূরে তার বুকে একফালি জলাশয়—গ্লেসিয়ার লেক। দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তার কাছে গিয়ে বসা কিংবা তার বুকে রতবনের প্রতিবিম্ব দেখার অবকাশ নেই এখন। অতএব উঠে দাঁড়াই। রুকস্যাক পিঠে নিয়ে গ্রাবরেখার বাঁদিক ধরে এগোতে থাকি। আন্দাজেই চলতে হচ্ছে। কারণ এখানে কোন পথরেখা নেই। তাহলেও বুঝতে পারছি এটাই পথ। কারণ হিমবাহের ডানদিকটা রতবনের সেই খাড়া দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে।

অল্প কিছুক্ষণ পথ চলার পরেই গ্রাবরেখার ওপরে একটা পায়েঁচলা পথরেখার হদিশ পাওয়া গেল। এই পথটাই আমরা মানচিত্রে দেখেছি। অতএব নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলি।

কিন্তু আর কতক্ষণ? সেই ভোরবেলা থেকে চড়াই ভাঙতে শুরু করেছি। বিকেল হতে চলল অথচ চলার শেষ হচ্ছে না।

কিন্তু সুবিধেমত একটা শিবিরক্ষেত্র না পাওয়া পর্যন্ত তো থামা চলবে না। সুতরাং ক্লান্ত দেহটাকে বয়ে নিয়ে এগিয়ে চলতে হয়।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা একটানা পথ চলার পরে পথের প্রান্ত পাওয়া গেল। গ্রাবরেখার প্রস্তরপ্রবাহ ঢালু হতে হতে একটা উপত্যকায় নেমে এসে হারিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কেবল উপত্যকা বললে অবিচার করা হবে। ইংরেজিতে লিখব—'The Promised land', আর বাংলায় বলব 'শান্তিভূমি'।

উপত্যকা, না উপত্যকা বলব না, বলব অধিত্যকা। অধিত্যকার অধিকাংশ জায়গা জুড়েই ফুলের মেলা, জুনিপার আর নানা রঙের জানা-অজানা ফুল। তবে ফুলগাছের সঙ্গে প্রচুর কাঁটাগাছও রয়েছে। তোমরা সবাই এখানে এলেও জ্বালানির অভাব হত না। উচ্চ-হিমালয়ের এইসব গাছপালায় প্রচুর তৈলজাতীয় বস্তু বিদ্যমান। ফলে কাঁচা অবস্থাতেও খুব ভাল জ্বলে।

অধিত্যকার মাঝখান দিয়ে প্রায় আড়াআড়ি ভাবে বয়ে যাচ্ছে একটি নালা, আর সারা জায়গাটা জুড়েই ঝরণার মেলা। তারা নিজেদের খেয়ালে চারিদিকে ছুটোছুটি করছে আর প্রাণহীন প্রান্তরে জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছে।

শুধু সদাচঞ্চল ঝরণা নয়, তাদের পাশে পাশে এখানে-ওখানে গুটিকয়েক অচঞ্চল স্ফটিকস্বচ্ছ ছোট-ছোট জলাশয়। সেখানে বেশ কয়েকটি বলাকা মনের আনন্দে জলকেলি করছে। এবং তারা দেখছি আমাদের এই অনধিকার অনুপ্রবেশে বিচলিত বোধ করছে না।

শান্তিভূমি শুধু সুন্দর নয়, সেই সঙ্গে সুবিশাল। লম্বায় বোধকরি পাঁচ-কিলোমিটারের মতো। এই উচ্চতায় এতবড় সবুজ সমতল সত্যিই বিস্ময়কর। তাই তোমাদের জন্য বড্ডই খারাপ লাগছে। তোমরা আসতে পারলে না এখানে। অথচ তোমাদের জন্যই আমরা আজ এই সুখ ও শান্তির স্বপ্নভূমিতে।

তোমাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদে একটি জলাশয়ের তীরে আমরা আজ অভিযানের মূল-শিবির স্থাপন করতে পেরেছি। এ জায়গাটা সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট তার মানে ৪৪২০মিটারের মতো উঁচু। নেতার নির্দেশমত আমি আমার অকালে সদ্যপ্রয়াত বোনের নামে এই শিবিরের নাম রেখেছি 'শুক্লা কানন'।

এত সবের পরেও কিন্তু লিখব, এখনো আমাদের জীবন ধন্য হয়ে ওঠে নি। আমরা আজও হাতি পর্বতকে দর্শন করতে পারি নি। অর্থাৎ তার দেখা পাই নি। এখানে

পৌঁছবার আগেই কোথা থেকে কুয়াশা এসে আমাদের সামনে সাদা চাদর টাঙ্গিয়ে দিয়েছে। হাতি ও ঘোড়ি পর্বতের দিকটা সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছে। আজকের মতো বোধকরি তারা অদৃশ্যই হয়ে রইবে।

অবশ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়তে যেমন তাঁদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করছি, তেমনি শ্রবণেন্দ্রিয়তেও শুনতে পাচ্ছি তুষারধসের প্রবল গর্জন। মনে হচ্ছে হাতি পর্বত থেকেই বিকট শব্দগুলো ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই সারা শান্তিভূমি কেঁপে কেঁপে উঠছে। কি জানি, এখানে হয়তো এইভাবেই তিনি তাঁর ভক্তদের স্বাগত জানান।

আশা করছি আগামীকাল সকালেই দেখা হবে তাঁর সঙ্গে। তাঁকে প্রণাম করেই আমরা তাঁর কাছে পৌঁছবার পথ খুঁজতে শুরু করব। যতই গম্ভীর গর্জনে তিনি চারিদিক প্রকম্পিত করে তুলুন, এবারে কিন্তু তাঁকে আমাদের গলায় জয়মাল্য দিতে হবে পরিয়ে। আমরা যে অমৃতের সন্তান।

সুতরাং এখন আমাদের শুধুই প্রতীক্ষা। আগামী কয়েকটি দিন ধরে রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতের প্রতীক্ষা। তোমাদের সকলের শুভেচ্ছায় এ প্রতীক্ষা ব্যর্থ হবে না।

॥ নয় ॥

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা

গতকাল চিঠির সঙ্গে গৌতম একটা ফর্দ পাঠিয়েছে। কিছু চাল-ডাল, হট্-ড্রিঙ্কস্ এবং দড়ি ও পিটন পাঠাতে বলেছে। কাল সকালেই ল্যাপ্ বৈশাখ সিং এবং গাঁয়ের একজন লোককে দিয়ে জিনিস গুলো পাঠাতে হবে ওপরে। ওদের প্রয়োজন আগে, তারপরে আমাদের ভাবনা।

ওদের মালপত্র গুছিয়ে ফেলার পরে সন্ধ্যের আগেই ভটচাজ ও বিনয় জোশীমঠ থেকে ফিরে এলো। ফ্যাকস পাঠাতে দেরি হওয়ায় ওরা গতকাল আসতে পারে নি। ওরা লজেন্স নুন ও মশলাপাতি বিড়ি দেশলাই আর ওষুধ নিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য ওষুধ এনেছে ডাক্তারের অনুরোধে, গ্রামের মানুষদের চিকিৎসার জন্য।

মূল-শিবির প্রতিষ্ঠা আর ওপরের আবহাওয়ার খবর শুনে দুজনেই খুশি হয়। ভটচাজের আনন্দ তো সীমাহীন। পরশু জেনে গেছে অভিযান পরিত্যক্ত আর আজ এসে শুনছে মূল-শিবির প্রতিষ্ঠিত। ওরা দুজনেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গৌতমের চিঠি পড়ে। তারপরে ভটচাজ জানায় কলকাতার শিখর মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সদস্যা বাঙালী মেয়ে অনিতা সরকার ২৪,১২৪ ফুট উঁচু আবিগামিন শিখরে আরোহণ করেছে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য কামেট অভিযান পরিত্যক্ত হয়েছে।

গত একসপ্তাহ সারা হিমালয়ের আবহাওয়াই খারাপ ছিল, খুবই খারাপ। আমাদের অদৃষ্ট ভাল, এদিকটায় অপেক্ষাকৃত কম ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে এবং তুষারপাত হয় নি। আমরা নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছি লোকালয়ে। কিন্তু ওঁরা পারলেন না।

—কারা ?

—সরসুনা সরকারহাটের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স এ্যাসোসিয়েশনের ছ'জন পদযাত্রী।

—তাঁরা কোথায় গিয়েছিলেন ?

—লাহুল-হিমালয়ে। মাঝখান থেকে শৈলেশ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। বলে—ওরা সাতজন। অমিতকুমার দাস, বিকাশ সরকার, আশিস চক্রবর্তী, ভানু মুখার্জি, মৃদুল দাশগুপ্ত, তপন অধিকারী ও সুবীরকুমার চন্দরায়। আমি ওদের সবাইকে চিনি।

খুবই স্বাভাবিক। শৈলেশ বড়িশায় থাকে। সরসুনার হিমালয় প্রেমিকদের সঙ্গে তার পরিচয় তো থাকবেই। একটুকাল চুপ করে থাকে সে। তারপরে ভারি গলায় বলে—ব্যাপারটা খুলে বল্ তো!

ভটচাজ চুপ করে থাকে। আমরা বিনয়ের দিকে তাকাই। একটু ভেবে নিয়ে সে বলতে শুরু করে—ওঁরা ১৮ই সেপ্টেম্বর লাহুলের জেলাসদর কেলং থেকে বড়ালাচার বাস ধরে দারচা পৌঁছান। সেখান থেকে হেঁটে উদয়পুর যেতে চেয়েছিলেন।

পরদিন সকালে পাঁচজন মালবাহক ও একজন পথ-প্রদর্শক নিয়ে তাঁদের পদযাত্রা শুরু হয়। সন্ধ্যার আগেই তাঁরা কেলং সরাইতে পৌঁছে তাঁবু ফেলেন। সে রাতেই সুবীর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওষুধপত্র খেয়েও তাঁর অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। সকালে সুবীর বুঝতে পারেন, তিনি সঙ্গে গেলে সহযাত্রীদের গতিবেগ ব্যাহত হবে। তাই পরদিন তিনি দারচায় ফিরে যেতে চান। সঙ্গীরা তাঁকে হাঁটাপথে একা ফিরে যেতে দেন না। সেদিনই তাকে নিয়ে সবাই দারচায় ফিরে আসেন।

পথ প্রদর্শক ও মালবাহকরা সুবীরকে সুস্থ করে তুলবার জন্য দারচায় দেরি করতে রাজী হয় না। সুবীর তখন স্বেচ্ছায় মানালি ফিরে গিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

২১শে সকালে সহযাত্রীরা সুবীরকে বাসে তুলে দিয়ে আবার পদযাত্রা শুরু করেন। ১২ কিলোমিটার পথ পার হয়ে পালমো পৌঁছান।

পরদিন অর্থাৎ আমরা যেদিন কোসা থেকে রাড়ু গিয়েছি, সেদিন তাঁরা পালমো থেকে যাত্রা শুরু করে জাঁসকার-সুন্দো নামে একটা জনহীন জায়গায় উপস্থিত হলেন। জায়গাটার উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফুট। পথে তাঁরা তোপা নালার ধারে শেষ বসতি-চিকা-বারিক ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

একবার থামে বিনয়, তারপরে আবার তেমনি একটু করুণ হাসি হেসে বলে—শুনলে অবাক হবে সেদিন ওখানেও বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এবং যেহেতু জায়গাটা লাহুল-হিমালয়ে সেইহেতু কিছুক্ষণ পর থেকেই শুরু হয় তুষারপাত ও অবশেষে তুষারঝড়।

সারারাত ধরেই চলে ঝড়ের তাণ্ডব। ওরা তাঁবু ধরে বসে বসে রাত কাটান।

সকালে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে ওঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। চারিদিকে দু তিন ফুট বরফ জমে গেছে। এবং তখনও তুষারঝড় সমানে চলেছে। বিশারদরা বলছেন, তখুনি তাঁদের দারচায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। খুবই স্বাভাবিক। তাঁরা তো ঘরে বসে মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা ভেবেছেন এটা লাহুল হিমালয়ে ভাল আবহাওয়ার সময়। সুতরাং এ ঝড় কমে যাবে। একটু কষ্ট করে সেখানে থাকলে তাঁরা পরিকল্পিত

পদযাত্রাটি সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারবেন। আমরাও তো রাড়ুতে বসে সেদিন একই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের ভাগ্য ভাল, আমরা কোসায় ফিরে আসতে পেরেছি। ওঁদের দুর্ভাগ্য ওঁরা দারচায় আর ফিরে যেতে পারেন নি। হিমালয়ের পথে কিছু কিছু ঝুঁকি বা 'claculated risk' সর্বদাই নিতে হয়।

আমরা মাথা নাড়ি। বিনয় বলে যেতে থাকে—ওঁদের ওখানেও আবহাওয়া ভাল হয় না, বরং আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে। সারাদিন ধরেই চলে প্রাকৃতিক তাণ্ডব। প্রায় ১২০ কিলোমিটার বেগে তুষার ঝড়, উত্তাপ মাইনাস তিরিশ ডিগ্রির মতো।

বলা বাহুল্য এই অবস্থায় টিকে থাকার মতো পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সরঞ্জাম তাঁদের ছিল না। ফলে পাঁচটা তাঁবুর মধ্যে তিনটেই ভেঙে পড়ে। দুটি তাঁবুতে ওঁরা প্রাণ হাতে নিয়ে কোনমতে বসে থাকে।

মৃত্যুশীতল শীত আর যমদূতের মতো ঝড়ের সঙ্গে সারারাত সংগ্রাম করে ওঁরা দিনের আলো পর্যন্ত প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখলেন। তাঁরা জানতেন নরম তুষারের সমুদ্র পার হয়ে তাঁদের দারচা ফিরে যেতে হবে এবং তাঁদের জুতো তার উপযোগী নয়। তাই তুষারক্ষত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রত্যেকে পলিথিন শিট দিয়ে জুতো সমেত পাগুলি বেঁধে নিলেন। যাঁর যা কিছু ছিল সবই গায়ে দিলেন। তারপরে শুধু রুকস্যাকটি পিঠে নিয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁবুর বাইরে। তাঁবু থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ও খাবার-দাবার পড়ে রইল সেখানে। ঘড়িতে তখন ভোর পাঁচটা।

বাইরে বেরিয়ে ওঁরা দেখতে পেলেন যতটা আশংকা করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তুষার সঞ্চিত হয়েছে সর্বত্র। তাঁদের সবচেয়ে লম্বা মালবাহক টেকচাঁদকেই প্রায় বুক সমান তুষারস্তূপের ভেতর দিয়ে পথ চলতে হচ্ছিল।

তবু তাঁরা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে নেমে যাবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

এইভাবে কয়েক ঘণ্টা প্রাণপাত করে পথ চলার পরে দলনেতা অমিত দাস অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে ওঁদের গতিবেগ আরও কমে গেল। সতীর্থরা অমিতকে যথাসাধ্য সাহায্য করে একসঙ্গে পথ চলতে থাকলেন।

দুপুর নাগাদ অমিত একেবারে অচল হয়ে পড়লেন। তখন তাঁকে পিঠে করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সদস্যদের কারও পক্ষে কাজটা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পথপ্রদর্শক ও মালবাহকদের অনুরোধ করলেন।

তাঁরা রাজী হল না। বরং বলল—দাস সাহেব আর ফিরে যেতে পারবেন না। ওঁকে এখানে ফেলে রেখে আপনারা এগিয়ে চলুন, নিজেদের প্রাণ বাঁচান।

হিমালয় অভিযানে এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। কিন্তু সরকারহাটের তরুণ অভিযাত্রীরা সেই স্বার্থপর প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। তাঁরা তাঁদের নেতাকে ফেলে এক-পা এগিয়ে আসেন নি। এমনকি পথপ্রদর্শক এবং মালবাহকরা তাঁদের ফেলে চলে যাচ্ছে দেখেও। অমিতকে কোলে নিয়ে বিকাশ আশিস ভানু মৃদুল ও তপন স্বেচ্ছায় শহীদ হয়েছেন। হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় 'কমরেডশিপ'-এর উদাহরণ আর আছে কি ?*

*পরম সান্ত্বনা যে সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় অভিযাত্রীদের মরদেহগুলি সরকারহাটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। এবং বোধনের সন্ধ্যায় (১৬.১০.৮৮) কেওড়াতলা মহাশ্মশানে

মহাসমারোহে তাঁদের অন্ত্যেষ্টি সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে পরদিন আনন্দবাজারে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষ উল্লেখ করছি।

'হিমাচল প্রদেশে দুর্ঘটনায় মৃত ছ'জন বাঙালি ট্রেকারের দেহ রবিবার সকালে বিমানে কলকাতায় আনা হয়। সন্ধ্যায় কেওড়াতলা শ্মশানে...ওই ছয় সদস্যের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।...তুষারাবৃত দুর্গম পাহাড় থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সাংসদ মমতা ব্যানার্জি এবং বিভিন্ন পর্বতারোহী সংগঠনের উদ্যোগেই কলকাতায় আত্মীয় পরিজনদের হাতে মৃতদেহগুলি তুলে দেওয়া গিয়েছে। ...এরা সকলেই অবিবাহিত, বয়স ২৫ থেকে ৩৫-এর মধ্যে। সকালে দিল্লী থেকে এয়ারবাসে করে দেহগুলি দমদমে আনা হয়। একই বিমানে কলকাতায় আসেন এই অভিযানের একমাত্র জীবিত সদস্য সুবীরকুমার চন্দরায়।...অসুস্থতার জন্য ২১ সেপ্টেম্বর সুবীর মানালীতে ফিরে আসেন। ১ অক্টোবর সকালে তিনি জানতে পারেন, সহযাত্রীরা দুর্ঘটনায় পড়েছেন।

মমতা বিমানবন্দরে বলেন, মানালি মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর কর্নেল প্রেমচাঁদ ও তাঁর দলের ৩৬ জন সদস্য যেভাবে নিজেদের জীবনের মায়া ছেড়ে মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করেছেন, সেটা খুবই বিরল দৃষ্টান্ত। দেহগুলি প্রায় ১৩ হাজার ফুট উপরে...পাঁচ ফুট বরফের তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ১১ দিন ধরে অভিযান চালিয়ে মৃতদেহগুলি ১৪ অক্টোবর উদ্ধার করা হয়।

মমতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী...সব ব্যবস্থা করে দেন এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের হেলিকপ্টারে মৃতদেহগুলি নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। মৃতদেহগুলি ১৪ অক্টোবর উদ্ধার করে ছালাং-তাপ্লো থেকে দারচায় আনা হয়। কোথাল থেকে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসা হয় কেলং। কেলং থেকে হেলিকপ্টারে দেহগুলিকে আনা হয় দিল্লীতে। কর্নেল প্রেমচাঁদ ছাড়া মৃতদেহগুলি কিছুতেই উদ্ধার করা যেত না। হিমাচল প্রদেশের সরকার সবরকম সাহায্য করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।...

শনিবার কেলং থেকে মৃতদেহগুলি হেলিকপ্টারে বেলা ৩টা ৫৫মিনিটে দিল্লীতে পৌঁছয়। তারপরে সেগুলিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাঃ আগরওয়াল এবং ডাঃ মিস চৌধুরী মৃতদেহগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। শনিবার রাত ১২টা ৪০মিনিটে হাসপাতাল থেকে দেহগুলি পালাম বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়।

কলকাতায় মৃতদেহগুলি বিমান থেকে নামিয়ে এনে ছ'টি ভ্যানে তোলা হয়। অভিযাত্রীদের নাম লেখা ভ্যানে সাদা ফুলে সাজানো মৃতদেহগুলি রাখার সময় আত্মীয়েরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিকাশ সরকারের মৃতদেহ ভ্যানে তোলার সময় তাঁর দাদা এবং বৌদি কাঁদতে কাঁদতে বলেন "পুজোর দিনে তুমি এইভাবে এলে!"

বেলা বারোটা নাগাদ শববাহী গাড়ির মিছিল সরসুনায় পৌঁছয়। সরসুনার ঐ এলাকায় এবার পুজো বন্ধ।...পাড়ার লোকেরা নিজেরাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দুপুরে ওই এলাকায় গেলে আশেপাশের পুজোর উৎসবের মধ্যে একটি গা-ছমছমে শোকের ভাব অনুভব করি। দোকানপাট বন্ধ।..বেহালা এলাকার এবং দূর দুরান্তরের শতাধিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল আর মালা দিয়ে মৃত অভিযাত্রীদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। শবাধার ঘিরে শোকসন্তপ্ত পরিজনদের ভিড়। এ দিন মহাষষ্ঠী—দেবীর বোধন। এঁরা এসেছেন প্রিয়জনকে শেষ বিদায় জানাতে।

মৃত ভানু মুখার্জির শবাধারের পাশে মূর্ছিত হয়ে পড়েন তাঁর বোন ছন্দা। কলকাতা থেকে যাওয়ার আগে ভানু বোনের হাতে টাকা দিয়েছিলেন পুজোর জামাকাপড় কিনতে। বলেছিলেন—পাহাড় থেকে ফেরার তো ঠিক নেই, তুই জামাকাপড় কিনে নিস। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ছন্দা বললেন, "দাদার কথাটাই সত্যি হল।"

ভাগ্যচক্রে বেঁচে ফেরা সুবীর কিন্তু সহযাত্রীদের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়েই বললেন, "হিমালয় আমাদের ডাকে। সামনের বছর আবার যাবো।"

॥ দশ ॥

হিমালয়ের পথে দুর্ঘটনা সব সময়েই দুর্ঘটনা মন্তিরাম ও কৌসাগাঁওয়ের ভালোবাসা

হিমালয়ের পথে দুর্ঘটনার কথা শুনলে শুধু দুঃখ পাই না, সেইসঙ্গে নিজেকে অপরাধী বলেও মনে করি। মনে পড়ে মার্গারেট লেগি-র কথা। তিনি 'ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স' পড়ে বিলেত থেকে ছুটে এসেছিলেন গাড়োয়ালের ভুইন্দার উপত্যকায়। ফ্রাঙ্ক স্মাইথ 'ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স' না লিখলে হয়তো তিনি ওভাবে অকালমৃত্যু বরণ করতেন না।

তাই কোন বাঙালি হিমালয়ের পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে আমি ভাবি—কি জানি, হয়তো আমার কোন বই পড়েই তিনি হিমালয়ের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছেন। আমি বইখানি না লিখলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না।

এইসব ভাবনায় গতকাল রাতে আমার ঠিকমত ঘুম হয় নি। বার বার ঘুম ভেঙে গেছে। ওঁদের সঙ্গে মনে পড়েছে আরও অনেকের কথা—অণিমাদি, গৌরাঙ্গ, অমর, সুজয়া, কমলা ও অসিতদের কথা।

আজ সকালেও তার জের কাটে নি। সব কাজের মাঝে কেবলি মনে পড়ছে ওদের কথা। অবশ্য এজন্য কাজকর্ম আটকে থাকে নি। ওপরে মালপত্র সব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চা-জলখাবার খেয়ে এখন সবাই মন্ডপের উঠানে বসেছি। কিন্তু কথাবার্তা বড় একটা বলছি না।

ভটচাজ কিন্তু আবার সেই ভুলতে চাওয়া প্রসঙ্গটাই মনে করিয়ে দেয়। বলে—শুধু ওঁরা ছ'জনই নন, ঐ সময় অমলেশ সিংহ নামে বাংলার আরও একজন পদযাত্রী লাহুলে প্রাণত্যাগ করেছেন।

—কেবল লাহুলে নয়, বিনয় যোগ করে—গাড়োয়ালে প্রাণ দিয়েছেন দুর্গাপুরের দেবব্রত মুখার্জি ও নিধির পাল আর নিখোঁজ হয়েছেন অজয় মণ্ডল ও নবারুণ ব্যানার্জি। কুমায়ুনের পিণ্ডারী অঞ্চলে বলি হয়েছেন অজয় রায়।

—দুর্ঘটনা প্রতি বছরই হয় কিন্তু এবারে এই আবহাওয়া দেখছি অনেকগুলি প্রাণ নিয়ে গেল। শৈলেশ মন্তব্য করে।

নেতা মাথা নাড়ে। বলে—ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের।

বিনয় আরও খবর দেয়—জোশীমঠে খবর পেয়ে এলাম এ বছর ছাব্বিশ জন পর্বতাভিযাত্রী ও পদযাত্রী হিমালয়ে শহীদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আটজন বিদেশি ও আঠারজন ভারতীয়। ভারতীয়দের মধ্যে এগারোজনই বাঙালী। তাই কলকাতায় এখন প্রচণ্ড সোরগোল। সমালোচকরা কেউ বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মতো মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব গজিয়ে উঠছে। এটা বন্ধ করা দরকার। কেউ বলছেন, বাঙালি চিরকাল হুজুগপ্রিয়। এই হিমালয়প্রেমও একটা হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয়। কেউবা বলছেন, পদযাত্রীদের ওপরে একটা বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে এবং ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশানের উচিত কঠিন হাতে পর্বতাভিযান ও পদযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করা। এসব নিয়ে নাকি কলকাতার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাতেই প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে।

ব্যাপারটা বড়ই বেদনার। এক বছরে এতগুলো প্রাণ হিমালয়কে ডালি দিতে হল।

কিন্তু তাই বলে পদযাত্রীদের ওপরে বিধিনিষেধ! শুনে হাসি পায় আমার।

ওরা অবাক হয়। রঞ্জু জিজ্ঞেস করে—হাসলে যে বড় ?

আরেকটু হেসে উত্তর দিই—সত্যি বাঙালি বড় হুজুগপ্রিয় এবং এই হুজুগের মূলে খবরের কাগজ।

—কাগজের কথা থাক। আপনি এ সম্পর্কে কি মনে করছেন, আমাদের বলুন! শৈলেশ আমাকে বলে।

আমি আপত্তি করি—অমূল্য থাকতে আমি এ সম্পর্কে আমার মতামত জানাবো ?

—নিশ্চয়ই। নেতা বলে ওঠে—প্রথম কথা, মতামত তোমার নিজস্ব বক্তব্য। দ্বিতীয়ত এ সম্পর্কে বলবার মতো জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই তোমার রয়েছে। তুমি তোমার কথা বলো।

আমি শুরু করি—হিমালয়ের প্রতি ভারতবর্ষের মানুষের আকর্ষণ সুপ্রাচীন। তবে সেকালে প্রায় এর সবটাই ছিল গিরিতীর্থ কেন্দ্রিক। কিন্তু সে তীর্থযাত্রা কোনমতেই নিরাপদ ছিল না। প্রতি বছর বহু পুণ্যার্থী দুর্গম তীর্থপথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন। তাই বলে তীর্থপথে তীর্থযাত্রীর অভাব হয় নি। কারণ হিমালয়ের আকর্ষণ জীবনের চেয়ে বড়। সেকালে ছিল, একালে রয়েছে, ভাবীকালেও থাকবে।

একালে হিমালয়-যাত্রার রূপবদল ঘটেছে। এখন হিমালয়যাত্রা তিন ভাগে বিভক্ত—তীর্থযাত্রা, পদযাত্রা ও পর্বতারোহণ। তীর্থযাত্রা সুপ্রাচীন কিন্তু পদযাত্রা ও পর্বতাভিযান নিতান্তই একালের। এবং বলা বাহুল্য এ-দুটি য়ুরোপ থেকে আমাদের দেশে এসেছে। এসেছে এই শতকের প্রথম দশকে। কিন্তু আমাদের আগ্রহের প্রকৃত জন্ম ১৯৫৩ সালে, তেনজিং নোরগে ও এডমান্ড হিলারির এভারেস্ট আরোহণের পর থেকে। তারপরেও সে আগ্রহ তথা আকর্ষণটি সরকারি সমীক্ষক কিম্বা অভিযাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার তেমন যোগাযোগ ছিল না।

প্রয়াত প্রবোধকুমার সান্যাল ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৯৬০ সালে কলকাতায় হিমালয়ান এসোসিয়েশন (ইন্‌স্টিটিউট) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ভারতের প্রথম বে-সরকারি পর্বতারোহণ প্রতিষ্ঠান।

প্রয়াত অশোককুমার সরকারের অর্থানুকূল্যে ৺সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে হিমালয়ান এসোসিয়েশন ১৯৬০ সালেই সফলকাম নন্দাঘুন্টি (২০,৭০০'/৬৩০৯মিঃ) অভিযানের আয়োজন করেন। পরের বছর শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাসের নেতৃত্বে ভারতের দ্বিতীয় পর্বতারোহী সংস্থা পর্বতাভিযাত্রী সংঘ মানা অভিযানের আয়োজন করেন। ১৯৬২ সালে আমাদের নেতার নেতৃত্বে হিমালয়ান এসোসিয়েশন গাড়োয়ালের নীলগিরি পর্বত (২১,২৪০'/৬৪৪০মিঃ) শিখরে তাঁদের দ্বিতীয় সফলকাম পর্বতাভিযান পরিচালনা করেন।

তখন ছিল দুটি পর্বতারোহণ সংস্থা আর এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গেই শ'দেড়েক রেজিস্টার্ড সংস্থা হয়েছে। তখন বছরে দু-চারটি করে পদযাত্রা ও দু-এক বছর বাদে বাদে একটি করে পর্বতাভিযান আয়োজিত হত। আর এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বছরে শতাধিক পদযাত্রা ও তিরিশ/পঁয়ত্রিশটা করে পর্বতাভিযান পরিচালিত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনা ও শহিদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে।

সুতরাং এই বেড়ে যাবার জন্য যাঁরা সংগঠকদের দায়ী করছেন, তাঁরা ভুল করছেন। আমরা যারা হিমালয়ে আসি, তারা সবাই একদিন ঘরে ফিরে যাবো এই আশাতেই

আসি। চিরতরে হিমালয়ে রয়ে যাবার জন্য কেউ আসি না। কারণ আমরা সবাই জানি, হিমালয় আছে এবং হিমালয় থাকবে। আমি হারিয়ে গেলে হিমালয়ও যাবে হারিয়ে।

ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান ভারতে পর্বতাভিযান নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশানের মারফতে পশ্চিমবঙ্গের পর্বতাভিযাত্রী দলগুলিকে রাজ্যসরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু পদযাত্রীদের এই অনুমতি নেবার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। কেনই বা থাকবে? ভারতের যে কোন নাগরিক ভারতীয় হিমালয়ে পদচারণা করতে পারেন। কেবল নোটিফাইড এরিয়ায় যেতে হলে, নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করে ইনারলাইন ও ক্যামেরা পারমিট নিতে হয়।

অতএব সরকারহাটের পদযাত্রীদের যাঁরা হুজুগপ্রিয় বলছেন, তাঁরা অভিযাত্রীদের ওপর অবিচার করছেন। কারণ অজানাকে জানার জন্য যাঁরা দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে যাত্রা করেন, তাঁরা কেউ হুজুগপ্রিয় নন। সুন্দরকে পাবার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেওয়াকে কোনমতেই হুজুগ বলা যায় না।

দুর্ঘটনা সর্বসময়ে সর্বত্রই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কোন রকমফের নেই। কলকাতার পথ-দুর্ঘটনাও দুর্ঘটনা, হিমালয়ের পথেও তাই। এবং একথাও স্বীকৃত সত্য যে কলকাতাসহ যেকোন মহানগরীর পথে দুর্ঘটনার সংখ্যা হিমালয়পথের দুর্ঘটনার চাইতে বহুগুণ বেশি। তাই বলে কি কেউ আর কলকাতায় কিংবা দিল্লিতে পথে বেরুবেন না? কলকাতায় যেমন কেউ গাড়িচাপা পড়ে মারা যেতে চান না, হিমালয়ে এসেও কেউ ইচ্ছে করে শহীদ হন না।

আরেকটা কথা এ ব্যাপারে কিছুটা ভাগ্যকে মানতেই হবে। যে আবহাওয়ায় আমরা পাঁচদিন ও ছয়রাত কাটিয়ে এলাম, সেই একই আবহাওয়ার কবলে পড়ে ওঁরা চিরতরে হারিয়ে গেলেন।

সুতরাং ভাগ্যদোষে নেহাৎ দুর্ঘটনার কবলে পড়ার জন্যই আমরা একবছরে হিমালয়ের পথে ছাব্বিশ জন পর্বতারোহীকে হারালাম। তাঁরা সবাই আমার অতি আপনজন। দেবতাত্মা হিমালয়ের কাছে তাঁদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করছি। তারপরে তাঁদের উদ্দেশে বলি—তোমরা ভারতের জাগ্রত-যৌবনের স্বপ্নকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলেছো। আর্ভিন এবং ম্যালেরির মতো তোমরাও চিরকাল বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবে হিমালয়ের পাথরে, মাটিতে আর ঝরণার অবিরাম কুলুধ্বনির মাঝে। বেঁচে থাকবে পাখির কাকলিতে আর আমাদের মনের মাঝে। তোমরা মৃত্যুঞ্জয়ী, তোমাদের সবাইকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই!

সাব্! মিঠা দে, মিঠা...

ভাবনা থেমে যায়, বাস্তবে ফিরে আসি।

ওরা সমস্বরে আবার বলে ওঠে—সাব্ মিঠা দে!

না, কোন করুণ আবেদন নয়, স্নেহের দাবি!

ওরা মানে গাঁয়ের গুটি কয়েক ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে। আর মিঠা মানে লজেন্স। প্রতিদিন সকাল-বিকেল ওরা লজেন্স নিতে আসে। আমরা ওদের ফিরিয়ে দিই না। তবু গতকাল আমরা ওদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি নি। কারণ লজেন্স ফুরিয়ে গিয়েছিল, বলেছিলাম, আজ আসতে। ভটচাজ জোশীমঠ থেকে নিয়ে এসেছে। ওরাও তাই হাজির হয়েছে।

এখন অবশ্য মাত্র পাঁচ-ছ'জন এসেছে। সব মিলিয়ে ওরা জনপনেরো। বাকিরা পরে আসবে। এদের নেতা মস্তিরাম। বছর দশেকের গোলগাল একটি আকর্ষণীয় বালক।

রঞ্জু ঘরে গিয়ে লজেন্স নিয়ে এসে পরিবেশন শুরু করে। মস্তিরাম মনে করিয়ে দেয়—কল শামকো নহী মিলা।

অর্থাৎ একটি নয়, দুটি করে দিতে হবে সবাইকে, একটি কাল বিকেলের আরেকটি আজ সকালের।

রঞ্জু নেতার দিকে তাকায়। নেতা বলে—দুটো করেই দাও। খুবই স্বাভাবিক। কারণ সে আগেই বলে দিয়েছে—অসুস্থদের ওষুধ আর ছোটদের লজেন্স আমাদের যুগিয়ে যেতেই হবে।

মিঠা হাতে পাবার পরেও কিন্তু মস্তিরামের দল চলে যায় না। ওরা মণ্ডপের উঠোনে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। আমরা কেউ কোন বিরক্ত বোধ করি না। কারণ এই ছেলে-মেয়েগুলো শুধু মিঠার জন্যই এখানে আসে না, ওরা যে আমাদেরও ভালোবেসে ফেলেছে এবং আমরও তাই। ওরা যেমন প্রতিদিন এখানে আসে, তেমনি আমরাও ওদের জন্য প্রতীক্ষা করি। আর সে প্রতীক্ষা শুধু ওদের আগমনের জন্য নয়, সেইসঙ্গে স্নেহের অত্যাচার সইবার জন্যও বটে।

এবং এখুনি তা শুরু হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ এখানে ছুটোছুটি করবার পরে মস্তিরাম সদলবলে গিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকবে। প্রত্যেকে একখানি করে আইস এ্যাক্স ও কিছু নাইলন দড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসবে বাইরে। কোমরে দড়ি বেঁধে পাহাড়ে চড়ার খেলা করবে। তারপরে নিজেদের জুতো খুলে রেখে আমাদের হান্টারশুয়ের মধ্যে ওদের ছোট ছোট পাগুলো ঢুকিয়ে হেঁটে বেড়াবার চেষ্টা করবে। পারবে না। বার বার পড়ে যাবে আর খিল-খিল করে হেসে উঠবে। অবশেষে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে মরার মতো পড়ে থাকবে।

এজন্য গ্রামের বড়রা ওদের বকাবকি করেন। কিন্তু আমরা তাঁদের বাধা দিই। ওরা আমাদের অবসরক্লান্ত কর্মহীন জীবনের একমাত্র বৈচিত্র্য।

আজও দুপুর পর্যন্ত এইসব করার পরে ওদের আমরা ঘরে গিয়ে স্নান-খাওয়া করতে বলি। ওরা কিন্তু আমাদের কথা শোনে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরের দিকে পা বাড়ায়। যাবার সময় শুধু শুনিয়ে যায়—শামকো ফির মিলেঙ্গে।

আমরাও তাই চাই। হাসিমুখে ওদের বিদায় দিই।

ওরা চলে যাবার পরেই ডাক্তার তার প্রভাতী পরিসেবা সেরে ফিরে আসে। তার সঙ্গে বৈজনাথ, গাঁয়ের গ্রাজুয়েট। সে ডাক্তারের রোজগার মানে একথলি শাক-সবজি নিয়ে এসেছে। দুজনেই আমাদের পাশে এসে বসে।

কথায় কথায় ডাক্তার বলে—এই অসহায় মানুষগুলোকে চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়ে সত্যই বড় আনন্দ লাভ করছি। প্রতিদিন মনে হচ্ছে, আমার ডাক্তারি পড়া সার্থক হল। আর তাই আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

—কেন বল তো ? নেতা বিস্মিত—আমরা আবার এ ব্যাপারে তোমার কি উপকার করলাম ?

—কেবল করেন নি, এখনও করে চলেছেন। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

আমি বলি—কি রকম ?

—সুস্থ থেকে। আপনারা সুস্থ রয়েছেন বলেই তো আমি গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করার সময় পাচ্ছি।

—থাক্ গে, আমাদের কথা। শৈলেশ বলে—তুমি বলো এদের সাধারণত কি ধরনের রোগ রয়েছে?

—চর্মরোগ, পেটের রোগ, চোখের রোগ ও হৃদরোগই বেশি।

—শুনেছি গাঁয়ের একজন মানুষ নাকি কুষ্ঠরোগ থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন? বিনয় প্রশ্ন করে।

ডাক্তার উত্তর দেয়—হ্যাঁ। আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি যে এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত, সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই।

—তা ভদ্রলোক কেমন করে রোগমুক্ত হলেন? শঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

—স্থানীয় চিকিৎসায়।

—কি রকম?

—ভদ্রলোক বলেছেন, ঘরে দেবদারু পাতা বিছিয়ে তিনি কোন জামা-কাপড় না পরে তার ওপরে ছ'মাস শুয়ে বসে, কাটিয়েছেন। তাতেই তার রোগ সেরে গিয়েছে।

গোরা প্রশ্ন করে—তুমি এসব কথা বিশ্বাস করো ডাক্তার?

—না করে উপায় কি বলুন? ভদ্রলোক তো সত্যই রোগমুক্ত।

—তা তাঁর যে কুষ্ঠ হয়েছিল, সে সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত হলে কেমন করে? অর্ধেন্দু ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে।

ডাক্তার উত্তর দেয়—ভদ্রলোকের হাত ও পায়ের কয়েকটি আঙ্গুল দেখে।

অর্ধেন্দু আর কোন প্রশ্ন করে না। ডাক্তার আবার বলে—এঁদের নিজেদের কিছু ওষুধ রয়েছে, বলা বাহুল্য সবই গাছগাছড়া থেকে তৈরি। আমি তার কিছু ওষুধ কলকাতায় নিয়ে যাবো, পরীক্ষা করে দেখব।

—তাহলে ওরা তোমার কাছে চিকিৎসা করাচ্ছে কেন? নেতা প্রশ্ন করে।

—প্রথম কথা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি এদের আকর্ষণ আর দ্বিতীয়ত তাড়াতাড়ি ফল পাবে বলে। তাছাড়া খরচও তো কিছু লাগছে না।

মৃদু হেসে শিবশঙ্কর উঠে দাঁড়ায়। সে শিক্ষিত ছেলে। বাংলা না জানলেও ডাক্তারের বক্তব্য অনুমান করতে পারে। আবার বিকেলে আসবে বলে সে স্নান-খাওয়ার জন্য ঘরে চলে যায়।

আমরাও দল বেঁধে নদী থেকে স্নান করে এসে খেতে বসি। অর্ধেন্দু আজ শাক-পাতা দিয়ে উপাদেয় ডাল রান্না করেছে। ডাল-ভাত ও ডিমের ঝোল।

খাবার পরে ওরা কয়েকজন তাস নিয়ে বসল। শৈলেশ ও রঞ্জুকে নিয়ে আমি রিপোর্ট তৈরি করতে লেগে যাই—অভিযানে মূল-শিবির স্থাপনের রিপোর্ট। কলকাতা ও দিল্লিতে ফ্যাক্স পাঠাতে হবে। আগামীকাল ভটচাজ আবার জোশীমঠ যাচ্ছে।

রোদ থাকতে থাকতেই মিঠার খদ্দেররা আবার হাজির হয়ে গেল। নেতা মস্তিরামের সঙ্গে সহনেতা নরিন্দার আর মেয়েদের নেত্রী দশ বছরের রূপমতীও এসেছে। বিকেল পর্যন্ত তারা আমাদের ওপর স্নেহের অত্যাচার চালিয়ে গেল। তারপরে যুবক হরি সিং, শাহেন সিং ও পূরণ সিংকে আসতে দেখে বাড়ি পালিয়ে গেল।

নিজে যেতে পারবে না বলে শিবশঙ্কর ওদের পাঠিয়ে দিয়েছে। ডাক্তারকে আজ ওরা পাশের গ্রাম বাপনকুণ্ডে নিয়ে চলেছে। ডাক্তার গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করবে।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর। বাপনকুণ্ড থেকে ঘোড়া নেবার জন্য সেদিন এরা কি

ঝামেলাই না বাধিয়েছিল! আজ ডাক্তারকে ওরা সেখানেই নিয়ে চলেছে!

চা খেয়ে ডাক্তার চলে যায় ওদের সঙ্গে। আর তারপরেই কয়েকজন বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে মোড়ল আমাদের খবর নিতে এলেন।

গল্পসল্প করে তাঁরা যখন বিদায় নিলেন, তখন কোসাগাঁয়ের ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে উঠেছে। গৌতমদের ওপরে পাঠাবার পরে তিনটি দিন কেটে গেল। আরও সপ্তাহখানেক কাটাতে হবে এভাবে। নন-ক্লাইম্বিং মেম্বার হয়ে অভিযানে আসার শাস্তি।

যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন, তাঁদের চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ঘরের মানুষের, যাঁরা যুদ্ধরত জওয়ানদের ঘরে ফেরার প্রহর গোণেন। পর্বতাভিযানেও তাই। যারা প্রাণ হাতে করে প্রতিকূল প্রকৃতি আর দুস্তর হিমালয়ের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করে চলেছে, তাদের চেয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা অনেক বেশি। আমরা যে ওদের পথ চেয়ে বসে রয়েছি এখানে। বসে বসে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই আমাদের। প্রতীক্ষা, শুধুই প্রতীক্ষা—শবরীর প্রতীক্ষা।

॥ এগারো ॥

কোসাগাঁও থেকে মালারি
মূল শিবির থেকে এক নম্বর শিবির

না, হিমালয়ের অস্থিরা প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস সত্যই দেখছি অসম্ভব। কিছুতেই তার মনের নাগাল পাওয়া যায় না। নইলে, আজ আবার আকাশ এমন মেঘলা হবে কেন?

তারই মধ্যে শঙ্কর ও ভট্‌চাজ সকালের বাস ধরে জোশীমঠ চলে গেল। ওরা ফ্যাক্স পাঠাবে ও চিঠিপত্র ডাকে দেবে। আর নিয়ে আসবে ডাক ও ডাকটিকেট, গুঁড়ো দুধ, গুঁড়ো মশলা, ওষুধ আর লজেন্স। বিকেলের বাস ধরে ফিরে আসবে। ঘণ্টাচারেক সময় পাবে জোশীমঠে। পোস্টাপিসে যাওয়া আর কেনাকাটা করার পক্ষে যথেষ্ট।

না না, প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে নির্দয়া নন। মেঘ কেটে গেল, রোদ উঠল। আমাদের মুখে হাসি ফুটল।

চা ও চিড়েঁভাজা দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট শেষ হল। আর তারপরেই গোরা জানায়—কেরোসিন না আনলে রাতে রান্না চড়বে না।

কথাটা গতকাল বললে শঙ্কর জোশীমঠ থেকে নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু কেবল কিছুক্ষণ আগে গোরা অভাবটা টের পেয়েছে।

বিনয় বলে—মালারিতে কেরোসিন পাওয়া যায়, দাম অবশ্য বেশি।

—তা হোক্ গে, তুমি আর শৈলেশ দুটো জেরিক্যান নিয়ে মালারি চলে যাও, দশ লিটার কেরোসিন নিয়ে এসো।

ওরা খুশি হয়ে জামা-প্যান্ট পরতে ঘরে চলে যায়।

নেতাকে বলি—আমি আর অর্ধেন্দু কি যাবো ওদের সঙ্গে?

—না। তোমরা সিনিয়ার মেম্বার, সাত কিলোমিটার পথ ভেঙে কেরোসিন আনতে

যাওয়া তোমাদের কাজ নয়।

• নেতার অনুমতি ছাড়া পর্বতাভিযানে কোন কাজ করা নীতিবিরুদ্ধ। অতএব চুপ করে থাকি।

একটু বাদে নেতা বলে—তোমাদের দুজনকে আমি একটি শর্তে বিনয়দের সঙ্গী হতে দিতে পারি।

—কি সে শর্ত ? আমি আর অর্ধেন্দু একই সঙ্গে বলে উঠি।

নেতা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়—তোমরা মালারি যাবে ও ফিরে আসবে কিন্তু কেউ কেরোসিনের জেরিক্যান বইতে পারবে না। তেল বয়ে আনবে শৈলেশ ও বিনয়।

আমরা সানন্দে শর্ত মেনে নিই।

নেতার নির্দেশমত ন'টা-নাগাদ বেরিয়ে পড়ি পথে। নেতা ও গোরা আমাদের এগিয়ে দেয় সেই সমতলের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। আমার ও অর্ধেন্দুর হাতে শুধুই আইস এ্যাকস। আইস এ্যাকস্ কিংবা স্পাইক লাগানো লাঠি ছাড়া উচ্চ-হিমালয়ের পথে বের হওয়া নিয়ম নয়। বিনয় আর শৈলেশও আইস এ্যাক্স নিয়েছে। সেইসঙ্গে দুটি জেরিক্যান। আমরা সবাই উইন্ড-প্রুফ জ্যাকেট গায়ে দিয়েছি। হিমালয়ের বৃষ্টিকে বিশ্বাস নেই। বিনয় কিন্তু একটা হ্যাভারস্যাকও নিয়েছে। বলা তো যায় না, মালারিতে যখন বাজার আছে, আনাজপাতি পাওয়া যেতে পারে।

নেতা ও গোরা হাত নেড়ে সাময়িক বিদায় দেয় আমাদের। আমরা উৎরাই পথে নেমে চলি ধৌলির ধারে।

সেই কাঠের পুলের ওপর দিয়ে ধৌলি পার হয়ে আসি। চড়াই ভেঙে পৌঁছই মোটরপথে—জোশীমঠ থেকে মালারির মোটরপথ।

ধৌলির ধারে ধারে এগিয়ে চলেছি উত্তরে—মালারির দিকে। পথের দু-পাশে পাইনের সারি। বাঁদিকে ধৌলির তীরভূমি আর ডানদিকে আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গিয়েছে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত। উঁচু পাহাড় নয়। এখন সবুজ কিন্তু শীতকালে তুষারের প্রলেপে সাদা হয়ে থাকে। তখন দু-পাশের এই পাইনবীথিও তুষারের উত্তরীয় পরিধান করে পথিকের মন হরণ করে। এখন অবশ্য সবই সবুজ, শুধুই সবুজ।

অন্তহীন সবুজের মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম ধৌলি। শীতের সাদার প্রতিনিধি হয়ে শান্তির দূত রূপে বয়ে চলেছে। সারা বছর—বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে—অতীশ-দীপঙ্করের তিব্বত থেকে শঙ্করাচার্যের ভারতে—নিতি গিরিপথ থেকে জোশীমঠে।

আঁকাবাঁকা চড়াই পথ। মোটরপথ হলেও বেশ চড়াই। কারণ কোসাপুলের উচ্চতা সাড়ে আট হাজার ফুটের মতো আর মালারি ১০,০১৪ফুট। তার মানে ছয় কিলোমিটারে আমাদের দেড় হাজার ফুটের চেয়ে বেশি চড়াই ভাঙতে হবে। গড়ে প্রতি কিলোমিটারে আড়াইশ ফুট। মোটরপথের বিচারে বেশ খাড়া চড়াই বলতে হবে।

তাহলেও পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছিল না। কারণ এমন অপরূপ মোটরপথ খুব কমই দেখেছি। প্রতি বাঁকের শেষে নতুন চমক। সেইসঙ্গে শান্তি, অপার্থিব শান্তি।

এক জায়গায় পথটা যেন তিনতলা—তিনটি ধাপে ওপরে উঠে এসেছে। ওপরতলা থেকে রতবন দেখা গেল, হাতি ও ঘোড়ি পর্বতের প্রতিবেশী রতবন। এখান থেকেও কিন্তু তার চেহারা তেমনি ভয়ঙ্কর। মাথায় কেবল খানিকটা জায়গা জুড়ে বরফ। সারা গায়ে পাথর, কালো কঠিন পাথর।

বেলা বারোটায় মালারি পৌঁছে গেলাম। সাত কিলোমিটার পথ পার হতে তিন ঘণ্টা লেগেছে। চড়াই পথ। সুতরাং ভালই হেঁটেছি বলতে হবে।

বেশ বড় ও ভারি সুন্দর উপত্যকা মালারি। প্রায় চারিদিক জুড়েই পাহাড়—কোথাও কাছে কোথাও দূরে, কোনটি ছোট পাহাড়, কোনটি বা বড়। তবে তাদের সবার ওপরে মাথা উঁচু করে রেখেছে দুনাগিরি। এখান থেকে চমৎকার দেখায় তাকে। মনে হচ্ছে যেন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে। এই মোহিনী মায়ার টানে এবছরও দুটি বাঙ্গালি তরুণ তার কোলে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

একদিকে দুনাগিরি আরেক দিকে গামশালি ও নিতি গ্রাম। ঐ গ্রাম ছাড়িয়ে কামেট আবিগামিন ও মানা শৃঙ্গের পথ। পর্বতারোহণের সেই প্রদোষকাল অর্থাৎ প্রায় শ'খানেক বছর ধরেই পর্বতারোহীরা এখানে আসছেন।

যাঁরা এসেছেন তাঁদের স্মরণ করতে বসলে প্রথমেই মনে আসে প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও হিমালয়-সমীক্ষক ডাঃ টি. জি. লংস্টাফ-এর কথা। আলমোড়ার তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার সি. এ. শেরিং-কে নিয়ে তিনি ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিব্বত পরিক্রমার পরে তাঁরা এখানে আসেন ও ধৌলির ধারে ধারে পথ চলে তপোবন হয়ে গোয়ালদাম ফিরে যান।

তারপরেই স্মরণ করতে হয় ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ও তাঁর সতীর্থদের। ১৯৩১ সালে কামেট অভিযানের সময় যে তাঁরা মালারি এসেছিলেন, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু বলা হয় নি সহযাত্রী এরিক শিপটন-এর আশা ভঙ্গ হবার কথাটি।

সেদিন সকালে জুমা গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু করে অভিযাত্রীরা যখন মালারি পৌঁছলেন, তখন এখানে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যেই গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল আধেক এগিয়ে তাঁরা শিবির স্থাপন করলেন।

এরিক শিপটন ছিলেন দলের কমিসারিয়েট (Commissariat) অর্থাৎ খাদ্য সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। সতীর্থদের তাজা খাবার পরিবেশনের প্রতি তিনি সর্বদা যত্নশীল থাকতেন। তাঁর গোলাপী স্বপ্ন (roseate dream) ছিল মুরগির মাংস ও মুরগির ডিম। ধৌলি উপত্যকায় পদপরিক্রমা শুরু হবার পর থেকেই প্রতি গ্রামে তিনি এই দুটি সুখাদ্যের সন্ধান করতেন, পেতেন না। সতীর্থরা হাসাহাসি করতেন। তিনি গম্ভীর স্বরে তাঁদের অভয় দিতেন—পরের গ্রামে পাওয়া যাবে। আর আশায় বুক বাঁধতেন যে সেখানে ডজন ডজন মুরগি আর শত শত ডিম তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। এবারে স্মাইথের ভাষায় বলি—'He would talk to us of chickens, roasted and succulent, and of eggs–boiled eggs, poached eggs, curried eggs, scrambled eggs, fried eggs, and huge omelcttes. steaming savoury...'

সে স্বপ্ন সত্য হয় নি। মালারির আগে কোন গ্রামেই তিনি মুরগি কিংবা মুরগির ডিম যোগাড় করতে পারেন নি। কিন্তু এই ব্যর্থতায় শিপটন মোটেই নিরাশ হয়ে পড়েন নি।

তিনি শুনেছিলেন, মালারি ধৌলি উপত্যকার বৃহত্তম গ্রাম। এখানে বহু দোকান-পাট, অনেক মানুষের বাস। অতএব একবার এখানে পৌঁছতে পারলে, তাঁর সেই গোলাপী স্বপ্ন নিশ্চয়ই সত্য হবে।

তাই সেদিন সকালে জুমা গ্রাম থেকে রওনা হবার সময় অনেক আশা নিয়ে সবার

আগে পথচলা শুরু করেছিলেন। কিন্তু হায়! এখানে পৌছেও মুরগি কিংবা ডিম কিছুই পাওয়া গেল না। তাঁর স্বপ্ন ভঙ্গ হল। হতাশ শিপটন তাঁবুর বাইরে একটা বিস্কুটের বাক্সের ওপরে বসে পড়লেন। তখনো কিন্তু মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

কামেট অভিযাত্রীদের পরে মালারি এসেছেন সুইস অভিযাত্রীরা অঁদ্রে রশ-এর নেতৃত্বে ১৯৩৯ সালে। কিন্তু তাঁদের কথা বলা হয়েছে আমার। অতএব অতীতের কথা আর নয়, তার চেয়ে বর্তমানের মালারিকে একবার ভাল করে দেখা যাক।

কিন্তু তার আগেই দেখা হয়ে যায় ওঁর সঙ্গে—ইন্ডো টিবেটান বর্ডার পুলিসের ক্যাপ্টেন কাজির সঙ্গে। সেদিন কোসা আসার পথে ধস পরিষ্কার করার সময় আলাপ হয়েছিল দেশের এই সদাজাগ্রত প্রহরীর সঙ্গে। আজ আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এসে হাত ধরলেন। কুশল বিনিময়ের পরে প্রায় বন্দী করে নিয়ে এলেন একটা চায়ের দোকানে। চা-পানের সময় আমাদের অভিযানের খবরাখবর নিলেন। তাঁর শুভেচ্ছা জানালেন।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে নিজেই খোঁজ-খবর নিয়ে কেরোসিন ও কিছু সবজি যোগাড় করে দিলেন। তারপরে 'ফির মিলেঙ্গে' বলে তাঁর ক্যাম্পের দিকে চলে গেলেন।

আমাদের প্রতি তাঁর এই বিশেষ আকর্ষণ অকারণে নয়। সৈনিক হলেও পর্বতারোহণের প্রতি মমত্ব রয়েছে ওঁর রক্তে। ক্যাপ্টেন কাজি সিকিমের মানুষ। প্রথম ভারতীয় হাতি পর্বত অভিযানের সফলকাম নেতা প্রাতঃস্মরণীয় পর্বতারোহী সোনাম গিয়াৎসো তাঁর মামা।

তবু সৈনিক ক্যাপ্টেন কাজির কথাই আমার বার বার মনে পড়ছে। এই প্রাণময় মানুষগুলোর কথা মনে পড়লে যে বড়ই মায়া হয়। আমরা শখ করে হিমালয়ে আসি! কয়েকদিন কষ্ট করে ফিরে যাই ঘরে—আপনজনের মাঝে।

আর এঁরা! দেশের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সদাজাগ্রত প্রহরীর কর্তব্য পালন করে চলেছেন। বিনিময়ে আমরা তাঁদের কতটুকু দিতে পারছি?

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, এই সীমান্তরক্ষা, এঁদের এই দুঃসহ দুঃখ-কষ্টের সবটাই সভ্যতার অভিশাপ, যে সভ্যতা মানুষকে লোভী আর স্বার্থপর করে তুলেছে। হাজার হাজার বছর ধরে যে সীমান্ত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকায় কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি, আজ মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সেই সীমান্ত রক্ষার জন্য দরিদ্র দেশের শত শত কোটি কোটি টাকা জলে যাচ্ছে আর হাজার হাজার তাজা প্রাণ বলি দিতে হচ্ছে। একে সভ্যতার সঙ্কট ছাড়া আর কি বলতে পারি?

চা খেয়েছি, বিশ্রাম নিয়েছি, কেনা-কাটা সেরেছি। বেলা বারোটা বাজে। অতএব আর দেরি নয়। দেরি করলে আবার নেতার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ফিরে চলি কোসার পথে। চলতে চলতে যতটুকু পারা যায় মালারিকে দেখে নেওয়া যাক। ধৌলির ধারে ধারে সারি সারি ঘরবাড়ি দোকান-পাট। পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেত। মোটরপথ শেষ হয়েছে। এখান থেকে শুরু হয়েছে হাঁটাপথ, গামশালি ও নিতি গ্রাম হয়ে নিতি গিরিবর্ত্মে। পঁয়ত্রিশ বছর আগেও এপথে চলত তীর্থযাত্রা আর অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য। ভারত কিংবা তিব্বত কোন দেশের তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। বরং দু-দেশের স্থানীয় জনসাধারণ উপকৃত হয়েছেন। এখন নিতি গিরিবর্ত্ম

নিষিদ্ধ পথ। আর এই নিষেধের প্রাচীরকে রক্ষা করার জন্যই ক্যাপ্টেন কাজিদের মোতায়েন করা হয়েছে এখানে।

গামশালি গ্রামটি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ঐ গ্রাম থেকে ফেরার পথেই স্মাইথ এবং হোল্ডস্‌ওয়ার্থ 'ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স' আবিস্কার করেন। আজ আমরাও অনায়াসে এই পথে চলে যেতে পারি গামশালি গাঁয়ে, এমনকি নিতি গাঁয়ে। নিতি গিরিবর্ষ্মে যাওয়া না গেলেও নিতি গাঁয়ে যেতে কোন বাধা নেই।

আবার সেই পুরনো কথায় ফিরে আসতে হয়। আমরা নেতার অনুমতি নিয়ে আসি নি। অতএব গামশালি যাবার উপায় নেই।

আমরা ফিরে চলি কোসা গাঁয়ের পথে। চলতে চলতে আবার মালারিকে দেখি—বাজার, পুলিসচৌকি, ইন্‌সপেকশান বাংলো আর দূরে বর্ডার পুলিসের ছাউনি। জোশীমঠ ছাড়ার পরে আর এমন জমজমাট লোকালয়ে পদার্পণ করি নি।

চলতে চলতে আলাপ হয় কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে। সব শুনে তাঁরা প্রশ্ন করেন—তা আপনারা কোসাগাঁয়ে পড়ে আছেন কেন ? কি আছে সেখানে ? আপনাদের উচিত এখানে এসে অপেক্ষা করা। এখানে চমৎকার ইন্‌সপেকশান বাংলো আছে। ঘরে বসে না থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন গামশালি আর নিতিগাঁও থেকে। এখানে সব জিনিসপত্র পাওয়া যায়। খাওয়া-দাওয়ারও সুবিধে হবে।

কি উত্তর দেব ? চুপ করে থাকতে হয়।

ওঁরা আবার বলেন—ওপর থেকে অভিযাত্রীরা ফিরে আসার পরে অন্তত সকালের বাস ধরে চলে আসুন এখানে। একটা দিন এখানে থেকে গামশালি ও নিতিগাঁও থেকে ঘুরে আসুন। পরদিন এখান থেকেই সোজা জোশীমঠ চলে যাবেন।

তাতে কোসাগাঁয়ের মানুষরা অসন্তুষ্ট হবেন। তাছাড়া অত মালপত্র নিয়ে সে হাঙ্গামা করা উচিত হবে না। তবু এই অতিথিবৎসল সহজ সরল সদাহাস্যময় মানুষগুলোর মনে আঘাত দিতে পারি না। মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে তাঁদের কথা ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে চলি কোসাগাঁয়ের পথে।

যাবার সময় তিন ঘণ্টা লেগেছিল। ফিরে এলাম দু-ঘণ্টায় বেলা দুটোর একটু পরে। আর এসেই গরম খাবার পাওয়া গেল—ডাল-ভাত, সবজি ও আচার।

খাবার পরে সবাই এসে উঠানে বসি। অস্তগামী সূর্যের সোনালী রোদে কোসাগাঁওকে দেখি। মাথায় থাক মালারি, আমরা কোসাতেই বাকি দিনগুলো কাটিয়ে যাবো। কোসা যে আমাদের আনন্দ-নিকেতন।

একপাল ভেড়া ও দুটো ঘোড়া নিয়ে তিনজন মেষপালক নেমে এসেছেন ওপর থেকে। শীত আসছে। এরাঁ নেমে যাচ্ছেন নিচে। আজ ধৌলির ধারে রাত কাটিয়ে কাল চলে যাবেন জোশীমঠ। তারপরে আরও নিচে। সারা শীতকাল এঁরা নিচে কাটিয়ে আগামী গ্রীষ্মে আবার আসবেন উচ্চ-হিমালয়ে। এই এদের জীবন।

গৌতম বোধহয় সেদিন এঁদের কথাই লিখেছে। আজ সে এঁদের সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছে। নেতা চিঠিটা শৈলেশের হাতে দিয়ে বলে—জোরে জোরে পড়ো। সবাই যাতে শুনতে পায়।

শৈলেশ পড়তে থাকে। আমরা শুনি—

পরদিন। ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে সকাল ছ'টা। সময়ের তুলনায় বাইরে আলো ফুটেছে কম। টেন্টের চেন টেনে বাইরে মুখ বাড়ালাম। বিস্ময় ও আনন্দে হতবাক হয়ে গেলাম। আমাদের তাঁবুর সোজাসুজি উপত্যকার অপর প্রান্তে হাতি পর্বত। মনে হচ্ছে যেন সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মাথার ওপরে ঝুঁকে রয়েছে—তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

সার্থকনামা হাতি পর্বত। পিঠটা ঠিক হাতির পিঠের মতো। সামনের দিকে একটা গিরিশিরা শুঁড়ের মতো প্রসারিত হয়ে উপত্যকার প্রান্তে এসে মিশেছে।

তোমাদের জন্য সত্যই দুঃখ হচ্ছে। এত কাছে এসেও তোমরা হিমালয়ের সফেদ হাতিকে দেখতে পেলে না। সত্যই দেখবার মতো। গতকাল সন্ধ্যা থেকেই তাকে দর্শন করবার জন্য আকুল হয়েছিলাম। আজ আমার সকল প্রতীক্ষা সার্থক হল।

কিন্তু এ সৌন্দর্য তো একা উপভোগ করবার নয়! তাই জামা-জুতো পরে বেরিয়ে আসি। হাতি পর্বতকে প্রণাম জানিয়ে, সবাইকে ডেকে তুলি। সহযাত্রীরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাতি পর্বতের অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করি। তারপরে চারিদিকে তাকাই। প্রভাতী সূর্যের প্রথম পরশে সারা অঞ্চলটি স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে।

মুগ্ধ হয়ে যাই। অপলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিক দেখি। হাতির পাশেই ঘোড়ি পর্বত, যেন যমজ ভাই। অনামি শৃঙ্গটা তো হাতির গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। তারা তিনে মিলে উপত্যকাটির একটা দিক যেন ঘিরে রেখেছে।

আমরা কেউ কোন কথা বলি না। আমাদের সব কথা যেন গিয়েছে হারিয়ে। আমরা শুধুই দেখি, চেয়ে চেয়ে দেখি।

হাতি আর অনামি শৃঙ্গের মাঝখান দিয়ে একটা আইস-ফল্‌স বা তুষার প্রপাত নেমে এসেছে উপত্যকায়। আর সেখান থেকেই সৃষ্ট হচ্ছে বড় নালাটি।

এখন কিন্তু নালাটি আর সচল জলধারা নয়। রাতের হিম তাকেও অচল তুষারপ্রপাতে পরিণত করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপত্যকায় রোদ এসে পড়ল। এখন সে আরও সুন্দর। আর কেবল তার কথাই বা বলি কেন, দিবাকরের মধুর পরশে হাতি ঘোড়িও এখন সোনার খনি।

কিন্তু কেবল ওদের রূপ দর্শন করে সময় কাটানো উচিত হবে না। তোমাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, তা পালন করতে হবে। তাই শের সিং-কে প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে বলি। জলখাবার খেয়েই জগদীশ শ্রীকৃষ্ণ ও শেরপারা এক নম্বর শিবিরের জায়গা খুঁজতে যাবে। দু-জন হ্যাপ্‌-ও তাদের সঙ্গে যাবে। যে ভাবেই হোক্ কালকের মধ্যে আরও অন্তত দু-হাজার ফুট উঁচুতে মানে ষোলো হাজার ফুটের ওপরে কোথাও একনম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

তাঁবুতে ঢুকে বাইনোকুলারটা নিয়ে আসি। ওদের তৈরি হতে বলে আমি ও শ্রীকৃষ্ণ বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে হাতি পর্বতের সম্ভাব্য পথ খুঁজতে থাকি।

দেখে-শুনে কৃষ্ণ বলে—এদিক থেকে হাতি শিখরে আরোহণ সম্ভব নয়। কারণ

হাতির পর্বতগাত্র এ দিকটায় সত্তর-আশি ডিগ্রি খাড়া। এবং তার ওপরের তুষারাবৃত অংশও পর্বতারোহণের উপযোগী নয়।

কিন্তু আমরা নিরাশ হলাম না। আরও কিছুক্ষণ ভাল করে দেখে নিয়ে স্থির করলাম। মানুষকে যেমন শুঁড়ের সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকা হাতির পিঠে উঠতে হয়, আমরা সেইভাবে হাতি পর্বতের শিখরে উঠব। তবে এপথে অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। কারণ হাতি পর্বতের শুঁড়টা এসে যেখানে উপত্যকায় পড়েছে, সে জায়গাটা এখান থেকে সাত-আট কিলোমিটার দূরে।

তাহলেও উপায় নেই। চা-বিস্কুট ও সুজি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে ওরা রওনা হয়ে গেল। আমরাও বসে রইলাম না। পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে দেওয়াল তৈরি করে ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে একটা রান্নাঘর বানিয়ে ফেললাম। তারপরে দুপুর ও রাতের রান্না শুরু করে দেওয়া গেল।

ওদের কিন্তু ফিরে আসতে বিকেল হয়ে গেল। ওরা জানালো, এখান থেকে চার কিলোমিটারের মতো রাস্তা প্রায় সমতল ও সবুজ উপত্যকার ওপর দিয়ে সোজাভাবে চলে গিয়েছে। তারপরে খানিকটা ওপরে উঠে আবার নেমে যেতে হল একটা গ্রাবরেখায়। তার মানে প্রচুর পাথর আর অসমান দুর্গম প্রান্তর।

আড়াআড়ি ভাবে সেই গ্রাবরেখা পার হয়ে হাতির শুঁড়ের কাছে পৌঁছন গেছে। সেখানে আরও খানিকটা ওপরে আমাদের এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জায়গাটার উচ্চতাও ষোলো হাজার ফুটের কিছু বেশি হবে। ওখানে শিবির স্থাপনের পর আমাদের সম্ভাব্য পথ কি হবে, তা আজই জানাতে পারছি না।

আমরা ঠিক করেছি, আগামীকাল খুব সকালে আমি বুবেন শিবু এবং শেরপারা দু-জন হ্যাপ নিয়ে যতটা সম্ভব মালপত্র-সহ ওপরে চলে যাবো এবং এক-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করব। জগদীশ শ্রীকৃষ্ণ ও তপন বাকি দুজন হ্যাপকে নিয়ে এখানেই থেকে যাবে। বিকেলে কোসা থেকে মালপত্র আসবে। পরশু সকালে ওরা সব মালপত্র ও দুটো তাঁবুই খুলে নিয়ে এক-নম্বরে চলে আসবে। এখানে শুধু পড়ে থাকবে ত্রিপলের রান্নাঘর। কোসা থেকে এসে মালবাহকরা ওখানেই রাত কাটাবে এবং মালপত্র রেখে যাবে।

আগামীকাল আমরা এক-নম্বর প্রতিষ্ঠা করে পরশু সকালেই দু-নম্বরের জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ব। পরশু শ্রীকৃষ্ণরাও চলে যাবে এক-নম্বরে। বিকেলে এক-নম্বরে ফিরে আসার পরে ওদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের।

তোমরা জানো যে আমরা যারা ওপরে এসেছি, তাদের মাঝে এ রকম সাময়িক ছাড়াছাড়ি হতেই থাকবে। সুতরাং সেকথা ভাবছি না। ভাবছি, তোমাদের সঙ্গে কবে আবার দেখা হবে ? তোমাদের দেওয়া কর্তব্য পালন করে নির্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই সুস্থ শরীরে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারব তো ?

পারতেই হবে। সেই আশাতে বুক বেঁধে নিয়ে আমরা এখন তোমাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাপ্রার্থী।

॥ বারো ॥

কোসাগাঁওয়ের জীবন
এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা

কোসাগাঁয়ের কর্মহীন প্রতীক্ষারত জীবনের আরও একটি দিন অতিবাহিত হল। আজ ছ'দিন হল গৌতমরা অভিযানে চলে গিয়েছে। গতকাল সকালে আমরা ওদের আরও কিছু খাবার ও দড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। একজন ল্যাপ্ ও এই গ্রামের দু-জন যুবক মালগুলো নিয়ে গিয়েছে। তারা আজ বিকেলে ফিরবে। আশা করছি তারা গৌতমদের খবর নিয়ে আসবে—দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার খবর।

আমাদের কর্মহীন জীবনের প্রধান অবলম্বন কোসাগাঁয়ের মানুষ। শিশু থেকে বৃদ্ধরা পালা করে আমাদের বিরক্তিকর দিনগুলোকে আনন্দে ভরে রেখেছে। সকালেই মস্তিরামের দল এসে হাজির হয়—সাব্, মিঠা দে!

লজেন্স পাবার পরে তারা বেশ কিছুক্ষণ আমাদের মাতিয়ে রাখে। তারপর আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। গাঁয়ের যুবকরা এসে উপস্থিত হয়। তাদের দুয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার চিকিৎসায় বেরিয়ে পড়ে। বাকিরা আমাদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করে বিদায় নেয়। আমরা রান্নার আয়োজনে লেগে যাই।

দুপুরে ডাক্তার ফিরে আসার পরে দল বেঁধে নদীতে যাই। জামা-প্যান্ট ধুয়ে স্নান করে জল নিয়ে ফিরে আসি আস্তানায়। খাবার পরে কেউ হিসেব করে, কেউ চিঠিপত্র কিংবা রিপোর্ট লেখে, কেউবা তাস খেলে।

মস্তিরামের দল ফিরে আসে। তাদের দ্বিতীয়বার লজেন্স পরিবেশন করতে হয়। বিকেল হতেই গ্রামবাসীরা আসতে শুরু করেন—প্রায় সব বয়সের মানুষরাই। শিব সিং চায়ের জল চড়ায়। কথায় কথায় গ্রামবাসীরা জানান—এখানে তাঁদের মেয়াদ আর মাত্র দিন বিশেক। তার পরেই তাঁরা আবার দল বেঁধে নন্দপ্রয়াগে নেমে যাবেন। যাবার আগে মহাসমারোহে পর্বতদেবতার পুজো করবেন। বিশ-পঁচিশটা পাঁঠা ও ভেড়া বলি দেওয়া হবে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেকে বলি নিয়ে আসবেন। কারণ তাঁদের গাঁয়ের পর্বত-দেবতা এমন জাগ্রত নন।

পর্বত-দেবতার কাছেই ওঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি গচ্ছিত রেখে ওঁরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন। এই ছ'মাস পর্বত-দেবতা তুষারপাত, ঝড়, আগুন ও চোরের হাত থেকে গ্রামখানিকে রক্ষা করবেন।

এই ওঁদের জীবন। যে জীবনের অপর নাম বেঁচে থাকার জন্য লড়াই—'Struggle for existence.' দুঃসহ দারিদ্র্যই এঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। তবু এঁরা সৎ, সরল ও প্রাণময়। অফুরন্ত এঁদের ভালোবাসা। যে ভালোবাসার মধুর ছোঁয়ায় আমাদের এই একঘেয়ে বিরক্তিকর জীবনও আনন্দময় হয়ে উঠেছে।

দুপুরের খাবার পরে আবার এসে মণ্ডপের উঠানে বসি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা এখানে বসে বসে কাটিয়ে দিই। তবে রোদ থাকলেই মাথায় টুপি অর্থাৎ 'সান-ক্যাপ' পরে নিতে হয়। কারণ ডাক্তারের মতে উচ্চ-হিমালয়ে রোদ উঠলে কখনই মাথাটিকে খুলে রাখা ঠিক নয়, মাথায় রোদ লেগে গেলে জ্বর মাথাব্যথা অথবা গা-

ব্যথায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

শুধু মাথায় টুপি পরা নয়, আমরা ডাক্তারের সব কথাই সাধ্যমত পালন করবার চেষ্টা করছি। ডাক্তার দাবী করছে, সেইজন্যই আমরা নাকি এমন সুস্থ রয়েছি। আর আমরা সুস্থ রয়েছি বলেই ডাক্তার গ্রামবাসীদের এমনভাবে চিকিৎসা করতে পারছে।

এ ব্যাপারে আমারও চিন্তা কিছু কম ছিল না। আটান্ন বছর বয়সে শরীরের ওপর এত অত্যাচার সামলাতে পারার কথা নয়। সুতরাং আমাকে সুস্থ রাখায় ডাক্তারের যথেষ্ট কৃতিত্ব রয়েছে বৈকি!

গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে কোসাগাঁয়ের আকাশে আর মাটিতে, ধৌলির ধারে আর কোসানদীর দুই-তীরে। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা বৈকালীন-মিঠা নিয়ে ফিরে গিয়েছে ঘরে। বড়রা কয়েকজন এখনো রয়েছেন মণ্ডপের সামনে। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। আমরা এখন এই গাঁয়ের বাসিন্দা। তাই কোসাবাসীরা আমাদের হাসি-কান্নার অংশীদার। গৌতমদের খবরের জন্য এঁরাও বসে রয়েছেন। আজ এখনো কোন খবর এলো না বলে এঁরাও চিন্তিত।

এমন সময় সহসা শৈলেশ চিৎকার করে ওঠে—লিডার! পোর্টার! আমাদের পোর্টার।

নেতার সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াই। হ্যাঁ, শৈলেশ ঠিকই দেখেছে। তবে একজন নয়, তিন জন। আমাদের ল্যাপ্ বৈশাখ সিং এবং দুজন গ্রামবাসী। এরা কাল কিছু মালপত্র নিয়ে ওপরে গিয়েছিল। আমরা দুপুর থেকে এদের প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

ওরা সেলাম করে। নেতা জিজ্ঞেস করে—কেয়া খবর বৈশাখ?

—আচ্ছা সাব্।

—সব ঠিক ঠাক?

—জী।

বিনয় ও গোরা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের পিঠ থেকে রুকস্যাক খুলে নেয়। নেতা বসতে বলে।

বসে একটু জিরিয়ে নেয়। আমরাও চুপ করে থাকি। ওরা খুবই ক্লান্ত। কিন্তু তা কেবল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরে সহাস্যে বৈশাখ বলে—খবর অচ্ছা সাব্! মৌসম সাফ, সাবলোগ সব ঠিক হ্যাঁয়। আজ দো লম্বর লাগ যায়েগি। পরসো তক ক্লাইম্।

ক্লাইম্ মানে Climb, কিন্তু লোকটা কি বলছে! পরশু নাগাদ শিখরারোহণ হয়ে যাবে। কোন শিখর? হাতি কিংবা অনামি?

ওদের এসব কথা জিজ্ঞেস করা বৃথা। ওরা তো মাত্র মূলশিবির পর্যন্ত গিয়েছে। সেখানে বোধকরি কোন হ্যাপ্ ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার কাছ থেকেই খবরটা পেয়েছে। সুতরাং বিশদ খবর এমনকি খবরের সত্যতা সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ে কোন লাভ হবে না।

তাই নেতা অন্য কথা জিজ্ঞেস করে—ডিপটিসাব কোই চিঠি ভেজা?

জিভে কামড় দিয়ে বৈশাখ বলে—জি সাব্! তাড়াতাড়ি উইন্ডপ্রুফের পকেটে হাত দিয়ে সে চিঠিটা বের করে নেতার হাতে দেয়।

লিডার ওদের বলে—তুমলোগ কিচেনমে যাও। চায় বানাও, পী লো। বিস্কুট লে লেনা।

আবার সেলাম করে ওরা মণ্ডপে চলে যায়। লিডার চিঠিখানি খুলে রঞ্জুর হাতে দিয়ে বলে—জোরে জোরে পড়ো, যাতে সবাই শুনতে পায়।

রঞ্জু পড়তে শুরু করে। গৌতম লিখেছে—

প্রিয় লিডার,

তোমাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় আমরা চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে পারছি।

শুনে খুশি হবে জগদীশ, তপন ও শিবু এবং শেরপা ও দুজন হ্যাপ্ সহ অধিকাংশ মালপত্র নিয়ে আমি আজ এক-নম্বর শিবিরে চলে এসেছি। জায়গাটার উচ্চতা ১৬,৫০০ফুটের মতো।

সকালে ব্রেকফাস্ট করেই রওনা হয়েছিলাম। মূল-শিবির থেকে প্রথম ঘণ্টা দুয়েকের পথ বেশ সহজ ও সোজা। সেই নালা বা সরু নদীটির তীরে তীরে। এ রকম আবহাওয়ায় এ ধরনের পথে সারাদিন ধরে হাঁটলেও ক্লান্তি আসবে না। তার ওপরে দু-পাশের দৃশ্য এতই মনোরম যে আমরা পায়ের দিকে নজর দেবার সময়ই পাই না। আর তোর তেমন একটা দরকারও নেই।

দু-ঘণ্টা চলার পরে উপত্যকাটি একটু ধূসর হতে লাগল। আমরা সেই পাথুরে গ্রাবরেখায় উপস্থিত হলাম। চলার গতি কমিয়ে দেখে দেখে পথ চলা শুরু করতে হল। খানিকটা ওপরে উঠে এলাম। এবারে আবার নিচে নেমে যেতে হবে। তখন আর স্বপ্নভূমি-সদৃশ উপত্যকাটিকে দেখতে পাবো না, দেখতে পাবো না আমাদের মূল-শিবির। তাই একখানি বড় পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে ফেলে আসা উপত্যকাটির দিকে তাকাই।

অপূর্ব লাগছে, অপরূপ দেখাচ্ছে। যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা এলাম, সেটা যে সমতল নয়, ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসেছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে। আমাদের তাঁবু দুটিকেও বোঝা যাচ্ছে, তবে তাদের দুখানি রঙীন পাথরের মতই মনে হচ্ছে।

এবাবে আমরা সেই গ্রাবরেখার ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করি। একটু বাদেই দেখতে পাই ওদের। মানুষ নয়, পারিজাত। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অসংখ্য ব্রহ্মকমল। শাপলার মতো কাণ্ডের মাথায় হালকা-হলুদ রঙের শত শত ব্রহ্মকমল। 'ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স' ছাড়া এত ব্রহ্মকমল একসঙ্গে আর কোথাও দেখি নি। এও তো দেখছি আরেকটা ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স। কিন্তু কেউ এর নাম জানেন না কারণ কোন ফ্রাঙ্ক্ স্মাইথ আসেন নি এখানে।

ভুলে গেলাম শিবির স্থাপনের কথা, বিস্মৃত হলাম অভিযানের কথা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই পারিজাত বনে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। বেশ কিছু ছবি তুলে ফেললাম।

সেই পারিজাত বনে বোধকরি প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক পাগলের মতো পায়চারি করার পরে মনে পড়ল অভিযানের কথা। আর দেরি করলে শিবির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে বুঝতে পেরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নিলাম ফুলবন থেকে। বিদায়বেলায় জগদীশ বেশ কয়েকটা ব্রহ্মকমল তুলে তার বুকস্যাকে বেঁধে নিল।

কমলবন ছাড়িয়ে চড়াইটা কোসা হিমবাহের গ্রাবরেখায় এসে পড়ল। হাতি পর্বতের শুঁড়টা বড় থাবার মতো হয়ে ঠিক ওপারে হিমবাহে মিশেছে। অর্থাৎ হিমবাহটিকে

সরাসরি পার হতে হবে। কাজটা সহজ নয়। এখানে বড় বড় পাথর, সামনে বরফ। এবং সাধারণত এ ধরনের হিমবাহে প্রচুর চোরা ফাটল থাকে। তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে আবার এগিয়ে চললাম।

প্রায় আড়াই কিলোমিটার দুর্গম পথ পার হয়ে আমরা যখন হাতি পর্বতের শুঁড়ের কাছে এসেছি, তখন ঘড়িতে তিনটে। অর্থাৎ মূল-শিবির থেকে প্রায় সাত ঘণ্টা হাঁটতে হল। পথ খুব ক্লান্তিকর নয়, তবে দূরত্বটা উপেক্ষা করা উচিত হবে না। তাই স্থির করলাম, আর বেশিদূর না এগিয়ে কাছাকাছি একটা শিবিরস্থলী খুঁজে বের করতে হবে।

অতএব 'মার্কিং ফ্ল্যাগ' পুঁতে পুঁতে এগিয়ে চললাম। এবং কিছুক্ষণ চেষ্টার পরেই একফালি পাথুরে সমতল পাওয়া গেল। জায়গাটা কোসা হিমবাহের গ্রাবরেখার ঠিক ওপরে হাতি পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখান থেকে রতবন হিমবাহটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জায়গাটার উচ্চতা সাড়ে ষোলো হাজার ফুটের মতো। এখানে একটা জলের ধারা রয়েছে। আমরা দুটো টু-মেন ও একটা ফোর-মেন টেন্ট ফেলেছি, আরও গুটিদুয়েক তাঁবু অনায়াসে ফেলা যাবে। জায়গাটা বেশ নিরাপদ। মানে ধস নামার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে ধস নামছে। হাতি পর্বত থেকে কিছুক্ষণ বাদে বাদেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারধস নেমে আসছে। তাদের শব্দে কোসা হিমবাহ বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। জানি না সফেদ হাতি আমাদের ভয় দেখাচ্ছে কিনা? দেখালেও আমরা ভয় পাই নি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, আমরা নির্ভয়ে এগিয়ে যাবো। প্রকৃতি সহায় হলে আমরা তোমাদের স্বপ্ন সফল করে সবাই সুস্থ শরীরে তোমাদের কাছে ফিরে আসব।

আমরা সবাই ভাল। শুভেচ্ছাপ্রার্থী

—তোমাদের গৌতম।

থামল শৈলেশ। নেতা বলে ওঠে—এ তো পুরনো খবর। এর আগের চিঠিতেই তো জানিয়েছে, সাড়ে ষোলো হাজার ফুটে এক নম্বরের জায়গা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এ অবস্থায় বৈশাখ কেমন করে বলল, উসকে বাদ ক্লাইম! ডাকো তো ওকে!

অর্ধেন্দু ডাক দেয়। বৈশাখ আসে। নেতা তাকে প্রশ্ন করে। উত্তরে বৈশাখ জানায়, সায়ন সিং বলেছে। সে গতকাল মালপত্র নেবার জন্য এক-নম্বর থেকে মূল-শিবিরে নেমে এসেছিল। গৌতমের চিঠিও সে-ই দিয়েছে। সায়ন বলেছে, আজ দু-নম্বর শিবির স্থাপিত হয়ে যাবে। পরশু ওরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে।

ওর কাছ থেকে এর বেশি কিছু জানতে চাওয়া বৃথা। কিন্তু আমাদের যে হিসেব মিলছে না। যদি আজ দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে তা হয়েছে বড়জোর আঠারো-সাড়ে আঠারো হাজার ফুটে। সে শিবির থেকে ওরা হাতি শিখরে কেমন করে আরোহণ করবে? হাতির উচ্চতা ২২,০৭৪ ফুট। একদিনে চার হাজার ফুট আরোহণ ও অবরোহণ অসম্ভব। হাতি পর্বতে আরোহণ করতে হতে ওদের আরও একটা শিবির প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি। সে সময় ওরা পাবে কি? মনে হয় না। তবে ওরা যদি স্থির করে থাকে, অনামি শিখরে আরোহণ করবে, সেটা দু-নম্বর থেকে আরোহণ করা সম্ভব। কারণ অনামি ২০,২৩৪ ফুট উঁচু।

মোট কথা গৌতমের এই চিঠি আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করা তো দূরের কথা বরং নতুন সংশয়ের সৃষ্টি করল।

কিন্তু পর্বতাভিযানে এসে যারা নিচের দিকে থাকে, তাদেব এ যন্ত্রণা সইতেই হবে। আমাদের ছোট অভিযান, আমরা ওয়াকিটকি পর্যন্ত নিযে আসতে পারি নি। লোক পাঠিয়ে খবরাখবর পাওয়া। এ রকম সংশয় তো হবেই। ওরা ফিরে আসা পর্যন্ত এমনি উদ্বেগ আর আশঙ্কা বুকে বয়ে বেড়াতে হবে।

এবং আমাদের বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না। অবিচলিত ভাবে পরবর্তী কাজগুলো করে যেতে হবে। অভিজ্ঞ নেতা তার ডায়েরি খোলে, কলম বের করে কি যেন সব লেখে। আমরা চুপ করে থাকি।

একটু বাদে নেতা বলে—শঙ্কুদা. তুমি শৈলেশকে নিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করে ফেলো। কাল সকালের বাসে ভটচাজ আবার জোশীমঠ যাবে।

ভটচাজ মাথা নাড়ে। হঠাৎ অর্ধেন্দু বলে ওঠে—আমার একটা আবদার আছে লিডার!

—বেশ বলুন।

—আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে। বেশি নয় শ'দুয়েক।

—কেন বলুন তো?

—আমার ইচ্ছে, গৌতমরা যেদিন ফিরে আসবে, সেদিন সন্ধ্যায় এই উঠোনে ক্যাম্প্ ফায়ার করব।

—তার জন্য এত টাকা চাইছেন কেন? নেতা জিজ্ঞেস করে। আমারও একই প্রশ্ন।

অর্ধেন্দু উত্তর দেয়—আমার ইচ্ছে গ্রামের মানুষরা যারা সেদিন শেষ পর্যন্ত এখানে উপস্থিত থাকবেন, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে খাবেন। গৌতমদের সম্মানে সেদিন আমি ঘি-ভাত, আলুর দম ও পায়েস রান্না করব।

—থ্রি চিয়ার্স ফর প্রফেসর অর্ধেন্দু মুখার্জি! গোরা চিৎকার করে ওঠে।

আমরা সোচ্চার স্বরে সাড়া দিই—হিপ হিপ হুররে, হিপ হিপ...

নেতা হেসে বলে—মেম্বাররা সবাই যখন সমর্থন করল, তখন তো আমার অনুমোদন পেয়েই গেলেন। শঙ্কর, ভটচাজকে বাড়তি দু-শ' টাকা দিয়ে দিও। তাছাড়া লজেন্স আনাতে হবে। গোরা ও ডাক্তার! তোমাদের ফর্দ দিয়ে দিও ভটচাজকে।

—বৈশাখ বলছিল, কালই তাকে পোর্টার আর ঘোড়া নিয়ে ওপরে চলে যেতে বলেছে।

নেতা বিনয়কে পাল্টা প্রশ্ন করে—কে বলেছে, সায়ন সিং?

—বোধ হয়।

ডায়েরিতে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নেতা বলে—বৈশাখ আর ওপরে যাবে না, এখানেই থাকবে। শিব সিং দুজন হ্যাপ ও দুটো ঘোড়া নিয়ে পরশু সকালে মূল-শিবিরে রওনা হবে।

—কিন্তু সাতজন পোর্টার ও দুটো ঘোড়ায় সব মাল নিয়ে আসতে পারবে কি? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

—কেন পারবে না? যাবার সময় চারটে ঘোড়া ও ছ'জন পোর্টার গিয়েছে।

—তার পরেও ছ'পোর্টার মাল গিয়েছে।

নেতা আবার ডায়েরি দেখে। কি যেন হিসেব করে। তারপরে বলে—হ্যাঁ, দুটো নয়, তিনটে ঘোড়া পাঠিয়ে দিও। কাল সকালেই প্রধানের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা

করে রেখো।

বিনয় মাথা নাড়ে। সভা ভঙ্গ হয়। আমরা ঘরে এসে পেট্রোম্যাক্সের আলোয় যে যার কাজ শুরু করে দিই। কোসাগাঁয়ে জীবনের আরেকটি দিন গেল ফুরিয়ে।

॥ তেরো ॥

দু-নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন
হাতি পর্বতে প্রথম ভারতীয় আরোহণ
ত্রিশূল ও নীলগিরি পর্বতে প্রথম আরোহণ

আজ দেখছি আকাশের নীল আরও ঘন হয়েছে, যতদূর দেখা যাচ্ছে কোথাও মেঘের কোন চিহ্ন নেই। করুণাময়ী প্রকৃতিকে প্রণাম জানিয়ে দিনের কাজ শুরু করি, ল্যাপ্‌দের ডেকে তুলি, চা বানাতে বলি। তারপরে ভটচাজকে ডাকি। সে আজ প্রথম বাস ধরে জোশীমঠ যাবে।

চা ও ভরপেট ভাঙা বিস্কুট খেয়ে ভটচাজ খালি রুকস্যাক পিঠে তোলে, নেতা ও সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। আমি আর বিনয় ওকে ধৌলির ধারে সেই উৎরাই পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

আজ পরোটা ও তরকারি দিয়ে ব্রেকফাস্ট হল। জনৈক রোগী কাল ডাক্তারকে কিছু বিন্‌স দিয়েছিলেন। আলু আর সেই বিন্‌স-এর তরকারি করেছে গোরা। এইসঙ্গে অবশ্য সে জানিয়ে দিল—লাঞ্চ-এ আজ তরকারি পাবে না। ডাল ভাত ও ডিমের ঝোল।

ডিম আমরা নিয়ে এসেছি কলকাতা থেকেই। হিসেব করে খরচ করায় এখনো কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। দুঃখ হচ্ছে এরিক শিপটনের জন্য। তাঁর যুগে ডিম পরিবহনের এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। বেচারা বৃথাই ডিমের খোঁজে ধৌলি উপত্যকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর ডিম সেদ্ধ, ডিমের পোচ, ডিমের কারি এবং ওমলেট ইত্যাদির স্বপ্ন দেখেছেন।

—কিন্তু বাচ্চাগুলো আজ এখনো আসছে না কেন? ব্যাপার কি!

নেতা বিস্মিত। এবং সেইসঙ্গে আমরাও।

—ওরা আর আসবে না। গোরা জানায়।

—কেন? নেতার সঙ্গে প্রায় সমস্বরে বলে উঠি।

—কাল বিকেলে আমি ওদের ভয় দেখিয়েছি। গোরা জবাব দেয়।

—সে কি?

—হ্যাঁ। বড্ড জ্বালাতন করে। প্রথম দিকে একবার করে আসত। তারপরে দু-বার এখন তিনবার আসতে আরম্ভ করেছে। সারাদিন ধরে কেবল, সাব্ মিঠা দে! মিঠা আর মিঠা! গোরা তার কুকর্মের কারণ ব্যাখ্যা করে।

নেতা বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তাই বলে তুমি 'সেল্‌ফিস জায়েন্ট'-এর মতো ছেলে-মেয়েগুলোকে তাড়িয়ে দেবে?

লজ্জিত গোরা কোন জবাব দিতে পারে না। সে চুপ করে থাকে।

নেতা আবার বলে—নিজের মেয়ের কথা মনে করেও তো এমন কাজ করা উচিত ছিল না তোমার। আট-দশটা ছেলে-মেয়ে। দৈনিক না হয় বিশ-তিরিশটা লজেন্স লাগছে। আজও ভটচাজকে লজেন্স আনতে বলে দিয়েছি। সামান্য লজেন্সের বিনিময়ে ওরা আমাদের যে আনন্দ দিয়ে যায়, তার কথা ভাবলে না একবারও।

না। গোরার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। বেশিক্ষণ তাকে নেতার তিরস্কার শুনতে হয় না। হঠাৎ সে দেখতে পায় একটি মেয়ে গুটি গুটি এদিকে আসছে। সে উঠে দাঁড়ায়। মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে মেয়েটাকে ইশারা করে কাছে ডাকে।

মেয়েটার চলা বন্ধ হয়ে যায়। সে থমকে দাঁড়ায়। গোরা আর ধৈর্য ধরতে পারে না। দৌড়ে গেলে পালিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেই বোধকরি সে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় মেয়েটির কাছে। গিয়ে তার একখানি হাত ধরে ফেলে। তারপরে সাদরে নিয়ে আসে আমাদের কাছে। তার দুহাতে চারটি লজেন্স ঘুষ দিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বলে—তোমার সাথীরা সব কোথায় গেল ? তারা আজ মিঠা নিতে আসছে না কেন ?

মেয়েটা প্রথমে গোরার আদর-আপ্যায়নে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে, গোরা বঙ্গালি সাব এবং বাপের বয়স হয়েও তার কৃপাপ্রার্থী। তাই গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়—ওরা কেউ আর আসবে না তোমাদের কাছে। আমিও আসতাম না, ভুলে এসে পড়েছি।

—কেন বলতো ? নেতা জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি এগিয়ে আসে নেতার কাছে। তারপরে গোরাকে দেখিয়ে বলে—এই সাব্ আমাদের ক্ষেপায়। মিঠা দেয় না, তাড়া লাগায়।

—আর তাড়াবো না, মিঠা দেব। তুমি তোমার সাথীদের ডেকে নিয়ে এসো। গোরা প্রায় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

এ যুগের মেয়ে, সে যেখানে যার ঘরেই জন্ম নিয়ে থাকুক। সুযোগ বুঝে সে বলে ওঠে—ওদের ডেকে আনলে, আমাকে কি দেবে ?

অসহায় গোরা আমাদের দিকে তাকায়। আমরা অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখি।

বন্ধুবৎসল বিনয় বন্ধুর বিপদে নীরব থাকতে পারে না। সে ঘরে গিয়ে লজেন্স নিয়ে আসে। মেয়েটার হাতে দিয়ে বলে—এই দুটো এখন নাও। ওদের ডেকে নিয়ে এলে আরও পাবে।

—বেশ, আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসছি, তখন কিন্তু সবার সঙ্গে আমাকেও মিঠা দেবে আর এই মিঠা দেবার কথা কাউকে বলবে না।

নেতা গোরা ও বিনয় একসঙ্গে মাথা নাড়ে। মেয়েটা ছুট লাগায়। আমরা ওর সঙ্গীদের আগমনের প্রতীক্ষায় বসে থাকি।

সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু তাদের আগেই দল বেঁধে ওরা আসে। গুটিচারেক কুকুর। সকালে ও দুপুরে খাবার পরে নিয়মিত হাজিরা দেয়।

গোরা আজ দাতা কর্ণ। কিচেন থেকে রুটি এনে সারমেয়দের বিতরণ করে। খেয়ে নিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে তারা আবার গাঁয়ের দিকে ফিরে যায়।

তাদের চলে যাবার কয়েক মিনিট বাদেই সদলবলে মন্ত্রিরাম এসে যায়। সবার হাতে দুটি করে মিঠা তুলে দিয়ে গোরা ওদের মানভঞ্জন করে।

লজেন্স মুখে পুরে ওরা আমাদের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে খেলা শুরু করে দেয়। আমরা হাসিমুখে দুষ্টুমি দেখতে থাকি। আর দেখি অনুতপ্ত গোরার হাসিখুসি মুখখানি।

ওরা চলে যাবার পরে গোরার খেয়াল হয়, এবারে দুপুরের রান্না আরম্ভ করা দরকার। আজ আর তার নিজের হাতে তেমন কিছু করার দরকার নেই। কারণ ল্যাপ্ বৈশাখ সিং বেশ ভাল রান্না করতে পারে।

গোরা তাই বৈশাখকে বলে—তুমি স্টোভ ধরিয়ে ডাল-ভাত রান্না করে আমাকে ডাক দিও, আমি ডিমের কারি রাঁধবো। অর্ধেন্দুদা ডিম খান না, তাঁর জন্য আলু ভাজতে হবে।

বৈশাখ মাথা নেড়ে চলে যায়। আমরা নিশ্চিন্ত মনে আড্ডা মারতে থাকি।

কিন্তু মারে কৃষ্ণ রাখে কে ? কয়েক মিনিট বাদেই বৈশাখ ফিরে আসে। হতাশ কণ্ঠে বলে—সাব্, স্টোভ জ্বলছে না।

সে কি ! ওর কথা শুনে অবাক হই। এই তো মাত্র ঘণ্টাদুয়েক আগে ব্রেকফাস্ট তৈরি করা হয়েছে। আর এখন স্টোভ বিগড়ে গেল !

ব্যাপারটা আশ্চর্যের হলেও সত্যি। বিনয়, শৈলেশ এবং গোরা বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও অচল স্টোভকে সচল করে তুলতে পারল না। জোশীমঠ নিয়ে গিয়ে ঠিক করে আনতে হবে। কিন্তু সে তো দু-দিনের ব্যাপার। এই দু-দিন চলবে কেমন করে ? আজ দুপুরের রান্নার কি হবে ?

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আমাদের।

না, আছে। মনে হচ্ছে উত্তর একটা পাওয়া যাবে। কিন্তু কথাটা আগে না বলাই ভাল। তাই নীরবে ঘরে চলে আসি। বুকস্যাক থেকে প্যাকিং লিস্ট-এর কপিটা বের করি।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই মনে পড়েছে আমার, শ্রীকৃষ্ণ তার অফিসক্যান্টিন থেকে যে স্টোভটা নিয়ে এসেছে, সেটার প্যাকিং এখনো খোলা হয় নি। কারণ স্টোভটা প্রকাণ্ড, প্রচুর তেল লাগে। সেটি সাত নম্বর কাঠের ক্রেট-এ বন্দী হয়ে রয়েছে।

ফিরে এসে কথাটা বলতেই সবাই যেন একসঙ্গে স্বর্গ হাতে পায়। নেতা বলে ওঠে—এই না হলে ম্যানেজার।

ক্রেট খুলে স্টোভ বের করা হয়। তেল ভরে জ্বালানো গেল। চমৎকার জ্বলছে। তেল একটু বেশি পুড়বে। কিন্তু কি আর করা যাবে ?

সকাল-বিকেল তবু মস্তিরাম ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কেটে যায়। কিন্তু দুপুর আর রাত কাটানো বড়ই কষ্টকর। দুপুরে ঘুমোতে পারি না। কারণ দিবানিদ্রা আলস্যের আকর এবং তাতে রাতের ঘুম নষ্ট হয়। অনিদ্রা উচ্চতাজনিত রোগগুলির অন্যতম।

আমার সহযাত্রীরা কয়েকজন অবশ্য তাস ও দাবা খেলে দিনরাতের অনেকখানি সময়ের সদ্ব্যবহার করছে। কিন্তু আমরা যারা ও-রসে বঞ্চিত, তাদেরই হয়েছে বিপদ। আমাদের একমাত্র সম্বল প্রতীক্ষা। সকালে বিকেলের জন্য প্রতীক্ষা, বিকেলে রাতের আর রাতে সকালের। আর এই সব প্রতীক্ষা জুড়ে শুধুই গৌতমদের ভাবনা—আমার পর্বতারোহী বন্ধুদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা।

আজ আবার একটা বাড়তি প্রতীক্ষা ছিল। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল না। সন্ধ্যের সময় ভটচাজ ফিরে এলো জোশীমঠ থেকে। আজও সে সবার সব ফরমাশ পূরণ করেছে।

রিপোর্টের ফ্যাক্স পাঠিয়ে চিঠিপত্র ডাকে দিয়ে ডাক নিয়ে এসেছে। এনেছে মশলাপাতি থেকে কন্ডেন্সড মিল্ক, লজেন্স থেকে ওষুধ-পথ্য পর্যন্ত সবকিছুই। অর্ধেন্দু খুশি হয়, গরম-মশলা, কিশমিশ কাজুবাদাম কন্ডেন্সড মিল্ক প্রভৃতি সবই এসে গিয়েছে। গৌতমরা ফিরে আসার পরে ক্যাম্প-ফায়ার হবে। সেদিন রাতে গাঁয়ের মানুষদের ফ্রায়েড রাইস আলুর দম আর মিষ্টান্ন খাওয়ানো হবে।

ভট্চাজের 'কন্সাইনমেন্ট' গোছগাছ করে আর চিঠিপত্র পড়ে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দেওয়া গেল। তারপরে গ্রামবাসীরা বিদায় নিলেন। গোরাও ডিনারের আয়োজনে লেগে যায়।

ঘরে এসে ম্যাট্রেসে গা এলিয়ে দিয়ে আবার শুরু হয় প্রতীক্ষা—আপাতত ডিনারের তারপরে নিদ্রাদেবীর।

নীরবতার অবসান ঘটিয়ে সহসা শঙ্কর বলে ওঠে—লীডার, ভারতীয়রা কবে প্রথম হাতি পর্বত শিখরে আরোহণ করেছেন ?

—১৯৬৩ সালের ৬ই ও ৭ই জুন।

—কে সেই অভিযানের নেতা ছিলেন ? এবারে শৈলেশের প্রশ্ন।

অমূল্য উত্তর দেয়—সোনাম গিয়াৎসো। নেতা ছাড়া আর যাঁরা শিখরে আরোহণ করেছেন, তাঁরা হলেন—এইচ. সি. রাওয়াত, সোনাম ওয়াঙ্গিল, ডি. এস. শিশোদিয়া এবং লেঃ কৌসল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শেরপা থণ্ডুপ, শেরিং, লাক্পা তেনজিং ও দাওয়া নরবু।

নেতা থামতেই শৈলেশ বলে—আরও কিছু বলো না হাতি পর্বত সম্পর্কে।

একটু ভেবে নিয়ে নেতা আবার শুরু করে 'Abode of Snow' বইতে Kenneth Mason লিখেছেন—তিব্বত সীমান্তের কাছে ভারতীয় হিমালয়ে, ধৌলি ও সরস্বতী নদীর মধ্যাঞ্চলে অনেকগুলি উঁচু পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। এদের মধ্যে কামেট, আবিগামিন, মানা, মন্দির, নীলগিরি, রতবন, ঘোড়ি ও হাতি পর্বত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৯ সালের আঁন্দ্রে রশ-এর নেতৃত্বে এক সুইস পর্বতারোহী দল এই অঞ্চলে আসেন। প্রাতঃস্মরণীয় পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল তাঁরা কোসা হিমবাহ অঞ্চল সমীক্ষা করবেন এবং সেইসঙ্গে দুনাগিরি, হাতি-পর্বত, ঘোড়ি-পর্বত, রতবন ও চৌখাম্বা শিখরে আরোহণ করবেন। তাঁরা ৫ই জুলাই (১৯৩৯) দুনাগিরি শিখরে আরোহণ করে কোসা হিমবাহে আসেন। ৮ই আগস্ট রতবন এবং ১৮ই আগস্ট ঘোড়ি পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন। কিন্তু তারপরে আর হাতির দিকে না এগিয়ে চৌখাম্বা অভিযানে চলে যান। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। কারণ ঘোড়ি ও হাতিকে প্রায় যমজ পর্বতশিখর বলা যেতে পারে।

হয়তো ঘোড়ি থেকে সোজাসুজি হাতিতে আরোহণ করা যায় না, কিন্তু একেবারে নিচে নেমে আসার দরকার পড়ে না। তাহলে কেন তাঁরা হাতিতে না চড়ে চৌখাম্বা চলে গেলেন ? অর্থাভাব, সময়াভাব ? না, এসব সমস্যা তাঁদের ছিল না। আমার ধারণা হাতি পর্বতে তুষারধসের আধিক্য দেখেই তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনার পরিবর্তন করেছেন।

থামল নেতা। আমি ভাবি অন্যকথা, রশ যা পারেন নি, আমরা কি পারব ?

কেন পারব না। ভারতীয় পর্বতারোহীরা যে ১৯৬৩ সালে পর পর দু-দিন হাতি পর্বতশিখরে আরোহণ করেছেন। পারব, আমরাও পারব। আমার ভাইরা আমাদের জন্য

জয়মাল্য নিয়ে আসবে। আমরা বিজয়ী হয়ে ঘরে ফিরব।

—সেলাম লীডারসাব্, সেলাম সাব্, সেলাম...।

আমার ঘরে ফেরার ভাবনা হারিয়ে যায়। তাকিয়ে দেখি হ্যাপ্ সায়ন সিং ঘরে ঢুকছে। এত দেরিতে! সাধারণত ওরা দিনের আলো থাকতে থাকতেই এসে যায়। আজ বোধকরি দেরিতে রওনা হয়েছে।

নেতা জিজ্ঞেস করে—কেয়া খবর সায়ন? মেম্বারলোগ সব ঠিকঠাক?

—জি লীডারসাব্। লেকিন আজ মৌসম অচ্ছা নহী। উপারমে বারিশ শুরু হুয়া। ইসি লিয়ে দের হো গিয়া।

কল বারিশ বন্ধ হো যায়েগি। নেতা বোধকরি সায়নের সঙ্গে আমাদেরও আশ্বস্ত করতে চায়।

সায়ন মাথা নাড়ে। বলে—হামলোগ ভি এ্যায়সা হি মাংতা।

শুধু ওরা কেন, আমরা সবাই তো চাইছি আবহাওয়া ভাল থাকুক। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির কাছে আমাদের চাওয়া না-চাওয়ার যে কোন মূল্যই নেই। সরকার হাটের পদযাত্রীরা চেয়েছিলেন তুষারঝড় বন্ধ হোক। প্রকৃতি তাঁদের আকুল আবেদনে সাড়া দেন নি। ফলে ছ'টি তাজা প্রাণ অসময়ে দেহমুক্ত হয়েছে।

কিন্তু এসব ভাবনা থাক, তার চাইতে সায়নকে জিজ্ঞেস করা যাক, গৌতম কোন চিঠি দিয়েছে কিনা।

জিজ্ঞেস করতেই সায়ন তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানি খাম বের করে আমার হাতে দেয়। আমি খাম ছিঁড়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করি। গৌতম লিখেছে—

এক নম্বর শিবির

ছাতু ও চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে, জেলি-মাখানো আটার রুটির প্যাক্-লাঞ্চ নিয়ে আমি ও রুবেন শেরপাদের সঙ্গে ঠিক সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। বলা বাহুল্য রুবেন দুটি ফ্রুট জুসের টিন ও কিছু চুয়িঙ্গাম রুকস্যাকে ভরে নিতে ভুল করল না।

আজ আমরা হাতি পর্বতশিখরের পথ খুঁজতে চলেছি। হাতি পর্বত ও তার পাশের অনামি শৃঙ্গের মাঝখান দিয়ে যে আইস ফল্স বা অতিকায় তুষারপ্রপাতটা নেমে এসেছে, তাকে অবলম্বন করেই ওপরে উঠতে হবে।

যেভাবেই হোক আরও অন্তত হাজার দুই-আড়াই ফুট ওপরে অর্থাৎ আঠেরো-উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে হাতি পর্বতের গায়ে একটা শিবিরের জায়গা খুঁজে বের করতেই হবে। সেখানে আমরা আজ কিছু মালপত্রও ফেলে আসব। ঠিক দুপুর বারোটা পর্যন্ত অর্থাৎ এখন থেকে ঘণ্টা চারেক সময়ে যতটা ওপরে ওঠা যায় ততটাই উঠব, তারপরে ফিরে আসতে শুরু করব। আশা করছি মধ্যাহ্নের মধ্যেই একটা সুবিধেমত ক্যামপ্-সাইট পেয়ে যাবো। মার্কিং ফ্ল্যাগ দিয়ে পথ ও জায়গাটা সুচিহ্নিত করে নেমে আসব এক নম্বরে।

আজকের সাফল্যের ওপরে অভিযানের অনেকখানি ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তবে আশা করছি আজ একটা ভাল ক্যাম্প-সাইট পেয়ে যাবো। আর তা পেলে দু-তিন দিনের চেষ্টায় আমরা বিশ থেকে একুশ হাজার ফুট উচ্চতায় তিন-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হব। এবং তাহলে নেতার দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই হাতি-শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারব।

কিন্তু থাক্‌গে ভবিষ্যতের কথা, আজকের কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা এখন সেই আইস-ফল্‌সের দিকে এগিয়ে চলেছি। অক্লেশেই চলেছি বলা যেতে পারে কারণ পথটা বরফে ঢাকা হলেও তেমন চড়াই নয়, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গিয়েছে। চলতে ভালও লাগছে। যত ওপরে উঠছি, ততই আমাদের দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হচ্ছে, দূর এগিয়ে আসছে কাছে।

এমন আরামে অবশ্য বেশিক্ষণ পথ-চলা গেল না। ঘণ্টাখানেক চলার পরে একটা বেশ খাড়া ঢালের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। সহজ হলেও ঘণ্টাখানেক চড়াই ভেঙেছি। এবারে খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে হবে। অতএব একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক,

রুকস্যাক নামিয়ে বরফের ওপরেই বসে পড়ি। ফ্রুট-জুস-এর টিন বের করে একবার গলা ভিজিয়ে নিই। উচ্চ-হিমালয়ে যেমন জলাভাব, তেমনি অনন্ত পিপাসা। বরফ চুষে এই পিপাসার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে আবার উঠে দাঁড়ানো গেল। বরফে ঢাকা খাড়া পাথুরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করি। কাজটা কঠিন। কারণ প্রায় প্রতিটি পাথরের খাঁজে নরম তুষারের স্তূপ জমে রয়েছে। সেখানে পা দিলেই হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে। পা টেনে তুলে তুলে পথ চলতে যেমন সময় লাগছে, তেমনি দম ফুরিয়ে আসতে চাইছে। তা হলেও পথ চলতে হবে। কারণ এই পথ-চলার নামই পর্বতারোহণ। শারীরিক সুখ বিস্মৃত হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে এগিয়ে চলার অপর নাম পর্বতাভিযান।

কেবল তুষারস্তূপ নয়, সেইসঙ্গে পাথরগুলোর কোণা এখানে-ওখানে বেরিয়ে রয়েছে। পাথর তো নয় যেন তীক্ষ্ণ ত্রিশূল। মনে হচ্ছে হাতির দাঁতের খোঁচা খাচ্ছি।

পথ চলতে যতই কষ্ট হোক, চারিপাশের পরিবেশ কিন্তু পরম রমণীয়। নির্মল নীলাকাশে মধ্যাহ্নের দিবাকর ঝলমল করছে। আমাদের ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে হাতি ও ঘোড়ি পর্বত। সামনে নীলাকাশের বুকে এই দেওয়ালের বাঁধ বানিয়ে দু-জনে মুচকি হাসছে আর কাছে ডাকছে। আশা করছি এই দেওয়ালের ওপরে উঠতে পারলেই হাতি পর্বতের দক্ষিণগাত্রে শিখরের একটা সম্ভাব্য পথ পেয়ে যাবো।

আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে চলি। চলা শুধুই পথচলা, ওপরে আরও ওপরে।

চলতে চলতে হঠাৎ আকাশের দিকে নজর পড়ে। সূর্য প্রায় মধ্য-গগনে। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি। সেকি ! এ যে দেখছি এগারোটা ! তার মানে দু-ঘণ্টা ধরে এই যন্ত্রণাদায়ক পথ চলছি। হাতে আর ঘণ্টাখানেক সময় আছে। তার মধ্যে কি একটা পছন্দমত ক্যাম্প-সাইট খুঁজে পাবো ? পেতেই হবে।

আশায় বেঁচে থাকে মানুষ। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আর পানীয়েরও প্রয়োজন। একটা ভাল জায়গা দেখে বসে পড়ি সবাই। রুকস্যাক থেকে প্যাক্-লাঞ্চ এবং ফ্রুট-জুস-এর খোলাটিনটা বের করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাই।

সময় সংক্ষিপ্ত। সুতরাং খাওয়া শেষ হতেই উঠে দাঁড়াতে হয়। সূর্য একটু বাদেই পশ্চিমাচলের বুকে আশ্রয় নিতে ছুটবে। তার মধ্যে আমাদের দু-নম্বর শিবিরের জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। সেখানে বয়ে আনা মালপত্রগুলো ফেলে রেখে সন্ধ্যার আগেই এক নম্বরে ফিরে যাওয়া দরকার। জগদীশ ও রুবেন আজ মূলশিবির থেকে এক নম্বরে আসবে। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আগামীকালের কর্মসূচী ঠিক করে নিতে হবে।

না, ভাগ্য ভাল বলতে হবে। আর বেশিক্ষণ সংগ্রাম করতে হল না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ বেলা বারোটার অনতিকাল পরেই আমরা ঈপ্সিতকে পেয়ে গেলাম একফালি তুষারাবৃত প্রায় সমতল। শেরপাদের সঙ্গে আলোচনা করে এখানেই আমাদের দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। ওরা বলল, জায়গাটার উচ্চতা আঠারো হাজার ফুটের চেয়ে কিছু বেশিই হবে।

অতএব আজকের মতো এখানেই পথচলা শেষ হল। সবাই বসে পড়ি সেখানে। বসে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হাতি পর্বতকে প্রণাম জানাই। জানি না, তিনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করবেন কিনা? কারণ মাঝে মাঝেই তাঁর গা থেকে এক-একটা অতিকায় তুষারধস নিচে পড়ছে। আর সেই প্রচণ্ড শব্দ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুক্ষণ ধরে সারা অঞ্চলটিকে প্রকম্পিত করে রাখছে। সবচেয়ে ভাবনার কথা এখান থেকে শিখর-শিরাটিতে পৌঁছতে হলে ঐ তুষার-সম্প্রপাত স্থানের তলা দিয়ে এগোতে হবে।

এখুনি অবশ্য এসব বাড়তি দুশ্চিন্তা। অতএব ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের হাতেই তুলে রেখে আমরা আবার উঠে দাঁড়াই। দড়ি ও অন্যান্য সব সাজ-সরঞ্জামগুলো এখানেই রেখে দিই। তারপরে পাশের একখানি উঁচু পাথরের সঙ্গে একটা মার্কিং ফ্ল্যাগ বেঁধে দিই। যাতে দূর থেকেও জায়গাটাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

অবশেষে শুরু হল ফেরার পালা। এবারে উৎরাই পথ। আমরা জোর কদমে নেমে চলি। মনে অপার আনন্দ। আজকের কষ্টকর পথপরিক্রমা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে!

পড়া শেষ করে চিঠিখানি নেতার হাতে দিই। সে পকেটে রেখে দিয়ে বলে—আঠেরো হাজার ফুট উঁচুতে দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার খবর আমরা আগেই পেয়েছি। তাই গৌতমের এ চিঠিতে কোন নতুন খবর নেই। তাছাড়া বৈশাখ এসে বলছে আজকের মধ্যে নাকি শিখরারোহণ হয়ে যাবে! কোন্ শিখর? হাতি কিংবা অনামি? সে প্রশ্নের উত্তরও এ চিঠিতে নেই।

—আমার তো মনে হচ্ছে হাতি। কারণ তারই শিখরশিরার সামনে দু-নম্বর শিবির স্থাপিত হয়েছে। শৈলেশ মন্তব্য করে।

নেতা নীরব। কিন্তু বিনয় বলে—গৌতমের চিঠি পড়ে আমার কিন্তু মনে হল না, যেখানে ওরা দু-নম্বর শিবির স্থাপন করেছে, সেখান থেকে দু-তিন দিনের মধ্যে হাতি পর্বত শিখরে আরোহণ করা সম্ভব।

মাথা নেড়ে নেতা বলে—তুষার সম্প্রপাত স্থানের কথা বাদ দিলেও আঠেরো হাজার ফুটের শিবির থেকে সোজাসুজি বাইশ হাজার ফুট উঁচু শিখরে আরোহণ সম্ভব নয়।

অর্ধেন্দু প্রতিবাদ করে—কেন সম্ভব নয়? তুমি কি ১৯০৭ সালে ডঃ টি. জি. লংস্টাফ-এর সেই ত্রিশূল আরোহণের কথা ভুলে গেলে। তাঁরা তো ১৭,৪০০ফুট উঁচু শিবির থেকে রওনা হয়ে দশ ঘন্টায় ২৩,৩৬০ফুট উঁচু ত্রিশূল শিখরে আরোহণ করেছিলেন। আর সেটা পর্বতারোহণের প্রথম যুগের কথা। ১৯০৭ সালের ১২ই মে। তখন সাজ-সরঞ্জাম বলতে প্রায় কিছুই ছিল না এবং তার আগে কোন পর্বতারোহী অত উঁচু শিখরে আরোহণ করেন নি।

অর্ধেন্দু মনে করিয়ে দেবার পরে কথাটা আমারও মনে পড়ে। ঘটনাটি আজও বিশ্ব পর্বতারোহণের ইতিহাসে পরম বিস্ময় হয়ে রয়েছে। কিন্তু সেদিন লংস্টাফ যা সম্ভব

করেছেন, আজ প্রায় নব্বুই বছর পরেও যে আমাদের কাছে তা অসম্ভব হয়ে রয়েছে।

নেতা সেই কথাই বলে—ডঃ টি. জি. লংস্টাফ-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা করতে যাবেন না অর্ধেন্দুদা, লোক হাসাহাসি করবে। শুধু জেনে রাখুন, তিনি পেরেছেন আমরা পারি না।

একবার থামে নেতা। তারপরে আবার বলে—লংস্টাফ কেন, স্মাইথ যা পেরেছিলেন আমরা তো তাও পারি নি।

—কি রকম ? ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

নেতা উত্তর দেয়—স্মাইথ ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স-এ উদ্ভিদ সমীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মালবাহকদের নিয়ে চারপাশের শৃঙ্গগুলির কয়েকটি শিখরে আরোহণ করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিখরারোহণ হচ্ছে ২১,৩৬০ফুট উঁচু নীলগিরি পর্বত। স্মাইথ ঐ পর্বত শিখরের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত শিবির থেকে ভোরে আরোহণ শুরু করে দুপুরের কিছু পরে শিখরে উপস্থিত হন, আবার সন্ধ্যে নাগাদ শিবিরে ফিরে আসেন। সেদিন পনেরো ঘণ্টায় তাঁরা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট করে আরোহণ এবং অবরোহণ করেছেন। এজন্য যোল থেকে একুশ হাজার ফুট উচ্চতায় সেদিন তাদের ঐ পনেরো ঘণ্টায় প্রায় ষোল কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

একবার থামে অমূল্য। তারপরে একটু হেসে আবার বলে—স্মাইথের সেই আরোহণের ঠিক পঁচিশ বছর পরে ১৯৬২ সালে আমরা ঐ নীলগিরি পর্বতে আরোহণ করেছি। কিন্তু যে দূরত্ব ওরা পনেরো ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিলেন তা পার হবার জন্য আমাদের দুটি শিবির প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল আর সময় লেগেছিল প্রায় এক সপ্তাহ।

তাই বলছি, ওঁদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করবেন না। এবং আরেকটা শিবির প্রতিষ্ঠা না করে গৌতমরা কিছুতেই হাতি পর্বতশিখরে আরোহণ করতে পারবে না।

অর্ধেন্দু কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। আমরাও নীরব থাকি।

॥ চোদ্দ ॥

কোসাগাঁওয়ের রক্ষক পর্বতদেবতার পূজা

গতকাল থেকেই কোসাগাঁও উৎসবের সাজে সেজেছে। ধৌলির ধারে ধারে উঠে এসে চড়াই পথটা যেখানে গাঁয়ের সমতলে মিশেছে, সেখানে গাছের ডাল-পালা আর ফুল দিয়ে পথের ওপরে একটা তোরণ তৈরি করা হয়েছে। একখানি বড় কাগজে 'স্বাগতম' লিখে তোরণের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের উৎসবে তোমাদের 'সবারে করি আহ্বান।'

এ আমন্ত্রণে কিন্তু কোনমতেই কেবল লোক-দেখানো নয়, সত্যি সত্যি গতকালই বেশ কয়েকজন অতিথি এসে পৌঁচেছেন পাশের গ্রাম পাবনকুণ্ড জুমা ও জেলাম থেকে। তাঁরা এসেছেন পূজায় অংশগ্রহণ করতে। কারণ কোসার পর্বতদেবতা নাকি খুবই জাগ্রত। এবং তাঁদেরও পরমারাধ্য।

তাঁরা খালি হাতে আসেন নি। একটি করে ভেড়া কিংবা পাঁঠা নিয়ে এসেছেন। সেগুলিও আজ বলি দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে নাকি গুটি বিশেক বলি পড়বে।

কেবল পথ নয়, গ্রামের বাড়ি-ঘরও সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফুল ও পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। দরজার সামনে আলপনা দিয়ে জলভরা মঙ্গল-কলস রেখে দেওয়া হয়েছে। নেহাৎ এখানে কলাগাছ পাওয়া যায় না বলেই বোধকরি লাগানো হয় নি। এঁদের গৃহসজ্জা দেখে বার বার বাংলার গ্রামীণ উৎসবের কথা মনে পড়ছে আমার। কাকদ্বীপের সঙ্গে কোসাগাঁয়ের তো দেখছি কোন পার্থক্য নেই। একই সনাতন সংস্কৃতির ধারা সেই সুদূর অতীত থেকে এই বর্তমান পর্যন্ত একইভাবে বহমান। ভৌগোলিক বা ভাষাগত ব্যবধান সেই ফল্গুধারাকে অচল করে দিতে পারে নি।

আগেই বলেছি, কোসাগাঁয়ের পর্বতদেবতা অতিশয় জাগ্রত। তাঁরই কাছে বাড়ি-ঘর আসবাবপত্র ও ক্ষেত-খামার জমা রেখে এঁরা দল বেঁধে নন্দপ্রয়াগে নেমে যাবেন। তিনি শীতের মাসগুলোতে এঁদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবেন। অতএব এই পূজা, এঁদের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসব।

আজ কিন্তু কেউ আসে নি আমাদের আস্তানায়। আসে নি মস্তিরামের দল লজেন্স নিতে। আসে নি যুবকরা, ডাক্তারকে নিয়ে যেতে। আসেন নি বৃদ্ধরা আমাদের খোঁজ-খবর করতে। আজ যে ওদের লোক-উৎসব, পর্বতদেবতার পূজা।

আমাদেরও যেতে হবে। গতকাল প্রধান নিজে এসে নেমন্তন্ন করে গিয়েছেন।

ডাল-পরোটা দিয়ে ভরপেট ব্রেকফাস্ট করা গেল। তারপরে বৈশাখকে নিয়ে রওনা হলাম পূজো দেখতে। এখন সকাল সাড়ে দশটা। একটু দেরি হয়ে গেল। ওঁরা আরও আগে যেতে বলেছিলেন। তাছাড়া ফিরে এসে রান্না করতে হবে, স্নান কাচাকাচি ও জল আনাও রয়েছে। কি আর করা যাবে ! কর্মহীন জীবনে আমরা যে গতি হারিয়ে ফেলেছি, অখণ্ড অবসর যাপন করতে করতে মন্থর হয়ে গিয়েছি।

গ্রামের ঘর-বাড়ি ছাড়িয়ে এলাম। নদীর ঘাটকে ডাইনে রেখে খেতের ভেতর দিয়ে গিরিশিরার দিকে এগিয়ে চলেছি। সেই একই পথ। এই পথ দিয়েই আমরা রাড়ু গিয়েছিলাম, এই পথ ধরে গৌতমরা হাতি পর্বতে গিয়েছে, এই পথ ধরেই তারা ফিরে আসবে আমাদের কাছে।

কবে ? জানা নেই আমাদের। কেবল জানি সেদিন আর দূরে নেই। মিলনের মহানন্দে মুখরিত হয়ে ওঠার সময় সমাগত।

না। আজকের পথ সেদিনের পথ নয়। ক্ষেত ছাড়িয়ে গিরিশিরার গা বেয়ে কেবল শ'খানেক মিটার ওপরে উঠতে হল। তারপরেই ডানদিকে একটা পাকদণ্ডি পাওয়া গেল। বৈশাখ সেইপথ ধরে এগিয়ে চলল। আমরা ওকে অনুসরণ করি।

এ পথটাও বনের ভেতর দিয়ে কিন্তু চড়াই নয়। আমরা উৎরাই পথ বেয়ে কোসা নদীর তীরভূমির দিকে চলেছি এগিয়ে।

পৌঁছলাম কোসার কাছে। এখানে সে একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে নদীর একফালি বেলাভূমি। বালুকাবেলা নয়, পাথুরে প্রায় সমতল খানিকটা জায়গা। পাশ দিয়ে দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে কোসা। বৈশাখ বলে—পর্বতদেবতার থান।

পাকদণ্ডি পথটা কিন্তু ঠিক সমতল জায়গায় নেমে আসে নি। মিটার দেড়েক ওপরে পৌঁছে সহসা শেষ হয়ে গিয়েছে, পথ থেকে লাফিয়ে নেমে আসতে হয় পূজাস্থলীতে।

বৈশাখ সেভাবেই নেমে যায়, আমাদেরও নামতে বলে। কেবল বৈশাখ নয়, আরও অনেকে। এমন কি স্বয়ং প্রধানজি পর্যন্ত।

কিন্তু আমরা নামতে পারি না। পথের প্রান্তে দাঁড়িয়েই পূজা আর পূজাস্থলীকে দেখতে থাকি। শুনতে থাকি পূজার্থীদের উল্লাসধ্বনি।

জায়গাটি ছোট। বোধকরি বিশ-পঁচিশ বর্গমিটার হবে। জায়গাটার একদিকে পথ, একদিকে দু-তিন মিটার উঁচু একটা পাথরের দেওয়াল আর অপর দু-দিক জুড়ে কোসা নদী, মাত্র মিটার খানেক নিচে বয়ে চলেছে।

দেওয়ালের ধারে গাছের ডাল দিয়ে একটা গোল-পোস্টের মতো বানানো হয়েছে। সিং সহ কয়েকটি হরিণ আর মোষের মাথার কঙ্কাল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তার সঙ্গে। আর তাদের তলায়, গোলপোস্টের মাঝামাঝি জায়গায় একখানি মাঝারী আকারের পাথর। ওরা বলছেন—শিলা। পর্বত-দেবতার পুণ্যময় প্রতীক। তারই সামনে পূজার উপকরণ সাজিয়ে পুরোহিত পুজোয় বসেছেন।

পুজোর কথায় পরে আসছি, তার আগে আরেকটা কথা সেরে নিই। বৈদিক পূজায় নারীদের অধিকার নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এবং এখনো হয়ে চলেছে। ব্যাপারটার আজও নিষ্পত্তি হয় নি, কোনদিন হবে কিনা জানা নেই আমার।

কিন্তু এটা তো কোন বৈদিক পুজো নয়, নিতান্তই একটি স্থানীয় লোক-উৎসব—সামাজিক সম্মিলন। হিমালয়ের সমাজে মেয়েদেরই বেশি অধিকার। কারণ সন্তান-পালন থেকে ক্ষেতখামারে উৎপাদন পর্যন্ত, সংসার ও সমাজের যাবতীয় কর্তব্যের অধিকাংশই মেয়েরা সম্পাদন করে থাকেন। এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই সংসার-নায়ের কাণ্ডারী। আর একথা কোসাগাঁয়ের ক্ষেত্রেও সমান সত্য।

অথচ এখানে দেখছি পূজাস্থলে মেয়েরা অনুপস্থিত। এই উৎসবমুখর কোসাগ্রামের গৃহিণীরা বোধকরি প্রায় সকলেই আজকের দিনেও ঘরে রয়েছেন। যে সামান্য কয়েকটি তরুণী ও কিশোরী এখানে এসেছে, তারাও পথের ধারে রয়েছে দাঁড়িয়ে, দূর থেকে পুজো দেখছে। এমন কি ছোট-ছোট মেয়েরা পর্যন্ত কেউ নিচে নামে নি, মাসি-পিসি কিংবা দিদিদের সঙ্গে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, পূজাস্থলে মেয়েদের প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু থাক গে, পুরুষ শাসিত সমাজ কিংবা নারী স্বাধীনতার প্রসঙ্গ অবতারণা করে সময় নষ্ট করা বৃথা। তার চেয়ে পুজো দেখা যাক।

কাজটা অবশ্য খুবই কষ্টকর। কারণ এখানে পুজো মানেই বলি। না না, বলি বলা যায় না। বলা উচিত 'হালাল' বা জবাই। হ্যাঁ, পর্বতদেবতার নামে কিছুক্ষণ বাদে বাদেই এক-একটি মেষশাবক কিংবা ছাগশিশুকে জবাই করা হচ্ছে। আর পূজার্থীদের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি ওপারের পাহাড়ে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার এপারে ফিরে ফিরে আসছে।

তাহলেও আমরা ওঁদের নিমন্ত্রিত অতিথি। অতএব ওঁদের অনুরোধে নেমে আসতে হয় সেই রক্তাক্ত বধ্যস্থলে। ছোট জায়গা, অনেক লোক। তারই মধ্যে ওঁরা আমাদের দাঁড়াবার জায়গা করে দেন। পুরোহিতের পেছনে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে থাকি সেই হত্যাকাণ্ড।

দু-জন স্বেচ্ছাসেবক গলায় দড়ি বেঁধে একটি ভেড়া কিংবা পাঁঠাকে সেই পাথরখানির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পুরোহিত চোখ বুজে বিড় বিড় করে কোন দুর্বোধ্য মন্ত্রপাঠ

করছেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে চোখ মেলে স্বেচ্ছাসেবকদের দিকে একবার তাকাচ্ছেন। তারা অসহায় প্রাণীটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদীর ধারে এবং সে কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই তাকে ধাক্কা দিয়ে খরস্রোতা নদীর হিমশীতল জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরে নাকানি-চোবানি খাবার পরে টেনে তুলে আবার সেই একই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অসহায় প্রাণীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। পুরোহিত আবার চোখ বুজে কয়েক মিনিট ধরে দুর্বোধ্য মন্ত্রপাঠ করেন।

পাঠ শেষে পুরোহিত চোখ মেলেন। মাথা নুইয়ে পর্বত-দেবতাক প্রণাম করেন। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের ইশারা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকগণ বধ্যপশুটির কানে কোসার খানিকটা তুষারশীতল জল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই ভীত ও সন্ত্রস্ত চতুষ্পদটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। ব্যাস, সমবেত পূজার্থীদের উল্লাসধ্বনিতে কোসানদীর প্রবল গর্জন হারিয়ে যাচ্ছে।

উল্লাসের কারণ, গা ঝাড়া দিয়ে বধ্যপ্রাণীটি নাকি স্বেচ্ছায় বলিপ্রদত্ত হবার সম্মতি জানিয়ে দিল। বলা বাহুল্য পর্বত-দেবতার অপার করুণার কথা উপলব্ধি করে আপন আত্মার অক্ষয় স্বর্গবাসের বাসনায় ব্যাকুল হয়েই সে এই সম্মতি প্রদান করল।

সুতরাং পরমুহূর্তেই পশুটিকে চিৎ করে শুইতে দিয়ে তার মাথা ও পা চারখানিকে বধ্যস্থলে চেপে ধরা হচ্ছে। একজন একখানি রক্তমাখা ছোরা সজোরে তার গলায় বসিয়ে দিচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে উঠছে।

শ্বাসনালিটা কাটা হবার পরে কসাই ছোরা হাতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বধ্যপ্রাণীটির গায়েই ছোরাখানি মুছে নিচ্ছে। কিছুক্ষণ ছটফট করার পরে হতভাগ্য প্রাণীর দেহটা নিশ্চল হয়ে যায়। নিজের রক্ত নিজের গায়ে মেখে সে পর্বতদেবতার সামনে পড়ে থাকে।

পূজার্থীরা জল ঢেলে তার গায়ের রক্ত পরিষ্কার করে। তারপরে সেই কসাই আবার সেই ছোরাখানি হাতে নিয়ে মৃত প্রাণীটির পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। নিহত চতুষ্পদের বুক চিরে তার কলিজাটা বের করে এনে পুরোহিতের হাতে দিচ্ছে। তিনি একখানি পেতলের থালায় সাজিয়ে সেটিকে দেবতার সামনে রেখে দিচ্ছেন। এর আগে যেসব ভেড়া ও পাঁঠা জবাই দেওয়া হয়েছে, তাদের সব কলিজাগুলি সারি দিয়ে সাজানো রয়েছে।

বৈশাখ জানায়—কলিজাগুলোই নাকি পর্বতদেবতার আসল প্রসাদ। সমস্ত বলি হয়ে যাবার পরে উপস্থিত ভক্তদের হাতে এক এক টুকরো কলিজার প্রসাদ বিতরণ করা হবে। তারা ভক্তিভরে কলিজাগুলো কাঁচা খেয়ে নেবে। আর বিকেলে বাড়িতে বাড়িতে মাংস প্রসাদ বিতরণ করা হবে। এবং বলা বাহুল্য আমরাও বাদ পড়ব না।

অনেকদিন আমরা মাংস খেতে পাই না। মাংস পাওয়া যাবে শুনে গতকাল খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আজ এখানে এসে পুজোর নামে এই নৃশংসতা দর্শন করবার পরে রসনার মৃত্যু ঘটেছে। এখন মনে হচ্ছে এ পুজো দেখতে আসা উচিত হয় নি। কারণ এই অমানুষিক হত্যার দৃশ্য অবলোকন করবার মতো শক্ত কলিজা আমাদের নয়।

অতএব আর এখানে অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। সুতরাং পূজোর প্রণামী বাবদ মোড়লের হাতে একখানি একশ' টাকার নোট গুঁজে দিয়ে সবিনয়ে বিদায় নিই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। বৈশাখ কিন্তু সঙ্গী হয় না আমাদের। সে কলিজা প্রসাদ পেয়ে আসবে।

নিঃশব্দে পথ চলি, আর চলতে চলতে ভাবি—ধর্মের নামে আমরা আর কতদিন

এমন অধর্ম করে যেতে থাকব ? ভাগ্যিস, রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন এবং তিনি ভাবতেও পারেন নি যে 'বিসর্জন' নাটকখানি প্রকাশের শতবর্ষ পরেও 'দেবতার নামে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ' এবং তাঁর সেই শাশ্বতবাণীতে আমরা কেউ কর্ণপাত করছি না—

'জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে।'

জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রতিমুহূর্তে মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের সাধনায় মানুষ এখন অমিত শক্তির অধিকারী। কিন্তু দুঃখের কথা সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের অধঃপতন ঘটছে। ব্যক্তি-স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থকে হত্যা করছে। মানুষ তার মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলছে।

আরও দুর্ভাগ্যের কথা বিজ্ঞানের এই অবিশ্বাস্য উন্নতির পরেও মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলো কিছুমাত্র সংযত হয় নি। ধর্ষণ লুণ্ঠন সহ অন্যান্য নিষ্ঠুরতার অবসান হওয়া তো দূরের কথা বরং তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারই একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখে এলাম পর্বতদেবতার পুজোর নামে।

দৃশ্যটার কথা ভাবলে এখনো শিউরে উঠছি। আর ভেবে অবাক হচ্ছি, সহজ সরল ও প্রেমময় হিমালয়ের মানুষগুলো পর্যন্ত অন্ধবিশ্বাসের কবলে পড়ে কত বড় অমানুষই হয়ে উঠতে পারে !

॥ পনেরো ॥

দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা
হিমালয়ে চাঁদের যাদু

আমাদের নেতা অমূল্য সেন মাঝেমাঝেই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সাংখ্যযোগ থেকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করে—

'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈব পাপমবাপ্স্যসি ॥ (২/৩৮)

সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় তুল্যজ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কারণ কেবল এমনটি করতে পারলেই তুমি পাপের অংশীদার হবে না।

আবৃত্তি করে সে বোঝাতে চায় যে হিমালয়ে এসে কোন অবস্থাতেই তার কিছুমাত্র 'টেন্‌শন' হয় না। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। নইলে রাড়ু থেকে ফিরে আসার সময় সেদিন সেও আমাদের সঙ্গে অমন কেঁদে আকুল হত না এবং আজও সারা দুপুর এমন ছটফট করত না। মুখে কিছু না বললেও আমরা বেশ বুঝতে পারছি, ওপরের খবরের জন্য তার 'টেন্‌শন' আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এবং ওপর থেকে লোক আসতে যত দেরি হচ্ছে, তার 'টেনশন' তত বাড়ছে।

আজ অবশ্য অস্থির হয়ে পড়বার একটা বাড়তি কারণ ঘটেছে। আজ আকাশের

চেহারাটা গত কয়েকদিনের মতো নয়। গতকাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আজও সকাল থেকে মেঘের আনা-গোনা চলেছে। কি জানি প্রকৃতির মনে কি আছে ?

মালবাহকরা যা-ই বলুক, হিসেব অনুযায়ী আজ কিম্বা কাল ওদের চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার কথা। এ অবস্থায় যদি আবার আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায় ?

না। কথাটা ভাবতে ভাল লাগছে না। প্রকৃতির অকরুণ আচরণের জন্য আমাদের আর কত কষ্ট করতে হবে ? আমরা হাতি পর্বত অভিযানে এসে হাতি পর্বতকে দর্শন না করে এই কোসাগাঁয়ে বসে আছি। বসে বসে পর্বতারোহী সহযাত্রীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রহর গুণছি। এসব দেখেও কি তাঁর কিছুমাত্র মায়া হচ্ছে না, একটু দয়া ?

হচ্ছে বৈকি ! নিশ্চয়ই হচ্ছে। নইলে হঠাৎ আকাশটা এমন হালকা হয়ে যাবে কেন ? এরই মধ্যে এখানে-ওখানে নীলাকাশের নীলিমা দেখা দিয়েছে। আর সেখান থেকে সোনালী রোদের মিঠে পরশ এসে পৌঁচেছে।

কিন্তু এই পরশ ওরা পাচ্ছে কি ? ওরা এই রোদের ছোঁয়াটুকু পেলেই আমাদের সকল আশা পূর্ণ হবে। অপূর্ণের যন্ত্রণাভোগ সইতে হবে না।

গাঁয়ের মানুষ গাঁয়ের পথে চলাচল শুরু করেছেন। ওরা ক্ষেতে-খামারে কাজে চলেছেন। হিমালয়ে রোদ মানেই জীবন। রোদের পরশ পেয়ে ঘরের মানুষ ঘরকে পর করে পথে বেরিয়ে পড়েছেন।

মেঘলা আকাশ কিন্তু মস্তিরামের বাহিনীকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। তারা নিজেদের পাওনা বুঝে নিয়ে পাঠশালায় গিয়েছে। ছুটির পরে আবার আসবে।

হরি সিং আর মোতিরাম আসে। ডাক্তারকে নিয়ে হরি গ্রাম পরিক্রমায় যায়। মোতি আমাদের সঙ্গে গল্প করতে থাকে। নিজের গল্প, কোসাগাঁয়ের গল্প, নন্দপ্রয়াগের গল্প। সে-ও একজন শিক্ষিত বেকার। লেখা-পড়া শিখেও পৈতৃক বৃত্তি চাষাবাদ দিয়ে জীবনধারণ করতে হচ্ছে। জীবনযাত্রার ব্যয় যেভাবে বেড়েছে, ফসলের উৎপাদন কিংবা দাম সেভাবে বাড়ে নি। ফলে দিন দিন অভাব বাড়ছে।

আজকাল গাড়োয়ালে অবশ্য ব্যবসার সুযোগ বেড়েছে। কিন্তু ব্যবসা করতে হলে মূলধন চাই। শিক্ষিত-বেকারদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য 'গ্যারান্টার' দরকার। টাকা না দিলে গ্যারান্টার পাওয়া যায় না এবং টাকা পাবার আগেই সেই টাকা দিতে হবে। সুতরাং তার পক্ষে এখনো ঋণ পাওয়া সম্ভব হয় নি।

মনে পড়ছে সুইজারল্যান্ডের কথা। একদিন আমরা জুরিখ থেকে বেশ খানিকটা দূরে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দেখলাম ঝকঝকে মসৃণ পথ, সুসজ্জিত দোকান-পাট, ছবির মতো সুন্দর সুন্দর 'ভিলা'। প্রতি ভিলার সামনে চকচকে গাড়ি।

কথায় কথায় গাইড আমাদের জানালেন, কয়েকবছর আগেও এসব গ্রামের মানুষরা গরীব ছিলেন, কিন্তু পর্যটন ব্যবসা প্রসারিত হবার পর থেকে তাঁদের অবস্থা ফিরে গিয়েছে। বলা বাহুল্য প্রথম দিকে সরকার তাঁদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন। খুবই স্বাভাবিক, জনগণের সরকারকে জনগণের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেই হবে।

সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের দেশেও পর্যটন ব্যবসার কিছু উন্নতি হয়েছে এবং উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছে। আর তুলনায় এই উন্নতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে হিমালয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা স্বর্গীয় সৌন্দর্য আর অন্তহীন ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও হিমালয় তার ছেলে-মেয়েদের মুখে অন্ন যোগাতে

পারছেন না। কারণ আমাদের দেশে গণতন্ত্রের নামে নেতাতন্ত্র প্রচলিত।

—শিব সিং!

অর্ধেন্দুর চিৎকারে মোতিরামের কথা ও আমার ভাবনা হারিয়ে যায়। তাকিয়ে দেখি সত্যই শিব সিং, আমাদের মালবাহক।

বিনয় তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তার পিঠ থেকে বুকস্যাক নামিয়ে নেয়। বলে—এত ভারি কেন হে?

—আজ্ঞে ডিপটিসাব কিছু বাড়তি মাল পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে আর ওপরে যেতে নিষেধ করেছেন।

তার মানে তো অভিযানের শেষ পর্যায়।

কিন্তু শিব সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তবে সে নাকি শুনেছে—দু-নম্বর শিবির থেকে হাতি শিখরের পথ পাওয়া যায় নি। যে গিরিশিরাটি ধরে এগিয়ে যাওয়া যায়, তার ওপরে অবিরত তুষারধস নেমে আসছে, তাই অভিযাত্রীরা অনামি শৃঙ্গের দিক এগিয়ে গিয়েছেন। এবং আশা করা যায়, ইতিমধ্যেই তারা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

—তার মানে তো হাতি পর্বত অভিযান ব্যর্থ হল? শৈলেশ নিরাশ কণ্ঠে বলে ওঠে।

নেতা সান্ত্বনা দেয়—না। এখুনি তা বলা যাবে না। কারণ শিব সিং দু-নম্বর শিবিরে যায় নি। এক নম্বরে বসে সে যা শুনেছে, তাই বলল।

একবার থামে সে। তারপরে শিবকে জিজ্ঞেস করে—সাব্‌লোগ কোঁই চিঠি দিয়া?

জিভে কামড় দিয়ে লজ্জিত স্বরে শিব বলে ওঠে—জি সাব্! সে চিঠিটা বের করে নেতার হাতে দেয়। নেতা জোরে জোরে পড়তে শুরু করে। গৌতম লিখেছে—

গতকাল এক নম্বর শিবিরে ফিরে যেতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। যেতে যেতে ভাবছিলাম তোমাদের কথা। আজ জগদীশ আর শ্রীকৃষ্ণ মূল-শিবির থেকে এক নম্বরে আসবে। তাদের কাছে তোমাদের খবর পাওয়া যাবে, জানা যাবে নেতার নির্দেশ।

তাই দূর থেকে এক নম্বরের সামনে তিনজন মানুষকে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম, কারণ আমরা শের সিং-কে একা রেখে দু-নম্বরের জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছি।

দূর থেকে ওরাও দেখতে পেয়েছিল আমাদের। তাই খানিকটা এগিয়ে এসেছিল। শিবিরে পৌঁছুবার আগেই আমরা জগদীশ ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। ভাবছিলাম, দু-দিন বাদে দেখা হতেই এত আনন্দ, কোসা ফিরে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হবে, তখন আমরা কি করব?

ওদের কাছে খবর পেলাম, তোমরা আমাদের জন্য আরও দশ লিটার কেরোসিন, পাঁচ কেজি চাল আর এক কেজি করে চিনি ও ডাল পাঠিয়ে দিয়েছো। বুঝতে পারছি, নিজেরা উপোসী থেকে তোমরা আমাদের পেট ভরাতে চাইছো। জানি না আমরা তোমাদের এই আত্মত্যাগকে সার্থক করে তুলতে পারব কিনা?

শ্রীকৃষ্ণের কাছে অমূল্যদা ও শঙ্কুদার চিঠি পেলাম। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা অভিযান শেষ করে তোমাদের কাছে ফিরে আসব আর আমরা কখনও কোন বাড়তি ঝুঁকি নেব না।

তোমাদের চিঠি পড়তে পড়তে বেশ বুঝতে পারছিলাম, দূরে রয়েছো বলেই তোমরা

আমাদের জন্য এত দুশ্চিন্তা করছ। কোসাগাঁয়ে না থেকে তোমরা যদি মূল-শিবিরে থাকতে, তাহলে আমাদের জন্য তোমাদের দুশ্চিন্তা অনেক কম হত। সত্যই দুর্ভাগ্য আমাদের, নইলে একসঙ্গে অভিযানে এসে আমরা এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব কেন?

কিন্তু থাকগে, এসব কথা। পর্বতাভিযানে এসে কখনো পেছনে তাকাতে নেই, তাতে দুশ্চিন্তা বাড়ে, মনোবল নষ্ট হয়ে যায়। অতএব তোমাদের ভাবনা থামিয়ে চায়ের মগ হাতে নিয়ে আমরা আগামীকালের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনার পরে সাব্যস্ত হয়—আগামীকাল খুব সকালে বেরিয়ে পড়তে হবে। যে যতটা মাল বইতে পারি, তা নিয়ে রওনা হব দু-নম্বরে। এখানে শুধু একটা তাঁবু পড়ে থাকবে। পরশু পথ তৈরি করে অন্তত বিশ হাজার ফুট উঁচুতে তিন নম্বর শিবিরের জন্য একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। তরশুর মধ্যে তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এই দু-দিন আমরা শুকনো ফল, সুজি চাউ ও বিস্কুট এবং চা খেয়ে কাটিয়ে দেব। পরশু তিন নম্বরের পথ তৈরি হবার পরে দু-জন হ্যাপ এখানে এসে কিছু চাল ডাল আলু ও ডিম দু-নম্বরে নিয়ে যাবে।

পরশু এক নম্বরে বসে যে চিঠি শুরু করেছি, আজ দু-নম্বরে বসে তা শেষ করছি। গতকাল আমরা যে হ্যাপদের নিয়ে এসেছি, তাদের একজন এই চিঠি নিয়ে আজ মূল-শিবিরে নেমে যাবে, আগামীকাল কেউ কোসা গিয়ে এই চিঠি তোমাদের হাতে দেবে। আর তোমাদের কাছে চিঠি লেখা অর্থাৎ খবর পাঠাবার জন্য আমি আজ ওদের সঙ্গে তিন নম্বরের পথ খুঁজতে যাই নি।

গতকাল সকালে ভরপেট খিচুড়ি খেয়ে একসঙ্গে ব্রেক-ফাস্ট্ ও লাঞ্চ্ সেরে নেওয়া গেল। তারপরে তাঁবু গুটিয়ে যতটা সম্ভব মালপত্র রুকস্যাকে ভরে নিলাম। অবশেষে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে দু-নম্বরের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

বেশি মালপত্র বয়ে নিয়ে আসার জন্য গতকাল আমাদের দু-নম্বরের জায়গায় পৌঁছতে প্রায় দ্বিগুণ সময় লেগেছে। পরশু লেগেছিল চার ঘণ্টা আর কাল সওয়া সাত ঘণ্টা। সকাল আটটায় রওনা হয়ে সোয়া তিনটায় এখানে এসেছি। আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। পথের দৃশ্যকে অমন মনোরম মনে হয় নি। মাঝে মাঝে কেবল পেছনে তাকিয়ে ফেলে-আসা কোসা হিমবাহকে দেখেছি। ওরই হৃৎপিণ্ড গলিয়ে সৃষ্টি করা কোসানদীর তীরে বসে তোমরা যে আমাদেরি পথ চেয়ে রয়েচো।

কোসা হিমবাহটিকে কিন্তু ওপর থেকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল। হিমবাহ নয়, যেন চতুর্থীর চাঁদের মতো একটি স্ফটিকস্বচ্ছ বাঁকা রাজপথ। রাজপথই বটে, হিমালয়ের রাজাদের পথ। আমরা যে এখন তাঁদেরই উত্তরপুরুষ। হিমালয়ের অন্তরলোকের অস্থায়ী অধিশ্বর।

অতিরিক্ত মাল বইবার জন্য আমরা তখন খুবই ক্লান্ত। কিন্তু শেরপারা ক্লান্ত হতে জানে না। আমাদের বিশ্রাম নিতে বলে তারা তাঁবু খাটিয়ে মালপত্র গুছিয়ে চা বানিয়ে ফেলল।

বিস্কুট আর চানাচুর দিয়ে চা খেয়ে খানিকটা চাঙ্গা হওয়া গেল। রোদ নেই, তার ওপরে হিমেল হাওয়া বইছে। তবু তাঁবুতে না ঢুকে আমরা বাইরে বসে হাতি পর্বতকে দেখতে থাকলাম।

হ্যাঁ, এখন হাতি পর্বত প্রায় আমাদের ঢিল-ছোড়া দূরত্বে। মনে হচ্ছে কয়েকপা এগিয়ে হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যাবে। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে তার দক্ষিণগাত্রে শিখরে ওঠার পথ খুঁজতে থাকলাম।

বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও পথ খুঁজে পেলাম না। কেবল তার গা থেকে অবিরত নেমে আসা তুষারধসের বিকট শব্দে বার বার চমকে উঠতে হল।

এই শব্দে আতঙ্কিত হচ্ছি সেই মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই। কিন্তু এখান থেকে শব্দটা আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। শব্দটা শুনছি আর ভাবছি—আচ্ছা, কত তুষারধস সঞ্চিত রয়েছে হাতির বুকে?

দেখতে-দেখতে শুনতে-শুনতে আর ভাবতে-ভাবতে সময় বয়ে চলে, সময় যে বসে থাকতে জানে না। তাই আপন পথ বেয়ে দিবাকর পৌঁছে গেল পশ্চিমাচলের বুকে। তার শেষ আলোয় সফেদ হাতির পিঠটা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। অথচ ঘোড়ি রতবন ও নীলগিরি পর্বতের চূড়াগুলি কাঁচা হলুদের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে। আমরা অপলক নয়নে সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে থাকি।

কিন্তু গোধূলি যে গোষ্পদের মতই ক্ষণস্থায়ী। সহসা দিবাকর অদৃশ্য হল। মুহূর্তে নেমে আসে অন্ধকার। সেইসঙ্গে তীব্রতর হিমেল হাওয়া হাজির হয়। তার উৎপাতে আমরা বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে পড়ি।

সকালের বাড়তি খিচুড়ি সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। ঠিক ছিল পথে কোথাও লাঞ্চ সেরে নেব। কিন্তু সময়াভাবে খাওয়া হয়ে ওঠে নি। ভালই হয়েছে সেই খিচুড়ি গরম করেই ডিনার সেরে নিলাম। ডিনারের পরে অবশ্য 'হট্-ড্রিঙ্ক্স' পাওয়া গেল, আধমগ হরলিক্স।

হরলিক্স শেষ হতেই স্লিপিং ব্যাগের জঠরে প্রবেশ করি। ক্লান্ত দেহ, প্রচণ্ড শীত। ঘুম নেমে আসে দু-চোখের পাতায়।

অনিদ্রা উচ্চ-হিমালয়ের অন্যতম প্রধান রোগ। কিন্তু আমার তেমন কোন অলটিচ্যুড সিক্‌নেস আছে বলে জানি না। তবু হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। বোধকরি দুটি কারণে। একে আজ বড় সকাল সকাল শুয়ে পড়েছি, তার ওপরে পাশের কোন তাঁবু থেকে একটা গোঙানির শব্দ কানে আসছে। কার কি হল আবার?

মাথার ওপর থেকে স্লিপিং ব্যাগের 'হুড' খুলে নিয়ে কান পাতি।...

হ্যাঁ। একটা যন্ত্রণাকাতর গোঙানি।

পাশে শুয়ে থাকা জগদীশকে ডাকি। বেশ কয়েকটা ডাক দেবার পরে বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—কি হল আবার? এত রাতে ডাকাডাকি করছিস কেন?

সব শুনে উপদেশ দেয়—যা করবার কাল সকালে করা যাবে। এখন ঘুমো।

আমার মন সায় দেয় না। ভ্রাতৃত্ববোধ পর্বতাভিযানের প্রথম কথা। আমার কোন সহযাত্রী যন্ত্রণায় কাঁদছে, আর আমি ঘুমিয়ে থাকব! উঠে বসি। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করি—কৌন্ হ্যায়? ক্যায়া হুয়া?

বার তিনেক জিজ্ঞেস করার পরে শেরপাদের তাঁবু থেকে উত্তর আসে। দাওয়া উত্তর দেয়—গিয়ালজেনকা আঁখমে বহৎ দর্দ, পানি নিকালতে, অওর জ্যায়দা লাল ভি হো গিয়া।

সর্বনাশ। 'স্নো-ব্লাইন্ড' মানে তুষারান্ধ হয়ে গেল না তো! স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ মায়া

কাটাতেই হল, জগদীশের উপদেশও মানা গেল না। টর্চ জ্বেলে রুকস্যাক থেকে ওষুধ বের করি। তারপরে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসি। জুতো জোড়া টেনে এনে পা ঢোকাই। জুতো তো নয় তুষারের ডেলা। সারা শরীরে শীতের শিহরণ বয়ে যায়। তাড়াতাড়ি 'উইন্ড-চীটার' ও 'ফেদারজ্যাকেট' পরে নিয়ে বালাক্লাভা টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে।

বরফ ভেঙে এগিয়ে চলি শেরপাদের তাঁবুর দিকে। বেশ জোরে বাতাস বইছে। ঠাণ্ডায় হাত-পা যেন শরীর থেকে খসে পড়তে চাইছে।

ওদের তাঁবুর সামনে এসে হাঁক দিই—দরজা খোল।

দাওয়া চেন টেনে দেয়। আমি টর্চ জ্বেলে ভেতরে আসি। গিয়ালজেন শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওর চোখ দেখে চমকে উঠি। শুধু লাল নয় সেই সঙ্গে ফুলে উঠেছে।

অবিমৃষ্যকারিতা ও অবাধ্যতার পরিণাম। আজ বরফে পথ চলার সময় সে স্নো-গগল্‌স চোখে দেয় নি। বার বার বলার পরেও কথা শোনে নি।

কিন্তু সেকথা বলে এখন আর কি লাভ? ওয়াটার বট্‌ল থেকে জল নিয়ে ওর চোখ দুটো ভাল করে ধুইয়ে দিই। তারপরে ওষুধ দিই, ওষুধ খাওয়াই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর আর্তনাদ বন্ধ হয়ে যায়। সে আরাম বোধ করে।

'আই ড্রপ্‌'-এর শিশিটা দাওয়ার হাতে দিয়ে বলি—ঘড়ি দেখে নাও। এক ঘণ্টা বাদে বাদে দু-ফোঁটা করে ওর দু-চোখে দিয়ে যাবে। সকালে আবার খাবার ওষুধ দেব।

দাওয়া মাথা নাড়ে, আমি বেরিয়ে আসি ওদের তাঁবু থেকে। কিন্তু এ আমি কোথায় এলাম! তখন তাড়াতাড়ির জন্য দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে নি। এখন সামনে চোখ পড়তেই বিস্ময় ও আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছি। ভাবছি এ আমি কোথায় এলাম? রাত্রিশেষের রূপতীর্থ হিমালয়ের অপরূপ রূপ যে আমার জীবনকে ধন্য করে তুলল!

আমি শীতবোধ বিস্মৃত হয়েছি। অচল ও অনড় হয়ে শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছি সামনে, বহুদূরে। সেখানে সারা পুবদিগন্ত জুড়ে যেন হাজার হাজার 'কম্প্যাক্ট ফ্লুয়োরেসেন্ট ল্যাম্পস' জ্বলছে। মনে হচ্ছে নিয়ন আলোর চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল একটা সুদীর্ঘ আলোক-রেখা। তার স্নিগ্ধ কিরণসম্পাতে হাতি পর্বত সহ চারিদিকের সমস্ত শিখরগুলো আঁকাবাঁকা আলোর রেখায় পরিণত। ওরা যেন সম্পূর্ণ শৃঙ্গ নয়, শুধুই পাহাড়ের 'প্রোফাইল'।

কে ঐ আলোর উৎস? চন্দ্রিমা কিংবা অংশুমান? যিনিই হোন, তার মর্তে আগমনের এখনো কিছু দেরি রয়েছে। তিনি অদৃশ্যালোক থেকে হিমালয়ের অন্তরলোকে যাদুর মায়া বিস্তার করেছেন।

কতক্ষণ পরে জানি না, সহসা সম্বিত ফিরে আসে আমার। এই স্বর্গীয় রূপ স্বার্থপরের মতো একা উপভোগ করা উচিত নয়। তাই চিৎকার করে ডাকতে থাকি—শ্রীকৃষ্ণ বুবেন জগদীশ...তোরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়, দেখে যা কি অপরূপ দৃশ্য।

এই উচ্চতায় এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছু আছে বলে জানা নেই আমার। তবু আমার চিৎকারে শেষ পর্যন্ত ওদের বেরিয়ে আসতে হয় তাঁবু থেকে।

বলা বাহুল্য ওরা আমার ওপর খুবই রেখে গেছে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসেই ওদের সব রাগ জল হয়ে যায়। ওরাও আমারই মতো বিস্ময় ও আনন্দে হতবাক হয়ে

পড়ে। আমারই মতো পুলকিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আমরা সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে সেই মায়ার খেলা দেখতে থাকি।

কিন্তু তখনো বিস্ময়ের অনেক কিছুই বাকি ছিল। একটু বাদেই দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল। এবং তাও আরেক অবিশ্বাস্য আলোর মায়া। দিগন্তেই সেই নিয়ন-আলোর অতিকায় সরলরেখাটি দু-দিকে বেঁকে একটি অর্ধবৃত্তাকার বক্ররেখায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর তার পরেই তিনি উদিত হলেন। সূর্য নয়, চাঁদ—চন্দ্রকলা, চন্দ্রকান্তা, চন্দ্রপ্রভা।

তবে চাঁদ বলে আমরা যাঁকে জানি, ইনি তেমন নন। সারা দিগন্ত জুড়ে একখানি সুবিশাল বাঁকা চাঁদ। এত বড় চাঁদ আমরা এর আগে আর কখনো দেখি নি। চাঁদ যে এত বড় হতে পারে, তাও জানা ছিল না।

বিশাল বাঁকা চাঁদ আস্তে আস্তে আকাশে উঠতে শুরু করেছে। একটু একটু করে ওপরে উঠছে আর একটু একটু করে ছোট হচ্ছে। ওপরে আরো ওপরে, ছোট আরো ছোট। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আমাদের সুপরিচিত বাঁকাচাঁদে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

আমাদের বিস্ময়েব ঘোর কাটল। কেবল এই অবিশ্বাস্য রূপান্তর মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রইল।

॥ ষোল ॥

কোসাগাঁয়ে সার্ভে পার্টি
হিমালয়ে দুর্ঘটনা

গতকাল রাতে আমরা কেউ ঘুমোতে পারি নি। অনিদ্রা এক প্রকার 'হাই অলটিচ্যুড সিক্‌নেস' বা উচ্চতাজনিত রোগ।

কিন্তু উচ্চতা যা-ই হোক, শীতকালে যত বরফই পড়ুক, কোসাগাঁও একটি গ্রীষ্মকালীন গ্রাম। এসময়ে এখানে মানুষ বাস করে এবং আমরাও বেশ কয়েকদিন ধরে বসবাস করছি। অতএব আমাদের অনিদ্রা উচ্চতাজনিত রোগ নয়।

আমরা ঘুমোতে পারি নি কারণ গতকাল শুয়ে শুয়ে আমরা কেবল ওদের কথা ভেবেছি। ভেবেছি গৌতমের চিঠি আর শিব সিং-য়ের সংবাদের কথা। শিব সিং গৌতমের চিঠি নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে যা বলছে, তার সঙ্গে চিঠির কোন সম্পর্ক নেই। গৌতম লিখেছে, তারা তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করে হাতি শিখরে আরোহণের চেষ্টা করবে। আর শিব সিং বলছে তুষারধসের জন্য ওরা হাতি আরোহণের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে অনামি শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করছে। এবং আজই ঘোড়া ও মালবাহক পাঠিয়ে দিতে হবে।

তার ওপরে দু-জন শেরপার একজন তুষারান্ধ হয়ে গিয়েছে। একজন শেরপার সাহায্যে ওরা কি শিখরে আরোহণ করতে পারবে ?

এইসব নানা ভাবনার জন্য গতকাল রাতে ঘুমোতে পারি নি। তবু আজ সকাল ছ'টায় উঠতে হয়েছে। মালবাহকদের ঘুম ভাঙিয়ে বেড টি বানিয়েছি। সাড়ে ছ'টায় ঘোড়াওয়ালা এসেছে। তাকে চা-রুটি খাওয়ানো হয়েছে। মালবাহকরাও তৈরি হয়ে

নিয়েছে। সাতটা নাগাদ ওরা ওপরে রওনা হয়ে গেল।

ওরা চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদেই মস্তিরাম তার দল নিয়ে হাজির হয়। ওরা মিঠা নিয়ে পাঠশালায় চলে যায়। পাঠশালা ছুটি হলে আবার আসবে। তখনো মিঠা দিতে হবে এবং তখন ওরা বেশ কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গদান করবে।

ইতিমধ্যে মণ্ডপের উঠানে রোদ এসে গেছে। আমরা বাইরে এসে বসি। আরাম লাগছে। আজ আর করবার মতো কোন কাজও নেই। সুতরাং এখন নির্ভেজাল আড্ডা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আড্ডায় মন বসছে না। গতরাতের চিন্তাগুলো এখনো মাথার ভেতরে কিলবিল করছে। গৌতমের চিঠি আর শিব সিং-য়ের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। হাতি পর্বতাভিযান কি পরিত্যক্ত? ওরা কি আজ অনামি শৃঙ্গে আরোহণ করছে?

প্রশ্ন আছে, আরও অনেক প্রশ্ন। অথচ উত্তর জানা নেই। অতএব শুধুই যন্ত্রণা। নীরবে নিরুত্তরের যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি।

কিন্তু ওঁরা কারা? ঐ যে কোসাপুলের দিক থেকে আসছেন? জন পাঁচেক মানুষ আর দুটি মালবোঝাই ঘোড়া। ঘোড়াওয়ালা ছাড়া সবারই পিঠে রুকস্যাক হাতে আইস স্যাক্স। মাথায় টুপি, পরনে উইন্ড-চিটার, পায়ে ট্রেকিং-শু।

কোন পর্বতাভিযাত্রী দল বোধকরি। কিন্তু অক্টোবরের শেষ। এখন তো নতুন করে পর্বতাভিযান, এমন কি পদযাত্রা আরম্ভ করার সময় নেই।

ওরা আসেন। আমরা উঠে দাঁড়াই। করমর্দন করি। বসতে বলি।

বসার পরে আলাপ শুরু হয়। এঁরা সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া-র একদল সমীক্ষক। একজন সার্ভেয়ার, দু-জন সহকারী, একজন কুক-কাম্-বেয়ারা এবং ঘোড়াওয়ালা। দেরাদুন থেকে এঁরা সোজা মালারি চলে গিয়েছিলেন। সে অঞ্চলে সমীক্ষা শেষ করে আজ সকালের বাস ধরে এখানে এসেছেন। এই গাঁয়ের অদূরে শিবির স্থাপন করে কয়েকদিন চারিপাশের অঞ্চলে কিছু সমীক্ষা চালাবেন। তারপরে ফিরে যাবেন। আগামী গ্রীষ্মে আবার এখানে আসবেন। কোসা নদী ও হিমবাহ অঞ্চলে বিস্তৃত সমীক্ষা চালিয়ে মানচিত্র অঙ্কন করবেন।

কথায় কথায় সার্ভেয়ার শ্রীকাপুর বলেন—হিমালয়ের হিমবাহ অঞ্চল সতত পরিবর্তনশীল। এ অঞ্চলে এখন যাতায়াতের এত সুবিধে হয়েছে, তবু বিগত বিশ বছরে কোন সার্ভে পার্টি আসে নি। এতদিন বাদে আমরা সে সুযোগ পেয়েছি। দেখা যাক, দেবতাত্মা হিমালয় আমাদের কতখানি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেন।

এঁরা এখন এই গ্রামের অতিথি। কিন্তু এখন এখানে কোন গ্রামের মানুষ নেই। অতএব আমাদেরই অতিথিসেবার দায়িত্ব নিতে হয়। ওঁদের চা-বিস্কুট খাওয়াই। তারপরে পরামর্শ দিই—আপনারা উঠানের ওপাশে ঐ ফাঁকা জমিটায় তাঁবু খাটিয়ে রান্নার আয়োজন করুন। বিকেলে প্রধানজি এসে বাকি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

—আমাদের কোন বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নেই। এখন আর রান্নার হাঙ্গামাও করব না। আমরা মালারি থেকে ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। তাঁবু টাঙানো হলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে গ্রামটিকে সার্ভে করতে বেরিয়ে পড়ব। বিকেলে ফিরে এসে একসঙ্গে লাঞ্চ-কাম্-ডিনার সেরে নেবো। আগামীকাল সকালেই এখানকার পাট উঠিয়ে ওপরে চলে যাবো।

অভিযাত্রী না হলেও এরা হিমালয়পথিক তো বটেই। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়, তিন থাকতে হিমালয় নয়। কিন্তু এঁরা সরকারি কর্ম-চারি! এঁদের নাকি কোন সততা নেই, আন্তরিকতা এবং 'ওয়ার্ক কালচার' নেই!

কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর তো ওরা ফিরে আসার আগে পাওয়া যাবে না। তাহলে এখন আমরা কি করব ?

—কিছুই নয়। নেতা বলে ওঠে—এবেলা আমাদের কোন কাজ নেই। সময় না কাটলে তাস নিয়ে বসতে পারো।

—সেকি ! গোরা বিস্মিত। বলে—রান্না করতে হবে না ?

—হবে। তবে সামান্য। সকালে শুধু চা সেই সঙ্গে চিড়েভাজা ও চানাচুর দিয়ে ব্রেকফাস্ট। দুপুরে ডাল-ভাত ও আলুসিদ্ধের লাঞ্চ্।

একবার থামে নেতা। তারপরে আবার বলে—আজ ডাক্তার রোগী দেখতে বেরুচ্ছে না। সকাল সকাল স্নান সেরে এসে লাঞ্চ করে নিতে হবে। গোরা তুমি বেলা একটার মধ্যে কিচেন ছেড়ে দেবে। অর্ধেন্দুদা ক্যাম্প্ ফায়ার-এর রান্না শুরু করে দেবেন। তপন রঞ্জু গোরা ও বিনয় তাঁকে সাহায্য করবে।

বেলা বারোটার আগেই ঘাটে চলি। স্নান সেরে জল নিয়ে ফিরে আসি আস্তানায়। কিন্তু ওখানে কে ? ঐ পাথরের বেঞ্চির এক কোণে, মাথা নিচু করে বসে আছে। গ্রামবাসীরা কেউ কি ? না। লোকটির মাথায় সান্-হ্যাট, গায়ে উইন্ড-প্রুফ জ্যাকেট, পরনে ক্লাইম্বিং ট্রাউজার, পায়ে মাউন্টেনিয়ারিং বুট। সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার কেউ হতে পারেন। কিন্তু না। তাঁরা তো সবে আজ সকালে ওপরে চলে গেলেন। তাছাড়া তাঁদের কারও পায়ে তো মাউন্টেনিয়ারিং বুট থাকবার কথা নয়। তাহলে কি আমাদেরই কেউ ? কে ?

—কৌন হ্যাঁয় ? নেতা জিজ্ঞেস করে।

—ম্যঁয় হুঁ সাব্। আমাদের শেরপা গিয়ালজেন !

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে চোখদুটি দেখে চমকে উঠি। যেমন টকটকে লাল তেমনি ফুলে ঢোল। মনে হচ্ছে এখুনি কোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

ডাক্তার বলে ওঠে—স্নো ব্লাইন্ডনেস।

তারপরেই দাওয়াকে ধমক লাগায়—কালো চশমা খুলে রেখেছো কেন ?

—জি সাব্। সে হাতের চশমাটা তাড়াতাড়ি চোখে দেয়। হেসে বলি—গৌতমের চিঠিতে পড়িস নি, চশমা না পরার জন্যই ওর এই হাল।

ডাক্তার মাথা নাড়ে। তারপরে নেতাকে জিজ্ঞেস করে—আমি ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করে দিই।

নেতা মাথা নাড়ে। তারপরে জিজ্ঞেস করে—কিন্তু তুমি খাবে না ?

—খাবো বৈকি ! ডাক্তার উত্তর দেয়। বলে—আপনারা বসুন, আমি আসছি।

—গিয়ালজেনও তো খাবে।

—হ্যাঁ, আমি ওকে নিয়েই আসছি।

গিয়ালজেন উঠে দাঁড়ায়। নেতা তাকে জিজ্ঞেস করে—গিয়ালজেন, তুমকো কৌন্ লে আয়া ?

—সায়ন সিং।

—সায়ন কিধর ?

—ইধর সাব্। সায়ন কিচেন থেকে সাড়া দেয়।

নেতা আবার জিজ্ঞেস করে—উপারকা হাল চাল ? সব আদমি ঠিক হ্যায় ?

—জি সাব্। ক্লাইম্ব্ হো গিয়া।

—হো গিয়া !

—জি।

আমরা উত্তেজিত, আমরা পুলকিত। দাওয়া নিজেও বোধকরি বিস্মৃত হয় তার চোখের যন্ত্রণা। সে বলতে থাকে—গতকাল ভোর পাঁচটায় শিবির থেকে বেরিয়ে বেলা সাড়ে এগারোটায় আমরা শিখরে পৌঁছই।

—কে কে শিখরে আরোহণ করেছে ?

—জগদীশসাব, বুবেনসাব, দো হ্যাপ, দাওয়া অওর ম্যঁায়।

—তুমি ! তুমি এই চোখ নিয়ে ওদের সঙ্গে গিয়েছো !

—জি সাব্ !

—কাজটা ঠিক করো নি। ডাক্তার আবার ধমক লাগায়।

দাওয়া চুপ করে থাকে। আমরা আর কেউ কিন্তু ওকে কিছুই বলি না। কারণ আমরা জানি শিখরের অত কাছের থেকে কোন পর্বতারোহীর পক্ষে শিখরে আরোহণ না করে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। চোখের জ্বালার চেয়ে সে জ্বালা অনেক বেশি কষ্টকর বলেই গিয়ালজেন শিখরে আরোহণ করেছে।

—তা তোমরা কোন শিখরে আরোহণ করেছো ? নেতা সরাসরি প্রশ্নটা করে বসে।

গিয়ালজেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—কেন, অনামি শিখরে।

—সেটা কোথায় ?

—হাতি পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম-শিখরশিরার উপকণ্ঠে। গৌতমসাব বলেছেন, উচ্চতা ২০,৩০০ফুট।

—তোমরা যেটায় আরোহণ করেছো সেটা সত্যই একটা Peak, হাতি পর্বতের কোন Hump নয় ?

—নহী সাব্। 'পিক্', জরুর কোই পিক।

গিয়ালজেন বেশ কয়েকটি শিখরে আরোহণ করেছে। সে একজন অভিজ্ঞ শেরপা। তার কথা অবিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু মানচিত্রে অনামি শিখরটা নেই কেন ?

তাহলেও এ বিষয়ে এখন ওকে আর কিছু বলা সমীচীন হবে না। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা, তোমরা হাতি আরোহণের চেষ্টা ছেড়ে দিলে কেন ?

—এ দিক থেকে কোন নিরাপদ পথ পেলাম না। যে পথটা দিয়ে যাওয়া যেতো, সেটা Avalanche Zone-এর তলা দিয়ে এবং সেখানে লাগাতার তুষারধস নেমে আসছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার-ধস।

—হাতি শিখরের আর কোন পথ নেই ?

—আছে নিশ্চয়ই। নইলে তেষট্টি সালে সোনাম গিয়াৎসো আরোহণ করলেন কেমন করে ? কিন্তু আমরা এদিক থেকে তেমন কোন পথ খুঁজে পেলাম না। পাহাড়টার অপর দিক থেকে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে পথের হদিশ করতে হলে আমাদের আবার ষোল হাজার ফুটে নেমে গিয়ে Traverse করে ওপারে গিয়ে পথের খোঁজ করতে হত। আবহাওয়া ভাল ছিল, পথ পেলে হয়তো আরোহণ করা যেত। কিন্তু তার জন্য আরও অন্তত দিনদশেক সময়ের দরকার ছিল।

—আরও দশদিন ! বিনয় বলে ওঠে।

—জি সাব্। গিয়ালজেন মাথা নাড়ে।

মাঝখান থেকে শঙ্কর জিজ্ঞেস করে—বাকি মেম্বারলোগ সব কব্ ওয়াপস্ আয়গা ?

—আজ। সাম তক্ আ যায়েঙ্গে।

ব্যাস ! আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। ডাক্তার ওকে নিয়ে ঘরে চলে যায়। রঞ্জু তার সঙ্গী হয়। আমরা খেতে বসে যাই।

গিয়ালজেনের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ওকে নিয়ে ডাক্তার আর রঞ্জুও খেয়ে নেয়। তারপরেই শুরু হয়ে যায় অভিযাত্রীদের সম্বর্ধনার আয়োজন, ক্যাম্প্-ফায়ারের ব্যবস্থা।

গ্রামবাসীদের সহায়তায় অন্য সব ব্যবস্থাই হয়ে গিয়েছে। গোরা, রঞ্জু, বিনয় ও তপনকে নিয়ে অর্ধেন্দু রান্না শুরু করে দিল। এখন শুধু মিষ্টান্ন আর আলুর দম রান্না হবে। ঘি-ভাত চড়বে সন্ধ্যার পরে, ক্যাম্প-ফায়ার শুরু হবার পরে। কারণ গরমভাত না হলে খাওয়াটা জমবে না। তাছাড়া ক্যাম্প্-ফায়ার চলার সময়ে চায়ের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

এক আয়োজন সম্পূর্ণ হবার আগেই শুরু হল আরেক আয়োজন। পাহাড়ের পাদদেশে অভিযাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে মাল্যভূষিত করা, এবং শোভাযাত্রা করে গ্রামে নিয়ে আসা।

অবশ্য এ ব্যাপারেও আমাদের কিছুই করতে হবে না। হরি সিং, মোতিরাম ও মাস্টারজি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। মাস্টারজির স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযাত্রীদের মালা দেবে, তারাই মালা গেঁথে আনবে এবং শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকবে। প্রধানজিও যাবেন আমাদের সঙ্গে।

অতএব এবারে শুধুই প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা তো করছি সেই সেদিন থেকেই, যেদিন আমাদের এখানে রেখে ওরা ওপরে চলে গেল। কিন্তু এতদিনের প্রতীক্ষা আর আজকের প্রতীক্ষার মাঝে পার্থক্য প্রচুর। আজকের প্রতীক্ষা এতদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাবে।

আমি তাই শুতে পারছি না, বসতে পারছি না, দু-দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না। কেবল মণ্ডপের উঠানে পায়চারি করছি আর তাকিয়ে তাকিয়ে কোসাগাঁয়ের পথটিকে দেখছি। এই পথের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের অনেক স্মৃতি। প্রথম দিন গ্রামবাসীরা এই পথ অবরোধ করেছিলেন। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে আসাবার পরে এই পথের ওপরে দাঁড়িয়েই তাঁরা আমাদের সাদর স্বাগত জানিয়েছেন। এই পথ দিয়েই আমার পর্বতারোহী ভাইরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে চলে গিয়েছে আবার এই পথ ধরেই তারা আজ জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে আমার কাছে ফিরে আসছে। এ পথ আমার বেদনার সড়ক, আনন্দের সরণি।

তাই বার বার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি এই পথের ধারে, আবার ফিরে যাচ্ছি ঘরে। আমার অস্থিরতা দেখে ওরা মুখ টিপে হাসছে। তবু আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না।

না পেরে শেষ পর্যন্ত শিব সিংকে চা বানাতে বলি। শিব সিং একটু হেসে বলে—সবে চারটে বেজেছে, এখনো যে ওনাদের ফিরে আসতে অনেক বাকি।

কে ওকে এ খবর দিয়েছে, জানা নেই আমার। কিন্তু সেকথা জিজ্ঞেস না করে ধমক দিয়ে বলি—যা বলছি, তাই করো ! স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপাও। গরম জল দিয়ে বড় ফ্লাস্কটা ধুয়ে নাও। পুরো এক ফ্লাস্ক চা নিয়ে ওপরে যেতে হবে।

শিব আর কোন আপত্তি করতে সাহস পায় না। সে ঘাড় নেড়ে স্টোভ ধরাতে লেগে যায়। আমি টিন থেকে বিস্কুট বের করে একটা থলিতে ভরতে থাকি।

নেতা বলে—এত আগে গিয়ে তো মাঠের ধারে বসে থাকতে হবে।

—না, না। বসব কেন ? আমরা এগিয়ে যাবো। তবে আমার মন বলছে, বেশিদূর এগোতে হবে না, ওরা সন্ধ্যার আগেই চলে আসবে।

—বেশ যাও। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর কে যাচ্ছে ?

—ভটচাজ শৈলেশ শঙ্কর আর সায়ন। হরি সিং আর মোতিরাম বলেছে তাদের ডেকে নিয়ে যেতে।

—বেশ যাও। সবাই আইস এক্স আর টর্চ সঙ্গে নিও।

কোসাগাঁয়ের সেই প্রিয় পথটি ধরে হাঁটতে শুরু করি। গাঁয়ের ঘর-বাড়ি ছাড়িয়ে আসি। ক্ষেত পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছই। আগে ঠিক হয়েছিল, আমরা এখানেই প্রতীক্ষা করব। কিন্তু না। আমার আর প্রতীক্ষা ভাল লাগছে না। আমার মন এখন প্রতীক্ষার অবসান চাইছে।

তাই মনের তাগিদে চড়াই ভাঙতে শুরু করি। কঠিন চড়াই। তবু কোন কষ্ট হচ্ছে না। প্রতীক্ষা যে এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর।

না, আমার মন মিথ্যে বলে নি। বোধকরি আধঘণ্টাও চড়াই ভাঙি নি। সহসা শৈলেশ চিৎকার করে উঠল—ঐ তো নীল উইন্ডপ্রুফ গায়ে কেউ এদিকে আসছে!

হ্যাঁ, আসছে! সত্যিই আসছে। তবে শুধু নীল নয়, হলুদ বেগুনি কমলা— অনেক রঙ। একজন নয়, একের পর এক—অনেকে। ওরা সবাই সারি বেঁধে নেমে আসছে, সেই সবু বনময় উৎরাই পথ পার হয়ে।

এসে গেছে! আমার দামাল ভাইরা এসে গিয়েছে! নিরাপদে ফিরে এসেছে আমার কাছে। আমি একে একে ওদের বুকে টেনে নিই। ওদের চোখের জলে আমার বুক ভেসে যায় আর আমার আনন্দাশ্রু ওদের পিঠ ভিজিয়ে দেয়।

সহসা সম্বিত ফিরে আসে। মনে পড়ে আমার। বলি—অনেকটা পথ হেঁটে এসেছিস। এখানে বসে একটু জিরিয়ে নে। চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছি।

খুশি হয়ে ওরা পথের ওপরেই বসে পড়ে। তারপরে সুর করে সমস্বরে গেয়ে ওঠে—"এমন ম্যানেজার কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সে আমাদের শঙ্কুদা, আমাদেবি অন্তর্যামী..."

—এই কি হচ্ছে। আমি ওদের গান থামিয়ে দিই। বলি তাড়াতাড়ি চা খেয়ে গাঁয়ে চল, সবাই তোদের পথ চেয়ে বসে রয়েছে।

না, কেউ বোধকরি পথ চেয়ে বসে নেই, সবাই পথে বেরিয়ে এসেছে। খবর সর্বত্রই বাতাসে ভেসে বেড়ায়। আমরা পাহাড় থেকে নেমে এসেই দেখতে পাই ওদের। আমাদের নেতা থেকে গাঁয়ের মোড়ল, নারী-পুরুষ তরুণ-তরুণী কিশোর-কিশোরী ও শিশুর দল। সবাই সেদিনের মতো পথের দু-পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের জাগ্রত যৌবনের প্রতীকদের সাদর অভিনন্দন জানায়।

ওরা তাদের মালা পরিয়ে কপালে চন্দনের টিকা এঁকে দেয়। ছেলেরা জয়ধ্বনি করে, মেয়েরা শাঁক বাজায়। আর ছোটরা কাঁসর নিয়ে এসেছে। ঘণ্টাধ্বনি সহ শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে।

ফিরে আসি মণ্ডপের সামনে। ততক্ষণে গোধূলি নেমে এসেছে কোসাগাঁয়ের বুকে। পাশের কালো পাহাড় ধূসর হতে শুরু করেছে। গোরা পেট্রোম্যাক্স জ্বালায়।

নারী ও শিশুর দল ফিরে যায় ঘরে। মোড়ল সহ কয়েকজন বৃদ্ধ ও যুবক শুধু রয়ে গেলেন। ক্যাম্প্ ফায়ার-এর সময় সবাই আবার আসবে এখানে।

উপস্থিত গ্রামবাসীদের সামনেই হিন্দি ও বাংলা মিশিয়ে জগদীশ তাদের চূড়ান্ত সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়—

চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য সহনেতা আমাকে দলপতি নির্বাচিত করে। আমার দলে ছিল বুবেন, শেরপা দাওয়া লামা ও গিয়ালজেন এবং হ্যাপ রঘুবীর সিং।

আগের রাতে আমরা একেবারে ঘুমোতে পারি নি। একে তো শিখর বিজয়ের উত্তেজনা, তার ওপরে তুষারধসের প্রচণ্ড গর্জন। সারা রাত হাতি পর্বত থেকে তুষারধস নেমে আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে দিয়েছে।

তবু ভোর চারটে থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। ঠিক পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়লাম শিবির থেকে। সঙ্গে নিলাম একটা বুকস্যাক বোঝাই আইস এবং রক্ পিটনস্ ক্যারাবিনা ও জুমার ইত্যাদি, দুটো ক্লাইম্বিং রোপ, পাঁচ কয়েল ফিক্সড রোপ আর কিছু খাবার। খাবার বলতে শুধুই ফ্রুট-জুস আর বিস্কুট।

শিবির থেকে বের হবার পরেই পথ ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে বোঝাই। তুলনায় বরফ ছিল সামান্যই। উচ্চ-হিমালয়ে বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে পথচলা যেমন কষ্টকর, তেমনি সময়সাপেক্ষ। ঐ পাথুরে জায়গাটা পার হতেই আমাদের একঘণ্টা লেগে গেল। ততক্ষণে রাতের কুয়াশা কেটে গিয়ে দিনের ঝক্‌ঝকে আলো নেমে এসেছে চারিদিকে।

ডানদিকে অর্থাৎ কোসা উপত্যকার দিকে একটা উঁচু পাথুরে দেওয়াল আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বাঁদিকটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমরা অনতিদূরে কয়েকটি তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলাম।

পাথুরে জায়গাটা পার হয়েই চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। এবং জোরে জোরে পা ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা তুষারাবৃত গিরিশিরার সামনে এসে উপস্থিত হলাম। কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরোহণ করতে থাকি।

অচিরেই চলার বেগ কমিয়ে দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিতে হল। কারণ পথটা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে ও সাবধানে সেই বিপদসঙ্কুল পথ পার হয়ে পৌঁছলাম একটা খাড়া বরফের দেওয়ালের সামনে। দেওয়ালটা ষাট থেকে সত্তর ডিগ্রি কোণ করে দাঁড়িয়ে। অতএব 'ফিক্সড রোপ' লাগাবার জন্য থামতে হল আমাদের।

দু-ঘণ্টা ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে তিন-কয়েল দড়ি লাগানো গেল। আমাদের ভাগ্য ভাল। আবহাওয়া ছিল চমৎকার।

ফিক্সড রোপ লাগাবার পরে আবার শুরু হল আরোহণ। আরোহণ আর আরোহণ। ওপরে আরও ওপরে। কাজটা ছিল খুবই কঠিন। কারণ তুষারমিশ্রিত পিচ্ছিল পাথুরে পথ পার হতে হচ্ছিল। তবু আমরা সাবধানে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে থাকলাম। ওপরে আরো ওপরে।

অবশেষে শিখরশিরা স্পর্শ করতে পারলাম। একে একে উঠে এলাম সবাই। এ গিরিশিরাটি আগের মতো বিপজ্জনক নয়, তবে পথটা কষ্টকর। কারণ সর্বত্রই প্রচুর নরম

তুষার। সেই বরফের কাদা ভেঙে পথ চলতে হচ্ছিল। প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে

তাহলেও আমরা হাল ছেড়ে দিই নি, একবারও চলা থামাই নি। শরীরের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ করে দৃঢ় পদক্ষেপে চলেছি এগিয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এইবার বুঝি জীবনীশক্তিটুকু ফুরিয়ে গেল। আর তখুনি তাকিয়ে চারিদিক দেখে নিয়েছি একবার। দেখেছি তুষারমৌলি হিমালয়ের মনোমুগ্ধকর রূপ। ফুরিয়ে আসা প্রাণশক্তি ফিরে এসেছে দেহে, মন ভরে উঠেছে আনন্দে। সকল ক্লান্তির অবসান হয়েছে। আবার চলেছি এগিয়ে।

চলতে চলতে কেবলি মনে পড়েছে তোমাদের কথা। হাতি পর্বত অভিযানে এসেও তোমরা হাতি পর্বতকে দেখতে পেলে না। মনে পড়েছে শের সিং গৌতম আর শ্রীকৃষ্ণের কথা। নিচের শিবিরে তারা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে। নিজেরা শিখরজয়ের কৃতিত্ব কুক্ষিগত করতে চায় নি। মনে পড়ছিল আমাদের অযোগ্যতার কথাও। হাতি পর্বতকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও আমরা তার শিখরসেবা করতে পারলাম না।

এসব ভাবনা কিন্তু আমাদের আরোহণের বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। শরীর ও মনের সকল অবসন্নতা ও দুশ্চিন্তাকে অবহেলা করে আমরা চলেছি এগিয়ে। আমরা পথ চলেছি, সংগ্রাম করেছি, চূড়ান্ত সংগ্রাম।

এইভাবে সাড়ে ছ'ঘণ্টা সংগ্রামের পরে হিমালয় আমাদের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। বেলা সাড়ে এগারোটার সময় আমরা অনামি শিখরে আরোহণ করলাম।

শিখরদেবতাকে প্রণাম করে আমরা আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম, আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। তারপরে আমাদের সাফল্যে তোমাদের ত্যাগের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে শুরু করলাম শিখরপূজা।

প্রথমে জাতীয় পতাকা, তারপরে আমাদের ইন্‌স্টিটিউটের পতাকা প্রোথিত করি। নারকেল ও চকোলেট অঞ্জলি দিয়ে পূজা শেষ হয়। আমরা সবাই তখন আনন্দিত। কিন্তু রুবেনের আনন্দ যেন আর ধরে না। কারণ মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নেবার পরে এটাই তার প্রথম শিখর।

পূজা শেষ হবার পরে চারিদিক ভাল করে দেখে নেবার আগেই সহসা কোথা থেকে যেন দলে দলে মেঘ ছুটে এসে আমাদের দূরদৃষ্টিকে বন্দী করে ফেলল। চারিদিকের সুনীল আকাশ আর সোনালী শৃঙ্গগুলি মুছে গেল চোখের সামনে। এমনকি পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির ফটো নেবার সময় পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

আমরা অপেক্ষা করি। সেই প্রবল হিমেল হাওয়া আর হাড় কাঁপানো শীতকে উপেক্ষা করে বসে থাকি। কিন্তু মেঘদল অচল ও অনড়। তারা হৃদয়হীন প্রহরীর মতো বন্দী করে রাখে আমাদের। বোধকরি তাদের প্রিয় পর্বতশিখরকে মনুষ্য-পদলাঞ্ছিত করার অপরাধে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে সেই দুঃসহ শাস্তিভোগের পরে আমরা নিরুপায় হয়ে অবরোহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

যে পথ আরোহণ করতে সাড়ে ছ'ঘণ্টা প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছে, সেই একই পথ নেমে আসতে মাত্র দু-ঘণ্টা সময় লাগল। এবং তাতে সামান্যই পরিশ্রম হল।

বাইনোকুলার চোখে দিয়ে গৌতম ও শ্রীকৃষ্ণ সারাক্ষণ আমাদের দিকে নজর

রেখেছিল। এবারে তারা ছুটে আসে কাছে, আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে। সতীর্থদের উষ্ণ আলিঙ্গনে শরীরের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

চা ও বিস্কুট নিয়ে শের সিং বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে। করমর্দন করে সে আমাদের দিকে গরম চায়ের মগ বাড়িয়ে ধরে।

গরম চা ঠোঁটে ঠেকিয়ে আবার অনামি শিখরের দিকে তাকাই। বিস্মিত হতে হয়। ইতিমধ্যে কখন যেন সে তার মেঘের ওড়না সরিয়ে রেখে মুখখানিতে মায়ার হাসি তুলেছে ফুটিয়ে। চারিপাশের শৃঙ্গগুলিও তার সঙ্গে আবার তুষারমৌলি রূপ ধারণ করেছে।

॥ আঠারো ॥

কোসাগাঁয়ে ক্যাম্প-ফায়ার
কোসা থেকে বিদায়
ঘরের পথে

সেও ছিল এক মঙ্গলবার, আজ আরেক মঙ্গলবার। সেদিন রাতে দেরাদুন এক্সপ্রেসে রওনা হয়েছিলাম ঋষিকেশের পথে আর আজ মালারির বাসে কোসাগাঁও থেকে ফিরে যাবো জোশীমঠ। ইতিমধ্যে তিনটি মঙ্গলবার এসেছে ও চলে গিয়েছে। তাদের কথা আলাদা করে মনে করতে পারি না, কিন্তু তারা সবাই মিলে আমার মানস-পটে এঁকে রেখেছে বহু ছবি। তার অনেক কিছুই মুছে যাবার মতো নয়। তারা আমার মনের মণিকোঠায় অবিস্মরণীয় স্মৃতি রূপে অক্ষয় হয়ে রইবে। যেমন দুর্যোগে মত্ত ভয়ঙ্কর হিমালয়ের নিষ্ঠুর রূপ, শান্ত-সুন্দর পরম-পবিত্র হিমালয়ের আনন্দমুখর স্বর্গীয় রূপ আর সহজ সরল ও অতিথিপরায়ণ হিমালয়বাসীদের মধুর স্মৃতি।

এবং এই স্মৃতির ভাণ্ডারে গতকাল রাতের ক্যাম্প্‌-ফাযারের স্মৃতিও অক্ষয় হয়ে রইবে। গতকাল সন্ধ্যার কিছু পরে মণ্ডপের উঠোনে আমাদের ক্যাম্প-ফায়ার খুবই জমে উঠেছিল। গ্রামের ছেলে-মেয়েরাই আগুন জ্বালিয়েছে এবং সারাক্ষণ সে আগুনের পরিচর্যা করেছে। আগুনের পরশমণি প্রাণে ছুঁইয়ে আমরা আমাদের দেহগুলিকে দেবালয়ের প্রদীপ করে তুলতে চেয়েছি।

কোসার মানুষরাও পেছিয়ে থাকে নি। বরং তারাই বেশি আসর মাতিয়েছে। ওরা গান গেয়েছে, হিন্দি ও গাড়োয়ালী গান, সেইসঙ্গে নাচ আর বাজনা—রঞ্জুর মাউথ অরগ্যান, মোতিরামের ঢোল এবং মস্তিরামদের কাঁসর ও ঘণ্টা। আমরা সেসব নাচ-গান ও বাজনা ক্যামেরা ও টেপ-রেকর্ডারে বন্দী করে রেখেছি।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলেছে সেই জমাট মজলিস। বলা বাহুল্য আমরাও অংশ নিয়েছি এবং হিন্দির সঙ্গে কিছু বাংলাগানও গাওয়া হয়েছে। ওরা ভাষা বোঝে নি, কিন্তু মাথা নেড়েছে এবং মস্তিরামের দল যথাসাধ্য সঙ্গতও করেছে।

রাত বারোটার কিছু পরে যখন আনন্দাসর শান্ত হল, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

অবাক হয়েছি—একি সত্যই হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে কোসাগাঁও, যেখানে সন্ধ্যের পরেই সবাই রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেয়!

আসর শান্ত হবার পরে উপস্থিত গ্রামবাসীদের সারি বেঁধে বসে পড়ার অনুরোধ করেছি। খাবার পরিবেশন করা হয়েছে—গরম গরম ঘি-ভাতের সঙ্গে আলুর দম ও মিষ্টান্ন।

আমরা ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত কেবল কয়েকজন বৃদ্ধ ও যুবক উপস্থিত থাকবে। বড়জোর তাদের সংখ্যা হবে জনবিশেক। কিন্তু শেষ অবধি প্রায় পঞ্চাশজনকে খাবার পরিবেশন করতে হল। খুবই আনন্দের ব্যাপার। কেবল অর্ধেন্দুর রান্না কেমন হয়েছে, তা চেখে দেখার সুযোগ হল না, সব খাবারটাই অতিথি-সেবায় লেগে গেল।

অতিথিরা যখন বিদায় নিলেন, তখন রাত প্রায় একটা। অতরাতে রান্না করা সম্ভব ছিল না, তাই চিনি মিশিয়ে কাঁচা চিঁড়ে ও ছাতু আর ভাঙা বিস্কুট দিয়ে জঠরাগ্নির জ্বালা নেবাতে হল। কিন্তু সেজন্য আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে নি। বরং সেই আনন্দময় মিলনোৎসবের সুখস্মৃতি সুখনিদ্রা নিয়ে এসেছে। এবং এমন মধুময় রাত আমার জীবনে খুব বেশি আসে নি।

কিন্তু থাক্‌গে কালকের কথা, এখন আজকের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আজ মঙ্গলবার। আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি কোসাগাঁও আর তার সহজ সরল প্রাণময় মানুষগুলোর কাছ থেকে। আশ্চর্য এদের ভালোবাসা! কাল অত করে বুঝিয়ে বলার পরেও আজ সকালে বালক মস্তিরাম থেকে প্রবীণ মোড়ল পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকেই একযোগে অনুরোধ করছে—আজ মত যাইয়েগা সাব্! কল যাইয়ে।

অথচ আমাদের পক্ষে এ অনুরোধ রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমনিতেই কয়েকদিন দেরি হয়ে গেছে, তার ওপরে স্থির হয়েছে আমরা একদিনের জন্য বদ্রীনাথ যাবো। আজ রাতটা জোশীমঠে কাটিয়ে আগামীকাল বদ্রীবিশালজিকে দর্শন করব। কালকের রাত বদ্রীনাথে কাটিয়ে পরশু সকালে সোজা ঋষিকেশ রওনা হব। অর্থাৎ তরশুর আগে কলকাতা রওনা হতে পারছি না।

তাছাড়া আজকের দিনটা কোসাগাঁয়ে থেকে গেলেও সমস্যার সমাধান হবে না। কাল সকালেও সজল চোখে বিদায় বেলায় এরা এমনিভাবেই বলে উঠবে—'যেতে নাহি দিব।'

অতএব জীবনের রঙ্গমঞ্চে বিষাদ-অঙ্কটি আজই মঞ্চস্থ করে নেওয়া যাক। তাতে অন্তত উভয়পক্ষেরই একটা দিনের চোখের জল বেঁচে যাবে।

সুতরাং হৃদয়বান কোসাবাসীদের কাছ থেকে আজ সত্যি সত্যি বিদায় নিতে হল। ওঁরা অনেকেই আমাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সেই সমতলের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এলো। অর্থাৎ তেমনি শোভাযাত্রা করে বিদায় জানালো। এক হাতে চোখ মুছতে মুছতে অপর হাতখানি মাথার ওপর তুলে নাড়তে থাকল। আমরা সজল চোখে হাত নাড়তে নাড়তে ধৌলির ধারে উৎরাই পথ ভাঙতে শুরু করলাম। আর সেই সঙ্গে ভাবতে থাকলাম, এই মায়াময় মানুষগুলোর কি অমানুষিক নিষ্ঠুর রূপই না সেদিন দেখে এসেছি পর্বতদেবতার থানে। ধর্মের নামে আমরা এখনো কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারি!

যারা আমাদের বিদায়বেলায় শোভাযাত্রার সামিল হয়েছিল, তারা সবাই কিন্তু সমতলের শেষপ্রান্তে বিদায় নেয় নি। বিদায় নেন নি মোড়ল আর মাস্টারজি, বিদায় নেয় নি মোতিরাম রাধেশ্যাম, বীর সিং, বাবুলাল আর মস্তিরাম ও তার দুই সঙ্গী। তারাও

আমাদের সঙ্গে নেমে চলেছে ধৌলির ধারে, চলেছে আমাদের বাসে তুলে দিতে।

বেশ কয়েকদিন বাদে আজ দেখা হল ধৌলিগঙ্গার সঙ্গে। ধৌলির ধারে আসতেই আমার চোখদুটি আবার জলে ভিজে উঠল। প্রকৃতপক্ষে এবারের মতো আজই যে তার সঙ্গে শেষ দেখা। বদ্রীনাথ যাওয়া-আসার পথে বিষ্ণুরপ্রয়াগে আগামীকাল ও পরশু তার সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু সে দেখা নিতান্তই ক্ষণিকের। তার মানে, ধৌলির ধারে ধারে পথচলার পালা আমাদের আজই শেষ করে দিতে হচ্ছে। আর তাই তার সঙ্গে দেখা হতেই আমার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে।

কোসাপুল পার হয়ে ধৌলির বাঁ তীরে আসি। এবারের হিমালয়যাত্রায় এখানেই প্রথম রাতটি অতিবাহিত করেছি। সেই শিবিরস্থলী ছাড়িয়ে উঠে আসি পথে—জোশীমঠ-মালারি মোটর রোডে। চারটি ঘোড়া ও ছ'জন ল্যাপ ও হ্যাপ মালপত্র বয়ে এনেছে। সদস্যরাও সাধ্যমত মাল বয়েছে। কেবল রুকস্যাক বইতে হয় নি, নেতা অর্ধেন্দু ও আমাকে। মোড়ল বইতে দেন নি। মোতিরাম বাবুলাল আর বীর সিং আমাদের রুকস্যাক বয়ে এনেছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে বাকি গ্রামবাসীরা কেউ খালি হাতে এসেছে। তারা কিছু না কিছু মাল নিয়ে এসেছে। আর মন্তিরাম পাশে পাশে পথ চলতে চলতে একসময় আমার আইস অ্যাক্সটি হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে। তার পর থেকে সেটি আর আমাকে দেয় নি। এখনো ওরই হাতে।

প্রায় সেই একই জায়গায় মালপত্র নামানো হল। ডিম টিনফুড রেশন তেল অন্যান্য খাবার-দাবার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে তিন কয়েল ফিক্সড রোপ ফেলে আসতে হয়েছে। হারিয়ে গেছে একজোড়া ক্র্যাম্পন, বেশ কিছু রক্ ও স্নো পিটন এবং আরও কয়েকটি ছোট-খাটো জিনিস। এর অধিকাংশই আমরা ভাড়া নিয়ে এসেছি। সুতরাং কলকাতার ফিরে দাম দিতে হবে। এমনিতেই খরচ বেশি হয়ে গেছে। তার ওপরে এই বাড়তি খরচ। কি আর করা যাবে ! মাস মাইনে থেকে আমাদের এই ব্যয়ভার বহন করতে হবে বেশ কিছুদিন ধরে। এটি অবশ্য কোনমতেই নতুন কোন ব্যাপার নয়। প্রতি অভিযানেই আমরা হিমালয় থেকে কিছু ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাই। এইভাবে চলেছে বিগত তিরিশ বছর ধরে। অতএব এবারে তার অন্যথা হবে কেমন করে ?

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, ইদানিং আমাদের দেশে হিমালয়কে মূলধন করে পর্বতাভিযানের নামে এক লাভজনক ব্যবসা শুরু হয়েছে। এর চেয়ে দুঃখের ঘটনা এদেশে খুব কমই ঘটেছে। কারণ আজও ভারতবাসীদের কাছে হিমালয় শিবালয়, হিমালয় দেবালয়, হিমালয় শান্তিনিকেতন—মানুষের পরমাশ্রয়। তাঁর নাম করে লোক-ঠকানো ব্যবসায় ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়তে পারে কিন্তু মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা হয়। অতএব হিমালয়কে নিয়ে কেউ যদি ব্যবসা করে করুক, আমরা হিমালয়ে এসে কিছু ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরব।

এসব কথা এখন থাক, এবারে কাজের কথা ভাবা যাক। মালপত্র কিছু কমেছে সত্যি, কিন্তু এখনো অনেক মাল। আসার সময় ঋষিকেশ ও জোশীমঠ থেকে বাস ছেড়েছে। বাসে মাল বোঝাই করতে এবং বসার জায়গা পেতে কোন অসুবিধে হয় নি। কিন্তু এটা নিতান্তই মাঝপথ। পথের মাঝে বাস থামিয়ে ড্রাইভার এত মাল নিতে রাজী হবেন কি ?

প্রধানজি আশ্বাস দেন—মত ঘাবড়াও সাব্। বস খালি আতি হ্যায়। আপকো সিট মিল যায়েগি। সামান ভি ঠিকঠাক উঠ যায়গা। আপকো নহী লেনে সে ইয়ে রাস্তে মে বস নহী চলেগি!

কি সর্বনাশ! ড্রাইভার কোন গোলমাল করলে এরা কি আবার পথ অবরোধ করে বসবেন নাকি? বন্‌ধ আর অবরোধ এখন যে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পেশি প্রদর্শনের সব চেয়ে জনপ্রিয় হাতিয়ার। হিমালয় না করুন, তেমন কিছু যেন না ঘটে!

অতএব এসব কথা না ভেবে সেদিনের কথা ভাবা যাক। সেদিন জোশীমঠ থেকে এসে বাস থেকে মালপত্র নামিয়ে যেখানে রাখা হয়েছিল, আজ বাসে তোলার জন্য মালপত্র ঠিক সেখানেই রাখা হয়েছে। সেই একই মালপত্র। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজকের কত তফাৎ!

সেদিন হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছি, আর আজ হিমালয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। সেদিন আসা, আজ যাওয়া। সেদিন আরম্ভ, আজ শেষ। জানি না আবার কবে হিমালয়ের অন্তরলোকে আশ্রয় পাবো, কেবল জানি এই পরমাশ্রয়ের জন্য আমার জীবনে আজ থেকে আবার প্রতীক্ষা শুরু হল।

সহসা সবাই সচকিত হয়ে উঠি। গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, বাস আসছে কি?

হ্যাঁ। প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে দুলতে দুলতে বাসটা নেমে আসছে ওপর থেকে। আমরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

আমাদের মালপত্রের সামনে এসে বাস থেমে যায়। কণ্ডাক্টার সহাস্যে নেমে আসে পথে। ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করে দেন। কোসার মানুষদের আর পথ অবরোধের প্রয়োজন পড়ল না। কেনই বা পড়বে? বাসে যে মাত্র কয়েকজন যাত্রী বসে আছেন।

কণ্ডাক্টার ছাদে উঠে যায়, শের সিং তার সঙ্গী হয়। মালবাহক ও ঘোড়াওয়ালারা মালপত্র তুলে দিচ্ছে। শৈলেশ, শঙ্কর ও বিনয় তার তদারকি করছে। দলের কয়েকজন ইতিমধ্যে বাসে উঠে বসেছে। ওরা আমাকেও ডাকছে।

আমি পথের ধারে এসে দাঁড়াই, কোসাগাঁয়ের মানুষগুলোর মায়ায়। অমূল্য শ্রীকৃষ্ণ আর বুবেনও আমার পাশে আসে। কোসার মানুষরা ঘিরে ধরে আমাদের। জিজ্ঞেস করে—সাব্ আগলে সাল ফির্ আওগে তো?

কি বলব? ওরা পরম প্রত্যাশায় আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিরুপায় নেতা মাথা নাড়ে। আমরা নীরব থাকি।

কোসার মানুষ উল্লসিত হয়ে ওঠে। আমি ভাবি অন্যকথা—সত্যই কি এ জীবনে আর কোনদিন আসা হবে ধৌলির ধারে, এই কোসাগাঁয়ে?'

বাসের ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। আমাদের সম্বিত ফিরে আসে। বাসের ছাদে মালপত্র বাঁধা শেষ হয়েছে। মালবাহকদের নিয়ে শের সিং বাসে উঠে পড়েছে। ড্রাইভার আমাদের বাসে ওঠার জন্য ইশারা করেন।

কোসাগাঁয়ের বড়দের সঙ্গে শেষবারের মতো হাত মিলিয়ে মস্তিরামদের কাছে আসি। ওরা কাঁদছে।

বিনয় মস্তিরামের চোখ মুছিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ পকেট থেকে একমুঠো লজেন্স বের করে ওর হাতে দিতে চায়। সে হাত সরিয়ে নেয়। এবারে সশব্দে কেঁদে ওঠে।

লজেন্সপ্রিয় মস্তিরামের আজ আর লজেন্সের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। শ্রীকৃষ্ণ

এবারে তার হাত দুখানি ধরে প্রায় জোর করেই লজেন্সগুলো দিয়ে দেয়। বিনয় আবার তার চোখ মুছিয়ে সস্নেহে বলে—রোতা কিঁউ ? হমলোগ ফির্ আয়েঙ্গে তুমলোগোকে পাস। ফির্ হাতি পর্বত যায়েঙ্গে।

—সাচ্ ?

—জরুর।

মস্তিরামের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে সযত্নে লুজন্সগুলো পকেটে রেখে দিয়ে আমাদের সঙ্গে বাসের দরজার কাছে এগিয়ে আসে। এতক্ষণ বাদে আইস অ্যাকসটা আমাকে ফেরৎ দেয়।

আমরা বাসে উঠি। কন্ডাক্টার দোর বন্ধ কবে, বাস চলতে শুরু করে।

—জরুর আওগে সাব্ ! সমবেত কিশোরকণ্ঠের চিৎকার কানে আসে। তাকিয়ে দেখি মস্তিরামের দল বাসের পেছনে ছুটছে আর চিৎকার করে বলছে—জরুর আওগে সাব্ !...জরুর...

কিন্তু ওদের সাধ্য কি কলের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেয় ? ওরা পেছনে পড়ে থাকে, আমরা এগিয়ে আসি। তবু আমার অবাধ্য মন পড়ে থাকে ওদেরই কাছে। ওরা যে পরমপবিত্র ও শাশ্বতসুন্দর হিমালয়ের প্রাণময় সন্তান। তাই শিবালয় হিমালয়কে প্রণাম করে প্রার্থনা জানাই—তুমি এদের প্রকৃত মানুষ করে তোলো।

তমসার তীরে তীরে

অবশেষে তমসার তীরে তীরে শুরু হল আমাদের পথ-পরিক্রমা।

কলকাতা থেকে রওনা হবার ছ'দিন পরে, আজকের এই সোনালী দুপুরে দেখা হল রুপোলী তমসার সঙ্গে। আমি বিস্ময় ও আনন্দে হতবাক হলাম, তমসার আশ্চর্য সুন্দর রূপে মোহিত হলাম।

এ তমসা কিন্তু 'ছন্দবাণবিদ্ধ' বাল্মীকির তমসা নয়। এ তমসা যমরাজ-ভগিনী যমুনার সখী। এ তমসা স্বর্গোরোহিণীর অমৃতধারা। এ তমসা গাড়োয়াল হিমালয়ের একটি অপরূপা উপনদী।

স্বর্গোরোহিণী শৃঙ্গ নিঃসৃত হরকিদুন নালা ও বান্দরপূঁছ পর্বতশ্রেণী থেকে নির্গত রুঁইসারা গাডের মিলিতধারা এই তমসা। ওসলা গাঁয়ের কাছে পৌঁছে দু'টি পাহাড়ী নদী এক হয়েছে। তমসার জন্মভূমি ওসলা এ উপত্যকার শেষ গ্রাম। আমরা এখন সেখানেই চলেছি। পথে, পদ-যাত্রার এই দ্বিতীয় দিনে, মোরি গ্রাম ছাড়িয়ে, একটু আগে দেখা হল তমসার সঙ্গে। এখান থেকে সে নেমে গেছে হরিপুর-ব্যাসে—মিশেছে যমুনায়। কিন্তু না, যমুনার কথা নয়, তমসার কথা হোক্।

আমরা পথ চলেছি তমসার তীরে তীরে। চলেছি তার উৎসের দিকে। চলতে চলতে তাকে দু'চোখ ভরে দেখছি আর মনে মনে বলছি—তমসা! তুমি সত্যই সুন্দর। আমার সকল শ্রম সার্থক হল—আমি ধন্য হলাম।

আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে আছি তমসার দিকে—আঁকাবাঁকা স্বচ্ছ-সুনীল সচল ধারা। প্রায় সমতল তার কোমল তটভূমি। সেখানে সোনালী ধান আর রঙিন রামাদানার মেলা। তারপরে তীরভূমি সহসা উঁচু হয়ে পাহাড়ে মিশেছে। এপারে পাহাড়ের গা বেয়ে পাইন ও দেওদারে ছাওয়া আঁকাবাঁকা মসৃণ পথ। আর ওপারে পাহাড়ের গায়ে ক্ষেত-খামার ও বাড়ি-ঘর। ছবির মতো সুন্দর।

শুধু পথ, তটভূমি আর গ্রাম নয়, এখানকার আকাশ নদী মাটি ও মানুষ সব কিছু নিয়েই ঐ সীমাহীন সৌন্দর্য।

আমরা তাই অপলক নয়নে তমসাকে দেখছি তার তীরে তীরে পথ চলেছি। চলছি আর ভাবছি। ভাবছি তমসার কথা, আমাদের কথা—আমাদের এই তমসা উপত্যকা অভিযানের কথা—

বাংলা থেকে এটি এ অঞ্চলের প্রথম পর্বতাভিযান। কলকাতার পর্বতারোহণ সংস্থা 'দূতাগার' এ অভিযানের আয়োজন করছেন। প্রখ্যাত পর্বতারোহী অমূল্য সেন অভিযানের নেতা। সে অবশ্য আজ সঙ্গে নেই। মেডিকেল অফিসার ডঃ সুব্রত সেনগুপ্ত ও সহকারী কোয়ার্টার-মাস্টার পান্নালাল ভদ্রকে নিয়ে দিন তিনেক বাদে আসছে। তারা ওসলাতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

আমরা তেরজন অভিযাত্রী ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ রাতে রওনা হয়েছি কলকাতা থেকে। পথে লখনউ স্টেশনে দার্জিলিং থেকে আগত তিনজন শেরপা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হরিদ্বার ও ঋষিকেশ হয়ে ২১শে বিকেলে আমরা এসেছি উত্তরকাশী।

ইনার-লাইন ও ক্যামেরা পারমিট, পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম ও মালবাহক সংগ্রহের জন্য একটা দিন থাকতে হয়েছে সেই জেলা-সদরে।

তমসা উপত্যকা কিন্তু সংরক্ষিত এলাকা নয়। কাজেই এখানে আসার জন্য কিংবা ছবি তোলার জন্য কোন পারমিটের প্রয়োজন নেই। তবু আমরা পারমিট সংগ্রহ করেছি। কারণ, আমাদের ইচ্ছে আছে, হিমালয়ের খেয়ালী-প্রকৃতি সহায় হলে, আমরা রুঁইসারা গাডের উৎসের ওপরে অবস্থিত ১৮,৪০০ ফুট উঁচু ধূমধারকান্দি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে হরশিলে নেমে যাব। হরশিল ভাগীরথী উপত্যকায় একটি রমণীয় জনপদ—গিরিতীর্থ গঙ্গোত্রীর ১৫ মাইল নিচে অবস্থিত। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। *

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম—২৩শে সকালে দু'খানি বাস ভাড়া করে আমরা উত্তরকাশী থেকে পুরৌলা রওনা হয়েছি। যমুনোত্রীর পথ ধরে এসেছি বারকোট। সেখান থেকে একটি বাসপথ গিয়েছে যমুনোত্রীর দিকে, অপরটি পুরৌলা—উত্তরকাশী জেলার একটি তহশিল-সদর।

বারকোটের পরে আমরা কিছুক্ষণ দেরাদুনের দিকে যমুনার পাশে পাশে পথ চলেছি। তারপরে নওগার কাছে পুল পেরিয়ে পৌঁচেছি পুরৌলা। আমাদের ৭৪ মাইল দীর্ঘ বাসযাত্রার যতি পড়েছে।

কমলনদ নামে ছোট্ট একটি পাহাড়ী নদীর দুই তীরে মনোরম উপত্যকা পুরৌলা। উপত্যকাটি বেশ প্রশস্ত এবং সবুজ। বাস-স্ট্যাণ্ড, বাজার, ডাকঘর ও তহশিলদারের দপ্তর জনপদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। শ'পাঁচেক স্থায়ী বাসিন্দা নিয়ে পুরৌলা জনপদ।

বাজার ছাড়িয়ে নদীর ওপরে একটি লোহার পুল। মোটরপথটি পুল পেরিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে শেষ হয়ে গেছে। সেখানেই বন-বিশ্রাম ভবন। তারই সামনে আমাদের বাস থামল।

বিশ্রাম-ভবনের বারান্দা থেকে নিচের বাজার ও নদীটি ছবির মতো দেখায়। সমতল উপত্যকার ক্ষেত-খামার, আর ওপারে পাহাড়ের গায়ে বাড়ি-ঘরকে ভারী ভাল লেগেছে আমাদের।

পুরৌলা একটি নির্মীয়মান জনপদ। উন্নয়নের ঢেউ এসে আঘাত করছে তমসার তীরভূমিকে। পুরৌলা সেই উন্নয়ন-পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র। সেখান থেকে বাসপথ প্রসারিত হচ্ছে তালুকা পর্যন্ত। তখন তমসা উপত্যকার অভিযাত্রীদের আর পুরৌলায় রাত্রিবাস করার প্রয়োজন হবে না। তাঁরা বাসে করেই সোজা চলে যাবেন তালুকা—ওসলার ৮মাইল আগে তমসার তীরে ছোট একটি গ্রাম।

দেনাদুন থেকে পুরৌলা ৯৪.৫মাইল। নিয়মিত বাস চলাচল করে—ঘণ্টা ছয়েকের মতো সময় লাগে। সুতরাং উত্তরকাশী যাবার দরকার না থাকলে, আমরা একুশ তারিখ বিকেলেই পুরৌলা আসতাম এবং পরদিনই পৌঁছতে পারতাম জারমোলা। অর্থাৎ আমাদের নগদ দুটি দিন বেঁচে যেত।

১৬৮টি গ্রাম নিয়ে গঠিত পুরৌলা তহশিলের জনসংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজার। অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু। তবে বৈদিক দেব-দেবীর চেয়ে লৌকিক দেবতাদের প্রতি

* এখন এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়েছে।

তারা বেশি শ্রদ্ধাশীল। তমসা উপত্যকার সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা দুর্যোধন ও কর্ণ। কিন্তু স্বর্গের দেবতাদের কথা পরে হবে, এখন মাটির মানুষের কথা ভাবা যাক্।

কেবল অবস্থান নয়, আয়তন এবং সুখ-সুবিধার দিক থেকেও পুরৌলা বনবিশ্রাম-ভবনটি উল্লেখযোগ্য। সুতরাং আমরা সবাই খুশি। হাসি আর গানে বিশ্রাম-ভবন মুখরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সে গানের গমক আর হাসির হুল্লোড় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। হঠাৎ বিশ্রাম-ভবনের সামনে একখানি সরকারী জীপ এসে থামল। জনৈক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন আমাদের দিকে। করমর্দন করতে করতে পরিচয় দিলেন—আমি এখানকার তহশিলদার। কাগজে আপনাদের অভিযানের কথা পড়েছি। ভারি খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

ভদ্রলোকের আন্তরিকতা ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। বিশ্রাম-ভবনের বারান্দায় গল্পের আসর বসল। কথায় কথায় তহশিলদার বললেন—মকর-সংক্রান্তি হল তমসা উপত্যকার নববর্ষ আর মাঘ মাস হচ্ছে মেলার মরশুম। পালা করে গাঁয়ের পর গাঁয়ে মেলা বসে মাঘ মাসে।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর। মাঘ মাস শীতকাল। হিমালয়ের মানুষ তখন প্রাণের তাগিদে গৃহবন্দী হয়ে থাকেন। সেই সময় মেলা! তবু কোন প্রশ্ন করি না, কারণ আমরা নবাগত, আমরা শুধুই শ্রোতা।

গ্রামের পরে গ্রামের মানুষের কথা শুরু করেন তহশিলদার। তিনি বলে চলেন—কৃষিকার্য পশুপালন এবং কাষ্ঠছেদন তমসা উপত্যকার মানুষদের প্রধান জীবিকা। এ উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর, বনসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী। সুতরাং হিমালয়ের বহু অঞ্চলের চেয়ে এখানকার মানুষের অবস্থা ভাল। তারা স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর—বিশেষ করে মেয়েরা অসাধারণ সুন্দরী। তবে মুশকিল কি জানেন, অধিকাংশ যুবতীরই যৌনব্যাধি আছে।

আবার বিস্মিত হয়েছি। একে তো সদ্য পরিচিত, তার ওপর ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। অপ্রয়োজনে তিনি এসব কথা বলছেন কেন?

কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারি নি। আমরা নীরব রয়েছি। এবং আমাদের নীরবতায় তহশিলদার আরও উৎসাহিত হয়ে বলতে শুরু করেছেন—হিমালয়ের অধিকাংশ অঞ্চলের মতো এদের সমাজেও বহুপতি প্রথা বেঁচে আছে। তবে আরও একটি মজার ব্যাপার আছে এ অঞ্চলে। বিবাহিতা যুবতীরা ইচ্ছে করলে তাদের মনের মতো কোন যুবককে সেবকরূপে ঘরে রাখতে পারে। স্বামীরা সেই সেবকের খাওয়া-পরা দিতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় সেই সেবকের সংগে সহবাস করে, তাহলেও স্বামীরা কোন বাধা দিতে পারে না। বরং স্ত্রীর গর্ভজাত সেবকের সন্তানকে তাদের আপন সন্তানের মর্যাদা দিতে হয়।

তহশিলদার তমসা উপত্যকার সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তার জ্ঞান বিতরণ করে আরও কতক্ষণ আমাদের ব্যস্ত রাখতেন জানি না, কিন্তু রবীনের জন্য তিনি সেদিন আমাদের আর সময় নষ্ট করতে পারেন নি। শ্রদ্ধেয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের প্রপৌত্র রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত আমাদের অভিযানের সাংগঠনিক সম্পাদক। অতএব তার মাথায় অন্য চিন্তা। সুযোগ পেয়েই সে তহশিলদারকে বলে বসেছে—আপনি বোধহয় এখন নিচে যাচ্ছেন?

—কেন বলুন তো? তহশিলদার জিজ্ঞেস করেছেন।

রবীন বলেছে—না, আমরা কয়েকজন তাহলে আপনার গাড়িতে করে বাজার পর্যন্ত যেতাম।

—কেন আপনারা কি বাজার করে আনেন নি?

—এনেছি। কোয়ার্টার-মাস্টার বঙ্কিম মল্লিক ওরফে দাদু উত্তর দিয়েছে—তবে আরও কিছু তরি-তরকারি কেনা দরকার।

—বেশ তো। তার জন্য আজ রাত্তিরে আর হাঙ্গামা করার কি দরকার। কাল খুব সকালে আমি আমার হেড ক্লার্ককে পাঠিয়ে দেব। তার সঙ্গে গিয়ে বাজার সেরে ফেলবেন। একেবারে পাইকারী দরে সব জিনিস পেয়ে যাবেন।

—তাই তো কথাটা আপনাকে বলা। সহনেতা বিভাস দাস হেসে মনের কথাটা জানিয়েছে তহশিলদারকে। তারপর বলেছে—আমাদের নিচে যাবার আরও একটা কারণ আছে।

—কি বলুন তো? তহশিলদার প্রশ্ন করেছে।

—কাল সকালে আমাদের অন্তত বারোটা ঘোড়া দরকার। পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তী জানিয়েছে।

—ঘোড়া! ইউ মিন্ মিউল, খচ্চর?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। নবাগত সুশীল দে উত্তর দিয়েছে।

—কিন্তু খচ্চর দিয়ে আপনারা কি করবেন? আপনারা তো সংগে কুলি নিয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ, চুয়াল্লিশ জন। সমীক্ষক শম্ভুনাথ দাস বলেছে—কিন্তু আমাদের মালপত্রের ওজন তিন টন। নিজেরা সাধ্যমতো মাল বইবার পরেও অন্তত পঁচাত্তর জন কুলির দরকার। অথচ আমরা উত্তরকাশীতে চুয়াল্লিশ জনের বেশি কুলি যোগাড় করতে পারলাম না।

—এখানে পেয়ে যেতেন। তহশিলদার গম্ভীর স্বরে বলেছেন।

—তবে যে উত্তরকাশীতে শুনলাম, এখানে 'হাই অলিটিচ্যুড পোর্টার' পাওয়া যায় না! ফটোগ্রাফার জগন্নাথ দত্ত ওরফে মামা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছে।

তহশিলদার মুচকি হেসেছেন। হাসিমুখে বলেছেন—ঠিকই শুনেছেন। আপনারা পেতেন না, কিন্তু আমি পেতাম। বুঝতেই তো পারছেন, I am the monarch of all I survey.

—তা তে বটেই। আমরা প্রায় একযোগে বলে উঠেছি।

খুশিভরা স্বরে তহশিলদার প্রশ্ন করেছেন—তা আপনারা কুলিদের কি 'রেট' দিচ্ছেন?

—দৈনিক ন'টাকা ও খাওয়া। নবীন অভিযাত্রী নির্মল সেন উত্তর দিয়েছে।

—ন'...টাকা! তহশিলদার আঁতকে উঠেছেন। তারপর একটু থেমে গম্ভীর স্বরে বলেছেন—আমি আপনাদের পাঁচ টাকায় 'বেষ্ট-পোর্টার' দিতে পারতাম।

—তারা বরফে মাল বইতে পারত? প্রাণেশ সম্ভবতঃ সন্দেহ প্রকাশ করেছে?

—নিশ্চয়ই। তহশিলদার চেঁচিয়ে উঠেছেন।

—তাদের গরম জামা-কাপড় আছে?

আছে বৈকি। একবার থেমেছেন তহশিলদার, তারপর জিজ্ঞাসা করেছেন, আচ্ছা কাল সকাল সাতটায় যদি এখানে খচ্চর 'রিপোর্ট' করে, তাহলে চলতে পারে কি?

—কেন চলবে না ? বম্বের অভিযাত্রী দেশাই বলেছে—সাতটার আগে আমরা মাল-পত্র রেডি করতে পারব না।

—বেশ, তাই হবে। ঠিক সাতটায় খচ্চর রিপোর্ট করবে এখানে। তহশিলদার আশ্বাস দিয়েছেন।

পণ্ডিত জিজ্ঞেস করেছে—স্যার, এখান থেকে ওসলা পর্যন্ত খচ্চর প্রতি কত টাকা দিতে হবে আমাদের ?

—নর্ম্যাল রেট হচ্ছে ষাট টাকা। তবে আপনাদের আমি পঞ্চাশ টাকার মধ্যে ঠিক করে দেব।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যিই আপনার এ উপকারের কথা আমাদের বহুকাল মনে থাকবে। সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বিভাস জানিয়েছে।

চা ও বিস্কুট খাইয়ে সেদিন আমরা খুশি মনে বিদায় দিয়েছি তহশিলদারকে। তারপর আপসোস করেছি—এতগুলো কুলি উত্তরকাশী থেকে না নিয়ে এলেই হত। তহশিলদার পাঁচ টাকা করে কুলি যোগাড় করে দিতে পারতেন। তাছাড়া খচ্চরও তো শুনলাম খুবই সস্তা। একটা খচ্চর আড়াই জন কুলির মাল বইতে পারে। পুরৌলা থেকে ওসলা পর্যন্ত আড়াই জন কুলির জন্য আমাদের খরচ পড়বে অন্তত দেড় শ' টাকা। সেখানে তহশিলদার পঞ্চাশ টাকায় খচ্চর যোগাড় করে দেবেন। আগে জানলে বহু টাকা বেঁচে যেত। আশ্চর্য ! উত্তরকাশীতে কেউ বলে নি যে পুরৌলায় এমন একটি মহৎ মানুষ রয়েছেন। তাহলেও আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই পরোপকারী মানুষটির সংস্পর্শে আসতে পারলাম।

আনন্দ ও উত্তেজনার ভেতর দিয়ে পুরৌলার সুন্দর রাতটি অতিবাহিত হল। পরদিন অর্থাৎ গতকাল সকাল ঠিক ছ'টায় শেরপা-পাচক কামি বেড-টি পরিবেশন করল। চা খেয়ে তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পরে নিলাম। তহশিলদার চলে গেছেন, খুব সকালে তাঁর হেড-ক্লার্ক এসে যাবেন, ঠিক সাতটায় খচ্চর রিপোর্ট করবে—তার আগে আমাদের তৈরি হয়ে নেওয়া দরকার।

কিন্তু কোথায় হেড-ক্লার্ক, কোথায় খচ্চর ? আমরা বৃথাই তাদের পথ চেয়ে বিশ্রাম-ভবনের বাইরে বসে রইলাম। কুলিরা তৈরি হল, আমাদের ব্রেক-ফাস্ট শেষ হল, বেলা আটটা বেজে গেল, কিন্তু হেড-ক্লার্ক বা খচ্চর কেউ এল না।

বাজার করতে সময় খুব বেশি লাগবে না। তাছাড়া বাজারের ভেতর দিয়েই জারমোলার পথ। গতকাল আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল জারমোলা—পুরৌলা থেকে ৮ মাইল। তবে আগের দিন রাতে বাজার করে রাখতে পারলে, সকালে সেই সময়টুকুও বেঁচে যেত। এবং আমরা তাই করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তহশিলদারের 'পাইকারী দরে'র আশায় বাজার করা হয়ে ওঠে নি।

তবে আসল সমস্যা হচ্ছে খচ্চর। বেলা বাড়ছে, আর খচ্চর পাওয়া যাবে কি ? পেলেও বারোটা খচ্চরের পিঠে মাল চাপাতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময়ের দরকার। তার মানে তখনও যদি তহশিলদারের হেড-ক্লার্ক এবং খচ্চর রিপোর্ট করত, তাহলেও আমরা দুপুরের আগে রওনা হতে পারতাম না।

এই সব নানা কথা আমরা তখন ভাবছিলাম বসে বসে। এমন সময় সহযাত্রী সুশান্তবাবু পরামর্শ দিলেন—একবার তহশিলদারের কোয়ার্টার্স থেকে ঘুরে এলে কেমন

হয় ? সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় আমাদের দলের প্রবীণতম সদস্য। তারপরেই যথাক্রমে দাদু ও আমার স্থান। সুশান্তবাবু 'এ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার ক্যামেরাম্যান'। তমসা উপত্যকার ওপরে একটি রঙিন তথ্য-চলচ্চিত্র গ্রহণের জন্য তিনি সহকারী রামনাথকে নিয়ে আমাদের সংগে এসেছেন।

'জুওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট জুওলজিস্ট' দিলীপকুমার মণ্ডলও আমাদের সঙ্গে এসেছে। সে সুশান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছে—আপনি কি তহশিলদারের কোয়ার্টার্স চেনেন ?

—না চিনলেও ক্ষতি নেই। পথে নেমে যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারা যাবে। তহশিলদার হলেন পুরৌলার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। শম্ভু দিলীপ কুমারের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

আর প্রাণেশ মন্তব্য করেছে—ঠিক বলেছেন শম্ভুদা, He is the monarch of all he surveys.

আমরা সবাই হেসে উঠেছি।

—তাই ভাল সুশান্তদা। বিভাস বলেছে—আপনি ও শম্ভুদা একবার তহশিলদারের কোয়ার্টার্স থেকে ঘুরে আসুন।

সুতরাং শম্ভুকে নিয়ে সুশান্তবাবু চলে গেলেন তহশিলদারের খোঁজে। আর তারপরেই দাদু, নির্মল ও কামি কুলিদের নিয়ে রওনা হল জারমোলার পথে। অবশিষ্ট মালপত্র পড়ে রইল বিশ্রাম ভবনে। ঠিক হোল তহশিলদারের খচ্চর এলে বাকি মাল নিয়ে আমরাও রওনা হব। আমরা খচ্চরের প্রতীক্ষায় রইলাম। বসে বসে খচ্চরের কথাই ভাবতে লাগলাম—

খচ্চর। হ্যাঁ, ঘোড়া নয়, গাধা নয়—খচ্চর। বাঘ ও সিংহের সংমিশ্রণে যেমন টাইগন, তেমনি ঘোড়া ও গাধার সংমিশ্রণে খচ্চর। শব্দটা আমাদের ভাষায় সুখশ্রাব্য না হলেও, হিমালয়ের দুর্গম পথে এই কষ্টসহিষ্ণু পর্বতারোহী পশুটির সাহায্য অপরিহার্য।

হিমালয়ের মানুষদের কাছে খচ্চর তাই মোটেই খচ্চর নয়। তাদের কাছে খচ্চর সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ। যে গৃহস্থের গুটি চারেক খচ্চর আছে, স্বয়ং লক্ষ্মী তার ঘরে বাঁধা পড়েছেন। এবং মোটরপথের প্রভূত প্রসারলাভ সত্ত্বেও গাড়োয়াল, কুমায়ুঁ ও হিমাচল প্রদেশে খচ্চর আজও মাল পরিবহনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন।

বেলা দশটা নাগাদ শম্ভু ও সুশান্তবাবু ঘর্মাক্ত কলেবরে বিশ্রাম-ভবনে ফিরে এলেন। আর এসেই যে খবরটি দিলেন, তাতে আমাদের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হল—তহশিলদারকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না ! আমরা সবিস্ময়ে বলে উঠেছি।

—হ্যাঁ,। শম্ভু উত্তর দিয়েছে—তিনি বাড়িতে নেই, বাজারে নেই, অফিসে নেই।

—কোথায় গেলেন ? বিভাস ব্যস্তস্বরে জিজ্ঞেস করেছে।

সুশান্তবাবু বলেছেন—কেউ জানে না।

—তাঁর স্ত্রী কি বললেন ? রবীন প্রশ্ন করেছে।

—খুব সকালে নাকি জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন, তিনিও বলতে পারলেন না।

কোথায় গেলেন ? কেনই বা গেলেন ? আর যাবেনই যদি, আমাদের একটা খবর দিলেন না কেন ? তাহলে আর কিছু না হোক আমাদের অন্তত ঘণ্টা কয়েক সময় বেঁচে যেত।

কাল থেকে বহুবার ভেবেছি কিন্তু কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারি নি। তাহলে কি আমাদের এড়ানোর জন্যই তহশিলদার গতকাল সকালে ও-ভাবে গা ঢাকা দিয়েছিলেন ?

কিন্তু আমরা তো নিজের থেকে তাঁর কাছে কোন সাহায্য চাইতে যাই নি। তিনি স্বেচ্ছায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমরা যখন তাঁর কোন ক্ষতি করি নি, তখন তিনি অযথা আমাদের সঙ্গে এই নির্দয় রসিকতাটুকু কেন করলেন ?

পুরৌলার প্রথম নাগরিকের সেই বিস্ময়কর আচরণ, আজও আমাদের কাছে রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। তমসার তীরে তীরে পথ চলার সময়ও তাই তাঁকে আমরা ভুলতে পারছি না।

॥ দুই ॥

যমুনার সখী তমসা, গাড়োয়ালের অপরূপ উপনদী তমসা, স্বর্গারোহিণীর অমৃতধারা তমসা।

সেই তমসার তীরে তীরে পথ চলেছি। চলেছি জারমোলা থেকে নৈটয়ার। পথে পেরিয়েছি মোরি। মোরি ছাড়িয়েই দেখা হয়েছে তমসার সঙ্গে। তারপর থেকেই পাইন আর দেওদারে ছাওয়া তমসার তীর ধরে পথ চলেছি আমরা। আমরা মানে তেরোজন অভিযাত্রী, তিনজন শেরপা, চুয়াল্লিশজন কুলি ও দশটি খচ্চর। সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। চলছি আর ভাবছি।

না, তমসার অপরূপ রূপের কথা নয়। সে ভাবনা তো এখন আমাদের যাত্রাপথের পরম পাথেয়। তারই তীরে তীরে পথ চলে আমরা আজ পৌঁছব নৈটয়ার, কাল তালুকা, পরশু ওসলা। তারপরে তার দু'টি প্রধান উপনদী হরকিদুন নালা ও রুঁইসারা গাডের উৎসে। কাজেই তমসা তো এখন আমার পথের সাথী। সে সর্বদা রইবে আমার পাশে পাশে। তার গান শুনে রোজ সকালে আমার ঘুম ভাঙবে। আবার তারই ঘুমপাড়ানী গানে রাতে আমার দু'চোখের পাতায় তন্দ্রা আসবে নেমে।

তাই তমসার তীরে তীরে পথ চলেও আমি এখন তমসার কথা ভাবছি না। ভাবছি ফেলে আসা পথের কথা। ভাবছি গতকালের পদযাত্রার কথা।

গতকাল আমরা ৮মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পুরৌলা থেকে জারমোলা এসেছি। কিন্তু সেকথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে সেই পরোপকারী তহশিলদারকে। বিনা আমন্ত্রণে যিনি বিশ্রাম-ভবনে এসে দেখা করেছেন আমাদের সঙ্গে। অযাচিতভাবে 'পাইকারী দরে' বাজার ও 'পঞ্চাশ টাকা করে' খচ্চর যোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু গতকাল সকাল না হতেই উধাও হয়েছেন পুরৌলা থেকে। পুরৌলার প্রথম নাগরিকের এই বিস্ময়কর আচরণ আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সত্য সত্যই যখন তাঁকে পাওয়া গেল না, তখন আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। একদল বাজারে গেলাম, আরেকদল খচ্চরের খোঁজে পুরৌলার পথে ও প্রান্তরে পায়চারি শুরু করে দিল। বাজার করতে কোন অসুবিধে হল না। অবশ্য তহশিলদারের সেই পাইকারী দরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম না। তাহলেও ঘণ্টাখানেকের ভেতরই বাজার-পর্ব শেষ করে ফেললাম।

শেষ হল না খচ্চর-পর্ব। খচ্চরের অভাব নেই। কিন্তু কোন খচ্চরওয়ালা ঐ অবেলায় জারমোলা রওনা হতে রাজী হচ্ছিল না। খুবই স্বাভাবিক। হিমালয়ের পদযাত্রা শুরু হয় সকালে। আর এ নিয়ম মানুষ ও খচ্চর উভয়ের বেলাতেই সমান সত্য। একে তো হিমালয়ের আবহাওয়া সাধারণত বিকেলের দিকে ভাল থাকে না। তার ওপরে রাতের অন্ধকারে দুর্গম ও অপরিচিত পথ পাড়ি দেওয়া বাতুলতা।

অথচ একটা দিন নষ্ট হওয়া মানে কুলি ও শেরপা খাতে সাড়ে সাত'শ টাকা বাড়তি খরচ। তার ওপর দাদু ও নির্মল সকালে কুলিদের নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে। আমরা জারমোলা না পৌঁছলে তারা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকবে।

ভাবনা-চিন্তা যখন চরমে উঠেছে, তখন হঠাৎ বচন সিং ছুটে এলো। জানালো—একজন দোকানদার দশটা খচ্চর দিতে রাজী হয়েছেন।

অতএব বচনের সঙ্গে ছুটে গেলাম সেই দোকানদারের কাছে। বেশ বড় দোকান। দোকানী আজমীরের লোক। খুবই ভদ্র ও অমায়িক। বচন ঠিকই বলেছে। তিনি তখুনি তাঁর দশটি খচ্চর দিতে রাজী হলেন। তারা ওসলা পর্যন্ত আমাদের মাল পৌঁছে দেবে! খচ্চর প্রতি নব্বই টাকা করে দিতে হবে।

দরটা শুনে চমকে উঠলাম। তহশিলদার বলেছিলেন –পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় খচ্চর পাওয়া যাবে। আর তাই শুনে আমরা উত্তরকাশী থেকে চুয়াল্লিশজন কুলি আনার জন্য আপসোস করেছিলাম।

কথায় কথায় দোকনদারকে কথাটি জানালাম। তিনি শুধু মৃদু হাসলেন এবং অত্যন্ত ভদ্রভাবে ও বিনীত কণ্ঠে বললেন, নব্বুই টাকার এক পয়সা কমেও তাঁর পক্ষে খচ্চর দেওয়া সম্ভব হবে না।

সুতরাং দোকানদারকে অগ্রিম দিয়ে রসিদ নিলাম। ভাবলাম, ভালই হল—উত্তরকাশী থেকে বেশি কুলি আনার আপসোস আর অবশিষ্ট রইল না।

খচ্চরদের নাল পরানো শুরু হয়ে গেল। ওরা যাচ্ছে দূর-দুর্গম হিমালয়ে। অতএব আমাদের মতো ওদেরও নতুন জুতো পরার প্রয়োজন আছে বৈকি! নাল হচ্ছে ঘোড়া ও খচ্চরের জুতো—লোহার জুতো।

বেলা আড়াইটে নাগাদ নাল পরানো শেষ হল। দশটি খচ্চর নিয়ে আমরা বিজয়গৌরবে ফিরে এলাম বিশ্রাম-ভবনে।

প্রাণেশ অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। সে বলল—দশটা খচ্চরের পিঠে মাল চাপাতে কম করেও দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। সবাই মিলে এখানে বসে থেকে কি লাভ? তার চেয়ে আমি ও বিভাস শেরপাদের সঙ্গে এখানে অপেক্ষা করছি। আমরা খচ্চর নিয়ে পরে আসছি। আপনারা রওনা হয়ে যান।

বিভাসও সমর্থন করে তাকে। বিভাস আমাদের সহ-নেতা। অমূল্যর অনুপস্থিতিতে এখন সে-ই অভিযানের নেতৃত্ব করছে। অতএব বিভাস ও প্রাণেশের ওপর

খচ্চরবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করে রুক্স্যাক কাঁধে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পথে।

গতকাল আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল জারমোলা—পুরৌলা থেকে ৮ মাইল। ঐ পথটুকু পেরোতে দু'হাজার ফুট করে চড়াই ও উৎরাই ভাঙ্গতে হয়েছে। আগেই বলেছি তমসা উপত্যকার বর্তমান প্রবেশদ্বার পুরৌলার উচ্চতা ৫,৫০০ ফুট। আর জারমোলা পথের উচ্চতম স্থান জারমোলা-ধার ৭,৫০০ ফুট উঁচু। 'ধার' মানে গিরিবর্ত্ম।

পুরৌলা থেকে রওনা হয়ে দু'হাজার ফুট চড়াই পেরিয়ে আমরা গতকাল সেই জারমোলা গিরিবর্ত্মে পৌঁচেছি। তারপরে, ঘন জংগলের ভেতর দিয়ে একটানা সওয়া আঠারশ' ফুট উৎরাই ভেঙ্গে জারমোলা বন-বিশ্রাম-ভবনের পদার্পণ করেছি। বিশ্রাম-ভবনের উচ্চতা ৫,৬৭৫ ফুট। অর্থাৎ গতকাল ছ'ঘণ্টা চড়াই-উৎরাই করে আমরা মাত্র ১৭৫ ফুট ওপরে উঠেছি।

দুর্গম হিমালয়ের পথে এ কাজটি যেমন কষ্টকর তেমনি দুঃখদায়ক। কারণ আরোহণের সময় অবরোহণ মানেই পুনরায় আরোহণ। এ যাত্রায় আমাদের শেষ পর্যন্ত ১৮,৪০০ ফুট উঁচু ধুমধার-কান্দি গিরিবর্ত্ম পেরোতে হবে। কাজেই গতকালের উৎরাই অদূর ভবিষ্যতে আবার চড়াই হয়ে দেখা দেবে।

তার চেয়েও দুঃখের কথা আজ জারমোলা বন-বিশ্রাম ভবন থেকে রওনা হবার পরেও ক্রমাগত উৎরাই ভাঙ্গতে হয়েছে। মোরির উচ্চতা মাত্র, ৩,০০০ ফুট। অর্থাৎ ৫,৬৭৫ ফুট থেকে একেবারে, ৩,০০০ ফুট নেমে এসেছি। এখন অবশ্য একটু একটু করে ওপরে উঠেছি। নৈটয়ারের উচ্চতা ৪,৬০০ ফুট। অর্থাৎ সেখানে পৌঁছবার পরে দুদিনের 'নেট' লোকসান দাঁড়াবে ন'শ ফুট।

তা হোক্ গে। হিমালয়ের পথে এমন লোকসান সর্বদাই হয়। আর বড় লাভের জন্য ছোট লোকসানকে মেনে নেওয়াই তো জগতের নিয়ম।

সুতরাং লোকসানের জন্য হা-হুতাশ না করে বরং লাভের কথাই ভাবা যাক্। আজ আমাদের যা লাভ হয়েছে, তার তুলনায় লোকসানটা নেহাৎই নগণ্য। আজ আমরা তমসার তীরে উপনীত হয়েছি। তার ছবির মতো সুন্দর শ্যামল ও কোমল তীরভূমি ধরে পথে চলেছি। চলতে চলতে তমসাকে দেখছি আর ভাবছি গতকালের কথা।

গতকাল অপরাহ্নে সহনেতা বিভাস ও অভিজ্ঞ পর্বতারোহী প্রাণেশের ওপর দশটি খচ্চরের দায়িত্ব চাপিয়ে আমরা ন'জন অভিযাত্রী বেরিয়ে পড়লাম জারমোলার পথে। পুরৌলা বাজারের ভেতর দিয়ে নেমে এলাম নদীর ধারে। আগেই বলেছি পুরৌলার এই পাহাড়ী নদীটির নাম কমলনদ। সে নওগাঁওয়ের কাছে গিয়ে যমুনার সংগে মিলিত হয়েছে। বাজার ছাড়িয়ে কিছুদূর পর্যন্ত তাকে নদী বলা যেতে পারে। তারপরেই সে কয়েকটি পাহাড়ী ঝরণায় বিভক্ত। প্রকৃতপক্ষে উপত্যকার দু'পাশের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরণাগুলো একত্র হয়েই সৃষ্ট হয়েছে কমলনদ—পুরৌলার প্রাণধারা।

আর ঐ ঝরণাগুলি সেই উর্বর উপত্যকার জীবনসুধা। প্রায় সমতল ও সুবিস্তৃত উপত্যকা! সারা উপত্যকা জুড়েই ধানক্ষেত। চমৎকার ধান হয়েছে। ডানদিকে বহুদূরে কালো পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সীমারেখা—সেখানে আকাশ মাটি আর পাহাড় মিলিত হয়েছে। বাঁদিকে নদীর ওপরেই সবুজ পাহাড়। তারই ওপর দিয়ে প্রায় চল্লিশ মাইল দীর্ঘ বাসপথ তৈরি হচ্ছে—পুরৌলা থেকে তালুকা। সেখান থেকে তমসা উপত্যকার শেষ গ্রাম ওসলা মাত্র আট মাইল। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে তমসা উপত্যকা অভিযাত্রীদের

আর পুরৌলায় খচ্চরের খোঁজ করতে হবে না। তাঁরা দেরাদুন কিংবা ঋষিকেশ থেকে বাসে চড়ে সোজা চলে যাবেন তালুকা।

পথ কিন্তু আগেও ছিল। বাস নয়, জীপ-পথ। জীপে করে গত বছরও তালুকা পর্যন্ত যাওয়া যেত। ১৯৫৩ সালের সফলকাম বান্দরপূঁছ-১ (২০,৯৫৬) অভিযানের অভিযাত্রীরা তাঁদের মালপত্র সহ জীপে করেই তালুকা গিয়েছিলেন। ফলে খচ্চরের খোঁজে তাঁদের পুরৌলার পথে-প্রান্তরে পদচারণা করতে হয় নি। আমাদের করতে হয়েছে, কারণ সেই জীপ-পথকে প্রসারিত করেই এখন বাসপথে পরিণত করা হচ্ছে। নির্মীয়মাণ বাসপথের চেয়ে গাঁয়ের পায়ে-চলা-পথ সুগমতর। তাই আমরা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম।

একসময় বুঝতে পারলাম পথ ভুল হয়েছে। এবং তখন সামনের ঝরণাটি না পেরিয়ে উপায় নেই। অতএব জুতো খুলতে বসতে হল। গাঁয়ের মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করছিল। তারা আমাদের অবস্থা দেখে হাসি চাপতে পারে না। হাসির দমকে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়তে থাকে।

না, আমরা কিছুই মনে করলাম না। এদেশের মেয়েরা ভারী সুন্দর। হাসলে যে ওদের আরও সুন্দর দেখায়।

কিন্তু দিলীপকুমারের সেদিকে খেয়াল নেই। সে কর্তব্যপরায়ণ 'জুওলজিস্ট'। সুতরাং রাওয়াইয়ের সুন্দরীদের দিকে মনোনিবেশ না করে সে প্রজাপতি ধরতে থাকে।

দিলীপকুমার মণ্ডল জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে সরকারী ভাবে আমাদের সঙ্গী হয়েছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু, উচ্চতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীট-পতঙ্গের বিবর্তন সম্পর্কে অনুশীলন করা। আর এই অনুশীলনের প্রধান উপকরণ প্রজাপতি। অতএব প্রজাপতি ধরা দিলীপের একমাত্র কর্তব্য।

এই কর্তব্য সম্পাদনের পদ্ধতিটিও অভিনব। গঙ্গোত্রীর বচন সিংকে তার সহকারী নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বচনের পিঠে দিলীপের হ্যাভার-স্যাক। তার মধ্যে রয়েছে 'কিলিং বট্ল' সহ প্রজাপতি নিধন ও সংরক্ষণের বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম আর দিলীপকুমারের হাতে প্রজাপতি ধরার জাল।

জালটি দেখতে অবিকল টেনিস র‍্যাকেটের মতো, কেবল তাতে স্ট্রিং-য়ের পরিবর্তে লম্বা ও সরু একটা পাতলা কাপড়ের থলি লাগানো। প্রজাপতি দেখতে পেলেই দিলীপ সেই জাল নিয়ে পিছনে ছোটে। তখন ওর সমস্ত দৃষ্টি সেই প্রজাপতির দিকে। নিজের পায়ের দিকে একেবারেই নজর দেয় না।

চিন্তায় পড়েছি। সেখানে ছিল সমতল, বড় জোর হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু ওপরে গিয়ে অমন অন্ধের মতো ছুটোছুটি করলে যে মহাবিপদ হবে।

তবু ওপরের কথা ওপরেই ভাবা যাবে। এখন নিচের কথায় আসা যাক। দিলীপকে প্রজাপতির পেছনে ছুটতে দেখলেই বচন বিশ্বস্ত অনুচরের মতো অনুসরণ করে তাকে। একসময় বেচারী প্রজাপতি দিলীপের ফাঁদে ধরা পড়ে। সে আনন্দে চীৎকার করে ওঠে—বচন, কিলিং বট্ল নিকালো!

বলা বাহুল্য, কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রজাপতিটি সদগতি লাভ করে। আর দিলীপ তার আত্মাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে—তোর অনেক ভাগ্যি রে অনেক ভাগ্যি! তুই Z.S.I.-তে যেতে পারলি...। Z.S.I. মানে জুওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া।

হয়তো বা হবে। শুনেছি সেকালে যখন দেবতার নামে নরবলি দেওয়া হত, তখনও নাকি ঘাতকরা এই একই কথা বলত—তোর অনেক ভাগ্যি রে, অনেক ভাগ্যি! তুই দেবতার চরণে আত্মদান করে সোজাসুজি স্বর্গে যেতে পারলি।

আমি জানি না, দিলীপের এই গবেষণা থেকে মানুষের সমাজ কতখানি উপকৃত হবে। তবে এটুকু জানি যে দেবতাত্মা হিমালয়ের এই অপরূপ কীটপতঙ্গ নিধনের কোন অধিকার নেই আমাদের।

যাক গে, যে কথা বলছিলাম, দিলীপ সুন্দরী মেয়েদের দিকে নজর দিচ্ছিল না, কিন্তু প্রজাপতি ধরতে গিয়ে বড়ই দেরি করে ফেলেছিল। তাই আমরা তাকে তাড়াতাড়ি পথ চলার জন্য তাড়া লাগালাম। সে 'সরি' বলে এগিয়ে চলল। কিন্তু তারপরেই একটি প্রজাপতি দেখতে পেয়ে তার পেছনে ছুটতে থাকল। কি করবে, সে যে ভারত সরকারের একজন কর্তব্যপরায়ণ অফিসার!

একবার নয়, ঝরণা পেরোতে দু'বার জুতো খুলতে হল। কাজটা খুব সহজ নয়। আমাদের প্রত্যেকের পায়ে হয় হান্টার-সু, নয় ট্রেকিং-সু। তার ওপরে মোজা তো আছেই। নেহাৎ নিরুপায় হয়েই হাঙ্গামাটি হজম করতে হল।

যাই হোক্, এক সময় ঝরণা-বিধৌত শস্যশ্যামল সমতল প্রান্তরটি পেরিয়ে পাশের পাহাড়ে উঠে এলাম। নাতিপ্রশস্ত আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পাহাড়ী পথ। কিছুদূর এগিয়ে একটি গ্রাম—ছোট গ্রাম। খানকয়েক কাঠের বাড়ি, কয়েক ফালি তরি-তরকারির ক্ষেত ও গুটিকয়েক আপেল গাছ নিয়ে সুন্দব গ্রাম।

জনৈক গ্রামবাসী জানালেন--গ্রামটির নাম মোলতারি। আমরা পুরৌলা থেকে ২মাইল এসেছি। ৩৫একর জমি, ১২টি ঘর ও ১৩টি পরিবার নিয়ে গ্রাম। জনসংখ্যা মাত্র ৪১ জন।

তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি। চারটে বেজেছে। অর্থাৎ এক ঘণ্টায় মাত্র দু'-মাইল এসেছি। সুতরাং জোরে জোরে পা চালাই।

কিন্তু পা চালাতে চাইলেই কি সব সময়ে পা চালানো যায়? পথটি যে ভারী সুন্দর, ডানদিকে গাছে-ছাওয়া গ্রাম। আর বাঁদিকে, খানিকটা নিচে ফসলে ছাওয়া দিগন্তবিস্তৃত সমতল ক্ষেত। তার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে কয়েকটি পাহাড়ী ঝরণা। ঝরণা নয়, আলপনা—আঁকাবাঁকা রুপোলী রেখা। সবুজের সঙ্গে সাদার এক আশ্চর্য-সুন্দর সহাবস্থান।

তবে সেই স্বর্গীয় দৃশ্য শান্তিতে উপভোগ করবার অবকাশ ছিল না। মাঝে মাঝেই খচ্চরবাহিনীর কণ্ঠলগ্ন ঘণ্টার ধ্বনি শুনে পথের পাশে সরে দাঁড়াতে হচ্ছিল। হিমালয়ের পথে সর্বদাই 'মিউল ফাস্ট'।

সুতরাং সন্তর্পণে পথ চলেছি। কিছুদূর এগিয়েই আরেকটি গ্রাম। নাম ভদ্রালী। ৬একর জমি, ২৪টি ঘর ও ৯১ জন মানুষ নিয়ে গ্রাম। প্রতি ঘরে একটি করে পরিবার বাস করে। আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

আবার জুতো খুলতে হল। এবারে আর ঝরণা নয়, একটা পাহাড়ী নদী। জল বেশি নয়, তবে স্রোত আছে। কিন্তু নদী পেরুতে খুব একটা কষ্ট হল না। গ্রামবাসীরা বড় বড় পাথর ফেলে রেখেছেন। তার ওপর পা দিয়ে আমরা সাবধানে নদী পেরিয়ে এলাম।

পেরোবার সময় কিন্তু ঠিক মনে পড়ল ওদের কথা—সুজয়া ও কমলার কথা। এমনি একটি পাহাড়ী নদী পার হবার সময়েই শহীদ হয়েছে তারা। ১৯৫৩ সালে ওরা গিয়েছিল লাহুল-হিমালয়ে। সঙ্গে ছিল সুদীপ্তা নীলু শেফালী ও পূর্ণিমা। ছ'জনের এই মহিলা পর্বতাভিযানের নেত্রী ছিল সুজয়া। ২১শে আগস্ট কমলা ও সুদীপ্তাকে নিয়ে সে ২০,১৩০ফুট উঁচু একটি অনামী শিখরে আরোহণ করে। শৃঙ্গটির নাম রাখে 'ললনা'। কিন্তু সুজয়া ও কমলা আর ফিরে আসে নি। তারা রয়ে গেছে লীলাভূমি লাহুলে।*

২৬ শে আগস্ট মূল শিবির থেকে ফিরে আসার পথে একটি পাহাড়ী নদী পেরোবার সময় সুজয়া ও কমলা চলে গেছে চিরকালের মতো। তাই হিমালয়ে এসে যখনি এমনি পায়ে হেঁটে কোন নদী পেরিয়েছি, তখনি মনে পড়েছে তাদের কথা। কালও সেই উচ্ছ্বসিত জলধারার মধ্যে আমি সুজয়া ও কমলার অক্ষয় স্মৃতিকে খুঁজে পেয়েছি। ভারতের জাগ্রত-যৌবনের স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করেছি।

নদী পেরিয়ে ভারাক্রান্তমনে চলেছিলাম এগিয়ে। সহসা শম্ভুর ডাকে বাস্তবে ফিরে এসেছি। শম্ভু বলেছে—চলো, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্।

পথের পাশে একটা চা ও ভাজির দোকান। সহযাত্রীদের সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে এসেছি দোকানের দাওয়ায়।

দোকানী জানিয়েছে—এ গাঁয়ের নাম পোড়া, মোলতারির চেয়ে অনেক বড়। ১৬৪একর জমি ও ৭০টি ঘর নিয়ে গ্রাম। ৪০০ লোকের বাস। স্কুল আছে। এখান থেকে পুরৌলা ৪ মাইল। তার মানে আমরা দিনের পদযাত্রার অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছি।

গরম গরম পকোড়া খেতে খেতে বাইরের দিকে তাকালাম। দোকানী ঠিকই বলেছে—গ্রামটি বেশ বড়। শুধু তাই নয়, মনে হয়েছে উন্নত এবং সমৃদ্ধ। কারণ কয়েকখানি টিনের ঘর দেখতে পেয়েছি। হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে টিনের ঘর—সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

ক্ষেত থেকে পাহাড়ে ওঠার পরেও পথটি মোটামুটি সমতল ছিল। পোড়া ছাড়িয়েই শুরু হল চড়াই-উৎরাই। কখনও কোন পাহাড়ী নদীর বেলাভূমিতে নেমে যেতে হল, কখনও বা উঠতে হল অনেক উঁচুতে। গতিবেগ মন্থর থেকে মন্থরতর হয়, দম ফুরিয়ে আসতে চায়। তাই মাঝে মাঝে পথের ওপর বসে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। তবু রক্ষে দিনের আলো নিভে আসছিল বলে প্রজাপতিরা তখন বাসায় ফিরে গেছে। নইলে তো আবার দিলীপ জাল হাতে ছুটোছুটি শুরু করে দিত।

বেলা প্রায় ছ'টার সময় আমরা রামাসেরাঁও পৌঁছলাম। সংক্ষিপ্ত নাম রামা। দেখে মনে হয়েছে রামা বেশ বড় গ্রাম। ৫০ একর প্রায় সমতল জমি নিয়ে গ্রাম। কিন্তু জনসংখ্যা ভদ্রালীর চেয়েও কম। মাত্র ৫০ জন লোকের স্থায়ী বাস।

তবে গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ। আমরা সংকীর্ণ চড়াই-পথ বেয়ে একফালি প্রশস্ত প্রান্তরে উঠে এলাম। সামনেই শিবমন্দির। হিমালয় শিবালয়। শিব হিমালয়-পথিকের পরমারাধ্য। আমরা দেবাদিদেব মহাদেবকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করলাম।

পথের দু'পাশেই দোকানপাট। চটি আছে, শোবার জায়গা মেলে। শহর হতে বলে

রাখলে দোকানে চাপাটি ও সবজি পাওয়া যায়। সুতরাং রামাতে রাত্রিবাসের অসুবিধে নেই।

রাত্রিবাস তো দূরের কথা, আমরা চা পর্যন্ত খেলাম না। কি দরকার? জারমোলা তো মোটে দু'মাইল। সেখানে দাদু ও নির্মল আমাদের জন্য গরম খাবার নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। সুতরাং একটু জিরিয়ে নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চললাম।

কিন্তু চলতে চাইলেই তো আর চলা যায় না হিমালয়ে! গ্রাম ছাড়িয়েই শুরু হোল চড়াই—বেশ খাড়া চড়াই। প্রথম দিনের পদযাত্রা, তার ওপরে প্রায় অভুক্ত। অতএব ক্রমেই আমাদের গতিবেগ কমতে থাকল।

পথটি কিন্তু ভারী সুন্দর। ডানদিকে সবুজ পাহাড়। বাঁদিকে, খানিকটা নিচে, সোনালী ক্ষেত। গাঁয়ের মেয়েরা ক্ষেতের কাজ সেরে দিনের শেষে ঘরে ফিরছে। কণ্ঠে তাদের কলগান। সেই গান শুনতে শুনতে আমরা চড়াই ভাঙ্গতে থাকি।

সন্ধ্যা নেমে এলো গাড়োয়ালের পাহাড়ে প্রান্তরে, ঘরে ও বাইরে। আমাদের ঘর নেই, আমরা তাই আঁধার-ছাওয়া বনপথ বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকলাম।

সহসা আঁধার গেল মিলিয়ে। চাঁদ উঠল শরতের আকাশে। পথ পাহাড় ও প্রান্তর মোহময় হয়ে উঠল। নিজেদের অলক্ষ্যেই আমরা একসময় গান গাইতে শুরু করে দিলাম। গাইতে গাইতে চড়াই ভাঙ্গতে থাকলাম।

ফটোগ্রাফার জগন্নাথ শিল্পী মানুষ। সে টর্চ নিভিয়ে দিতে বলল। কথাটা মিথ্যে নয়। টর্চ জ্বালালেই যে চাঁদের আলো যায় পালিয়ে।

চাঁদের আলোয় পথ দেখে দেখে একসময় আমরা উঠে এলাম জারমোলা-ধারে।

ধার অর্থাৎ গিরিবর্ত্মটির ঠিক ওপরেই একটা চায়ের দোকান। আমরা শ্রান্ত চরণে দোকানে ঢুকে যে যেখানে পারি বসে পড়ি। ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে।

শুধু শ্রান্ত নয়, আমরা তখন ক্ষুধার্তও বটে। কিন্তু চা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। কেনই বা যাবে? জারমোলা তো কোন গ্রাম নয়। সেখানে জনবসতি নেই। আসা-যাওয়ার পথের পাশে সাময়িক বিশ্রামস্থল এবং বন বিভাগের একটি কর্মকেন্দ্র জারমোলা।

দোকানীর কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পারলাম, তখন পর্যন্ত দশটি খচ্চরের কোন বাহিনী জারমোলা আসে নি। আমরা ভেবেছিলাম, পথে যখন বিভাসদের সঙ্গে দেখা হয় নি, তখন ওরা নিশ্চয়ই অন্য কোন পথ দিয়ে জারমোলা পৌঁছে গেছে।

দোকানী হেসে বলল—পুরৌলা থেকে জারমোলা আসার একটিই পথ। তা-ছাড়া চারটের পরে রওনা হলে, এর মধ্যে এখানে আসা সম্ভব নয়। তবে এসে যাবে কিছুক্ষণের ভেতরে।

—পারবে কি? এই রাতে? সুশান্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

দোকানী উত্তর দিল—কষ্ট হবে, আস্তে আস্তে চলতে হবে। তবে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে।

আশ্বস্ত হই। মালপত্র, বিশেষ করে স্লীপিং-ব্যাগগুলো সবই খচ্চরের পিঠে। আমরা নিচের থেকে আসছি। স্লীপিং-ব্যাগ না পেলে রাতে ঘুমোতে পারব না।

সুতরাং জারমোলা ধার-য়ের দোকানী যখন ভরসা দিলে খচ্চর এসে যাবে, তখন আমরা পুলকিত হলাম কিন্তু সেখানে আর দেরি করা সমীচীন মনে করলাম না। রাত

প্রায় ন'টা। তার ওপরে দোকানী জানালো—বন-বিশ্রাম-ভবন সেই ক্ষুদে গিরিবর্ত্ম থেকে মাইলখানেক এবং পথটুকু মোটেই সুগম নয়। মোটর পথ তৈরি হচ্ছে, কাজেই বড় রাস্তা পাথর আর গর্তে বোঝাই হয়ে আছে। আমাদের যেতে হবে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, পায়ে-চলা পথে, খাড়া উৎরাই ভেঙ্গে।

দু'টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন পথ-প্রদর্শক পাওয়া গেল। লোকটি বৃদ্ধ। কিন্তু সে অন্ধকার পথে যে গতিতে হাঁটতে থাকল, তাতে তার পা এবং চোখ দুটির প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারি নি। যাই হোক, কোন রকমে বৃদ্ধের সঙ্গে সমতা রেখে যখন বন-বিশ্রাম-ভবনে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা।

দাদু ও নির্মল আমাদের দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল। উল্লসিত হল শেরপাপাচক কামি! উল্লসিত হলাম আমরা।

কিন্তু সে উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মনে পড়ল বিভাস প্রাণেশ পাসাং ও দোরজির কথা। অতগুলো খচ্চর নিয়ে না জানি তাদের কি হাল হচ্ছে!

মেট তথা কুলির সর্দার সেতীরামকে ডেকে পাঠালাম। সেতী আমাদের পূর্বপরিচিত। ১৯৫০ ও '৬৮ সালের কেদারনাথ পর্বত (২২,৭৭০´) ও সতপন্থ (২৩,২১৩´) পর্বতাভিযানে এবং '৫০ সালের 'বিগলিত করুণা যাহ্নবী যমুনা' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় সেতী আমার সঙ্গে ছিল। * সে দূতাগারের যোগীন-২ (২০,৮৩৫´) অভিযানেও কুলির সর্দারী করেছে।

একটু বাদে সেতী এসে সেলাম করে। রবীন বলে—পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দু'জন কুলিকে ধ'র-য়ে পাঠিয়ে দে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভাসরা এসে যাবে সেখানে। কুলিরা যেন এক ফ্লাস্ক গরম চা ও কিছু বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে যায়।

—জী সাব্। সেতী ঘাড় নাড়ে। তারপরে বলে—আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম।

জগন্নাথ মানে মামা ধমক লাগায়—তা ভাবছিলি যখন, তখন কাজটা করিস নি কেন? ব্লাডি ফুল!

—জী সাব্।

আমরা সোচ্চার স্বরে হেসে উঠি। আর সেই সঙ্গে কথাটাও মনে পড়ে সবার। ১৯৫০সালে প্রথম যোগীন-২ অভিযানের সময় দলনেতা অমূল্য তার প্রিয় মেট সেতীরামের নাম দিয়েছে—ব্লাডি ফুল। এবং সেতী সেই থেকে সানন্দে তার এই নতুন নামে সাড়া দিয়ে আসছে।

আলো এবং চা-বিস্কুট সহ দুজন কুলি বিভাসদের নিয়ে আসার জন্যে জারমোলা ধারে চলে গেল। একটু বাদেই দাদু ও নির্মল ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ওরা পরিশ্রান্ত। তাই বিশ্রাম করতে চলে গেল। যাবেই তো, আমরা এসে গেছি—ওদের প্রতীক্ষা হয়েছে শেষ।

আমরাও পরিশ্রান্ত। কিন্তু বিশ্রাম করতে পারলাম না—বিভাস ও প্রাণেশ যে পৌঁছয় নি তখনও। আমরা তাই ওদের পথ চেয়ে বিশ্রাম-ভবনের বারান্দায় বসে থাকি।

বসে বসে ওদের কথাই ভেবে চলি। ভাবি দাদু ও নির্মলের প্রতীক্ষা হল সারা, আর আমাদের হল শুরু।

॥ তিন ॥

সোনার পাথরবাটি হয় কিনা জানি না কিন্তু তুলোর 'স্লীপিং-ব্যাগ' হয়। এবং এবারে পর্বতাভিযানে এসে জানতে পারলাম সেই ভারী ও প্রকাণ্ড বস্তুটি নিয়ে পর্বতারোহণ করতে হতে পারে।

অথচ এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। কারণ পর্বতারোহণের সময় নিজের ব্যক্তিগত সাজ-সরঞ্জাম নিজেকেই বইতে হয়। তাই বিশেষ ধরনের পালক দিয়ে তৈরি করা হয় স্লীপিং-ব্যাগ—যাতে সেটি গরম ও হালকা হয়। এবং অন্যান্য বহু সাজ-সরঞ্জামের মত পালকের স্লীপিং ব্যাগ এখন এদেশেই তৈরি হচ্ছে।

পর্বতারোহণকে জনপ্রিয় করে তুলবার জন্য দার্জিলিং ও উত্তরকাশীতে 'জয়াল মেমোরিয়াল ফান্ড' এবং 'ডায়াস মেমোরিয়াল ফান্ড' নামে দুটি সাজ-সরঞ্জামের ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কর্তৃপক্ষকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই তাঁরা পর্বতারোহণের অনুপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম কিনে কেন সেই ভাণ্ডার বোঝাই করেছেন, এটি লোকসভার একটি প্রশ্ন হতে পারে।

দুর্ভাগ্যের কথা বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশান এবার আমাদের পালকের স্লীপিং-ব্যাগ ভাড়া দেন নি। তুলোর তৈরি এক অভিনব বস্তু দিয়েছেন। ওঁরা অবশ্য বলেন 'কাপোক্' (Kapok), কিন্তু আমি বলি তুলো।* কারণ সেগুলো যেমন ভারী, তেমনি প্রকাণ্ড। তার তিনখানা ব্যাগ বইতে একজন করে কুলি লাগে। তাই নিজেরা না বয়ে আমরা সেগুলি খচ্চরের পিঠে দিতে বাধ্য হয়েছি। খচ্চরবাহিনী কোন কারণে কাল রাতে জারমোলা আসতে পারে নি, সুতরাং আমাদের সারারাত শীতে কষ্ট পেতে হয়েছে।

তাহলেও আজ সকালে বারান্দায় বেরিয়েই বিমোহিত হয়েছি। জারমোলা জায়গাটি যেমন মনোরম, তেমনি সুন্দর তার বন-বিশ্রাম-ভবনটি। চমৎকার অবস্থান। একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে ৫,৬৭৫ ফুট উঁচুতে দু'টি বাড়ি ও চৌকিদারের কোয়ার্টার্স নিয়ে বিশ্রাম-ভবন। ছোট বাড়িটিতে থাকবার জন্য কোন অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র ছাড়া বড় বাড়িটি খুলে দেবার নিয়ম নেই। ফরেস্ট-রেঞ্জার এই অনুমতিপত্র দিয়ে থাকেন। তিনি রয়েছেন নৈটয়ারে। সুতরাং আমরা সেটি সংগ্রহ করতে পারি নি। তবু চৌকিদার কীর্তি সিং আমাদের বড় বাংলোটি খুলে দিয়েছে।

না, বেআইনী করে নি সে। আমাদের দলে দু'জন কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার রয়েছেন—সুশান্তবাবু এবং দিলীপকুমার। কীর্তি সিংকে তাঁদের পরিচয়পত্র

ওসলা
পানওয়ানি
গঙ্গাড়
ওরুরা গাড
নৈটয়ার
তমসা নং
ঢাটমির
তালুকা
গোবিন্দ পশু বিহার
মোরি
গরু গাড
জারমোলা
রামা
টিউনী
পুরোলা
স্যানা
যমুনা
কুতনৌর
যমুনা নদী
গঙ্গানী
বারকোট
নওগাঁও
সিঙ্গোট
সিলকিয়ারী
গেঁওলা
কল্যাণী
ধরাসু
অর্ধেন্দু দত্ত

হরকিদুন
যমদ্বার হিমবাহ
২০,০০০
তালাও
২০,৩৭০'
১৭,৫৭৩
২০৫১২ স্বর্গারোহিণী
সিয়াম হিমবাহ
ধুমধার-কান্দি
১৮,৪০০'
কফেরা গাড়
বান্দর পুঁছ হিমবাহ
যমুনোত্রীশৃঙ্গ
ব্ল্যাকপিক (কৃষ্ণচূড়া)
২০,৯৫৬'
বান্দর পুঁছ (শ্বেত শিখর)
২০,৭২০'
২০,০২০'
যমুনোত্রী
জানকীবাঈ
খারশালী
বনাস
ফুলচাটি
হনুমান গঙ্গা
হনুমান চটি
ডোড়িতাল
বাণসারু
ঝালা
সুখী
গোমুখী
লোহারিনাগ
গাংনানী
ভুক্কী
ভাগীরথী নং
ভাটওয়ারী
মাল্লা
উত্তরকাশী
মানেরী
ভাগীরথী নং
মোটর চলাচলের পথ
খচ্চর ,, ,,
শিবির
পায়ে-হাঁটা পথ
অভিযানের পথ
গিরিবর্ত্ম
উষ্ণ-প্রস্রবণ
গিরিশিরা
শৃঙ্গ
০ ২ ৪ ৬ মাইল

দেখাতেই সে সসম্মানে বড় বাংলাটিতে বাস করবার অনুমতি দিয়েছে। আমরা সেখানেই রাত্রিবাস করেছি। স্লীপিং-ব্যাগ না আসায় অসুবিধে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু রাতটা খুব খারাপ কাটে নি—কারণ ঘরের ভেতরে খুব ঠাণ্ডা নেই। মোটামুটি ঘুম হয়েছে আমাদের।

তিনখানি বেডরুম, একখানি বড় হলঘর, দু'টি বাথরুম এবং দু'পাশের বারান্দা নিয়ে জারমোলা বন-বিশ্রাম-ভবনের বড় বাংলো। মেঝেতে কার্পেট পাতা। ডাইনিং টেব্‌ল, সোফা, রাইটিং-ডেস্ক, চেয়ার খাট আলমারি প্রভৃতি প্রচুর আসবাবপত্র রয়েছে। থাকবেই তো, তমসা উপত্যকা যে কাঠের খনি। সুতরাং বনবিভাগের বাংলোতে কাঠের আসবাব থাকবেই।

দরজা-জানালা কিন্তু সবই কাঁচের এবং তার প্রত্যেকটিতে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে রঙিন পর্দা ঝুলছে। আগেই বলেছি আমাদের ফটোগ্রাফার জগন্নাথ ওরফে মামা শিল্পী মানুষ। সে পর্দাগুলি গুটিয়ে রেখেছিল। তাই চাঁদের আলোয় জারমোলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা কাল রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার আজ সকালে সেই কাঁচের দরজা-জানালা দিয়েই প্রভাতী সূর্যের রোদ এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছে।

কাল রাতে বুঝতে পারি নি, আজ ভোরের আলোয় দেখেছি জারমোলায় বিশ্রাম-ভবনের চারিদিকেই গাছে ছাওয়া পাহাড়। বাসপথ তৈরি হচ্ছে। বিশ্রাম-ভবনের সামনের রাস্তাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে। সেই রাস্তার ওপারে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ফলের বাগান। প্রচুর আপেল ও তরি-তরকারি হয়। আপেল বেশ সস্তা, এক টাকা বিশ পয়সা করে কিলো। খুব মিষ্টি নয়, তবু কোয়ার্টার মাস্টার বঙ্কিম মল্লিক ওরফে দাদুর নির্দেশে সুশীল কাল বিকেলে দশ কিলো আপেল কিনে এনেছিল। বলা বাহুল্য, আজ সকালে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং নির্মল ও দেশাই আজ আবার দশ কিলো আপেল নিয়ে এসেছে। সেগুলি আমরা না খেয়ে সঙ্গে নিয়েছি। সেতীরাম বলেছে, এ পথে আর নাকি আপেল পাওয়া যাবে না।

জারমোলা মাত্র ৫,৬৭৫ ফুট উঁচু। কিন্তু শীতকালে এখানে প্রবল তুষারপাত হয়। বিশ্রাম-ভবনটির প্রায় সমস্তটাই নাকি তলিয়ে যায় বরফের নিচে। কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। উচ্চতা যাই-হোক, স্থায়ী তুষাররেখা বা 'পারমানেন্ট স্নো লাইন' থেকে এ অঞ্চলের দূরত্ব খুবই কম।

আজ সকালে চা-বিস্কুট খেয়ে আমরা রওনা হয়েছি জারমোলা থেকে। তখন আমরা এগারো জন অভিযাত্রী, একজন শেরপা ও বিয়াল্লিশ জন কুলি। প্রাণেশ বিভাস বিজীন্দর ও দু'জন শেরপা তখনও দলছাড়া। আর একজন কুলিকে জারমোলা-ধার-য়ে রেখে আসা হয়েছে। খচ্চরবাহিনীকে নিয়ে প্রাণেশ ও বিভাস সেখানে পৌঁছলে, সে তাদের বিশ্রাম-ভবনে না নেমে সোজা পথে নৈটয়ার চলে আসতে বলবে। এতে ওদের মাইল দু'য়েক পথ কম হাঁটতে হবে।

আগেই বলেছি, জারমোলা থেকে নৈটয়ার ১২ মাইল। দীর্ঘ পথ জেনেও সকালে জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয় নি। কারণ তার জন্য ঘণ্টা দুয়েক সময়ের প্রয়োজন ছিল। আমরা সে সময়টুকু নষ্ট করতে চাই নি। পথেও রান্নার ব্যবস্থা করা হয় নি। কারণ চৌকিদার বলেছে, মোরি বড় জায়গা। সেখানে দোকানপাট আছে, খাবার কিনতে পাওয়া যাবে।

জারমোলা বিশ্রাম-ভবন থেকে রওনা হয়ে আমরা একটানা উৎরাই ভেঙ্গেছি। মাঝে

মাঝেই ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পথ—ধানক্ষেত। চমৎকার ধান হয় তমসা উপত্যকায়। কেনই বা হবে না। একে তো উচ্চতা কম, তার ওপরে নরম মাটির চওড়া উপত্যকা। প্রায় প্রত্যেক সমতল প্রান্তরের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে ছোট-বড় পাহাড়ী নদী কিংবা ঝরণা।

ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পথ চলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি। আগেই বলেছি, এদেশের মেয়েরা সত্যি সুন্দরী। যেমন রূপ, তেমনি স্বাস্থ্য। তার ওপরে বিচিত্র তাদের রঙিন পোশাক। রোমাঞ্চিত হবার মতই বটে।

হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের মতো, এখানকার মেয়েরাও ছেলেদের চাইতে অনেক বেশী পরিশ্রমী। পথের দু'পাশের ক্ষেতে যারা কাজ করছিল, তাদের মাঝে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। পথচারীদের মধ্যেও অধিকাংশ মেয়ে। আমরা তাই পথ চলতে চলতে ওদের অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। ওরাও বোধ করি পুলকিত হচ্ছিল আমাদের এই অস্নাত অভুক্ত দাড়ি-গোঁফময় চেহারা দেখে।

প্রাণেশ ও বিভাস না থাকায় আমরা নিজেরা তখন এগারো জন। পরিসংখ্যানটি কিন্তু ঠিক হয় নি—আজ সকাল থেকে আমরা বারো জন। নতুন সদস্যটি জারমোলা থেকে আমাদের সঙ্গী হয়েছে। আমরা তার নাম জানি না। তবে আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক রবীন পণ্ডিত তাকে 'লালু' বলে ডাকছে। এবং মজার ব্যাপার সে ঐ নামে নিয়মিত সাড়া দিচ্ছে।

প্রথম যখন জারমোলা থেকে লালু আমাদের সঙ্গী হল, ভেবেছিলাম অন্যান্য পাহাড়ী ডাকবাংলোর কুকুরের মতই সে খানিকটা এসে ফিরে যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। লেজ নাড়তে নাড়তে সে চলেছে সবার আগে। ও কি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

হয়তো বা হবে। আমরা যে চলেছি স্বর্গারোহিণীর পদপ্রান্তে। যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গারোহণ করেছিলেন, তখনও নাকি একটি সারমেয় তাঁর সঙ্গী হয়েছিল।

ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পথ। ক্ষেতে কাদা নেই কিন্তু পথ কর্দমাক্ত। তার চেয়েও বড় কথা প্রায় প্রতি পদক্ষেপে অশ্ববিষ্ঠা মাড়াতে হচ্ছিল। ও-পথে যে প্রচুর খচ্চর চলাচল করে!

সংকীর্ণ পথ। পথের দু'পাশে কাঠের বেড়া—যাতে পথের ঘোড়া ক্ষেতের ফসল না খেয়ে ফেলতে পারে।

জারমোলা থেকে মাইল দু'য়েক নেমে একটি গ্রাম, নাম দোভালগাঁও। গুটিকয়েক বাড়ি আর শ'দুয়েক বাসিন্দা নিয়ে গ্রাম। দু'পাশের পাহাড়ই অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। মাঝখানে একটি প্রায়-সমতল উপত্যকা। তার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে এক উচ্ছ্বসিতা পাহাড়ী নদী। নদীর ওপরে কাঠের পুল। সেই পুলের ওপর উঠে আমি নদীর দিকে তাকালাম।

খরস্রোতা নদীর জলে কাঠ ভেসে যাচ্ছে। দূরের বনময় পাহাড় থেকে কাঠ কেটে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নদী তাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিচের সমতলে—নিখরচায় পরিবহন। শুধু নদীর বাঁকে বাঁকে কোম্পানীর মজুরদের তীরে এসে ঠেকে থাকা কাঠগুলিকে জলে ঠেলে দিতে হয়। ওখানেও রয়েছে মজুরদের তেমনি একটি ঘাঁটি। কয়েকজন নারী-পুরুষ লম্বা লম্বা কাঠগুলো জলে ঠেলে দিচ্ছিল।

কাজটা কিন্তু সহজ নয়। দুর্বার পাহাড়ী নদী, হিমশীতল জল। সেই নদীর জলে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল ওরা। খুবই কষ্ট হচ্ছিল ওদের। তাহলেও ভেবেছি, তবু তো এরা যাহোক্ একটা কাজ পেয়েছে। সেই কাজের বিনিময়ে অন্তত একবেলা দু'টি খেতে পাচ্ছে। হিমালয়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ভূমিহীন বেকার। উপবাস তাদের নিত্য নিয়ম।

এমনটি কিন্তু মোটেই হওয়া উচিত নয়। হিমালয় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের রত্নভাণ্ডার। হিমালয়ের মানুষ সৎ এবং পরিশ্রমী। হিমালয় ভারতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। অযোগ্য ও স্বার্থপর কর্তৃপক্ষ হিমালয়ের ঐশ্বর্য আহরণে ব্যর্থ হয়েছে বলেই হিমালয়বাসীরা উপোস করছে, ভারতের দারিদ্র্য ঘুচছে না।

কিন্তু হিমালয়ের ভাবনা এখন থাক্, তার চেয়ে হিমালয়ের মানুষদের কথাই বলা যাক্। রঙিন পোশাক পরে কয়েকজন নারী-পুরুষ পোঁটলা-পুঁটলি খুলে একখানি বড় পাথরের ওপরে খেতে বসেছিল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েছি। বেলা তখন মোটে দশটা। ভেবেছি এরই মধ্যে লাঞ্চে বসে গেছে। কি জানি সকালে হয়তো কিছু মুখে না দিয়েই কাজে চলে এসেছে। ঘরে খাবার যা ছিল, তাই পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে এনেছে। এখন খেতে বসেছে—একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ্ সেরে নিচ্ছে।

দিলীপ মণ্ডল এবং তার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট্ বচন সিং ছাড়া দলের সবাই সামনে এগিয়ে গেছে। আমি মণ্ডলের সঙ্গে ছিলাম। প্রজাপতি ধরার জন্য মণ্ডলের মন্থর গতি। তবু তার সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি বহুক্ষণ তার সঙ্গে পথ চলেছিলাম। কিন্তু পথ চলতে শুরু করে কতক্ষণ থমকে থাকা যায়। তাই শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমি এগিয়ে এসেছিলাম।

দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। কারণ বচন অভিজ্ঞ এবং অনুগত। সে গঙ্গোত্রী পথের শেষ গ্রাম মুখীমঠের অধিবাসী। মুখীমঠ গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের নিবাস। সে-ও পাণ্ডা পরিবারের মানুষ। কিন্তু পাণ্ডাগিরি করে পেট ভরে না এখন। তাই আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে এসেছে।

বয়সে প্রবীণ হলেও বচনের দেহ এবং মনে এখনও যুবকের শক্তি এবং উৎসাহ। সে এবং তার ভাইপো বিজীন্দর দূতাগার-য়ের সফলকাম যোগীন-২ (২০,৮০৫´) পর্বতাভিযানের সঙ্গে ছিল। তারা কুলি কিংবা শেরপা নয়। কিন্তু প্রয়োজনে যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। তাই বিভাস এবারও ওদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এনে ভালই করেছে। বচনের মতো একজন সহকারী না হলে মণ্ডলের খুবই অসুবিধে হত।

বচনের সঙ্গে আমার অবশ্য এই প্রথম পরিচয়, কিন্তু বিজীন্দর আমার পূর্বপরিচিত। 'বিগলিত-করুণা-জাহ্নবী-যমুনা' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় অমূল্য এই সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবকটিকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল! পৈতৃক পেশা পাণ্ডাগিরির মধ্যে বন্দী না থেকে বিজীন্দর পর্বতারোহণকে পেশা করে নিয়েছে। আগামী গ্রীষ্মে সে উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে 'বেসিক ট্রেনিং' নিচ্ছে। আজ অবশ্য বিজীন্দর আমাদের সঙ্গে নেই। অমূল্য, পান্না ও ডাক্তারকে নিয়ে আসার জন্য আমরা তাকে পুরৌলাতে রেখে এসেছি। অমূল্য এপথে এই প্রথম। পান্না এবং ডাক্তার এর আগে আর কখনও পর্বতাভিযানে যোগ দেয় নি।

দিলীপের সঙ্গে বচন সিং ছিল বলে আমি নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

কিন্তু একা একা পথ চলতে মোটেই ভাল লাগছিল না। বড়ই নির্জন পথ। তাই দোভালগাঁও-য়ের সেই কাঠের পুল থেকে নেমে পথের পাশে একখানি পাথরের ওপর বসে পড়েছি। বসে বসে দিলীপের কথা ভেবেছি।

পঁয়ত্রিশ বছরের উৎসাহী যুবক দিলীপকুমার মণ্ডল। মেধাবী ছাত্র ছিল সে। 'জুয়োলজি' ও 'কম্পেয়ারেটিভ অ্যানাটমী' নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এস-সি, পাস করেছে। বটানিতেও তার প্রচুর পড়াশুনা আছে। আর রয়েছে ফরাসী ভাষা শিক্ষার ডিপ্লোমা।

পারিবারিক জীবনে বিবাহিত ও তিনটি কন্যার জনক। তার স্ত্রী নাকি শুধু সুদর্শনা নয়, সুগৃহিণী। এবং পণ্ডিত বলেছে, কলকাতায় ফিরে একদিন আমাদের তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে মণ্ডলকে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

মণ্ডল 'জুয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া'র 'অ্যাসিস্ট্যান্ট জুওলজিস্ট'। সরকারী ভাবে সে আমাদের সঙ্গে এসেছে। সুতরাং ভারত সরকারের অনুগত অফিসার দিলীপকুমার প্রজাপতি ধরতে গিয়ে পথচলার কথা ভুলে বসে থাকছে।

কেটে গেছে কিছুক্ষণ। হিমালয়ের সুশীতল স্নিগ্ধ সমীরে আমার শ্রান্তি দূর হয়েছে। কিন্তু তখনও দিলীপের দেখা নেই। কতক্ষণ বসে থাকব? আমি উঠে দাঁড়াই। আর ঠিক তখুনি ঘটনাটা ঘটে যায়।

খাটো লোকটি এগিয়ে আসে আমার কাছে। কি যেন একটা বলে। তারপরেই একেবারে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেলে আমাকে।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। তাহলেও হাত ধরে টেনে তুলি তাকে। জিজ্ঞেস করি, "কেয়া মাংতা?"

কি যেন একটা উত্তর দেয় সে। বুঝতে পারি না। একে তো তার কণ্ঠস্বরটা একটু জড়ানো, তার ওপরে সে স্থানীয় গাড়োয়ালী ভাষায় কথা বলছিল।

কিছুকাল থেকেই এদেশে প্রচার করা হয়ে আসছে যে, বাংলা আসাম উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য স্থানের মাতৃভাষা হয় হিন্দী, নয়তো সেখানে সবাই হিন্দী বলতে ও বুঝতে পারে, সুতরাং হিন্দী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা। আর তাই জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে হিন্দী শিক্ষা দেবার চেষ্টা চলেছে। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা এই চেষ্টাই জাতীয় সংহতিতে সব চেয়ে বড় ফাটল ধরিয়েছে। তা সত্ত্বেও শাসকবর্গ অন্ধের মতো হিন্দী-তোষণ-নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন।

দূরদৃষ্টি না থাকলে নাকি রাজনীতিবিদ্ হওয়া যায় না। যখন পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশ ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেছে, তখন এক বিচিত্র জাতীয়তাবোধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে আমরা 'আংরেজী হাটাও' আন্দোলনের ধ্বজা উড়িয়েছি। হিন্দী-ভাষা-ভাষী রাজনীতিবিদদের বাহবা দিতে হবে বৈকি!

যাক্ গে যে কথা বলছিলাম, বিস্ময়কর হলেও কথাটা সত্য যে সেই খর্ব আগন্তুক উত্তরপ্রদেশের উত্তরকাশী জেলার অধিবাসী হয়েও ঠিকমত হিন্দী বলতে পারে না। তাহলেও আমাকে হিন্দীতেই আবার প্রশ্ন করতে হয়—হঠাৎ এমন প্রণাম করলে কেন? তুমি কি চাও?

লোকটি বোধহয় বুঝতে পারে, আমি স্বাধীন ভারতের দেশপ্রেমিক নাগরিক।

সুতরাং হিন্দী ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমার বোধগম্য নয়। সে-ও তাই হিন্দীতে উত্তর দিল—জী মহারাজ।

কিন্তু সে হিন্দী আমাকে কোন সাহায্যই করে না। আমি তার মনের কথা বুঝতে পারি না। এবং ঐ অবস্থায় আমার কি করা উচিত, সাব্যস্ত করতে পারার আগেই বামন অবতার সহসা আমার রুকস্যাক্‌টা নিজের কাঁধে তুলে নিল।

ব্যাপার কি! লোকটা কি 'লাগেজ লিফ্‌টার'—ছিনতাইকারী?

আমি তার একখানি হাত ধরে ফেলি। সোচ্চার স্বরে চিৎকার করে উঠি—চোর, চোর। ডাকু...

লোকটি কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেয় না। তবে সে-ও গলা ফাটিয়ে বলতে থাকে—জী মহারাজ! জী মহারাজ!...

বিস্মিত হলাম। চোর কিংবা ডাকাত স্বীকার করছে সে চোর, সে ডাকাত—কিন্তু সে পালাবার চেষ্টা করছে না।

আমাদের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে কর্মরত কয়েকজন নারী-পুরুষ কাঠ ঠেলে দেবার কাজ ফেলে ছুটে এল কাছে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। আগন্তুকদের সকলেই গ্রামবাসী হলেও তাদের একজন বেশ ভাল রাষ্ট্রভাষা জানত। সে দোভাষীর কাজ শুরু করে দিল।

আমাদের উভয়ের বক্তব্য শুনে নিয়ে দোভাষী হো-হো করে হাসতে থাকল। হাসি থামলে সে আমাকে জানালো—বামন অবতার চোর ডাকাত কিংবা ছিনতাইকারী নয়, সে এই গ্রামেরই একজন দরিদ্র অধিবাসী। তার তিন কুলে কেউ নেই। সে মোট বয়ে কিংবা ফাইফরমাশ খেটে কোন রকমে অন্ন সংস্থান করে। গত দু'দিন ধরে কোন কাজ যোগাড় করতে পারে নি। আজ সকাল থেকে না খেয়ে আছে। তার ধারণা, রুক্‌স্যাক্‌টা বইতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তাই সে ওটিকে মোরি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। বিনিময়ে তাকে আমার দু'টি টাকা দিতে হবে।

রুক্‌স্যাক্‌ বইতে আমার কোন কষ্টই হচ্ছিল না। তবু লোকটির হাত থেকে সেটি কেড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তখন সে কিছুতেই ওটি হাতছাড়া করত না। কারণ ঐ রুক্‌স্যাক্‌ আজ তার অন্নদাতা।

অতএব গ্রামবাসীদের বিদায় জানিয়ে বামন অবতারের পেছনে এগিয়ে এসেছি নৈটয়ারের পথে। আমরা দু'জনে দু'জনের ভাষা জানি না। তাই নীরবে পথ চলেছি।

দিলীপের দেখা নেই। তার সঙ্গে বচন সিং রয়েছে, চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু তার দেরি হচ্ছে কেন?

দু'টি বারো-চোদ্দ বছরের বালক দশ-বারো ফুট লম্বা দুখানি জলের পাইপ ঘাড়ে নিয়ে ওপরে চলেছে। বোঝা বড়, বাহক ছোট। তবু ঐ কিশোর দুটি শ্রান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল। পেটের দায় যে বড় দায়।

পাহাড়ী ঝরণাই হিমালয়বাসীদের জলের উৎস। কিন্তু মাটির ওপর দিয়ে বয়ে এলে, জল নোংরা হয়ে যায়। তাই আজকাল হিমালয়ের অপেক্ষাকৃত উন্নত কোন কোন গ্রামে পাইপ দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে পানীয় জল গ্রামে নিয়ে আসা হচ্ছে।

সেই পাইপ দু'টি কোন গ্রামের মানুষদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে, জানা ছিল আমার। কিন্তু ঐ শ্রান্ত কিশোর দুটি যে কয়েকটি টাকা পারিশ্রমিক পাবে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। অতএব তাদের ক্লান্তিতে ক্লান্ত হই নি। বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। আজ

যাহোক কিছু পেটে পড়বে ওদের।

কিছুদূর এগিয়ে একটি গ্রাম। পথের পাশে চায়ের দোকান। কোন প্রকার প্রস্তাবনা না করে বামন অবতার দোকানের দাওয়ায় বসে পড়ল। বুঝতে পারি শ্রীমানের চায়ের নেশা ধরেছে।

দোকানীকে দু'গেলাস চা দিতে বলি। কথায় কথায় দোকানী জানায়, সে গ্রামের নাম গরু-গাড়্।

ভারী সুন্দর গ্রামটি। ঝরণার তীরে তীরে পথ। পথের ধারে ধারে ক্ষেত। ক্ষেতের শেষে পাহাড়ের গায়ে বাড়িঘর ও সব্জির বাগান।

দিলীপের দেখা নেই। তার বড়ই দেরি হচ্ছিল।

বাড়িঘরের মাঝে একটি বাড়ি আকৃষ্ট করে আমাকে। মাটির দু'তলা ঘর। টিনের চাল। নতুন রং করা হয়েছে। ঝক্‌ঝক্ করছে।

বাড়িটি দেখিয়ে বামন অবতারকে জিজ্ঞেস করি—কার বাড়ি ?

আশ্চর্য, আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারে সে। মাথা দুলিয়ে জবাব দেয়—পাটোয়ারী।

গাড়োয়াল কুমায়ুঁর প্রায় প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে একজন করে পাটোয়ারী থাকেন। তাঁর কাজ অনেকটা চৌকিদারের মতো, কিন্তু সে ক্ষমতায় প্রায় 'অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট'। তাঁর অমন ঝক্‌ঝকে্ বাড়ি হতেই পারে। তিনি যে চিনি ও কেরোসিন তেলের 'পারমিট' বিতরণ করে থাকেন।

হিমালয় দেবালয় হলেও স্বাধীন ভারতের অংশ। সুতরাং হিমালয়ে ঘুষ থাকবে না কেন ?

॥ চার ॥

বেলা একটা নাগাদ আজ আমরা মোরি এসেছি। আমি মোরি লিখছি কারণ স্থানীয়রা তাই বলছেন। নইলে এখানে ওখানে ইংরেজিতে লেখা দেখেছি 'Mohri'। এপথে বড় জায়গা হিসেবে পুরৌলার পরেই মোরির স্থান। এটি পুরৌলা ওসলা ও চাক্‌রাতা পথের সঙ্গম।

চাক্‌রাতা দেরাদুন জেলার একটি মহকুমা সদর। মহকুমা তথা তহশিলটি হিমাচল প্রদেশ ও গাড়োয়ালের মাঝখানে অবস্থিত। চাকরাতা তহশিল পর্বতময়।

দক্ষিণবাহিনী যমুনা ঐ তহশিলে প্রবেশ করে উত্তরকাশী ও দেরাদুন জেলার সীমা নির্ধারণ করেছে। সীমারেখা ধরে বিশ মাইল প্রবাহিত হবার পরে সে পশ্চিমবাহিনী হয়েছে। আরও দশ মাইল চলার পরে যমুনা কালসির সোয়া-মাইল দূরে ডাকপাথরের কাছে হরিপুর-ব্যাসে (জালালিয়া) তমসাকে বুকে টেনে নিয়েছে। আর সেখান থেকেই শুরু হয়েছে দুন উপত্যকা—যে উপত্যকার অধিকার নিয়ে যুগে যুগে এত যুদ্ধ!

স্বর্গারোহিণীর অমৃতধারা তমসা দুন উপত্যকাকে সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা করে তুলেছে। রাওয়াইয়ের প্রাণবারি দেরাদুনের মানুষের তৃষ্ণা মিটিয়েছে।

কিন্তু তখনও তমসার সঙ্গে দেখা হয় নি আমার। মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমাদের

শুরু হয়েছে তমসার তীরে তীরে পদচারণা। কিন্তু সেকথা পরে হবে, আগে মোরির কথা বলে নিই।

বড় জায়গা হিসেবে এপথে পুরৌলার পরেই মোরির স্থান। পথের বাঁদিকে বয়ে যাচ্ছে সেই পাহাড়ী নদী। গরু গাড্ গ্রাম থেকে যে নদীর তীরে তীরে পথ চলে আমরা মোরি এসেছি। নদীটির নামও গরু গাড্? সে মোরিতে এসে তমসায় মিশেছে। তারই তীরে এক নাতিপ্রশস্ত উপত্যকা মোরি। কিছু দোকানপাট, ক্ষেতখামার ও বাড়িঘর। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানে একটি পোস্ট অফিস আছে। পুরৌলার পরে আর ডাকঘর দেখি নি। আর তাই বোধ হয় পণ্ডিত অমন মনোযোগ দিয়ে চিঠি লিখছিল। কার কাছে, কে জানে! পণ্ডিত তো বিয়ে করে নি!

শুধু এপারে নয় গরু গাডের ওপারেও একটি পথ দেখতে পেয়েছি। সেই পথটি দিয়েই বন-বিভাগের জীপে করে পৌঁছনো যায় তিউনি। সেখান থেকে বাসে চাক্রাতা। ভবিষ্যতে তিউনির পথটিকেও চওড়া করা হবে। তখন চাক্রাতা থেকে বাসে চড়ে আসা যাবে মোরি। বাসে চড়েই যাওয়া যাবে তালুকা। তবে সে সুঃসময়টি যত দেরিতে আসে, পথযাত্রীদের ততই মঙ্গল।

মোরি থেকে চাক্রাতার পথটি শুনেছি ভারি সুন্দর। তিউনি পর্যন্ত জীপ না পেলেও অসুবিধে নেই কোন। বরং পদযাত্রীর কাছে সেটি সুসংবাদ। গরু গাড্ ও তমসার সঙ্গম থেকে ওপরের পথটি দিয়ে অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমে মাত্র মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই সান্দ্রা! আনুমানিক উচ্চতা ৩,৮০০ফুট। সেখানে চমৎকার একটি বন-বিশ্রাম-ভবন আছে।

সান্দ্রা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে প্রথম দিনে ১০ মাইল গিয়ে থাডিয়ার। জায়গাটি মাত্র সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। সেখানেও রয়েছে বন-বিভাগের বিশ্রাম-ভবন। জীপ-রাস্তাটি তমসার বাঁ তীর দিয়ে হলেও সান্দ্রা এবং থাডিয়ারের বিশ্রাম-ভবন তমসার ডান তীরে। দুটি বিশ্রাম-ভবনই পুরৌলার ডিভিশ্যনাল ফরেস্ট অফিসারের অধীনে। তাঁর কাছ থেকেই বাস করার অনুমতি পত্র নিতে হয়।

তিউনি (৩০০৫) থাডিয়ার থেকে নয় আর মোরি থেকে বিশ মাইল। সেখানকার বিশ্রাম-ভবনটি চাক্রাতা ফরেস্ট ডিভিশনের অন্তর্গত।

তিউনি থেকে চাক্রাতা ৫০মাইল, নিয়মিত বাস চলাচল করে। পথে কানাসারে একটি বন-বিশ্রাম-ভবন আছে। জায়গাটির উচ্চতা প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ফুট। কানাসার তিউনি থেকে ৪০ এবং মোরি থেকে ৬০ মাইল। অর্থাৎ সেখান থেকে চাক্রাতা মাত্র ১০মাইল।

যাক্ গে, এবারে মোরির কথায় আসি। মুদি মনোহারী চা ও খাবারের দোকান লন্ড্রি ও সেলুন সবই রয়েছে মোরিতে। আছে বলেই আমরা আজ দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে আসি নি এবং পথে রান্নার হাঙ্গামা করি নি।

জারমোলা থেকে মোরি ৬মাইল। সহজ ও প্রায় সমতল পথ। তাহলেও আমার প্রায় চার ঘণ্টা লেগেছে। লাগবেই তো। দিলীপকুমারের জন্য অপেক্ষা করতেই যে ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়েছে!

পণ্ডিত ও মামা বসেছিল একটা চায়ের দোকানে। আমাকে দেখতে পেয়েই পণ্ডিত চিঠি লেখা বন্ধ করল। মামার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো।

জিজ্ঞেস করি—আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো? ওরা সবাই কোথায়?

—নৈটয়ার রওনা হয়ে গেছে। একটু থেমে জগন্নাথ আবার বলে—আর থেকেই বা কী করবে বলুন, কোন খাবার পাওয়া গেল না। চা-বিস্কুট ছাড়া আর কিছু নেই মোরিতে।

—সে কি ? আঁতকে উঠেছি—খিদেয় যে পেট জ্বলে যাচ্ছে। নৈটয়ার তো আরও ছ'মাইল।

—উপায় নেই শঙ্কুদা। রবীন বলেছে—আজ একটু কষ্ট করতেই হবে। চা-বিস্কুট খেয়ে রওনা হয়ে যান। নৈটয়ার পৌঁছেই খাবার পেয়ে যাবেন। কাল থেকে আর কোন অসুবিধে হবে না, পথে হট্ লাঞ্চ-য়ের ব্যবস্থা থাকবে।

চুপ করে থাকি। হঠাৎ খেয়াল পড়ল বামন অবতারের দিকে। সে আমার রুক্স্যাক্ কাঁধে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের কথা শুনছিল। কি বুঝছিল কে জানে।

তাকে ইশারায় রুক্স্যাক্ নামাতে বলি। সে আমার আদেশ পালন করে।

মৃদু হেসে জগন্নাথ প্রশ্ন করে—একে আবার পেলেন কোথায় ?

—পথে।

—আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ? রবীন সহসা জিজ্ঞেস করে আমাকে।

—হঠাৎ এ প্রশ্ন ? পাল্টা প্রশ্ন করি।

—না, মানে একে দিয়ে রুক্স্যাক্ বইয়ে আনালেন কিনা ?

—না এনে উপায় ছিল না।

—কেন ?

—লোকটি পথের মাঝে রুক্স্যাক্টা কেড়ে নিয়েছে।

—কেড়ে নিয়েছে ! ওরা রীতিমত বিস্মিত।

ঘটনাটা বলি। সব শুনে ওরা বেশ কিছুক্ষণ প্রাণ খুলে হেসে নেয়। হাসি থামলে রবীন প্রথমে দোকানীকে দু'কাপ চা ও বিস্কুট দিতে বলে। তারপরে মন্তব্য করে—ভারী মজার তো।

—জী মহারাজ। মাঝখান থেকে বামন অবতার বলে ওঠে।

রবীন অবাক হয়, মামা সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে বামন অবতারের দিকে।

মৃদু হেসে বলি—না, না, বাংলা জানবে কেমন করে ? বাংলা দূরের কথা, হিন্দীই যৎসামান্য জানে।

—তা হলে লোকটি এমন ঠিক ঠিক উত্তর দিল কেমন করে ?

—ওটা কাকতালীয়। আসলে জী মহারাজ কথাটা ওর একটা 'মেনিয়া'।

রবীন ও জগন্নাথ প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, আর বামন অবতার গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

হাসি থামলে জগন্নাথ বলে—তা পণ্ডিতের বন্ধুকে কোথায় রেখে এলেন ?

—সে বচনকে সঙ্গে নিয়ে পথের সব প্রজাপতি ধরে আনছে।

—বড্ড দেরি করে ফেলল। পণ্ডিত রীতিমত চিন্তিত।

দোকানী দু'গ্লাস চা ও চারখানি দিশী বিস্কুট পরিবেশন করে। বামন অবতার চা ও বিস্কুট হাতে নিয়ে গাড়োয়ালী ভাষায় কি যেন বলে দোকানীকে।

দোকানী হিন্দীতে রবীনকে জিজ্ঞেস করেন—এ লোকটি আরও দু'খানি বিস্কুট চাইছে।

বেচারীর বোধহয় খুবই খিদে পেয়েছিল, কাল থেকে কিছু খায় নি।

পণ্ডিত আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি ঘাড় নাড়ি। পণ্ডিত দোকানীকে অনুমতি দেয়।

চায়ে চুমুক দিয়েই কথাটা মনে পড়ে আমার। জিজ্ঞেস করি—প্রাণেশরা আসে নি এখনও ?

—না। মামা উত্তর দিল। আগেই বলেছি, মামা মানে জগন্নাথ দত্ত—একজন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ যুবক। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে ছোট একটি কারখানার মালিক। বিবাহিত। স্ত্রী মায়াও চাকরি করে। ওদের একটি তিন বছরের মেয়ে আছে। বাবা যে এবছরও পূজোর সময় হিমালয়ে থাকে, এটা নাকি মেয়ের একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু অবাধ্য বাবা মেয়ের কথা শোনে নি। মেয়ের মায়ের কি ইচ্ছে ছিল, সেকথা অবশ্য জগন্নাথ বলে নি আমাদের। হয়তো বা অনুমান করে নেওয়া কষ্টকর নয় বলেই।

জগন্নাথ দূতাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সে ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের দু'টি যোগীন অভিযানেরই সদস্য ছিল। পর্বতাভিযানে যোগদানের আগে সে হিমালয়ের বিভিন্ন দুর্গম তীর্থদর্শন করেছে।

জগন্নাথ আমাদের সহনেতা বিভাসের মামা। সেই সূত্রে সে সবারই মামা। সে আমাকে দাদা বললেও আমি তাকে মামা বলেই ডাকছি আজ ক'দিন ধরে।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম, মামার উত্তর শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। গতকাল বিকেলে বিভাস প্রাণেশ পাসাং ও দোরজির সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। শুধু তাই নয়, তখন পর্যন্ত তাদের কোন খবরই পাই নি। তারা কোথায় কাল রাত কাটিয়েছে, কি খেয়েছে, কিছুই জানা ছিল না আমাদের। অত মালপত্তর তাদের সঙ্গে। তারা কোন বিপদে পড়ে নি তো।

আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যই বোধ করি পণ্ডিত বলে উঠল—এইবারে এসে পড়বে ওরা।

এ আশা ছাড়া আমরা ওদের জন্য আর কি-ই বা করতে পারতাম ?

চায়ের শেষ চুমুক দিয়ে বামন অবতার সহসা উঠে দাঁড়ালো। গ্লাসটা দোকানীকে ফিরিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে এলো আমার কাছে। ইশারায় নিজেকে দেখিয়ে দিয়ে বলল—রুপয়ে।

সে টাকা চাইছে। ঘরে ফিরবে। ঘরণী না থাকলেও ঘর আছে বামন অবতারের।

পকেট থেকে ব্যাগ বের করি। চারটে টাকা ওর হাতে দিই।

গুনে দু'টি টাকা নিজের ছেঁড়া কোটের পকেটে রাখল। তারপরে বাকি টাকা দু'টি আমার দিকে এগিয়ে ধরল। বোধহয় ভেবেছিল আমি ভুল করে বেশি দিয়েছি।

ঘাড় নেড়ে, ইশারা করে ও হিন্দী বলে তাকে বোঝাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকি—আমি ইচ্ছে করেই তাকে দু'টি টাকা বেশি দিয়েছি।

সে কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

পণ্ডিত ও মামা আমার সাহায্যে এগিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত দোকানীও তাকে বোঝাতে চাইলেন।

কিন্তু সবার সব চেষ্টাই বিফল হল। বামন অবতার একরকম জোর করেই টাকা দু'টি আমার বুক পকেটে গুঁজে দিল। তারপরে একে একে আমাদের তিনজনকে পা

ছুঁয়ে প্রণাম করল। এবং অবশেষে ঘরের পথে রওনা হল।

আমরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম সেই চলমান ক্ষুদ্র মানুষটির দিকে। এক সময়ে সে পাহাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে আর কোন দিন হয়তো দেখা হবে না তার সঙ্গে। কিন্তু মনে হচ্ছে বহুদিন ওর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার মানসপটে।

কয়েকটা মুহূর্ত কোথা দিয়ে কেটে গেল, খেয়াল করতে পারলাম না। তারপরে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। প্রথমে পণ্ডিত কথা বলল—বিভাসরা না আসা পর্যন্ত আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু খালি পেটে এভাবে বসে থাকি কেমন করে।

প্রশ্নটা অমূলক নয়। খালি পেটে কাজ নিয়ে থাকা যায়, এমন কি দুর্গম পথও চলা যায়, কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা যায় না। অথচ না থেকেই বা উপায় কি? এখানকার দোকানদারদের ভাঁড়ারে মা ভবানী। খাবার নেই কারও কাছে। অতএব আমরা পণ্ডিতের প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারি না।

পণ্ডিত নিজেই কথাটা বলে কিছুক্ষণ বাদে। বলে—দোকানীর স্ত্রী নিজেদের রান্না করছে, রুটি বানাচ্ছে। ম্যানেজ করা যায় কিনা একবার দেখব নাকি?

—দেখতে পারো। আমি বললাম—তবে যা ডাকসাইটে চেহারা, সুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

পণ্ডিত কোন মন্তব্য না করে এগিয়ে গেল ভদ্রমহিলার কাছে। সবিনয়ে বলল—মাতাজী রোটি বানাচ্ছেন বুঝি?

—হ্যাঁ, বেটা। নিজেদের খানা তৈরি করছি। ভদ্রমহিলা মাতৃ-সম্বোধনে রীতিমত বিগলিতা।

—মা, আপনারার বুঝি পুরৌলা থেকে আটা আনান?

—না, বাবা! এখানেই গম, যব ও রামদানা হয়।

—আলু? পণ্ডিত আবার প্রশ্ন করে।

মা উত্তর দিলেন—আলু তো প্রচুর ফলে এ অঞ্চলে।

—আপনারা নিশ্চয়ই সব সময়ে ঘরে কিছু আটা ও আলু মজুদ রাখেন?

—তা রাখি বৈকি।

—যদি অনুমতি করেন, একটা কথা বলি মা।

—বেশ তো, বলো না বাবা।

—আমাদের কেজি দু'য়েক আটা আর কেজি খানেক আলু দেবেন? আমরা দাম দেব।

—কেন বলো তো? মা বিস্মিতা।

—কেন আবার? সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। আমাদের ছ'জন সঙ্গী আসছে, তারা কাল রাতেও কিছু খায় নি।

—তা আলু আর আটা দিয়ে কি করবে?

—কি করব আবার! রুটি আর সবজি বানিয়ে নেব।

—তা আমি বানিয়ে দিলে তোমাদের খেতে কোন আপত্তি আছে কি? আমরা ক্ষত্রিয়।

আমরা পুলকিত হলেও চুপ করে থাকি। পণ্ডিত উত্তর দিল—আপত্তি থাকবে

কেন ? কিন্তু আপনার যে কষ্ট হবে।

—কষ্ট ! কিসের কষ্ট ? ভদ্রমহিলা ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—তোমরা কি আমাকে কুঁড়ে ঠাওরেছো নাকি ?

—আজ্ঞে না, তা নয়...

—তাহলে ? এ-সব কথা বলছ কেন ? একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাদের খাবার তৈরি করে দিচ্ছি ? তোমরা পরদেশী নওজয়ান, আমার ছেলের মতো, আর তোমরা আমাদের মোরিতে এসে রান্না করে খাবে !

পরে জেনেছি ভদ্রমহিলা সন্তানহীনা।

বেলা ঠিক দুটোর সময় বিভাস ও প্রাণেশ মোরি পৌঁছল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু তারা কোথায় ? যাদের নিয়ে আসার জন্যে প্রাণেশ ও বিভাস গতকাল পুরৌলা থেকে আমাদের সঙ্গী হতে পারে নি ? দশটা তো দূরের কথা, একটি খচ্চরও যে ওদের সঙ্গে আসে নি !

কথাটা জিজ্ঞেস করতেই বিভাস উত্তর দিল—পেছনে আসছে।

প্রাণেশ বলল—কাল পুরৌলা ছাড়ার পরে চা ভিন্ন আর কিছু পেটে পড়ে নি। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন।

পণ্ডিত বলে—এখন ঐ দোকানে চল, চা ও বিস্কুট খেয়ে নাও। একটু বাদে রুটি-তরকারি পাওয়া যাবে।

—ব্যবস্থা করছিস বুঝি ? বিভাস পুলকিত।

—হ্যাঁ; দোকানীর স্ত্রীকে মা ডেকে পণ্ডিত ব্যবস্থা করেছে। মামা উত্তর দিল।

—শেরপাদের জন্য রুটি বানাতে বলেছিস তো ?

—হ্যাঁ। শেরপা, মণ্ডল ও বচন সিং—সবার জন্য রুটি হচ্ছে।

—মণ্ডল আর বচন সিং কোথায় ?

—প্রজাপতি ধরছে। অনেক পেছিয়ে পড়েছে। আমি অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে এগিয়ে এসেছি। প্রাণেশের প্রশ্নের উত্তর দিই।

বিভাস ও প্রাণেশকে নিয়ে আমরা চা-এর দোকানে ফিরে আসি। মামা দোকানীকে চা বানাতে বলে। পণ্ডিতের পাহাড়ী-মা আমাদের জন্য রুটি বানাচ্ছেন। ছেলেকে দেখে তিনি অভয় দিলেন—এই হয়ে এলো বলে ! তোমরা আরেকবার চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করো, তার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে বেটা।

—না মাতাজী, আপনার তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আমাদের মোটেই ভুখ লাগে নি।

—ঝুটা বাত মাত বলো বেটা ! ভুখ তোমাদের জরুর লেগেছে। আমার যে দেরি হয়ে গেল। তাঁর কণ্ঠস্বরে রীতিমত হতাশা।

—না, না। দেরি কোথায় ? মোটেই দেরি হয় নি। আপনি ধীরে সুস্থে রান্না করুন। পণ্ডিত মাকে অনুরোধ করে।

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে প্রাণেশ গতকালের কথা বলতে থাকে—সত্যি বলছি শঙ্কুদা, হিমালয়ে অভিযানে বহুবার এসেছি, প্রতিবারেই খচ্চরের সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু খচ্চর যে এত বড় খচ্চর হতে পারে, তা এর আগে জানা ছিল না।

—কি রকম ? আমরা সবিস্ময়ে বলে উঠলাম।

প্রাণেশ বলে চলল—কাল আপনারা রওনা হবার পরে, খচ্চরের পিঠে মাল বোঝাই শুরু হল। খুব হাত চালিয়েও দশটা খচ্চরের পিঠে মাল বোঝাই করতে দু'ঘণ্টা লেগে গেল। বেলা চারটের সময় বিশ্রাম-ভবন থেকে রওনা হলাম। বাজারের ভেতর দিয়ে নেমে এলাম নিচের ঝরণা-বিধৌত উপত্যকায়। আর তারপরেই খচ্চরের দল খচরামি শুরু করে দিল।

—কি ভাবে ? মামা জিজ্ঞেস করল।

—তারা পালা করে পিঠ থেকে মাল ফেলতে আরম্ভ করল। পদ্ধতিটা অভিনব। হঠাৎ একটা খচ্চর ছুটতে থাকে কাত হয়ে। মালটা ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দেবার পরে সে থেমে ঝোপঝাড় খেতে থাকে নির্বিকার চিত্তে। আমরা ছুটে গিয়ে খচ্চরটা ধরে নিয়ে আসি। পিঠে মাল চাপিয়ে দিই। শ্রীমান খচ্চর নিরাসক্ত ভাবে এগিয়ে চলে। কিন্তু কিছুক্ষণ না কাটতেই আবার আরেকটি খচ্চর পূর্বসূরীকে অনুসরণ করে। এইভাবে ওরা পালা করে সারা রাস্তা ধরে মাল ফেলেছে আর আমরা সেই মাল আবার ওদের পিঠে তুলে দিয়েছি। ফলে কাল আমাদের রামা পৌঁছতেই রাত আটটা বেজে গিয়েছে। অভুক্ত অবস্থায় একটা দাওয়ায় বসে সারারাত খচ্চরদের সঙ্গে কাটিয়েছি। আজ খুব ভোরে রামা থেকে রওনা হয়ে জারমোলা ধার-য়ে এলাম। খচ্চর-ড্রাইভাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেখানকার চায়ের দোকানে কিছু মাল নামিয়ে রেখে তবে এখানে এসেছি।

—কেন ? আমরা বিস্মিত।

—নইলে আজও খচ্চরের দল গতকালের মতই খচরামি করত। প্রাণেশ উত্তর দিল। বলল—খচ্চররা যতই খচরামি করে থাকুক, তাদের পিঠে যে বেশি মাল চাপানো হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—তা সেই বাড়তি মাল আসবে কেমন করে ? পণ্ডিত রীতিমত চিন্তিত।

বিভাস তাকে আশ্বস্ত করে—আগামী কাল বিকেলে তিনটে খচ্চরের পিঠে নৈটয়ার পৌঁছবে। সেখান থেকে কুলি করে ওসলা নিয়ে যেতে হবে।

—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু তারা কোথায় ? এখনও আসছে না যে ? পণ্ডিত জিজ্ঞেস করে।

—কারা ? প্রাণেশ পাল্টা প্রশ্ন করে।

একটু হেসে পণ্ডিত বলে—সেই খচ্চরের দল !

—ঐ যে এসে গিয়েছে। বিভাস বলে ওঠে।

আমরা পথের দিকে তাকালাম। বিভাস ঠিকই বলেছে। পাসাং ও দোরজি দু'টি গাছের ডাল হাতে নিয়ে দশটি খচ্চর তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।

—ওরা খচ্চর তাড়াচ্ছে কেন ? খচ্চরওয়ালারা কোথায় ?

—ঐ যে পেছনে। প্রাণেশ ইশারা করে দেখিয়ে দিল।

তাই তো বটে, পেছনে বিড়ি হাতে দুটি লোক, হেলে-দুলে পথ চলছিল। দেখে মনে হচ্ছিল না, ঐ খচ্চরের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক আছে। কেনই বা রাখবে ? নিজেদের গরজে পাসাং ও দোরজি যখন দায়িত্ব নিয়েছে, তখন তারা খচ্চরদের ব্যাপার নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবে কেন ? তাই তারা গল্প করতে করতে নির্ভাবনায় পথ চলেছিল।

কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে পণ্ডিতের, সে যেন আঁতকে ওঠে। বলে—কাল তাহলে খচ্চররা তো ডিমের বাক্সগুলিও ফেলে দিয়েছে!

—দিয়েছে বৈকি। বিভাস নির্বিকার স্বরে উত্তর দিল।

—ডিমগুলো বোধহয় সবই ভেঙ্গে গেছে। মামাও কম মর্মাহত নয়।

নিরাসক্ত প্রাণেশ বলল—সব না হলেও কিছু তো ভেঙ্গেছেই।

পণ্ডিত ও মামা চুপ করে রইল। পাসাং আর দোরজি দোকানে আসে। প্রাণেশ চায়ের অর্ডার দিল।

সহসা মামা চেঁচিয়ে উঠল—ঐ তো, ওরাও এসে গিয়েছে।

—কারা?

—মণ্ডল ও বচন সিং।

তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে আসি। মামা ফটোগ্রাফার, তার দৃষ্টিশক্তি প্রখর। সত্যই মণ্ডল আসছে। তার পেছনে বচন সিং। কিন্তু দিলীপকুমার খোঁড়াচ্ছে কেন?

প্রাণেশ এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ থেকে হ্যাভারস্যাক্টা নিয়ে নিল। দিলীপ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু প্রাণেশকে পরামর্শ দিতে ভুল করল না, বলল—সাবধান, ওর ভেতরে কিলিং বটল আছে।

—তাতে সাবধান হবার কি আছে? বিভাস সহাস্যে প্রশ্ন করল।

—সাবধান হবার নেই! মণ্ডল রীতিমত বিস্মিত।—কি যে বলেন? ব্যাগটা একটু কাত হয়ে গেলেই কিলিং মিক্সচার পড়ে যাবে।

—গেলে বেশ হবে। রাওয়াইয়ের প্রজাপতিগুলোর প্রাণ বেঁচে যাবে।

—কিন্তু আমার ডিরেক্টর যে আমাকে শূলে চড়াবেন!

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তবু আমরা না হেসে থাকতে পারি না। সে দোকানে ঢোকে। একখানি বেঞ্চিতে বসে পড়েই বলে উঠল—উঃ, কতক্ষণ বসি না। বড্ড আরাম লাগছে।

আমরা নীরবে হাসতে থাকি। একটু বাদে জিজ্ঞেস করি—তা তুমি এত খোঁড়াচ্ছিলে কেন?

—কেন আবার? আপনাদের হিমালয়ের পথে পাড়ি দিয়ে ঠ্যাং ব্যথা হয়েছে!

—একদিনেই এত ব্যথা?

—হবে না? আমার চোদ্দ-পুরুষে কেউ কোনদিন এমন পথ পাড়ি দিয়েছে?

আমরা সশব্দে হেসে উঠি।

মণ্ডল আবার বলে—এই পণ্ডিতটাই যতো গোলমাল বাধিয়েছে।

—কেন, আমি আবার কি করলাম?

—তুমিই তো আমার ডিরেক্টরকে 'হিপ্‌নটিজ' করে আমাকে ফাঁসিয়েছো?

আমরা আবার হেসে উঠি। কথাটাকে মিথ্যে বলা মুশকিল। অভিযানের সঙ্গে একজন জুওলজিস্ট নিয়ে আসার পরিকল্পনা প্রথম পণ্ডিতের মাথাতেই আসে। তাই সে জুওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ডাঃ এ. পি. কাপুরের সঙ্গে দেখা করে দিলীপকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে।

মণ্ডল বলতে থাকে—বলুন তো মশাই, কি বিপদে পড়েছি! বেশ ছিলাম কলকাতায়। আর আজ বউ ও মেয়েদের ছেড়ে এই পাণ্ডববর্জিত রাজ্যে এসে চড়াই-

উৎরাই করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবে...একবার থামে সে, গলার স্বর ভারী করে বলে—জায়গাটা সত্যি সুন্দর। এমন সুন্দর জায়গা জীবনে আমি কখনও দেখি নি।

—আমরা মানে তোমার সঙ্গীরা বুঝি সুন্দর নয়?

—না, না, সেকথা বলব কেমন করে? বরং বলব আমি সৌভাগ্যবান, এমন চমৎকার সব সঙ্গী পেয়েছি।

॥ পাঁচ ॥

অবশেষে তমসার তীরে এলাম। মোরি বাজার থেকে রওনা হয়ে মাত্র কয়েক মিনিট হেঁটে আমরা পৌঁছলাম তমসার কাছে—গরু গাড্ ও তমসার সঙ্গমে।

পুরৌলায় পদযাত্রা শুরু করার পুরো একদিন পরে দেখা হল তমসার সঙ্গে। আদিকবি বাল্মীকির তমসা নয়, যমরাজভগিনী যমুনার সখী তমসা। যমদ্বার হিমবাহ থেকে নির্গত স্বর্গারোহিণীর অমৃতধারা তমসা। গাড়োয়াল হিমালয়ের অপরূপা উপনদী তমসা।

ভারতে তিনটি তমসা আছে। ইংরেজরা এই তিনটি নদীকেই বলেন 'টন্‌স'। প্রথমটি অযোধ্যায়—সরযূর শাখানদী তমসা। সে আজমগড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভুলিয়ার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি মধ্যপ্রদেশে—রেওয়া জেলার একটি নদী। আর তৃতীয়টি উত্তরকাশী ও দেরাদুন জেলার এই তমসা। কালসির কাছে জালালিয়া বা হরিপুর-ব্যাসে যমুনায় মিশেছে।

কালসি মোরি থেকে ৯০ মাইল একটি সুপ্রাচীন জনপদ। সেখানে সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। কথিত আছে, হৈহয় জাতির জনক এবং কার্তবীর্যার্জুনের পিতামহ একবীর তমসা ও যমুনার সঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেছেন। হরিপুর-ব্যাস তাই একটি পবিত্র তীর্থ।

কাল থেকে এতক্ষণ আমরা উত্তর-পশ্চিমে এসেছি, এবারে শুরু হোল উত্তর-পূর্বদিকে পদযাত্রা। তমসা এখানে পশ্চিম-প্রবাহিনী। সে চলেছে সঙ্গমে, আর আমরা চলেছি তার উৎসে। চলছি আর দু'চোখ ভরে দেখছি। দেখছি আর মনে মনে বলছি—তমসা, তুমি সত্যই সুন্দর! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আজ আমাদের সকল শ্রম সার্থক হল—আমরা ধন্য হলাম।

যমুনার উপনদী বলেই হয়তো তমসাও নীলাঞ্জনা। তার সারা শরীরে নীলকান্তমণির মূর্ছনা। আমরা সেই অপরূপা উপনদীর রূপমাধুরী দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

নদীর বাঁ তীরে পাইন আর দেওদারের ছাওয়া পথ। পথ ও নদীর মাঝে ক্ষেত। শুধু এপারের বেলাভূমিতে নয়, ওপারেও ক্ষেতখামার। ক্ষেতের রঙ কোথাও লাল, কোথাও সোনালী, আবার কোথাও বা সবুজ।

ক্ষেতের শেষে বনের ধারে কিংবা পাহাড়ের ঢালে, কাঠ ও পাথরের সারি সারি ঘর—পাহাড়ী গ্রাম। নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ের দল রঙিন পোষাক পরে কাজকর্ম করছে—কেউ বা তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখছে। কি ভাবছে কে জানে? কিন্তু

আমার মনে হচ্ছে, অকৃপণ প্রকৃতি আমাদের জন্য এখানে কয়েকটি পহেল গাঁওকে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছেন।

প্রাণেশও একই কথা বলে। পুরো একদিন বাদে মাত্র কিছুক্ষণ আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। সেই থেকে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আমাদের আগে আগে যাচ্ছে বিভাস, পণ্ডিত ও মামা। পেছনে মণ্ডল ও বচন সিং। মণ্ডল কথা দিয়েছে, আজ সে আর প্রজাপতি ধরবে না। ভালই হল, হিমালয়ের কয়েকটি অপরূপ পতঙ্গের প্রাণ রক্ষা পেল। কিন্তু মণ্ডল শেষ পর্যন্ত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে কি ?

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম—প্রাণেশও একই কথা বলে, "সত্যি সুন্দর শঙ্কুদা, গোরীগঙ্গা উপত্যকা ছাড়া এমন অপূর্ব-সুন্দর উপত্যকা আমি আর কোথাও দেখি নি।"

ঠিকই বলেছে সে। তমসা উপত্যকার সৌন্দর্যের সঙ্গে একমাত্র পিথোরাগড় জেলার মুনসিয়ারী মহকুমায় গোরীগঙ্গা উপত্যকার তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু কথাটা সে না বললেই ভাল করত। গোরীগঙ্গা সুন্দরী হলেও নিষ্ঠুরা। সে আমাদের ওপর বড়ই নির্দয় আঘাত হেনেছে—অনিমাদিকে চিরকালের মতো ছিনিয়ে নিয়েছে। ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্ম (১৭,৭০০´) অভিযান থেকে ফেরার পথে লিলামের (৬০০০´) কাছে গোরীগঙ্গার তীরে ধসের কবলে পড়ে (২রা অক্টোবর ১৯৫০) শহীদ হয়েছেন অনিমাদি—শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্ত। *

"ওখানে কে ? শম্ভুদা নন ?"

বিভাসের আকস্মিক প্রশ্নে বর্তমানে ফিরে আসি। তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। তাই তো মনে হচ্ছে! পথের পাশে ছোট একটি নালার ধারে কয়েকজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে বসে দিব্যি আড্ডা দিচ্ছে শম্ভু—আমাদের অভিযানের সমীক্ষক শম্ভুনাথ দাস।

শম্ভু শৈশবে মাকে হারিয়েছে। তাই বোধহয় যৌবনে যে জননী জন্মভূমির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার বাসনায় বিভোর হয়ে আছে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাড়ি দিয়েও তার পথ চলার বিরাম নেই। পথের টানে সে ঘরকে পর করেছে। আর তাই আজও তার ঘরে ঘরণী এল না।

হিমালয়ের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় নেপালে—১৯৫০ সালে। তারপর থেকে সে প্রায় প্রতিবার হিমালয়ে এসেছে। ১৯৫৬ সালে উত্তরকাশী থেকে 'বেসিক ট্রেনিং' নিয়েছে। তবে এটি তার প্রথম পর্বতাভিযান।

শুধু ভ্রমণে তৃপ্ত থাকে না শম্ভুর মন। দেশকে, বিশেষ করে হিমাল্য়কে জানার জন্যে তার অসীম আগ্রহ। সে 'জাতীয় গ্রন্থাগারে'র একজন নিয়মিত পাঠক। শম্ভু খুব ভাল হিন্দী জানে। সে রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'নতুন মানব সমাজ' বইখানি বাংলায় অনুবাদ করেছে।

আমাদের ইচ্ছে আছে হিমালয়ের এই অপরিচিত ও অনগ্রসর অঞ্চলের একটা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমীক্ষা করব। এবং সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শম্ভুকে। তাই বোধহয় সহযাত্রীদের নৈটয়ারের পথে এগিয়ে যেতে বলে সে নিজে গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে আড্ডায় বসে গেছে।

আমরা কাছে আসতেই শম্ভু জিজ্ঞেস করে, "এত দেরি হল যে ?"

কেউ কোন উত্তর দেবার আগেই বিভাস বলে ওঠে, "মণ্ডল প্রজাপতি ধরছিল।"

"এ তোমার অন্যায় বিভাস, তুমি এখন এক্সপিডিশানের লীডার, তোমার পক্ষে পণ্ডিতের মতো 'লায়ার' হওয়া সাজে না।" মণ্ডল মন্তব্য করে।

"ওরে বেটা আমি লায়ার !" পণ্ডিত প্রতিবাদ করে।

"লায়ার নয় তো কি ? আমার ডিরেক্টরের কাছে মিথ্যে কথা বলে কে আমাকে এই গ্যাঁড়াকলের মধ্যে ফেলেছে !' তার পরেও বলছ, তুমি একটা ডাহা মিথ্যেবাদী নও।"

এ ঝগড়া সহজে শেষ হবে না বুঝতে পেরে শম্ভুকে প্রশ্ন করি, "তুমি এখানে কতক্ষণ ?"

"তা প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক।

"কি করছিলে ?"

"আর বলো কেন, পথ চলতে চলতে আলাপ হল ওদের সঙ্গে। কথায় কথায় বললাম, আজ আমার খাওয়া হয় নি। অমনি আমাকে এখানে অন্যদের সঙ্গে গল্পে বসিয়ে, একজন ছুটল তার ঘরে—নিচের ঐ গ্রামে। কিছুক্ষণ আগে সে রুটি ও আলুসিদ্ধ নিয়ে এলো। ভুরিভোজ সেরে উঠব উঠব করছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম তোমাদের। একবার থামে শম্ভু, তার পরে প্রশ্ন করে, "তোমাদের তো খাওয়া জোটে নি ?"

"জুটেছে, পণ্ডিত ম্যানেজ করেছে।" গল্পটা বলি তাকে। সে খুশি হয়।

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিই সেই অতিথিপরায়ণ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। তার পরে তমসার তীর ধরে এগিয়ে চলি নৈটয়ারের পথে। মোরি থেকে নৈটয়ার ছ'মাইল। আমরা মাত্র তার মাইলখানেক পথ পেরিয়েছি।

জীপ চলাচলের উপযুক্ত প্রশস্ত পথ ! এদিকটায় এখনও বাসপথ তৈরির কাজ শুরু হয় নি। তাই আঁকাবাঁকা মসৃণ পথ। সামান্য চড়াই-উৎরাই।

সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি আমরা। হিমালয়ের 'ট্র্যাফিক্ রুল্স' অনুযায়ী সবার আগে চলেছে খচ্চরের দল। না, তারা আজ কোন খচরামি করছে না। কেন করবে ? তাদের পিঠের বোঝা হালকা করে দেওয়া হয়েছে যে।

খচ্চরদের পেছনে বিশ্বস্ত শেরপা ও পাসাং দোরজি। তাদের পেছনে দুই খচ্চরওয়ালা—তেমনি বিড়ি মুখে দিয়ে হেলে-দুলে পথ চলেছে।

তারপরে বিভাস, মামা, পণ্ডিত ও মণ্ডল। পেছনে অনুগত সহকারী বচন সিং। সবার শেষে আমি, প্রাণেশ ও শম্ভু।

কথায় কথায় শম্ভু বলে চলেছে তমসা উপত্যকার কথা। আমি ও প্রাণেশ নীরব শ্রোতা। শম্ভু বলছে ঃ

"মহাভারত একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস, লোকশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। আমরা জানি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বছর রাজত্ব করে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যভার দিয়ে দ্রৌপদী ও চার ভাইকে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু জানি না তাঁরা কোন্ পথে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। অনেকে বলেন, কেদারনাথের পেছনেই সেই পথ।"

"তাহলে কেদারনাথ পর্বতের নাম স্বর্গারোহিণী হল না কেন ?" প্রাণেশ মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে। করতেই পারে। কারণ ১৯৫০ সালে আয়োজিত আমাদের কেদারনাথ

পর্বত (২২,৭৭০) অভিযানের সে ছিল অন্যতম শিখরাভিযাত্রী।

"সেইটেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। যদি কেদারনাথ দিয়েই স্বর্গারোহণের পথ হয়ে থাকবে, তাহলে তমসা উপত্যকার প্রান্তসীমায় অবস্থিত ২০,৫২১ফুট উঁচু এই অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গটির নাম স্বর্গারোহিণী হল কেন?" প্রাণেশের উত্তর দিতে গিয়ে শম্ভু পাল্টা প্রশ্ন করে।

আমরা চুপ করে থাকি। শম্ভু আবার বলতে থাকে, "যুধিষ্ঠির কোন্ পথে সেই সারমেয় সহ স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, মহাভারতে তার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও আমরা জানি, পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে প্রথমে পূর্ব দিকে পথ চলেছিলেন। তারপরে নানা দেশ ও বহু নদ-নদী পেরিয়ে লৌহিত্য সাগরের তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে তাঁরা লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গমন করেন। তারপরে আবার পশ্চিমদিকে যাত্রা করে সাগর-প্লাবিত দ্বারকা নগরী দর্শন করেন। সেখানে তাঁদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। তাঁরা উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে 'হিমবন্তং মহাগিরিম্' অতিক্রম করে বালুকার্ণব বা মরুভূমি পেরিয়ে "মহাশৈলং মেরুশিখরিনাম' মেরুপর্বতের দর্শন পান।"

"মহাভারতে স্বর্গারোহিণীর কোন উল্লেখ নেই?" প্রাণেশ আবার প্রশ্ন করে।

"না।" শম্ভু উত্তর দেয়।

"তাহলে তো পাণ্ডবরা কেদারনাথ দিয়েই গিয়েছিলেন।"

"কেমন করে বুঝলে?"

"কেদারনাথ পর্বতের উত্তর-পশ্চিমে কীর্তি হিমবাহের বাঁ তীরে মেরুপর্বত নামে একটি শৃঙ্গ আছে। শৃঙ্গটির উচ্চতা ২১,৫৫২ফুট।" একবার থামে প্রাণেশ। তারপরে আবার বলে, "তবে ঐ বালুকার্ণব ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।"

"আমিও যে ঠিক বুঝতে পেরেছি তা নয়, তবে অনুমান করা যেতে পারে যে মহাভারতকার বালুকার্ণব বলতে গোবি মরুভূমিকে বুঝিয়েছেন।"

"তাহলে তো 'স্বর্গারোহিণী ভারতের বাইরে হয়ে যাচ্ছে।"

"তা হচ্ছে।"

প্রাণেশ চুপ করে থাকে। শম্ভু আবার বলে, "আমাদের এই স্বর্গারোহিণীর পাদদেশে কিন্তু যমদ্বার বলে একটি হিমবাহও আছে।"

"জানি।" প্রাণেশ উত্তর দেয়, "সেই হিমবাহ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে হরকিদুন নালা—তমসার অন্যতম মূল-ধারা।"

শম্ভু পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যায়। সে বলতে থাকে, "পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথ যে দিক দিয়েই হয়ে থাক, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা হস্তিনাপুর থেকে হিমালয়ে এসেছিলেন। আর তাই হয়তো হিমালয়ের অসংখ্য তীর্থের সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবের পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে এবং হিমালয়ের অধিকাংশ মানুষ আজও পাণ্ডবদের দেবজ্ঞানে পূজা করে থাকেন।

"সুতরাং যখন শুনতে পেলাম, তমসা উপত্যকার অধিবাসীরা দুর্যোধন ও কর্ণের ভক্ত, তখন আমরা বিস্মিত বোধ করেছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম যে তাঁরাও তো পাণ্ডবদেরই ভাই এবং তাঁরা দু'জনেই অকুতোভয় এবং মহাবীর—সারা জীবন ক্ষাত্রধর্ম পালন করেছেন।

"দুর্যোধন সম্পর্কে আমরা মনে মনে যত অশ্রদ্ধাই পোষণ করে থাকি, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তিনি একজন জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। নইলে তাঁর পক্ষে সারা ভারত, এমন কি ভারতের বাইরে থেকে পর্যন্ত সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আর তোমরা তো জানো যে ভারতযুদ্ধে বাঙালীরা কৌরবপক্ষেই যোগদান করেছিলেন!"

আমরা মাথা নাড়ি।

শম্ভু বলে চলে, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু কৌরবপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য সকলেই নিশ্চয়ই মারা যান নি। অথচ পরাজিত বীরদের অনেকের পক্ষেই হয়তো আর ঘরে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তখনকার দিনে পরাজিতদের পক্ষে হিমালয়ই ছিল সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। পূর্ববর্তী যুগেও আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে অনার্যরা অনেকেই হিমালয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। অতএব, অনুমান করা বোধহয় অন্যায় হবে না যে, পরাজিত কৌরবপক্ষীয় বীরদের একটা বৃহৎ অংশ এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাই আমরা নৈটয়ার থেকে প্রায় প্রত্যেকটি বড় গ্রামে একটি করে দুর্যোধনের মন্দির দেখতে পাব। আর নৈটয়ারের এক মাইল ওপরে দেওড়া গ্রামে দর্শন করতে পারব কর্ণের মন্দির।"

"ওকি! থামলেন কেন? বলুন না, বেশ তো লাগছে শুনতে।" শম্ভুকে থামতে দেখে বিভাস বলে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে মামা, পণ্ডিত ও বিভাস আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। শুধু তারা নয়, মণ্ডলও তার খোঁড়া পা নিয়ে আমাদের সঙ্গে সমানতালে হেঁটে চলেছে।

একটু হেসে শম্ভু পকেট থেকে সিগারেট বের করে। সিগারেট ধরিয়ে একটা টান মেরে সে আবার বলতে থাকে, "এ অঞ্চলটার ভৌগোলিক নাম ফতে পর্বত বা উচ্চ-তমসা তথা 'আপার টন্স'। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বলে রাওয়াই। আর নিম্ন-তমসা তথা চাক্‌রাতা অঞ্চলের অধিবাসীরা হলেন জৌনসারী। তাঁরা পাণ্ডব-ভক্ত। তাঁদের কাছে দুর্যোধন ও কর্ণ-ভক্তরা হলেন শত্রুপক্ষীয়। বলা বাহুল্য, সেই সুদূর অতীত থেকেই এঁদের মাঝে বিরোধ লেগে আছে। তাহলেও বলব, এঁরা উভয়েই এক মহাভারতীয় সভ্যতার উত্তর-সাধক। মহাকালের প্রভাব এড়িয়ে, আধুনিক সভ্যতাকে অস্বীকার করে রাওয়াই ও জৌনসারীরা হিমালয়ের এই তমসাচ্ছন্ন অঞ্চলে মহাভারতের ট্রাডিশনকে বহন করে চলেছেন। এই টুকরো মহাভারতীয় সমাজ যেন এখানে একই অবস্থায় যুগ যুগ ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তমসা উপত্যকা আপন মহিমায় মহিমান্বিত।"

"অথচ আমরাই নৃতত্ত্ব বিভাগের ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে প্রথম এ অঞ্চলে এলাম।" পণ্ডিত সগর্বে ঘোষণা করে, সে আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক।

"হ্যাঁ।" এবারে আমি বলি, "এ অঞ্চলটা চিরকালই অবহেলিত। তবে তার মানে এই নয় যে এদিকে কারও নজরে পড়ে নি। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেই ইংরেজদের তমসার দিকে নজর পড়েছে। তাই ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত বৃটিশ সার্ভেয়ার রাদারফোর্ড লিখেছেন, 'The Tonse by telescope appeared treble the size of the Jumna.' তমসা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'This remarkable and yet, unknown river...'

"কিন্তু তখন ধারণা ছিল, তমসা শতদ্রুর একটি শাখানদী। বহু চেষ্টা করেও রাদারফোর্ড এ সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাই তিনি সাব্যস্ত

করেছিলেন তমসার প্রবাহ ধরে এগিয়ে যাবেন, এর উৎস আবিষ্কার করবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি। কারণ এ অঞ্চলে তখনও নেপালীদের অধিকারে।

"তমসা উপত্যকা চিরকালই গাড়োয়াল রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু এ অঞ্চলের প্রতি গাড়োয়ালী রাজাদের কোনকালেই মমতা ছিল না। তাই গাড়োয়ালের ইতিহাসে আমরা তমসা উপত্যকার উল্লেখ পাই না। এর একটি কারণ সম্ভবত এই যে, সে আমলে রাজধানী শ্রীনগর কিংবা টিহরী থেকে তমসা উপত্যকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ছিল রীতিমত কঠিন কাজ। ফলে নেপালীরা খুব সহজেই এ অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন।

"রাজা সুদর্শন শাহর অনুরোধে বৃটিশরা নেপালীদের তাড়িয়ে দিলেন গাড়োয়াল থেকে। বাধ্য হয়ে রাজধানী শ্রীনগর, কেদারনাথ-বদ্রীনাথ ও দেরাদুন সহ রাজ্যের সমৃদ্ধতর অর্ধাংশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উপঢৌকন দিতে হল। সেই অংশই পরবর্তীকালের বৃটিশ-গাড়োয়াল। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী সহ বাকি অর্ধাংশ নামে মাত্র স্বাধীন রইল। ইংরেজরা গাড়োয়াল রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা তিনশ' তিরিশে নির্দিষ্ট করে দিলেন। তিনি টিহরীতে রাজধানী 'স্থানান্তরিত করলেন। গাড়োয়াল রাজ্যের নাম হল টিহরী-গাড়োয়াল। ভারত স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চল ঐ নামেই পরিচিত ছিল।

"বলা বাহুল্য, টিহরী-গাড়োয়ালে বৃটিশদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এবং দূরদর্শী বৃটিশ-শাসকরা বুঝতে পেরেছিলেন, বৃটিশ-গাড়োয়ালের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে টিহরী-গাড়োয়ালকে জরিপ করা দরকার। তাঁরা জানতেন যে, বৃটিশ-ভারতের বৈষয়িক উন্নতির জন্য টিহরী-গাড়োয়ালের দুর্গম অঞ্চলের ভৌগোলিক সমীক্ষা অপরিহার্য।

"তাই নেপালীদের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত (মার্চ, ১৮১৬খ্রীঃ) হবার আগেই প্রখ্যাত জরিপবিদ, ক্রফোর্ডকে নিযুক্ত করা হল—'To make a correct survey of the lately liberated provinces of Garhwal Sirmur and Hindoor, as well as the countries north of them a tract which comprises the source of Ganges, Jumna, Tonse (hitherto unknown though larger than Jumna) and Sutlej rivers and which is bounded by some of the noblest mountains of the world.'

"ব্রেন নামে একজন প্রাক্তন ইংরেজ সৈনিককেও এই একই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—'In July 1815 he reported from Sahranpur the completion of his survey including fords and Ghauts of the two rivers (যমুনা ও তমসা) with their courses for a considerable distance.'*

"এই সময় দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, কখনও বা জীবন বিপন্ন করে, বহু সাম্রাজ্যপ্রেমিক ইংরেজ দুর্গম-হিমালয়ের জরিপ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হজ্‌সন, ওয়েব, জেমস হারবার্ট ও রবার্ট কোলব্রুক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তাঁরা কেউই উচ্চ তমসা উপত্যকার দিকে তেমন মনোনিবেশ করেন নি। তাঁদের কেউ যমুনোত্রী থেকে ফিরে গিয়েছেন, কেউ বা বুপিন কিংবা সুপিন নদীর প্রবাহ ধরে হিমাচলের দিকে চলে গিয়েছেন।"

"বৃপিন ও সুপিন বুঝি তমসার শাখানদী ?" আমি থামতেই মণ্ডল প্রশ্ন করে। কিন্তু আমাকে উত্তর দিতে হয় না। তার আগেই শম্ভু বলে, "হ্যাঁ।"

"নদী দু'টি কোথায় ?"

"একটি এখানে, ঐ যে বৃপিন দেখা যাচ্ছে। আরেকটি—"

শম্ভু শেষ করতে পারে না। আমরা সমস্বরে বলে উঠি, "তাই নাকি !" আমরা সামনের দিকে তাকাই। সে ঠিকই বলেছে, ওপারে উত্তব দিক থেকে একটি নদী এসে তমসায় মিশেছে।

"তাহলে যে নৈটয়ার এসে গেছে। বৃপিন আর তমসার সঙ্গমেই তো নৈটয়ার।" মামা বলে।

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে সামনের এই বাঁকটা ছাড়ালেই নৈটয়ার দেখা যাবে।"

ঘড়ির দিকে তাকাই। বুঝতে পারি শম্ভুর অনুমান মিথ্যে নয়। ছ'টা বেজে গিয়েছে। গল্প করতে করতে চলেছি বলে, পথ ফুরিয়ে যাবার কথা টের পাই নি।

"আচ্ছা, শম্ভুদা ! সুপিনের সঙ্গে আমাদের কোথায় দেখা হবে ?" মণ্ডল জিজ্ঞেস করে।

শম্ভু উত্তর দেয়, "এখানেই।"

"মানে ?"

"এই তো সুপিন—আমাদের সামনে।"

"কি যে বলেন !" মণ্ডল বোকা নয়, সে বুঝতে পারে শম্ভু তার সঙ্গে রসিকতা করছে। বলে, "এ তো তমসা !"

"হ্যাঁ। কিন্তু স্থানীয়রা নৈটয়ার থেকে ওসলা পর্যন্ত তমসার যে অংশ, তাকে সুপিন-তমসা বলে।

"আর শুধু তমসা বলে কোন্ অংশকে ?"

"নৈটয়ার থেকে মোহনা অর্থাৎ ডাকপাথর পর্যন্ত, নদীর শেষাংশকে। তার মানে ওদের কাছে নৈটয়ারই তমসার জন্মভূমি, ওসলা নয়।'

মণ্ডল আর কোন প্রশ্ন করে না কিন্তু বিভাস বলে, "সুপিন নামেও তো আলাদা একটি নদী আছে ?"

"আছে বৈকি।"

"কোথায় ?" পণ্ডিত প্রশ্ন করে এবারে।

শম্ভু উত্তর দেয়, "নৈটয়ার থেকে তালুকা যাবার পথে শাঁকড়ি গ্রামের কাছে দেখতে পাবে একটি পাহাড়ী নদী এসে তমসায় মিশেছে। তাকেও স্থানীয়রা সুপিন বলেন।"

কয়েক পা এগিয়েই নৈটয়ারকে দেখতে পেলাম। তমসা উপত্যকার সব চেয়ে সমৃদ্ধ গ্রাম নৈটয়ার। উচ্চতা ৪৬০০ফুট। এপারে বাজার, বিশ্রাম-ভবন, বন ও নির্মাণ বিভাগের দপ্তর আর ওপারে গ্রাম। খান পঞ্চাশেক ঘরে শ'দুয়েক মানুষের গ্রাম। কাঠ পাথর আর টিনের ঘর। দু'তলা ঘরই বেশি, কয়েকটি তিনতলাও আছে। অন্যান্য পাহাড়ী গ্রামের মতো এখানেও নিশ্চয় ঐ সব ঘরের একতলা গৃহপালিত পশু, দু'তলা শস্য এবং তিনতলা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট।

আমরা ত্রস্তপায়ে এগিয়ে চলি বিশ্রাম ভবনের দিকে। সুশান্তবাবু দেশাই সুশীল নির্মল দাদু ও কামি বহুক্ষণ আগে পৌঁছে গেছে ওখানে। তারা বোধহয় গরম-চা

প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এবং এর কয়েকটি ছবি ভারতীয় তথ্যচিত্রের গৌরব। তাঁর মতো একজন ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে পাওয়া সৌভাগ্য।

নৃতত্ত্ব বিভাগের জন্য সুশান্তবাবু এ পর্যন্ত চৌত্রিশখানি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তিনি ১৯৫৩সাল থেকে এই বিভাগে রয়েছেন।

তার আগে কিছুকাল কলকাতার ইন্দ্রপুরী এবং মাদ্রাজের একটি স্টুডিওতে কাজ করেছেন।

পারিবারিক জীবনে সুশান্তবাবু দু'টি কন্যার জনক। স্ত্রী শ্যামলা দেবী দক্ষিণ ভারতীয়া হলেও খুব ভাল বাংলা জানেন। তিনি একজন সুলেখিকা। সাহিত্য আকাদেমীর অনুরোধে তিনি এখন শ্রীমতী রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' বইখানির তামিল অনুবাদ করছেন।

সুশান্তবাবু শুধু সুলেখক নন, তিনি সুবক্তাও। এবং যাঁরাই তাঁর ছবি একবার দেখেছেন, তাঁরাই ভাষ্যকার সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন।

"পাহাড়ী গাঁয়ের তুলনায় জায়গাটা কিন্তু একটু বেশি জম-জমাট।"

সুশান্তবাবুর কথায় সুশান্তবাবুর কথা হারিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি উত্তর দিই, "হ্যাঁ, এতটুকু পাহাড়ী গ্রামে এত বড় বাজার বড় একটা দেখা যায় না।"

"শুধু কি বাজার! দেখুন নির্মাণ বিভাগের কত বড় অফিস ও গুদাম। বন-বিভাগের অফিসটিও কাল রাতে দেখেছি, বেশ বড়।"

"বন-বিভাগের অফিস তো বড় হবেই।" শম্ভু বলে, "এটি যে ওঁদের বিভাগীয় সদর দপ্তর।"

"আচ্ছা, এ পথে, মানে এই পুরৌলা থেকে হরকিদুনের পথে ক'টি ফরেস্ট রেঞ্জ আছে।" সুশীল কথা বলে এতক্ষণ বাদে। সুশীল এই প্রথম পর্বতাভিযানে এসেছে। কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু সাহসী তরুণ। কয়েকদিনেই সে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তারও হিমালয়ের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। আর সবার যা হয়, সুশীলেরও তাই হয়েছে—পরিচয় থেকেই প্রেম। হিমালয়ের প্রেমে পড়ে সুশীল হাবুডুবু খেতে থাকল। পর্বতাভিযানের নেশা পেয়ে বসল তাকে। তাই অমূল্য বিভাস ও পণ্ডিতকে বলে এবারে ওকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। এখন পর্যন্ত যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে না ভুল করেছি।

সুশীলের প্রশ্নের উত্তরে বলতে থাকি, "তমসা উপত্যকা বনসম্পদে সম্পদশালিনী। এ পথেও দুটি ফরেস্ট রেঞ্জ রয়েছে—সিংঘুর ও সুপিন। সিংঘুর বিভাগটি শুরু হয়েছে জারমোলা-ধার থেকে আর শেষ হয়েছে মোরি-নৈটয়ার পথে চিপারাগাড্ নামে একটা জায়গায়। মোরির কাছে নানাইতে হল রেঞ্জ অফিস। এই বিভাগের আয়তন ৬১.৪৩বর্গমাইল।

"চিপারাগাডের পর থেকে একেবারে হরকিদুন এবং তালাও পর্যন্ত অর্থাৎ তমসা উপত্যকার বাকি সমস্ত বনাঞ্চলই হচ্ছে সুপিন-রেঞ্জ। এই বনবিভাগের প্রধান কর্মকেন্দ্র নৈটয়ার, আয়তন ২৭০.২০ বর্গমাইল।"

আঁকাবাঁকা উৎরাই পথে আমরা নেমে আসি তমসার তীরে। পুল পেরিয়ে আবার চড়াই পথে এগিয়ে চলি।

গ্রাম শুরু হয়ে গেছে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে গ্রাম। গাঁয়ের কর্মব্যস্ত মানুষদের সঙ্গেও দেখা হচ্ছে। তাঁরা কেউ কাঠ কাটতে বনে চলেছেন, কেউ ফসল আনতে ক্ষেতে যাচ্ছেন, কেউ বা ঘরের দাওয়ায় বসে কাজ করছেন। শীত আসছে। এখন ওঁদের অবসর কোথায় ? খাদ্য ও জ্বালানী মজুদ না করতে পারলে যে শীতকালে উপোস করতে হবে।

সদলবলে মোড়ল স্বাগত জানান আমাদের। গতকাল রাতেই সুশান্তবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। ছবি তোলার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

মোড়লের সঙ্গে এগিয়ে চলি গাঁয়ের পথে। আমরা এখন মন্দিরে চলেছি, সেখানেই শুটিং করবেন সুশান্তবাবু।

শুধু মোড়ল ও তাঁর পারিষদবর্গ নন, আরও কয়েকজন গ্রামবাসী সঙ্গী হয়েছেন আমাদের। তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে বালক, প্রবীণা থেকে নবীনা, এমন কি শিশু পর্যন্ত রয়েছে। প্রথমেই নজর পড়েছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলির দিকে। ওদের যেন আমাদের মতো রোগ শোক আর পাপের শরীর নয়। মনে হচ্ছে, এদের দেখেই সেকালের কবিরা দেবশিশুর রূপটি বর্ণনা করে গিয়েছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই শিশুদের পরে নজর পড়ে মেয়েদের দিকে। কিন্তু তাদের সৌন্দর্যের কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে আমার। সুতরাং নীরবে শুধু চেয়ে চেয়ে তাদের দেখি।

আলোক-চিত্রশিল্পী সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় কিন্তু নীরব থাকতে পারেন না। বিনা প্রস্তাবনায় তিনি বলতে শুরু করেন, "সত্যি বলছি শঙ্কুবাবু, আমি সারা ভারত ঘুরেছি, ভারতের বাইরেও কয়েকটি জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু এমন রূপসী ও স্বাস্থ্যবতী নারী কোথাও দেখি নি।"

আমি ঘাড় নেড়ে সমর্থন করি তাঁকে। সুশান্তবাবু আবার বলেন, "সব চেয়ে দুঃখের কথা, সেদিন পুরৌলার তহশিলদার এদের সম্পর্কে কি মিথ্যে কথাটাই না বলেছে। আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, যৌনব্যাধি এখানে খুবই কম। লোকটা একটা ডাহা মিথ্যেবাদী।"

"তাতে আর সন্দেহ কী!" সুশীল বলে, "নইলে সেদিন গায়ে পড়ে অমন সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ওভাবে কেটে পড়ে!"

শম্ভু সমর্থন করে তাকে, "এইসব নীতিজ্ঞানহীন অসৎ ও মিথ্যেবাদী অফিসারদের জন্যই তো আজ দেশের এ দুরবস্থা।"

আমাদের আলোচনা আর অগ্রসর হতে পারে না। মোড়ল সুশান্তবাবুকে বলেন, "আপনার কথা মতো সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি স্যার! তবে নাচগানের দৃশ্যটা বিকেলের দিকে তুলতে হবে। এখন অনেকেই কাজে বেরিয়ে গেছে কিনা।" মোড়ল বেশ ভাল হিন্দী বলতে পারেন। না পারলে বিপদ হত। বামন অবতারের কথা ভুলে যাই নি এখনও।

"এখন গাঁয়ে কি মাত্র এই ক'জন মানুষ আছেন নাকি?" সুশান্তবাবু মোড়লকে প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ, হুজুর। এমনিতেই তো তিনভাগ মানুষের একভাগ এখন গ্রামে নেই। যারা

আছে, তাদেরও বেশির ভাগ চলে গেছে—ফসল কাটতে, গরু চরাতে আর কাঠ কাটতে।"

"যাঁরা গ্রামে নেই, তাঁরা কোথায় গিয়েছেন?"

"তাঁরা ভেড়া-ছাগলের পাল নিয়ে ওপরের সব চারণভূমিতে গিয়েছে। ফিরে আসতে এখনও দিন সাতেক।"

বূপিন আর তমসার সঙ্গমটিকে এখান থেকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ওখানেই মন্দির।

শম্ভু চলতে চলতে সেই মন্দির ও তার দেবতার কথাই বলছে আমাদের। বলছে "ঐ পোখু দেবতার মন্দিরই এখানকার সমাজ-জীবনের প্রাণকেন্দ্র। টিন, কাঠ ও পাথরের মন্দির। লোকালয় ছাড়িয়ে গ্রামের শেষপ্রান্তে মন্দিরটি। দেখতে অবিকল একখানি দো-চালা টিনের বাড়ি। সামনে পাথরবাঁধানো একফালি উঠান, পেছনে প্যাগোডার গড়নে তিনতলা মন্দিরচূড়া।"

"আপনি এত জানলেন কেমন করে শম্ভুদা, আপনি কি মন্দির দর্শন করছেন?" সুশীল বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" শম্ভু উত্তর দেয়। "আমি গতকাল রাতে মোড়লের সঙ্গে গিয়েছিলাম মন্দিরে, সুশান্তদার লোকেশান দেখে এসেছি।" একবার একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে, "মন্দিরের সামনে একফালি উঠান। সেখানে কয়েকখানি পাথরের ওপরে ছোট একটি নন্দীমূর্তি। মন্দিরশীর্ষে শিখরকলস। দরজার ঠিক সামনে ঘণ্টা ঝুলছে। মন্দিরে সামনের দিকে কোন দেওয়াল নেই। কয়েকখানি খোদাই করা কাঠ দিয়ে খানিকটা অংশ শুধু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ওপরটা একেবারেই ফাঁকা এবং দরজার কবাট নেই।

"মন্দিরে উঠে প্রথম নাটমন্দির, তারপরে পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ও কবাট লাগানো গর্ভমন্দির—পোখু দেবতার আপন আলয়।

"উৎসবের সময় এই উঠানেই নাচ গানের আসর বসে। প্রতিদিন দুপুরে পোখু দেবতার পুজো হয়। এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ নেই। এখানকার অধিবাসীরা খাস রাজপুত। তাঁদেরই একটি পরিবার পুরুষানুক্রমে পোখু দেবতার পুজো করে আসছেন।"

শম্ভু থামতেই সুশীল প্রশ্ন করে, "আচ্ছা শম্ভুদা, পোখু কি শিবের স্থানীয় নাম?"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন?"

"না, মানে মন্দিরের সামনে নন্দী মূর্তি রয়েছে কিনা?"

"আমার কিন্তু ধারণা পোখু কোন বৈদিক দেব-দেবী নন, তিনি লৌকিক দেবতা। তবে নৈটয়ারবাসীরা মনে করেন পোখু তাঁদের রক্ষক ও সংহারক। তিনি একদিকে যেমন অপদেবতাদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করেন, আরেকদিকে তেমনি কোন পাপ বরদাস্ত করেন না। তাই গ্রামবাসীরা পাপাচারী হতে সাহস পান না।"

"শুনেছি এঁদের প্রণামের পদ্ধতিটি বিচিত্র?" শম্ভু থামতেই সুশীল প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।"

"কি রকম?" সুশীল জিজ্ঞেস করে।

শম্ভু বলে, "এঁরা দেবতাকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পেছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তারপরে দু'দিক দিয়ে দু'খানি হাত পেছনে বাড়িয়ে দিয়ে পিঠের সঙ্গে ঠেকিয়ে করজোড়ে পোখু দেবতাকে প্রণাম করেন। অর্থাৎ প্রণামের সময় দেবদর্শন করেন না।"

"কে এই বিচিত্র নিয়মের প্রচলন করেছেন?"

"তা কেউ বলতে পারেন না। তবে শুনেছি, জনৈক পূজারী নাকি এই নিয়মের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাই একদিন তিনি মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে পোখু দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিলেন। তারপরে সশ্রদ্ধ চিত্তে দেবদর্শন করে সামনের দিকে হেঁটে মন্দিরে প্রবেশ করলেন।"

"কি হল তাঁর ?" সুশীল এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে।

শম্ভু উত্তর দেয়, "কেউ জানে না। কিন্তু তারপরে সেই পূজারী নাকি আর মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন নি। নৈটয়ারের মানুষ আর কখনও দেখেন নি সেই পূজারীকে।"

বিশ্রাম-ভবনে ফিরে এসে ব্রেক-ফাস্ট সেরে নিয়ে রওনা হতে সওয়া ন'টা বেজে গেল। খচ্চর ও কুলিরা আগেই রওনা হয়েছে। দেশাই নির্মল এবং কামিকে নিয়ে দাদুও বেরিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। তাকে যে 'হট্ লাঞ্চ'-য়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

আজও পাসাং এবং দোরজি খচ্চরদের সঙ্গে গিয়েছে। তবে প্রাণেশ ও বিভাস তাদের সহযাত্রী হয় নি। তারা আজ আমাদের সঙ্গী।

খচ্চর না থাকলেও কুকুরটা রয়েছে সহনেতার সঙ্গে লালু যে কেন হঠাৎ বিভাসের এমন ভক্ত হয়ে উঠল, বুঝতে পারছি না। মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় ওদের দু'জনের প্রথম পরিচয় হয়েছে। কি জানি হিমালয়ের কুকুর ! হযতো টের পেয়ে গেছে যে বিভাসই এখন অভিযানের নেতা।

কিন্তু লালুর মতলবটা কি ? সে আর কদিন থাকবে আমাদের সঙ্গে ? হিমালয়ের অধিকাংশ বিশ্রাম-ভবনে এমনি দু-একটি কুকুর থাকে। তারা ট্যুরিস্ট্দের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে। চলে যাবার সময় তাঁদের খানিকটা দূর অবধি এগিয়েও দেয়। কিন্তু তারপরেই আস্তানায় ফিরে যায়। অথচ লালুর এখন পর্যন্ত চলে যাবার কোন লক্ষণ নেই !

বিশ্রাম-ভবন থেকে বেরিয়ে আমরা সমতলক্ষেত্রে নেমে এসেছিলাম। সেই ক্ষেত শেষ হয়ে গেল। এবারে একটা গাছে-ছাওয়া পাহাড়ে উঠে এলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। মাঝে মাঝে ঝরণা—কোনটি ছোট, কোনটি বড। কোনটির ওপরে কাঠের পুল, কোনটি বা পায়ে হেঁটে পেরোতে হচ্ছে।

আমরা সারি বেঁধে পথ চলেছি। সবার আগে লালু, তারপর বিভাস। আর সবার শেষে মণ্ডল, তার পেছনে বচন সিং। বলা বাহুল্য, মণ্ডল প্রজাপতি ধরতে ধরতে ধীরে-সুস্থে পথ চলেছে।

কয়েকজন কুলি পথের পাশে মাল নামিয়ে রেখে মহাসুখে বিড়ি ফুঁকছে। প্রাণেশ তাদের পথ চলার তাগিদ দেয়। বলে, "এক মাইল এসেই বসে পড়লে ! আজ যে বারো মাইল যেতে হবে রে ভাই !"

"এক সিগ্রেট দে বেটা...এক সিগ্রেট..."

চমকে উঠি। থমকে দাঁড়াই। জনৈকা প্রৌঢ়া। পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আমার কাছে সিগারেট চাইছেন। তাঁর পরনে কম্বলের পোশাক, হাত কান নাক ও গলায় ভারী রুপোর গয়না। পিঠে একটা পশমের বোঝা।

অবাক হই না। আমাদের দেশের মেয়েরাও তো অনেকে ধূমপান করেন। কেবল অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলারা নন, বহু সুশিক্ষিতা শহুরে ভদ্রমহিলাও হমেশা 'স্মোক্' করে

থাকেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে জনৈকা প্রৌঢ়া স্কলারকে দেখেছি, যাঁকে সিগারেট খেতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাইরে যেতে হয়।

কিন্তু বিপদ হচ্ছে, আমি নিজে সিগারেট খাই না। তবে ভরসার কথা আমার সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই ও-বস্তুটি পছন্দ করেন। তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে একটি সিগারেট নিয়ে প্রৌঢ়ার হাতে দিই। খুশি হয়ে তিনি কি যেন বললেন আমাকে, বোধহয় আশীর্বাদ করলেন। মন্দ কি—পরের ধনে পোদ্দারি করা গেল!

মহিলাটি সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন, কিন্তু পথ ছাড়েন না। পথ আগলে দাঁড়িয়ে তিনি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁর সব কথা বুঝতে পারছি না। যতটুকু বুঝতে পারছি, তাতে মনে হচ্ছে—তাঁর নাম ফুল। সামনেই ঐ পাহাড়টার ওপাশে ছোট একটি অধিত্যকা আছে, সেখানেই তাঁর ঘর। ঘরে তাঁর ছেলে-মেয়ে এবং স্বামীরা আছেন। একফালি ক্ষেত ও কয়েকটা ভেড়া আছে তাঁদের। সেই ভেড়ার পশম নিয়েই তিনি নৈটয়ার চলেছেন—বিনিময়ে নমক এবং মিট্টিকা তেল নিয়ে আসবেন।

এ অঞ্চলে এখনও বিনিময় প্রথার প্রচলন রয়েছে। এরা জিনিসের বদলে জিনিস চায়। এমনকি শ্রমের পরিবর্তেও জিনিস পেলে খুশি হয়। টাকা নিয়ে কি করবে এরা? টাকা দিয়ে জিনিস কিনতে হলে তো সেই নিচে যেতে হবে। জিনিস বলতে অবশ্য প্রধানত তিনটি—কেরোসিন, চিনি ও নুন। তবে দেশলাই জুতো এবং একটু সরষের তেল পেলেও খুশি হয়। আর কিছু বড় একটা দরকার হয় না এদের। তমসা উপত্যকা বেশ উর্বরা। ক্ষেতে যা খাবার হয়, তাতেই চলে যায় কোন মতে। পোশাকও এরা ঘরে তৈরি করে নেয। ভেড়ার লোমের কম্বল বুনে প্যান্ট-কোট বানায়।

প্রৌঢ়া একটি সুখবর জানান আমাদের। বলেন, "আরেকটা জিনিসও আমরা ঘরেই তৈরি করে নিই।"

"কি?"

"দারু...সরাব।"

মহিলাটি চলে গিয়েছেন আপন পথে, আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের পথে। তমসার তীরভূমি দিয়ে পথ। তমসা আজ মাঝে-মাঝেই দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি সব সময়।

চড়াই পথ বেয়ে সংকীর্ণ একটি গিরিখাতের উপরে উঠে এলাম। এখন বেলা সাড়ে দশটা। সোয়া ঘণ্টায় আমরা মাত্র দু'মাইল এসেছি। এত আস্তে হাঁটতে চলবে না। তালুকা এখনও দশ মাইল।

মুশকিল হয়েছে মণ্ডলকে নিয়ে। সে বোধহয় বহু পেছনে। থাক গে, তার সঙ্গে বচন রয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে আসি সেই ক্ষুদে গিরিখাত থেকে।

কিছুদূর এসে কয়েকজন পথচারীর সঙ্গে দেখা হল। পথচারীদের সংখ্যা বড়ই কম এ-পথে। তবে আনন্দের কথা, তাদের অধিকাংশই যুবতী—সুন্দরী যুবতী।

ওরা চলে গেল। আমরাও এগিয়ে চলি।

সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম তাকে—তুষারাবৃত হিমালয়কে। মুহূর্তে সকল পথশ্রম দূর হয়ে গেল। আমার দেহ ও মন জুড়িয়ে এল।

কতদিন পরে আবার দেখা হল! গত বছর আমার আসা হয়নি হিমালয়ে। প্রায় দু'বছর বাদে আজ দেখা হল হিমতীর্থ-হিমালয়ের সঙ্গে। আমি তাই প্রাণভরে দেখে নিই

তাকে। এ দেখার শেষ নেই। তাহলেও একসময় পথচলা শুরু করতে হয়।

যতদূর মনে হচ্ছে সামনের তুষারধবল শৃঙ্গটিই স্বর্গারোহিণী। ২০,৫২১ফুট উঁচু ঐ শৃঙ্গটিকে স্থানীয়রা বলেন—সুগনালিন। আর প্রখ্যাত পর্বতারোহী এবং হিমালয়-প্রেমিক জে. টি. এম. গিব্‌সন বলেছেন—Sugnalin is a corruption of Swargarohini; meaning "The Path to Heaven" a fine name for a fine mountain.

আমরা তার কাছেই চলেছি। তমসা তো তারই তুষারবিগলিত বৈতরণী। তাছাড়া স্বর্গারোহিণী যে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে আমাদের। আমরা জোর কদমে এগিয়ে চলি।

কিন্তু চলতে চাইলেই কি চলার উপায় আছে? কুলিরা আজ বড়ই গোলমাল করছে। কয়েকজন কুলি পথের পাশে মাল নামিয়ে রেখে তাস খেলতে শুরু করেছে। প্রাণেশ অনেক বলে-কয়ে তাদের পথ-চলা শুরু করায়।

আজ কুলিদের বারে বারে এত বিশ্রাম নেবার কোন কারণ নেই। আজকের পথ মোটেই দুর্গম নয়।

নৈটয়ার থেকে মাইল চারেক এসে মৌটার—ছোট গ্রাম। খান পঁচিশেক ঘর আর শ'দেড়েক মানুষ নিয়ে গ্রাম। পথের ধারে একটিমাত্র চায়ের দোকান। আমরা সেই দোকানের দাওয়ায় এসে বসি। একে তো মণ্ডল পেছিয়ে পড়েছে, তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত হবে। তার ওপরে আড়াই ঘণ্টা ধরে একটানা হাঁটছি। এখন এক গ্লাস গরম চা পেলেই ভাল হয়।

চা শেষ করার আগেই কুলিরা এসে ঘেরাও করল—ওরাও চা খাবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া উচিত নয়। সুতরাং দোকানীকে আবার চা বানাতে বলি।

মণ্ডলের পাত্তা নেই। আর কতক্ষণ বসে থাকব? খিদে পেয়ে গেছে। শুধু চায়ে কি পোড়া পেটের জ্বালা মেটে!

পণ্ডিত তাগিদ দেয়, "চলুন তো এবারে রওনা হওয়া যাক্। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। দেখলেন না, বিভাস নেতা হয়েও লালুকে নিয়ে কেমন গট্‌মট্ করে করে এগিয়ে গেল।"

অতএব আমরাও এগিয়ে চলি। মণ্ডলের জন্য চিন্তার কি আছে? ওর সঙ্গে তো বচন সিং রয়েছে।

কয়েক পা এগিয়েই জনৈক গ্রামবাসীর সঙ্গে আলাপ হয়। সে জানায়—মৌটার ছোট গ্রাম হলেও, সামনের ঐ পাহাড়টার ওপারে কোটগাঁও নামে বেশ বড় একটি গ্রাম আছে। প্রায় সাড়ে তিনশ' লোকের বাস। শ'দুয়েক একর জমি আর গুটি ষাটেক ঘর নিয়ে গ্রাম। লোকটি সেই গ্রামেই চলেছে। সমানের পাহাড়ী নদীটা পেরিয়ে সে ডানদিকের চড়াই পথ ধরবে আর আমরা বাঁদিকের প্রায় সমতল পথে এগিয়ে যাব তালুকার দিকে।

পণ্ডিত রেগে গিয়ে আমাকে বলে, "কোটগাঁও-য়ের খবর নিয়ে কি হবে? ওকে শাঁকড়ির কথা জিজ্ঞেস করুন। শাঁকড়ি আর কত দূর?"

"দেড় মাইল।" আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই।

"কেমন করে বুঝলেন?"

"খুব সহজ। মৌটার থেকে শাঁকড়ি দু'মাইল। আমরা তার মাইল আধেক পথ পেরিয়েছি।"

"দেড় মাইল! তার মানে এখনও ঘণ্টাখানেক লাগবে। তাড়াতাড়ি পা চালান,

বিভাস বোধহয় এতক্ষণে গরম গরম খিচুড়ি নিয়ে বসে পড়েছে।”

অনুমানটা অমূলক নাও হতে পারে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই আবার থামতে হয়। ওখানে আমাদের মালপত্র পড়ে আছে কেন? কুলিরা কোথায় গেল? ছুটে আসি আখরোট গাছটির গোড়ায়।

হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। মালপত্র পথের ওপর ফেলে রেখে ওরা গাছে উঠেছে—আখরোট পাড়ছে।

অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে প্রাণেশ ওদের গাছ থেকে নামায়। কুলিরা সাধারণত প্রাণেশের কথা শোনে। সে যে একটু-আধটু নেপালী বলতে পারে।

কুলিদের সঙ্গে নিয়ে আমরা আবার পথ-চলা শুরু করি। তমসা আবার কাছে এসেছে। এখান থেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। আঁকাবাঁকা একটি নীলধারা। তার দু'পাশের বেলাভূমি সাদা। তারপরে শুধুই রঙের মেলা—সোনালী ক্ষেত, সবুজ বন আর ধূসর পাহাড়।

আমাদের চোখ কিন্তু তমসার তীরে, তার শ্বেতশুভ্র বেলাভূমির দিকে। ওখানে কয়েকখানি ঘর দেখতে পাচ্ছি—এখান থেকে ঠিক খেলাঘরের মতো মনে হচ্ছে।

না, ওগুলো কারও বসতবাড়ি নয়—ঠিকাদারদের কাঠ পরিবহন কেন্দ্র। তাঁরা পাশের পাহাড়টা ইজারা নিয়েছেন বন-বিভাগের কাছ থেকে। পাহাড়ের ওপরে বন কাটা হচ্ছে। 'রোপওয়ে' দিয়ে কাঠ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওখানে। ঠিকাদারদের লোক ওখান থেকে সেই কাঠ জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তমসা বিনা পারিশ্রমিকে তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিচের সমতলে।

কাঠগুলো যখন পাহাড় থেকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে তমসার তীরে নেমে যাচ্ছিল, তখন দেখতে ভারী মজা লাগছিল। আমরা তাই দাঁড়িয়েছিলাম রোপওয়ের নিচে।

কিন্তু সেতীরামের তাগিদে আব দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না। এতক্ষণ আমরা তার কুলিদের তাড়িয়ে এনেছি, এবারে সে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

সেতীরাম ছিল সবার পেছনে। তাই নিয়ম। সব কুলিদের রওনা করে দিয়ে মেট রওনা হয়। কিন্তু সে নিজে কোন মাল বয় না। অথচ আমাদের সুবিধার জন্য সেতী আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বিরাট এক বোঝা পিঠে নিয়েছে! তা সত্ত্বেও সে আমাদের ধরে ফেলেছে।

সেতীর সঙ্গে পথ চলতে থাকি। কয়েক পা এগিয়ে একটা পাহাড়ী ঝরণা—কিছুদূরে গিয়ে তমসায় মিশেছে। ঝরণা-তীরে পানিচাক্কি অর্থাৎ আটার কল, তেল কয়লা কিংবা বিদ্যুৎচালিত কল নয়, পাহাড়ী ঝরণার উচ্ছ্বসিত জলধারার সাহায্যে যাঁতা ঘুরিয়ে আটা তৈরী করা হয় ওখানে।

ঘরটির দিকে আমাকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সেতী জিজ্ঞেস করে, “একবার ভেতরে গিয়ে পানিচাক্কি দেখে আসবেন নাকি?”

সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হই। সেতীর পেছনে নেমে আসি ঝরণার তীরে—পানিচাক্কিতে। নিচু ও অন্ধকার ছোট একখানি পাথরের কুঠিয়া। ঝরণা থেকে একটি ধারাকে কৃত্রিম উপায়ে সেই ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। আর তারই স্রোতে প্রকাণ্ড একখানি পাথরের যাঁতা বন-বন করে ঘুরছে। এখন মণ্ডুয়ার আটা তৈরী হচ্ছে। মণ্ডুয়া দেখতে অনেকটা সর্ষের মতো। পথের ধারে কোমরসমান গাছে থোকা থোকা মণ্ডুয়া আজ আমরা

মাঝেমাঝেই দেখতে পেয়েছি।

সেতীরামের সঙ্গে আবার উঠে আসি পথে। কিছুদূর এগিয়ে আবার একটি মণ্ডুয়ার ক্ষেত। ক্ষেতের ধারে বসে একজন জোয়ান যুবক বিড়ি ফুঁকছে। আর জনৈকা বৃদ্ধা ও দুটি কিশোরী ক্ষেতে কাজ করছে।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা জানান—ঐ যুবকটি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আর মেয়ে দুটি তাঁর নাতনী।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর। বৃদ্ধা মা ও কিশোরী কন্যারা ক্ষেতে কাজ করছে আর জওয়ান বাপ বসে বিড়ি ফুঁকছে! কিন্তু হিমালয়ে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে সন্তানপালন থেকে ক্ষেতখামার ও ঘরের কাজ সবই করে মেয়েরা। ছেলেরা বড় জোর ভেড়া চরায়, কিংবা দোকান চালায়।

ক্ষেতের মাঝে ছোট একটি ঘর দেখে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করি, "ওটা কি?"

বৃদ্ধা বলেন, "রাতে আমরা ঐ ঘরে বসে ভালুক তাড়াই।"

"ভয় করে না?"

মেয়ে দুটি খিল খিল করে হেসে ওঠে। বলে, "ভয় করবে কেন? এখানে অপদেবতা নেই। আর এখানকার ভালুক কখনও মানুষ মারে না। মানুষকে তারা ভীষণ ভয় করে। চিৎকার করলেই পালিয়ে যায়।"

অথচ সামনের ঐ গিরিশ্রেণীর ওপারে—যমুনোত্রী উপত্যকায় একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। সেখানে প্রতি বছর ভালুকের আক্রমণে একাধিক মানুষ মারা যায়।

পরে এর কারণ অনুমান করেছি। তমসা উপত্যকার এই অঞ্চল সংরক্ষিত বন—নাম গোবিন্দ পশুবিহার। এখানে শিকার নিষিদ্ধ। সম্ভবত মানুষ অহিংস বলে এখানকার পশুরাও হিংসা ভুলে গিয়েছে।

বৃদ্ধা জানালেন—শাঁকড়ি সামান্যই দূর এখান থেকে। সামনের ঐ বড় বাঁকটা পেরোলেই শাঁকড়ি দেখা যাবে।

খিদেটা যেন আবার চাড়া দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি।

বৃদ্ধা ঠিকই বলেছেন। বাঁকটা পেরিয়েই শাঁকড়ি দেখতে পেলাম। খুব বড় নয় গ্রামটি, তবে বেশ জমজমাট। বাঁদিকে সমতল উপত্যকা। তারপরে তমসা। ওপারে একটি নদী এসে তমসায় মিশেছে। ওরই নাম সুপিন।

পথের পাশে কয়েকটি দোকান ও বাড়ি-ঘর। একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে এখানে। অবশ্য তাতে ডাক্তার আছেন কিনা জানি না। ইতিপূর্বে হিমালয়ের বহু ডাক্তারহীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখবার দুর্ভাগ্য হয়েছে আমার।

না, এজন্য ডাক্তারদের দোষ দেওয়া বৃথা। এই দূর দুর্গম অঞ্চলে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা না পেলে কোন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়, কর্তৃপক্ষ তার অধিকাংশই দিতে প্রস্তুত নন। কারণ হিমালয়ের এই অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষগুলি যদি বিনা চিকিৎসায় দেহত্যাগ করে, তাহলে সচিবালয়ের কিছুই এসে যায় না।

মাত্র পঁচিশ একরের মতো জমি নিয়ে শাঁকড়ি গ্রাম। খান পনেরো ঘরে শ'খানেক মানুষ বাস করেন এই গাঁয়ে। তাহলেও ছবির মতো সুন্দর একখানি গ্রাম।

সবই তো বুঝলাম—সুন্দর গ্রাম, শান্ত ও স্নিগ্ধ গ্রাম—কিন্তু তারা কোথায়? দাদু

নির্মল দেশাই ও আমাদের শেরপা পাচক কামি ? বিভাসটাই বা লালুকে নিয়ে কোথায় গেল ? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে কি কোন কারণে আজও পথে রান্না করা সম্ভব হয় নি ? কিন্তু খিদেয় যে পেট জ্বলে যাচ্ছে। দোকানেও চা-বিস্কুট বড় জোর ঠাণ্ডা পকোরার বেশি কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

একটি দোকানে কয়েকজন লোক বসেছিলেন। তাঁরা কেউই কোন হদিস দিতে পারলেন না। তবে অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে দোকানী জানায়, "হ্যাঁ, কয়েকজন সাহেবকে যেতে দেখেছি বটে। আপনারাও এগিয়ে যান না, দেখা হয়ে যাবে।"

পথে বেরিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমরা আর কিই বা করতে পারি ?

কিছুই করতে হল না। শাঁকড়ি ছাড়িয়েই দেখতে পেলাম ওদের। না, স্থান নির্বাচনের জন্য দাদুকে প্রশংসা করতে হবে বৈকি। পথের পাশে ঝরণার ধারে চমৎকার একখানি পাথরের নিচে রান্নার ব্যবস্থা করেছে। বিভাস, দেশাই ও নির্মল খেতে বসে গেছে। আমরা ছুটে চলি ওদের কাছে।

॥ সাত ॥

অতি উপাদেয় খিচুড়ি রেঁধেছে কামি। জানি না বেশি খিদে পাবার জন্যই এত ভাল লাগল কিনা ? তবে আরেকটু ভাগে পেলে যেন ভাল হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমাদের মাত্র দু'টি 'প্রেসার কুকার'। পদযাত্রার মাঝপথে একবারের বেশি রান্না করার উপায় নেই। একবারে যা রান্না হয়েছে, তাই ভাগ করে খেতে হল।

তাও তো আজ আমরা মোটে বাইশজন—চোদ্দজন সদস্য, তিনজন শেরপা, সেতীরাম ও 'কিচেন'-য়ের দুজন কুলি এবং লালু। ওপরে গিয়ে দুই প্রেসার কুকার খিচুড়ি তিরিশজনকে ভাগ করে খেতে হবে। নেতা সহ পাঁচজন সদস্য ও বিজীন্দর আজ আমাদের সঙ্গে নেই। ওসলা গাঁয়ে গিয়ে দু'জন স্থানীয় পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিতে হবে।

পর্বতাভিযানের সময় মূল পরিবার দু'টি—একটি সদস্যদের, আরেকটি মালবাহকদের। প্রথমটি একান্নবর্তী আর দ্বিতীয়টি বহু সরিকে বিভক্ত। সাধারণত তিন-চারজন করে কুলি একসঙ্গে রান্না করে খায়। কারণ ওরা সকলেই নেপালী এবং হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ওদের মধ্যে জাতিভেদ আছে—সবাই সবার ছোঁয়া খায় না।

পরিমাণে একটু কম হলেও আমাদের পরিবারের সবাই এখানে খেতে পেয়েছি এবং যা খেয়েছি, তাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশ চলে যাবে। কিন্তু কুলিরা যে এখানে কিছুই খেতে পেল না। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় আমরা ওদের রেশন দিয়ে দিই—চাল আটা আলু আচার মশলা তেল নুন চা চিনি দুধ ও সিগারেট। সকালে সময়াভাবে ওরা রান্না করতে পারে না। শুধু চা বানায়। আগের দিন রাতের রুটি ও চা খেয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। এটুকু খেয়েই সারাদিন দুর্গম পথে মাল বইবার অভ্যেস আছে ওদের। এবং হয়তো দিনের আলো থাকতে ওদের খিদে পায় না। কারণ সেটি এই উপমহাদেশে অন্যায়। এখানে যারা ক্ষেতে-খামারে, পথে-প্রান্তরে ও সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে কাজ করে, তাদের সারাদিনে একবারের বেশি খিদে পেতে নেই।

তাহলেও কুলিরা যখন আমাদের মাল পাশে রেখে আমাদেরই খাওয়া দেখছিল, তখন বড় খারাপ লাগছিল কিন্তু কিচেনের কুলিরা তাদের সহযোগীদের সেই সকরুণ দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। বরং তাদের শুনিয়েই কামিকে বলেছে—আজ বহুত আচ্ছা খিচ্‌ড়ি বানায়া ওস্তাদ !

কুলিরা শেরপাদের ওস্তাদ বলে ডাকে।

কিচেনের কুলিদের সেই উক্তি শুনে সম্ভবত অন্য কুলিরা তাদের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করেছে এবং নিজেদের দুভার্গ্যকে অভিসম্পাত দিয়েছে।

দেবারই কথা। কারণ কিচেনের কুলিরা কেউ 'স্টুয়ার্ড' নয়, তারাও সাধারণ মালবাহক। একই সঙ্গে উত্তরকাশীতে আমাদের কাজে লেগেছে, একই সমান মজুরী পাবে। নেহাৎ অদৃষ্টের জোরে তারা কামির সুনজরে পড়ে গিয়েছে। সে তাদের সহকারী নিযুক্ত করেছে। ফলে তারা আমাদের পরিবাভুক্ত হয়ে গিয়েছে—হাল্কা কাজ করছে, ভাল খেতে পাচ্ছে এবং সহকর্মীদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারছে। সব চেয়ে বড় কথা ওপরে গিয়ে তারাও আমাদের সঙ্গে তাঁবুতে শুতে পারবে। আর কুলিরা থাকবে ত্রিপলের ছাউনিতে।

কিন্তু কিচেনের কুলিদের কথা থাক, কিচেনের অধিকর্তার কথায় আসা যাক। পর্বতাভিযানের খাদ্যমন্ত্রী হল কোয়ার্টার-মাস্টার।

আমাদের কোয়ার্টার-মাস্টার দাদু ওরফে বঙ্কিম মল্লিক একজন অভিজ্ঞ ও পরিশ্রমী পর্বতাভিযাত্রী। বয়সের দিক থেকে তার স্থান সুশান্তবাবুর পরেই। এখন চুয়াল্লিশ চলছে। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় হলেও সে আমার পরে হিমালয়ে এসেছে, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে—প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবি দেখে। সেবারে দাদু কেদার-বদ্রী দর্শন করেছে। তারপরে ১৯৫২ সালে দিদিমা শ্রীমতী রেখাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে অমরনাথে গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, '৫২-তে শিলং ও কামাখ্যা আর '৫৭ সালে নেপালের পশুপতিনাথ।

কিন্তু তাতে তৃষ্ণা মেটে নি দাদুর। পারিবারিক দিক থেকে প্রখ্যাত পর্বতারোহী বিশ্বদেব বিশ্বাসের মা তার ভাগনী। শ্রীবিশ্বাস তাঁর দাদু বঙ্কিম মল্লিককে পর্বতারোহী ও লেখক সুনীল চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সুনীলের সাহায্যে দাদু ১৯৫৮ সালে দৃতাগারের রূপকুণ্ড পদযাত্রায় অংশ নেয় এবং পরের বছর তারই সঙ্গে সুন্দরডুঙ্গা' অভিযানে যোগদান করে। (সুনীলের 'অভিযাত্রীতীর্থ সুন্দরডুঙ্গা' বইখানি দ্রষ্টব্য।) ১৯৫০ ও '৫১ সালে দৃতাগারের দু'টি যোগীন অভিযানেই দাদু কোয়ার্টার-মাস্টারের কর্তব্য পালন করেছে। ১৯৫১ সালের সফলকাম অভিযানে সে ২০,৪০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেছিল। সুতরাং আমাদের কোয়ার্টার-মাস্টার একজন অভিজ্ঞ অভিযাত্রী।

পরিশ্রমীও বটে। সে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে কামি ও তার সহকর্মীদের ঘুম ভাঙায়। আমাদের বেড্‌-টি ও ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত করে। প্রতিদিন প্রথম দলে পথে বেরোয়। পথের মাঝে আমাদের হট্‌-লাঞ্চ খাইয়ে প্রথম গন্তব্যস্থলে পৌঁছে রাতের রান্নার যোগাড় করে। এবং সবার শেষে শয্যা নেয়।

বিশ্বদেব বিশ্বাসের দাদু বলে বঙ্কিম মল্লিক আজ আমাদের সবারই দাদু হয়ে গিয়েছে। দাদু নিঃসন্তান। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণতম পর্বতাভিযাত্রী শৈলেশদার (শৈলেশ চক্রবর্তী—'নীল-দুর্গম' দ্রষ্টব্য) সঙ্গে তার মিল রয়েছে। কিন্তু শৈলেশদা চুয়াত্তর বছর বয়সেও পর্বতাভিযানে অংশ গ্রহণ করে চলেছেন, দাদু কতদিন পারবে ?

আগেই বলেছি, দাদুর স্থান নির্বাচনটি চমৎকার হয়েছে। মনের মতো জায়গা খুঁজে পাবার জন্যই সে শাঁকড়ি ছাড়িয়ে এতটা পথ এগিয়ে এসেছে। পথটি এখানে প্রশস্ততর। ডানদিকে খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপর থেকে চমৎকার একটি ঝরণা নেমে এসে পথের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাঁদিকের সমতলে অবতরণ করেছে। সমতল জায়গাটি শুধু ক্ষেত নয়, সেই সঙ্গে গ্রাম—সৌর গ্রাম। শাঁকড়ির দক্ষিণ-পূর্বে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গ্রাম। একই রকম অবস্থান। তমসার দক্ষিণ তীরে নৈটয়ার-তালুকা পথের বাঁদিকে অবস্থিত। পাশাপাশি দু'টি গ্রাম—শাঁকড়ি ও সৌর। শাঁকড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সৌর সেখান থেকে শুরু। দেখে মনে হয় একই গ্রাম। কিন্তু ভিন্ন এদের নাম, ভিন্ন এদের মোড়ল ও মন্দির।

শাঁকড়ি সদর, সৌর শহরতলী। শাঁকড়ি কর্মচঞ্চল, সৌর শান্ত ও স্নিগ্ধ। শ'দেড়েক একর জমি, গুটি পঞ্চাশেক ঘর এবং শ'তিনেক সরল ও সুশ্রী মানুষকে নিয়ে ছবির মতো সুন্দর একটি গ্রাম সৌর।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দাদু তার দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। নির্মল ও দেশাই তার সঙ্গী হল। একে তো দাদুকে তালুকা গিয়ে রাতের রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে, তার ওপরে এবেলা নাকি তাকে ভাঙ 'কালেকশন' করতেই হবে।

কথাটা এর আগে বলতে ভুলে গিয়েছি। গতকাল এবং আজ দু'দিন পথের পাশে প্রচুর ভাঙ গাছ দেখেছি, বিস্মিত হই নি। গাড়োয়াল-হিমালয়ে পথে-প্রান্তরে এই মূল্যবান বস্তুটির প্রাচুর্য আমাদের অজানা নয়। কিন্তু ইতিপূর্বে পদযাত্রায় এসে কাউকে তা 'কালেক্ট' করতে দেখি নি, বড়জোর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভাঙের পাতা চিবুতে দেখেছি। ওতে নাকি পদযাত্রী হারিয়ে-ফেলা দম ফিরে পায়।

যাক গে যে কথা বলছিলাম। দাদু চলে যাবার পরেই বিভাস এবং মামাও রওনা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণটা বুঝতে পারছি না। তারাও কি ভাঙ সংগ্রহ অভিযান চালাবে নাকি? হতেও বা পারে, ওরা যে মামা ভাগনে এবং দাদু।

শেষ পর্যন্ত সুশীল প্রাণেশ এবং আমার ওপর দিলীপকুমারের দায়িত্ব চাপিয়ে লালুকে নিয়ে সহনেতা কেটে পড়ল। পণ্ডিত এবং মামা তার সঙ্গী হল। বলা বাহুল্য মণ্ডল ও বচনকে খাবার দেওয়া বাসনপত্র ধোবার জন্য ওরা কিচেনের একজন কুলিকে এখানে রেখে গেল।

বিভাস কিন্তু ভুল করে নি কিছু। বরং সে প্রাণেশকে রেখে গিয়ে নির্ভুল নেতৃত্বের পরিচয় দিল। কারণ প্রাণেশ এখন আমাদের দলে সব চেয়ে কৃতী এবং অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। যাঁরা আমার 'নীল-দুর্গম', 'গহন-গিরি-কন্দরে', 'উত্তরস্যাং দিশি', 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' ও 'গঙ্গা-যমুনার দেশে' বই ক'খানি পড়েছেন, তাঁদের কাছে প্রাণেশ চক্রবর্তী মোটেই অপরিচিত নয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সে পর্বতারোহণে অংশ নিয়ে আসছে। একটি আন্তর্জাতিক অভিযানসহ এ পর্যন্ত আটটি পর্বতাভিযানের অংশগ্রহণ করে পাঁচটি শিখরে আরোহণ করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তার মানা (২৩,৮৬০) আরোহণ (১৯৫৬) আজও ভারতের বে-সরকারী পর্বতাভিযানের উল্লেখযোগ্য একটি শিখরারোহণ। *

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মানা ছিল ভারতের বে-সরকারী পর্বতারোহণের সর্বোচ্চ শিখর। ১৯৫৯ সালে গুজরাটের পর্বতারোহীরা আবিগামিন (২৪,১৩০) আরোহণের পরে এই গৌরব পশ্চিমবঙ্গের হাতছাড়া হয়ে যায়। আনন্দের কথা ১৯৫৩ সালে মাউন্টেন লাভার্স এসোসিয়েশনের (আসানসোল) সদস্যরা ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কামেট (২৫,৪৪৭) শিখরে আরোহণ করে পশ্চিমবঙ্গের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেছেন। মজার ব্যাপার যে অভিযাত্রীটি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছ, তারও নাম প্রাণেশ—প্রাণেশ চৌধুরী।

সুতরাং বিভাস আমার মতো দুর্বল এবং সুশীল ও মণ্ডলের মতো অনভিজ্ঞ অভিযাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য প্রাণেশকে রেখে গেল। তাছাড়া পর্বতাভিযানে পদযাত্রার সময়ে সব চেয়ে শক্তিশালী সদস্যকে সর্বদা সবার শেষে থাকতে হয়।

ওরা চলে গেছে তালুকার পথে আর আমরা তাকিয়ে রয়েছি নৈটয়ারের দিকে, মণ্ডল ও বচনের পথ চেয়ে। প্রাণেশ ও সুশীল কি ভাবছে জানি না। কিন্তু আমি ভাবছি লালুর কথা—আমাদের দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। যথারীতি যে বিভাসের আগে আগে পথ-চলা শুরু করেছে। তাকে দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না সে অদূর ভবিষ্যতে সে আমাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু আমরা যে ধূমধার-কান্দি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে হরশিল উপত্যকায় চলে যাব। আর তো এপথে ফিরে আসব না। জারমোলার কুকুরকে হরশিলের কুকুররা আশ্রয় দেবে কেন? তখন লালুর কি হাল হবে? অথচ ওকে তো আমরা কলকাতায় নিয়ে যেতে পারব না। হিমালয়ের কুকুর কলকাতার গরম সইতে পারে না। খুব ছোট বয়সে নিয়ে গেলে তবু কিছুদিন বাঁচে, লালু যে দু'দিনেই মরে যাবে।

লালুর ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি বটে কিন্তু ভাবনাটা বোধহয় অর্থহীন। লালু এখনও ফেরার নামটি করছে না। তবে ওপরে গিয়ে বরফ দেখলেই শ্রীমান সারমেয় পালাবার পথ পাবে না। এক দৌড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। সুতরাং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহযাত্রীটির উত্তর-পুরুষের জন্য দুশ্চিন্তা করা অর্থহীন।

এবং আমি তার আর সুযোগও পাই না। সুশীল সহসা বলে ওঠে, "মণ্ডলদারা এলে তো জয়বাহাদুরই তাঁকে খেতে দেবে, তাঁরা নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন এখানে।"

আমি মাথা নাড়ি। সুশীল প্রস্তাব পেশ করে, "চলুন না, এই অবসরে গ্রামটি একবার দেখে আসি।"

প্রস্তাবটা ভালই। সুতরাং আমি ও প্রাণেশ মেনে নিই। আমরা উঠে দাঁড়াই। জয়বাহাদুরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আমরা গ্রামের পথে এগিয়ে চলি।

আমাদের কয়েকজন কুলি পথের ধারে বিশ্রাম করছে। তাঁদেরই একজন সহসা সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রাণেশ জিজ্ঞেস করে, "কি খবর দিলবাহাদুর?"

"ভাল নয় সাব।"

আঁতকে উঠি। কি হল আবার!

প্রশ্ন করতে হয় না। দিলবাহাদুর নিজেই বলে, "সাব্, ভুখ লাগ্ গিয়া।"

ভুখ মানে খিদে! না, তা তো লাগা উচিত নয়। ওরা যে মেহনতী মানুষ এত সহজে খিদে পাওয়া সাজে না ওদের।

কিন্তু সেকথা বলতে পারি না, কিছুক্ষণ আগেই যে খিদের জ্বালা সইতে হয়েছে

আমাকে। তাহলেও আমি নিরুপায়। দেবার মতো কোন খাবারই এখন নেই আমাদের কাছে। টাকা থাকলেই খিদে মেটানো যায় না হিমালয়ের পথে—এখানে দোকান নেই। তবু প্রশ্ন করি দিলবাহাদুরকে, "কি খাবে ?"

"আলু—আলু খাবো সাব।"

আলুসেদ্ধ বা আলুপোড়া হিমালয়ের মানুষদের অন্যতম 'মেজর ফুড'। তারা অনেকেই রুটির বদলে আলু খেয়ে বেঁচে থাকে। হিমালয়ে প্রচুর আলু হয় এবং সে আলু খেতেও খুব ভাল।

কিন্তু এখন আলু পাই কোথায় ? আমাদের আলু তো খচ্চরের পিঠে। এতক্ষণে বোধ হয় তালুকা পৌঁছে গেছে। সেই কথাই জিজ্ঞেস করি দিলবাহাদুরকে, "এখানে আলু কোথায় পাবে ?"

"ঐ যে সাব, ঐ বুড়ো লোকটি বলছেন, এক টাকা পেলেই তাঁর আলুগুলো আমাদের দিয়ে দেবেন।"

তাকিয়ে দেখি জনৈক বৃদ্ধ ঝরণার জলে দাঁড়িয়ে কতগুলো আলু পরিষ্কার করছেন। মালবাহকদের সঙ্গে তাঁর কাছে আসি। আলুগুলি বেশ বড় বড় এবং পরিমাণেও কম নয়—কিলো দু'য়েক তো হবেই।

বৃদ্ধকে একটি টাকা দিতেই তিনি আলুগুলি দিয়ে দিলেন। কৃতজ্ঞ কুলিরা সেলাম করে আমাকে। বলি, "খেয়ে নিয়েই রওনা দিও, দেরি করো না যেন।"

"জী সাব্।" ওরা আবার সেলাম করে।

প্রাণেশ ও সুশীলকে নিয়ে ঝরণার পাশ দিয়ে উৎরাই পথে নেমে আসি গাঁয়ে—সৌর গাঁয়ে। পথ থেকে সামান্য একটু নেমে এসেই গ্রাম। ঝরণাটি এখানে এসে সমতল পেয়ে খানিকটা প্রশস্ত হয়েছে। গ্রামবাসীরা পাথর ফেলে ফেলে পারাপারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

আমরা ঝরণা পেরিয়ে আসি। এপারেই বাড়ি-ঘর। ক্ষেত-খামার অনেক দূরে—গ্রাম ছাড়িয়ে সেই তমসার তীরে, যেখানে ঝরণা গিয়ে তমসায় মিশেছে।

ঝরণার তীরে ছেলে-মেয়ে ও মা-দিদিদের ভিড়। কেউ কাপড় কাচছে, কেউ গরু-মোষ স্নান করাচ্ছে, কেউ স্নান করছে, কেউ বা খাবার জল নিচ্ছে। না, না, নোংরা জল নেবে কেন ? প্রচণ্ড বেগে জল বয়ে যাচ্ছে। এ জল নোংরা হবে কেমন করে ?

বাড়ি-ঘরের ফাঁক দিয়েই অপ্রশস্ত পথ। বলা বাহুল্য পথ মোটেই পরিষ্কার নয়। প্রচুর পশুবিষ্ঠা ও নানা ধরনের নোংরা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। মাছি ভনভন করছে। কিন্তু পোকা-মাকড় ও মশা-মাছি যে হিমালয়ের অন্যতম প্রধান বাসিন্দা। আর আমরা যে কলকাতা মহানগরীর নাগরিক। নোংরা পথ পাড়ি দিতে আমাদের কষ্ট হবে কেন ? সুতরাং বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে এগিয়ে চলি।

পাথর ও কাঠের মজবুত বাড়ি। কয়েকটি বাড়ির টিনের চাল। কোনটি দু'তলা কোনটি তিনতলা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে কয়েকটি করে পরিবার বাস করে। অর্থাৎ হিমালয়েও 'ফ্ল্যাট সিস্টেম' চালু রয়েছে। কেবল তফাৎ এই যে, এখানে কলকাতার মতো 'ওটিস'-য়ের 'লিফ্‌ট' লাগে না, বাসিন্দারা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে অক্লেশে ওঠা-নামা করেন।

তাঁরা সহাস্যে ও সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানান। আমাদের সঙ্গে পরিচিত হন।

কয়েকজন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। আমরা মন্দিরে আসি।

গ্রামের প্রান্তে পাহাড় ও বনের ধারে মন্দির। কাঠ ও পাথরের ছোট্ট মন্দির। সামনে একফালি সমতল প্রাঙ্গণ। মন্দিরের সামনে খোলা বারান্দা। একতলা মন্দির কিন্তু চালটি বেশ উঁচু। কাঠের দেওয়াল ও দরজায় কিছু খোদাই কাজ রয়েছে। মন্দিরটি দেখতে ভালই।

দুর্যোধনের নামে উৎসর্গীকৃত এই মন্দির। কিন্তু সেই কৌরবপ্রধান ক্ষত্রিয়বীরকে দর্শন করতে পারি না। তিনি এখন রয়েছেন তাঁর 'উইন্টার ক্যাপিটাল' কোটগাঁও-য়ে। সৌরের দুর্যোধনের অধীনে তেরোটি গ্রাম রয়েছে। শাঁকড়ি তাঁর গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

শীতের শেষে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে তিনি নেমে আসবেন কোটগাঁও থেকে। না, সোজা এবং সংক্ষিপ্ত পথে নয়। আসার পথে দু'পাশের সমস্ত গ্রামে অন্তত একটি করে রাত কাটাবেন। ঐ দিনটি সে গ্রামের বড়ই আনন্দের দিন। ইষ্টদেবতার শুভ আগমনে সেখানে সেদিন আনন্দের সাড়া পড়ে যাবে। ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সেদিন সবাই রঙিন পোশাক পরে গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁদের ইষ্টদেবতকে বরণ করবেন। নানা বাদ্যযন্ত্র ও নাচ-গান সহযোগে তাঁরা দেবতাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। গ্রামের মোড়ল হবেন সেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

দুর্যোধন যেদিন সৌরে আসবেন, সেদিন এতক্ষণে এই প্রাঙ্গণে মেলা বসে গিয়েছে। আবাল-বৃদ্ধ বণিতার ছুটোছুটি আর চিৎকারে মন্দির তখন রীতিমত মুখর। দিন আর রাতের কোন তফাৎ নেই। দেবদর্শন পূজা-পার্বণ নাচ-গান ও হৈ-হুল্লোড় সারা গ্রামটি মেতে উঠেছে।

সেদিন গাঁয়ের সব বাড়িতে অরন্ধন। মন্দিরে যে সবাই ভরপেট প্রসাদ পেয়ে যান।

পরদিন সকালে সমস্ত গ্রামখানিকে অবসন্ন ও বিষাদগ্রস্ত করে রেখে দেবতা বিদায় নেবেন পাশের গ্রামে শাঁকড়িতে। সারা গ্রীষ্মকাল তিনি থাকবেন সেখানে। বর্ষার আগে আবার একই ভাবে গ্রামে সফর সেরে দেবতা ফিরে যাবেন কোটগাঁও। তখনও দেবতার আগমনকে কেন্দ্র করে গ্রামের পর গ্রাম আনন্দের বন্যায় ভেসে যাবে।

গ্রাম থেকে উঠে আসি পথে, সেই ঝরণার ধারে—আমাদের চড়ুইভাতির জায়গায়। এসেই নিশ্চিন্ত হলাম, দিলীপকুমার এসে গিয়েছে। নিজের ছোট হ্যাভারস্যাক্‌টিকে বালিশ বানিয়ে পথের পাশে শুয়ে রয়েছে। বহাল তবিয়তে সিগারেট টানছে।

আমরা কাছে আসতেই উঠে বসে মণ্ডল। গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে, "এটা কি উচিত হয়েছে আপনাদের?"

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। সে আবার বলে, "এক্সপিডিশানে বেরিয়ে গ্রাম দেখার নামে এইভাবে সময় নষ্ট করা?"

এবারে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। হো হো করে হেসে উঠি। কিন্তু দিলীপ গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে থাকে। ভাবখানা—হেসে বিষয়টাকে মোটেই হাল্কা করে দেওয়া যাবে না।

প্রাণেশও সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। সবিনয়ে বলে, "সত্যি মণ্ডলদা, বড্ড অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আমাদের জন্য আজ আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট হল। তবে আমরা যখন এসে গিয়েছি, এবারে যদি দয়া করে রওনা হন, তাহলে বড়ই বাধিত হই।"

"বেশ চলুন।" মণ্ডল উঠে দাঁড়ায়, হ্যাভারস্যাক্ পিঠে নেয়। আমরাও নিজেদের রুক্স্যাক্ তুলি

মণ্ডল চলতে শুরু করে। আমরা তাকে অনুসরণ করি। মণ্ডল বলে, "এবেলা আমি আর কালেক্শন করব না ভাবছি..."

"তাই ভাল মণ্ডলদা।" সুশীল উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে।

"কিন্তু তাহলে যে তোমাদের মুশকিল হবে ভাই!" দিলীপকুমারের কণ্ঠে সমবেদনার সুর।

"কিসের মুশকিল মণ্ডলদা?"

"আমি তাড়াতাড়ি হাঁটব।"

"তাতে কি হয়েছে?" প্রাণেশ প্রশ্ন করে।

দিলীপ গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, "আপনারা আমার সঙ্গে সমতা রাখতে পারবেন না, ক্রমেই পেছিয়ে পড়বেন।"

আবার সমবেত অট্টহাসি। তবে এবারে মণ্ডল আর গম্ভীর থাকে না। সে-ও হাসতে থাকে আমাদের সঙ্গে।

হাসি থামলে আমরা বিদায় নিই সৌরবাসী ও মালবাহকদের কাছ থেকে। কয়েকজন গ্রামবাসী আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিলেন আর কুলিরা এখন আলু পোড়াচ্ছে। সেতীরাম বলে, "আপনারা রওনা হয়ে যান সাব, আমি ওদের নিয়ে আসছি।"

আমরা পথ-চলা শুরু করি। বলা বাহুল্য মণ্ডল চলেছে সবার আগে আগে। তার পায়ের ব্যথা আজও কমে নি। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পথ চলছে।

আবহাওয়া খুবই ভাল। এখানে বেশ রোদ রয়েছে। বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে অবশ্য দেখার মতো নেই কিছু। সেই বনে ঢাকা পাহাড়—কোথাও একেবারে পথের পাশে, কোথাও বা খানিকটা দূরে।

বাঁদিকের দৃশ্যই দেখবার মতো। দূরে আকাশের গায়ে ধূসর পাহাড়ের ঢেউ আর কাছে সোনালী সবুজ লাল ফসলের ঢেউ-খেলানো বাহার। মাঝে আঁকা-বাঁকা তটিনী তমসা—অবিকল একখানি নীলাম্বরীর মতো পড়ে আছে সবুজে মাঝে—পাহাড় ও ক্ষেতের ধারে। আর বহুদূরে ঐ পাহাড় বন ও তমসাকে ছাড়িয়ে, দিগন্তের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোনা-রূপার স্বর্গারোহিণী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আর হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে আমাদের।

পিঠে হ্যাভারস্যাক্ নিয়ে একটি নেপালী যুবতী চলেছে তালুকার দিকে। আমাদের কয়েকজন কুলি তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। ওরা হাসাহাসি করতে করতে পথ চলেছে। মেয়েটির হ্যাভারস্যাক্ হালকা, অথচ কুলিদের বোঝা ভারী। কিন্তু কুলিরা মেয়েটির সঙ্গে সমান তালে পথ চলেছে। মাঝে মাঝে শুধু সিগারেট ধরাবার জন্য দু-একবার যা থামতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য মেয়েটিরও ধূমপানের প্রতি প্রবল আসক্তি।

যুবতীর সঙ্গী কুলিরা বোধ হয় বিশ্রামের কথাটা ভুলেই গেছে। জানি না মেয়েটি তালুকা পর্যন্ত যাবে কিনা? গেলে কিন্তু বড়ই ভাল হয়। আমাদের মালগুলো তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। এবং এই রকম জনাপাঁচেক পথচারিণী পেলে মালবাহকদের গতিবেগ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

হবেই বা না কেন? এরা যে ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার দল! মিষ্টি মুখ, মিষ্টি কথা ও

মিষ্টি হাসির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এদেশে এসেছে। এরা সকলেই নেপালের অধিবাসী। দুর্গম হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে যেতে হলে এদের সাহায্য অপরিহার্য। দেশে রোজগারের সুযোগ নেই। তাই পরিবার-পরিজনকে ফেলে এরা এদেশে এসেছে। মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির দাস। সুতরাং ঐ নেপালী যুবতীকে পাশে পেয়ে এরা পেট এবং পিঠের কথা ভুলে গিয়েছে। অভুক্ত শরীরে বিরাট বোঝা নিয়ে অক্লেশে পথ চলেছে।

উচ্চ-হিমালয়ের এই মালবাহকরা গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে এদেশে আসে। আবার শীত শুরু হবার আগেই দেশে ফিরে যায়। যাতায়াতটা ওরা সাধারণত পদব্রজেই করে থাকে। তার মানে দশ-পনর দিনের বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তারা এদেশে রোজগার করতে আসে। প্রতি মরশুমে গড়ে মাথা পিছু আয় পাঁচ-ছ'শ টাকা। এবং সেটাই গোটা পরিবারের বাৎসরিক আয়। এই কটা টাকার জন্যই তারা পরিবার-পরিজনকে ফেলে দেশ ছেড়ে এতদূরে আসে এবং প্রাণ বিপন্ন করে দুর্গম পথ পাড়ি দেয়।

আমার এখনও নেপালে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। তবে শুনেছি, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র রাজতন্ত্রী দেশটি তার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিশেষ স্নেহভাজন। তারা নেপালের উন্নতির জন্য নিয়মিতভাবে দাদন দিয়ে চলেছেন। কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রায় নেপালের রাজভাণ্ডার ভরে উঠছে। রাজধানী কাটমাণ্ডু এখন একটি বিলাসবহুল নগরীতে রূপান্তরিত। আধুনিকতার সমস্ত উপকরণ সেখানে সহজলভ্য। অথচ সেই দেশের সাধারণ মানুষ কত অসহায় এবং অধঃপতিত। হিন্দু হিসেবে পৃথিবীর এই একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্রের অধঃপতন দেখে বিচলিত না হয়ে পারি না।

কিন্তু তারপরেই মনে হয়, এই তো স্বাভাবিক। ভিক্ষায় কখনও মুক্তি মেলে না। বিদেশী সাহায্যে কোনদিন কোন দেশের দারিদ্র্য ঘুচতে পারে না। থাইল্যান্ড থেকে নেপাল পর্যন্ত একই ইতিহাস। একটা দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সেই দেশের মানুষের কর্মক্ষমতা আর শাসকদের সততার শক্তিতে।

থাকগে সে-সব কথা, আবার মালবাহকদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বাসপথের প্রান্তসীমায় অবস্থিত ভারতের বিভিন্ন শৈল-শহর কিংবা গঞ্জগুলি নেপালী মালবাহকদের মরশুমী আস্তানা। উত্তরকাশীও হল এমনি একটি আস্তানা। সেখান থেকে তারা কাজ ধরে। মাল নিয়ে হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে পৌঁছে দেয়। তারপরে আবার ফিরে যায় আস্তানায়।

পাঁচ-ছ'শ টাকা যাদের গোটা পরিবারের বাৎসরিক আয়, তাদের পক্ষে ঘরভাড়া কিংবা হোটেলে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই এই সব কুলিরা উত্তরকাশীতে বিড়লা অথবা কালীকমলি ধর্মশালার বারান্দায় কিংবা বাস স্ট্যাণ্ডে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটায়। দিনান্তে কয়েকখানি রুটি পুড়িয়ে জীবনধারণ করে। তাই বলে এরা অনেকেই কিন্তু অবশিষ্ট রোজগার নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারে না। বাসের দৌলতে এখন হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেক শহরেই উত্তরকাশীর মতো গণিকালয় এবং সিনেমা হল হয়ে গিয়েছে। হয়েছে মদ ও জুয়ার আড্ডা। সুতরাং এই হতভাগ্য মালবাহকদের অনেকেই মরশুমের শেষে শূন্য হাতে ঘরে ফিরে যায়।

তবু এই চরিত্রহীনদের আমি ঘৃণা করতে পারি না। এরা যে বড়ই কষ্টসহিষ্ণু ও

পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ ও স্নেহপ্রবণ। এরা যে দুর্গম হিমালয়ের পথে পথে আমাদের প্রাণরক্ষা করে—ওরা যে ভালবাসে আমাকে। তাই প্রতিবার যাত্রাশেষে বাসে ওঠার সময় এদের চোখের জল দেখে আমি কিছুতেই অশ্রুসংবরণ করতে পারি না। কলকাতায় ফিরে যাবার পরেও এই দুর্ভাগাদের স্মৃতি আমার বহু বিনিদ্র রজনীর দুর্ভাবনা হয়ে থাকে।

"ও প্রাণেশদা, শঙ্কুদা, আরে এই সুশীল, তোমরা ভাই এত জোরে পা চালালে আমি যে নিরুপায়।"

দিলীপকুমারের আর্ত চিৎকারে কুলিদের ভাবনা মিলিয়ে যায়। চলা বন্ধ করে পেছনে তাকাই। সত্যি সে অনেকটা পেছনে পড়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দিলীপ কাছে আসে। পথের পাশে একখানি পাথরের ওপরে বসে পড়ে। সখেদে বলে ওঠে, "পন্ডিতটা মাইরি কি বিপদেই ফেলেছে আমাকে। 'জুওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন' করতে এসে নিজেই 'এক্সপ্লোরড্' হয়ে যাচ্ছি।"

প্রাণেশ ও সুশীল হাসে। ওদের বোধ হয় সৌর থেকে রওনা হবার সময়ে মণ্ডলের মন্তব্যের কথা মনে পড়েছে। তাহলে ওরা বলে না কিছু। আমি জিজ্ঞেস করি, "কেন, কি হল আবার ?"

"কি হতে আর বাকি রয়েছে দাদা ? একটা সিগারেট যে খাবো, তার পর্যন্ত উপায় নেই।"

"অসুবিধে কি ?"

"ভীষণ।"

"যেমন ?"

"আইস-এক্স ধরে থাকার জন্য ডান হাতটায় কোনরকমে শীত সয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাঁ হাতটা কিছুতেই প্যান্টের পকেট থেকে বের করতে পারছি না—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছে।"

শীত এখানে সামান্যই, কারণ উচ্চতা তো মাত্র হাজার ছয়েক ফুট। তবু তার কথা শুনে হেসে উঠি না আমরা। বরং প্রাণেশ গম্ভীর স্বরে বলে, "ঠিক আছে মণ্ডলদা, আপনি আসই-এক্সটা আমাকে দিয়ে ডান হাতে সিগারেট খেতে খেতে পথ চলুন।"

"কিন্তু আইস-এক্স ছাড়া পথ চলতে গিয়ে পড়ে যাই যদি ?"

"পড়বেন না। এ তো প্রায় সমতল পথ। একটু পায়ের দিকে নজর রাখবেন। তাছাড়া আমি আপনার পাশে থাকব।"

"পারবেন কি আমার সঙ্গে 'স্পীড্ মেনটেইন্' করতে ?"

"চেষ্টা করে দেখি, না পারলে নিশ্চয়ই আপনাকে আস্তে আস্তে হাঁটতে বলব।" সবিনয়ে প্রাণেশ বলে। এবং এবারে সুশীল আর হাসি চাপতে পারে না।

পথটি ভারী সুন্দর এখানে—অবিকল একটি ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের মতো। বাঁয়ে খাদ। তারই ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে একটি পাহাড়ী নদী। সামনের পাহাড় দুটির মাঝখান দিয়ে এসে, পথের বুক চিরে খাদে নেমেছে—খানিকটা দূরে গিয়ে তমসায় মিশেছে।

কিন্তু দিলীপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। বলে, "এখান থেকে, মানে এই খাদ আর নদীর ওপর দিয়ে সোজাসুজি মাত্র মাইল আধেক একটা কাঠের পুল করে দিলেই তো দু'মাইল চড়াই-উৎরাই বেঁচে যেত।"

কথাটা মিথ্যে নয়, কারণ আমরা এখন এই পাহাড়ী নদীর বাঁ তীর দিয়ে নেমে

যাব দূরের ঐ কাঠের সাঁকোটির কাছে। সাঁকোর ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে আবার মাইলখানেক চড়াই ভেঙ্গে উঠে আসব বাঁকের শেষে—এই খাদের ওপারে। কিন্তু দিলীপকুমারের প্রস্তাবটা কার্যকর করা কিছুতেই সম্ভব নয় বলে তাকে অন্যমনস্ক করে তুলতে চাই। বলি, "আচ্ছা দিলীপ, তুমি তো আর কোনদিন হিমালয়ে এসে প্রজাপতি পাকড়াও করো নি ?"

"না। কিন্তু কথাটা ওভাবে বলবেন না দাদা। বলুন প্রাণীসর্বেক্ষণের প্রয়োজনে প্রজাপতি সংগ্রহ করতে আমি আর কোনদিন হিমালয়ে আসি নি।"

মণ্ডলের উক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই তাড়াতাড়ি নূতন প্রশ্ন করি, "কাজটা তোমার কেমন লাগছে ?"

"সামান্য এই কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে যে পর্বতাভিযানের সময় প্রাণীসর্বেক্ষণ কাজটি খুব সহজ নয়। কারণ এতে পর্বতাভিযাত্রীদের মধ্যে কাজ করতে হয়। তবে কাজটা তার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। এমন রমণীয় পরিবেশ এবং আবহাওয়া যে সমতলে পাওয়া সম্ভব নয়।"

"কিন্তু ওপরে গিয়ে যখন আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে ?"

"তখন হয়তো কষ্ট একটু বেশি হবে, কিন্তু আনন্দ পাবো বৈকি। কারণ তখুনি যে অনুশীলন করতে পারব—তুষারপাত ও প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও মানুষ যেখানে আসতে পারে, এমন কি বাস করতে পারে, সেখানে অন্যান্য প্রাণী, বিশেষ করে কীট-পতঙ্গ বাসা বাঁধতে পারে কিনা ? আর যদি পারে, তাহলে তারা সেই বৃক্ষলতাশূন্য বরফ আর পাথরের রাজ্যে কি খায়, কোথায় থাকে ? তারা দেখতে কেমন ? তাদের সংখ্যা কত ? এবং তাদের প্রজনন পদ্ধতিই বা কি রকম ?"

একবার থামে দিলীপ, কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই সে আবার শুরু করে, "সেই সঙ্গে আমাকে অনুশীলন করতে হবে যে ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এ অঞ্চলের কীট-পতঙ্গের ওপরে কি প্রভাব বিস্তার করেছে ? জানতে হবে, সমতলের কীট-পতঙ্গের সঙ্গে এদের চারিত্রিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কথা। তাদের সঙ্গে এদের বংশগত সম্বন্ধই বা কী ? উপকারী হলে এদের বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে আর অপকারী হলে উচ্ছেদ করার বন্দোবস্ত করতে হবে। কাজেই বুঝতে পারছেন, আমি কষাই কিংবা ঘাতক নই ?"

থামে মণ্ডল। পকেট থেকে আবার সিগারেট ও দেশলাই বের করে। মনে হচ্ছে, কথায় কথায় সে শীতের কথা ভুলে গিয়েছে। নইলে বিনা প্রস্তাবনায় প্যান্টের পকেট থেকে তার বাঁ হাতখানি বের করে ফেলল কেমন করে ?

অবশ্য এখন আর শীত লাগার কথাও নয়। কারণ ইতিমধ্যে আমরা কাঠের সাঁকো পেরিয়ে পাহাড়ী নদীর ডান তীর ধরে চড়াই ভাঙতে শুরু করেছি।

সহসা সুশীল প্রশ্ন করে, "আপনারা বুঝি সব জায়গা থেকে প্রজাপতি মেরে নিয়ে গিয়ে ঐ সব পরীক্ষা চালান ?"

দিলীপ একটু হাসে। বলে, "শুধু প্রজাপতি কেন ? যাবতীয় কীট-পতঙ্গ পাখী ও মাছ এবং বহু ছোট ছোট প্রাণীকে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে আমাদের দপ্তরে। আরেকটা কথা..."

আমরা দিলীপের দিকে তাকাই। সে বলে যায়, "আপনারা জানেন প্রজাপতি বা

মথ এক নয়, কিন্তু বোধ করি জানেন না সব প্রজাপতি বা Lepidoptera এক জাতের নয়। কেবলমাত্র ভারতীয় প্রজাপতিরাই দশটি প্রধান পরিবারে বিভক্ত।"

"আচ্ছা, কি ভাবে তোমরা এই প্রজাপতিদের সংরক্ষণ কর ?" এবারে আমি প্রশ্ন করি।

মণ্ডল উত্তর দেয়, "এই সমস্ত প্রজাপতিকে আমি বিশেষ ধরনের খামে পুরে গবেষণাগারে নিয়ে যাব। সেখানে প্রথমে প্রজাপতিগুলিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি একটি 'চেম্বার' বা অন্ধকূপের মতো একটি যন্ত্রের ভেতরে রেখে দেব কয়েক দিন। তারপরে আধুনিকতম যন্ত্রের সাহায্যে তাদের শ্রেণীবিন্যাস বা সনাক্তকরণ সম্পূর্ণ হলে সযত্নে তাদের সংরক্ষণ করব। আমাদের কলকাতার সংগ্রহশালাতেই শতাধিক বছরের পুরনো প্রজাপতি রয়েছে। সেগুলি দেখলে আপনারা মনে করবেন, মাত্র গতকাল তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে।"

"আমরা গেলে দেখতে পারব ?" প্রাণেশ জিজ্ঞেস করে।

"নিশ্চয়।" মণ্ডল উৎসাহিত, "কলকাতায় ফিরে গিয়ে সময় করে যদি একদিন জবাকুসুম হাউসে আসেন, তাহলে সব দেখিয়ে দিতে পারব।"

"তাতে আর অসুবিধে কি ?" প্রাণেশ বলে, "আমার অফিস তো খুবই কাছে। কিন্তু একটা কথা মণ্ডলদা !"

"বেশ বলুন।"

"এই সর্বেক্ষণ সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণের ফলে আমাদের কি লাভ হচ্ছে ?"

মণ্ডল উত্তর দেয়, "পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রাণীবিদ্যা বিভাগ রয়েছে। কারণ পশু পক্ষী ও কীট-পতঙ্গের যথাযথ সংরক্ষণ ছাড়া ক্ষতিকারক প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এবং এই নিয়ন্ত্রণ যে কোন উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষেই অপরিহার্য।"

"কিন্তু এজন্য আপনি প্রজাপতিদের মেরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? তারা তো মানুষের কোন ক্ষতি করে না ?" সুশীল জিজ্ঞেস করে।

মণ্ডল পাল্টা প্রশ্ন রাখে, "কে বললে তোমাকে ?"

"না, মানে আমাদের ধারণা আর কি।"

"ভুল ধারণা।" মণ্ডল বলতে থাকে, "দেখতে সুন্দর হলেও প্রজাপতি মানুষের ঠিক উপকারী পতঙ্গ নয়। কয়েক জাতের প্রজাপতি শস্য ও শাক-সবজির কাণ্ড, পত্র কিংবা মূলে অগণিত সংখ্যায় ডিম পাড়ে। আর সেই ডিম থেকে সৃষ্ট হয় ঐ পতঙ্গের জীবনচক্রের অবশিষ্ট তিন অবস্থা—শূককীট, মূককীট ও সমাঙ্গ। শূককীট অবস্থায় পতঙ্গ যেমন দেখতে কুৎসিত, তেমনি অতিভোজী। তারা শাক-সবজী ও শস্যের ভীষণ ক্ষতি করে। এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সমস্ত প্রজাপতির সনাক্তকরণ করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আমরা যে-সব কীট-পতঙ্গ পাখি ও প্রাণীকে মেরে ফেলছি, তারা বিজ্ঞানের শহীদ।"

মণ্ডলের মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারি না। নীরবে পথ চলতে থাকি। এখন আমাদের আগের চাইতেও বড় একটি 'ইউ' আকৃতির বাঁক পেরোতে হচ্ছে।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াতে হল। মাথার উপরে একটি কাঠের ঝুলন্ত ঝরণা—ডানদিকের পাহাড় থেকে নেমে এসে ওভারব্রিজের মতো পথটিকে অতিক্রম করে বহু নিচের পাহাড়ী নদী পর্যন্ত প্রসারিত।

পাহাড়ের ওপরে কাঠ কেটে তা এই কৃত্রিম ঝরণার সাহায্যে নিচের পাহাড়ী নদীতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উৎরাই পথ শেষ হয়ে গেল। পাশের পাহাড়ের একটা প্রকাণ্ড গাছ পড়ে পাহাড়ী নদীর পুলটি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু সেই ভেঙে পড়া গাছটাই পুলের কাজ করছে। আমরা তারই ওপর দিয়ে সাবধানে নদী পেরিয়ে এলাম।

এপারে ঘন জঙ্গল। বেলা মোটে চারটে অথচ মনে হচ্ছে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। একটু বাদেই অন্ধকার হয়ে যাবে। কুলিরা অনেকেই পেছনে। তাদের সঙ্গে আলো নেই। পিঠে বোঝা নিয়ে অন্ধকারে এই গাছের ওপর দিয়ে নদী পার হওয়া খুবই বিপজ্জনক।

একজন কুলিকে টর্চসহ সেখানে রেখে আমরা এগিয়ে চলি। ঘন জঙ্গলে ছাওয়া একটি পাহাড়ের গা বেয়ে সারি বেঁধে উঠতে হচ্ছে আমাদের। পুরনো জীপ-পথটি ভেঙে যাবার জন্যই এই পথকষ্ট।

পথটি কষ্টকর হলেও দীর্ঘ নয়। কিছুক্ষণ পরেই আমরা আবার হারিয়ে যাওয়া জীপ-পথটিকে খুঁজে পেলাম। আঁধার দূর হয়ে গেল। দিলীপকুমারও আবার মুখ খুলল, "আপনারা তো জানেন, ব্যাঙ কেটে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের হাতে-খড়ি দিতে হয়। আমাদের দেশ গরীব বলে ব্যাঙ, নইলে আমেরিকায় এক বিশেষ ধরনের বানর এবং সোবিয়েত য়ুনিয়নে কুকুর কেটে ডাক্তারদের প্রথম পাঠ নিতে হয়।"

"আমরা কিন্তু একবার সাদা ইঁদুর দিয়ে 'হাই অল্‌টিচ্যুড্‌ ফিজিওলজিক্যাল রিসার্চ' করেছিলাম।" অনেকক্ষণ বাদে কথা বলি আমি।

"হ্যাঁ জানি।" মণ্ডল মাথা নাড়ে। বলে, "আমি আপনার 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' বইতে পড়েছি সেকথা। আপনারা গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে। আপনারা সেবারে—কত হাজার ফুট যেন?"

"একুশ হাজার সাতশ' দশ।"

"হ্যাঁ, ২১,৭১০ ফুট উঁচু একটি অনামী শিখরে আরোহণ করে এভারেস্ট আবিষ্কারক রাধানাথ সিকদারের নামে শৃঙ্গটির নাম রেখেছেন। আর সেই আরোহণকারীদের মধ্যে আমাদের প্রাণেশদা ও অমূল্যদা অন্যতম।" দিলীপ সগর্বে প্রাণেশের দিকে তাকায়।

প্রাণেশ মৃদু হাসে। দিলীপ আবার বলতে থাকে, "সেবারেই হিমালয়-অভিজ্ঞ শারীরবৃত্তবিদ ডাঃ অমিতাভ সেন আপনাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি এক ডজন সাদা ইঁদুরকে নিয়ে গিয়েছিলেন অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে—কত উচ্চতা ছিল যেন প্রাণেশদা?"

"ষোল হাজার সাতশ' পঞ্চাশ ফুট।"

"হ্যাঁ, ১৬,৭৫০ফুটে ছ'টি ইঁদুরকে হত্যা করা হয়েছিল আর বাকি ছ'টিকে ফিরিয়ে এনে কলকাতায় হত্যা করেছিলেন ডাঃ সেন। আপনি অবশ্য বইতে হত্যা শব্দটি ব্যবহার করেন নি।" দিলীপ আমার দিকে তাকায়।

মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করি, "কি বলেছি?"

"বলেছেন—এ তো হত্যা নয়, এ যে আত্মাহুতি। মানুষের মঙ্গলের জন্য, জগতের উন্নতির জন্য, সভ্যতার অগ্রগতির জন্য, যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিনিয়ত এমন আত্মাহুতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতএব শঙ্কুদা, আমাকেও আপনার ঘাতক বলা উচিত নয়।"

"কি বলা উচিত হবে?"

"সমাজ সেবক।"

"জ্যারা ঠহরিয়ে সাব, থোরা ঠহরিয়ে..."

একটা চিৎকার কানে আসে। থমকে দাঁড়াই। স্বেচ্ছায় নয়, নেহাৎই অনিচ্ছার সঙ্গে পথ-চলা বন্ধ করি। সামনে যে তালুকা বন-বিশ্রাম ভবনকে দেখা যাচ্ছে। আর বড় জোর মাইলখানেক। ঘর দেখতে পাবার পরে কি আর পথে থামতে ইচ্ছে করে?

তবু থামতে হল আমাদের। লোকটি ছুটে আসছে যে। কিন্তু লোকটি কে? আমাদের কোন কুলি হবে নিশ্চয়ই। সে এমন করে ছুটে আসছে কেন? কোন বিপদ—কোন দুর্ঘটনা?

লোকটি কাছে আসে। কুলি নয়, কুলির সর্দার—সেতীরাম।

"কেয়া খবর সেতী?" আমরা উৎকণ্ঠিত।

সেতী হাঁফাতে হাঁফাতে জবাব দেয়, "আলু...সাব্! আলু।"

"আলু!"

"জী হাঁ।"

তাকিয়ে দেখি তার হাতে চারটি পোড়া আলু। ও হরি, এই জন্য এত ডাকাডাকি আর ছুটোছুটি! বিরক্তকণ্ঠে বলি, "তা তুই আবার কুলিদের কাছ থেকে এগুলি নিয়ে এলি কেন?"

"আমি আনি নি সাব্। কুলিরাই পাঠিয়ে দিল। খেয়ে দেখুন সাব্, বহুৎ মিঠা।"

তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ তো শুধু হিমালয়ের আলুপোড়া নয়, আমাদের মালবাহকদের ভালোবাসার মধু।

॥ আট ॥

ঘুম ভেঙে যায়। কেউ আমার গা টিপে দিচ্ছে।

কে আবার! নিশ্চয় সুশীল। সে খুব ভাল 'ম্যাসাজ্' করতে পারে। সকালে কারও ঘুম ভাঙাবার দরকার হলেই সে বিনা নোটিশে তাকে ম্যাসাজ করতে শুরু করে দেয়। ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু কেউ বিরক্ত হয় না। কারণ ম্যাসাজ বস্তুটি ঘুমের চাইতে বেশি আরামদায়ক। সুতরাং সুশীলের এই দলাই-মালাই ঘুমন্ত মানুষকে বিছানা ছাড়াবার চমৎকার দাওয়াই।

সুশীল মানে সুশীলকুমার দে। স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ যুবক। বয়স বছর তিরিশ। মাঝারি গড়ন। ১৯৭০ সালে 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় সে প্রযোজক ৺গিরীন্দ্র সিংহের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। তখুনি তার এই ম্যাসাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

কয়েক মিনিট ম্যাসাজ করার পরেই সুশীল আসল কথাটি বলে, "শঙ্কুদা, সাতটা বাজে। বিভাসদা বলেছেন, আটটায় মার্চ।"

অতএব আর শুয়ে থাকা উচিত হবে না। অনেক কাজ বাকি—হাত-মুখ ধোওয়া, পোশাক পরা, রুকস্যাক্ গুছিয়ে ব্রেক-ফাস্ট করা..। তাড়াতাড়ি উঠে বসি।

দিলীপ ছাড়া আর সবাই বিছানা ছেড়েছে দেখতে পাচ্ছি। সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। হিমালয়ে তো দূরের কথা, কলকাতায় পর্যন্ত আমি এত বেলা অবধি ঘুমিয়ে থাকি না।

আজও থাকতাম না। কামি যখন ছ'টার সময় বেড-টি নিয়ে এলো, তখন যথারীতি ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু বেড-টি শেষ করে আবার স্লীপিং ব্যাগের জিপ্-টা টেনে দিয়েছি। ভেবেছি একটু গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়ব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছি।

সুশীল বলে, "এবারে তাহলে মণ্ডলদাকে একটু ম্যাসাজ করে দিই?"

অর্থাৎ সে এবারে শেষ ঘুমন্ত সদস্যটির ঘুম ভাঙাবে। আমি মাথা নাড়ি। সুশীল মণ্ডলকে আক্রমণ করে। আর মণ্ডল আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে থাকে, "সুশীল ভাই! একটু আস্তে। তুমি তো জানো, আমি চর্ম-সর্বস্ব। আমার গায়ে মাংস-টাংস কিছু নেই, হাড়ের ওপর স্রেফ্ এক পোঁচ চামড়া।..."

রুক্স্যাক থেকে দাঁতের মাজন নিয়ে বাথরুমে আসি। এখনও ঠাণ্ডাজল মুখে দেওয়া যাচ্ছে, দাঁত মাজতে পারছি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই এ-সব পাট চুকিয়ে দিতে হবে। পাঠক-পাঠিকারা নোংরা ভাবলেও আমরা নিরুপায়। উচ্চ-হিমালয়ে ঠাণ্ডাজল মুখে দেওয়া আর বিষপান করা একই কথা।

তালুকা বন-বিশ্রামগৃহটি জারমোলা বা নৈটয়ার বিশ্রাম-ভবনের চেয়ে কিছু ছোট। তবে কাল আমাদের কোন অসুবিধে হয় নি। সামনের চওড়া বারান্দায় একপাশে মালপত্র রাখা হয়েছে, আরেক পাশে কুলি ও শেরপারা শুয়েছে। শেরপাদের অবশ্য ভেতরেই শুতে বলেছিলাম। কিন্তু ওরা তাতে রাজী হয় নি। ওদের নাকি ঘরে গরম লাগত। লাগতেই পারত—তালুকার উচ্চতা মোটে ৬,৫০০ফুট। আমাদের কিন্তু ঘরের ভেতরেও স্লীপিং-ব্যাগে ঢুকতে হয়েছিল।

দু'খানি বড় ও একখানি মাঝারি বেডরুমে এবং দু'টি বাথরুম নিয়ে তালুকা বন-বিশ্রামগৃহ। পাশের পাহাড়ের ওপর থেকে নল দিয়ে জল নিয়ে আসা হয়েছে। বলা বাহুল্য জলটা বড্ড ঠাণ্ডা। মুখে দিলে দাঁত কন্‌কন্ করছে। তাহলেও মুখে দেওয়া যাচ্ছে।

প্রাতঃকৃত্য সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসি। না, সুশীলকে বাহাদুর বলতে হবে, সে মণ্ডলকে স্লীপিং-ব্যাগ ছাড়িয়েছে।

পোশাক পরে বেরিয়ে আসি বারান্দায়। কুলিদের রান্না-খাওয়া শেষ। তারা রওনা হবার মুখে। পাসাং ও দোরজি তাদের মাল ঠিক করে দিচ্ছে। প্রাণেশ ও বিভাস তদারকি করছে।

বিশ্রামগৃহ থেকে নেমে আসি। রান্নাঘরটি পেছনে, তমসার দিকে, একটু নিচে। পাশেই চৌকিদারের ঘর। মানুষটি ভাল। কাল সে আমাদের ক্ষেতের সব্জি দিয়েছে। বিনিময়ে তাকে খানিকটা চিনি দিয়েছি। দাদুর অবশ্য একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বিভাসের জন্য শেষ পর্যন্ত আপত্তি করতে পারে নি। না করে ভালই করেছে। কারণ চিনি পেয়ে খুশি হয়ে চৌকিদার আমাদের দু'টি 'টেবল-ল্যাম্প্' ধার দিয়েছিল। আমরা একটিমাত্র 'পেট্রোম্যাক্স' নিয়ে এসেছি। সেটি সন্ধ্যেবেলা রান্নাঘরেই থাকে। গত তিন রাত ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়েছি। চৌকিদারের কৃপায় গতকাল টেব্‌ল-ল্যাম্প্ জ্বালানো গিয়েছে।

তালুকা ঠিক কোন গ্রাম নয়। এটি বন-বিভাগের একটি কর্মকেন্দ্র। গুটিকয়েক ঘর আর তিরিশ-চল্লিশজন মানুষ নিয়ে জনপদ। দোকান-পাট কিছুই নেই। ক্ষেত বলতেও এই বিশ্রামগৃহের চারিপাশের সামান্য সমতলটুকু।

গতকাল বিকেল সাড়ে ছ'টায় আমরা তালুকা পৌঁচেছি। হিমালয় বলেই বিকেল বলছি, নইলে সেপ্টেম্বরের শেষ, কলকাতায় রীতিমত রাত। এখানে দিনের আলো ছিল।

সেই আলোতেই আমার তালুকার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হল। আমি মুগ্ধ আবেশে দেখলাম তাকে। দেখলাম এই বিশ্রামগৃহটি ও বনময় পাহাড়ে ঘেরা তার চারিদিকের এই অপ্রশস্ত উপত্যকাটিকে। ছোট হলেও ভারী সুন্দর। তমসা এখানে অর্ধচন্দ্রাকারে একটি বাঁক নিয়েছে। তার দু-তীরে তেমনি সাদা পাথরের বেলাভূমি।

জীপ-পথটি বিশ্রামগৃহের সামনে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে। নির্মীয়মান বাসপথটিও এখানে এসেই শেষ হবে। অদূর ভবিষ্যতে তমসা উপত্যকার অভিযাত্রীরা দেরাদুন কিংবা ঋষিকেশ থেকে বাসে চড়ে এই পর্যন্ত চলে আসবেন। আগেই বলেছি দেরাদুন থেকে মুসৌরী হয়ে পুরৌলা বাস পথে ৯৪.৫ মাইল। এখন প্রথম শ্রেণীর বাসভাড়া ১৪.০০টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১১.০০টাকা। হাঁটাপথে পুরৌলা থেকে তালুকা ৩২মাইল। আর তখন বাসপথের দূরত্ব হবে ৪৬ মাইলের মতো। ভাগ্যিস জীপ-পথটি বন্ধ ছিল আর বাস-পথটি এখনও তৈরি হয় নি। নইলে যে তমসার অপরূপ রূপের অনেকখানি আমাদের অদেখা রয়ে যেত।

গতকাল রাতটি ভালই কেটেছে। কেবল দিলীপের হ্যাভারস্যাক্ থেকে উদ্ভট সব ওষুধের গন্ধে ঘুমোতে একটু দেরি হয়েছে এই যা। প্রজাপতি ও কীটপতঙ্গ নিধন এবং সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আছে ওর হ্যাভারস্যাকে। অত্যন্ত উগ্র এবং উদ্ভট সেগুলির গন্ধ। কিন্তু দিলীপ কিছুতেই ঐ থলেটিকে কাছছাড়া করবে না। মাথার কাছে রেখে ঘুমোবে। বলাই বাহুল্য তাতে ওর কোন অসুবিধে হয় না—হয়তো বা সুবিধেই হয়। পরম প্রিয় গন্ধটি শুঁকতে শুঁকতে সুনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

ব্রেক-ফাস্ট সেরে সকাল সওয়া আটটার সময় পথে বেরিয়ে পড়লাম। আজ আর জীপ চলাচলের প্রশস্ত পথ নয়, পাহাড়ী গাঁয়ের পায়ে-চলা পথ। বিশ্রামগৃহ থেকে উৎরাই বেয়ে নেমে এলাম তমসার তীরে। নৈটয়ার ছাড়বার পরে তমসাকে আর এত কাছে পাই নি। বাঁয়ে নীল তমসা, ডাইনে সবুজ পাহাড় আর সামনে শুভ্রা স্বর্গারোহিণী। আমরা পুলকিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

কিছুক্ষণ বাদেই ক্ষেতটি শেষ হয়ে গেল। চড়াই পথ ভেঙে ডানদিকের পাহাড়ে উঠে এলাম। গাছে-ছাওয়া পাহাড়, ছায়া-ঘেরা পথ আর রোদে-ভরা তমসা—আলো-ছায়ার সানন্দ-সহাবস্থান।

গতকাল চলার পথে তমসা মাঝে মাঝেই গিয়েছে হারিয়ে কিন্তু আজ এখনও সে কাছছাড়া হয় নি। আগেই বলেছি, নৈটয়ার ছাড়বার পরে তাকে আর এত কাছে পাই নি। তবে সে-তমসার সঙ্গে এ-তমসার পার্থক্য রয়েছে—এ-তমসা আগের চাইতে অনেক বেশি উচ্ছল, উদ্বেল ও উজ্জ্বল। কিন্তু এ-পথ সে-পথের মতো শ্যামল ও স্নিগ্ধ নয়, এ যেন অনেকখানি রিক্ত ও রুক্ষ।

দাদু তার দলবল নিয়ে আজও গিয়েছে এগিয়ে এবং বিভাস ও মামা তার সঙ্গী হয়েছে। আজ যে ওদের ভাঙ কালেক্‌শনের শেষ দিন। কাল থেকে পালা করে শুরু

হবে দুর্গমতর পথযাত্রা। কর্মবহুল জীবন। কে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কিছুই ঠিক নেই। সুতরাং সেই অনিশ্চিত জীবনযাত্রা আরম্ভ করার আগেই ওরা ভাণ্ডের ব্যাপারটায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে নিতে চাইছে।

আজ দেশাই ও নির্মল রয়েছে আমাদের সঙ্গে। দেশাই বম্বের ছেলে। মাঝারি গড়ন। সুদর্শন যুবা। এই প্রথম পর্বতাভিযানে অংশ নিলেও এর আগে কয়েকবার হিমালয়ে এসেছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়ার কর্মচারী হিসেবে সে আমাদের দলভুক্ত হয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক আমাদের এই অভিযানে উল্লেখযোগ্য অর্থসাহায্য করেছেন। তাঁদের তিনজন কর্মচারী আমাদের দলে রয়েছে—রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত, ইউ. ডি. দেশাই ও নির্মলেন্দুবিকাশ-সেন।

বেহালা পর্ণশ্রী পল্লীর ছেলে নির্মল। তিরিশ বছরের স্বাস্থ্যবান ও প্রাণময় যুবক। সে-ও এই প্রথম পর্বতাভিযানে এসেছে। তবে সে তিন বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'মাউন্টেন-ডিভিশন'-য়ে কাজ করেছে। সে উচ্চ-হিমালয়ের সঙ্গে সুপরিচিত।

খেলাধূলার প্রতি নির্মলের আগ্রহ আশৈশব। কলেজ স্পোর্টস-য়ে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। সে একজন ভাল ফুটবলার। আই. এফ. এ. শীল্ডে খেলেছে।

প্রথম দিন থেকেই দেখেছি নির্মল একজন উৎসাহী এবং কর্মঠ পর্বতপ্রেমিক। দাদুকে সে খুবই সাহায্য করেছে। তবে লক্ষ্য করেছি, মাঝে মাঝেই সে যেন কেমন আনমনা হয়ে যায়। প্রথম দিকে তার এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত হতাম। পরে কারণটা জানতে পেরে বিস্ময় কেটে গিয়েছে। নির্মল মাত্র ক'দিন আগে বিয়ে করেছে। বিয়ের পরে বউ নিয়ে হানিমুনে না গিয়ে, বউকে ফেলে বিপদসঙ্কুল পর্বতাভিযানে আসার নজির খুব বেশি নেই। সুতরাং মাঝে মাঝে নির্মলের অমন আনমনা হয়ে যাবার অধিকার আছে বৈকি।

আচ্ছা এবারে পর্বতাভিযানে এসে আমিও কি মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছি? আমি কি বাবার কথা ভাবছি? আমি যে পিতৃবিয়োগের মাত্র আঠার দিন পরেই এই অভিযানে রওনা হয়েছি। অনেকেই নিষেধ করেছেন।

আমি তাঁদের সে উপদেশ মানতে পারি নি। কারণ আমি জানতাম একমাত্র হিমালয় আমাকে বাবার এই আকস্মিক তিরোভাবের বেদনা বিস্মৃত করাতে পারে—আমাকে শান্তি দিতে পারে।

দিয়েছে বৈকি, হিমালয় আমাকে সীমাহীন শান্তি দান করেছে। নইলে পুরৌলার পরে আমি আর বাবাকে স্বপ্ন দেখছি না কেন? কেন পদযাত্রা শুরু করার পরেই আমার সমস্ত মানসিক ও দৈহিক দুর্বলতার অবসান হয়ে গেল?

তাই তো হবে। বাবা যে আমাকে এই অভিযানে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ এই দুর্গম যাত্রাপথে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়।

"আরেকটু পা চালিয়ে চলুন শঙ্কুদা!" প্রাণেশের কথায় আমার চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। বাস্তবে ফিরে আসি। লজ্জা পাই। সত্যিই আমি ওদের থেকে অনেকখানি পেছিয়ে পড়েছি। চোখ মুছে তাড়াতাড়ি পা চালাই।

আঁকাবাঁকা উঁচু-নীচু বনময় ছায়াপথ বেয়ে এগিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ বাদে একটি কাঠের পুলের ওপরে উঠে এলাম। পুলের তলা দিয়ে দুর্বার বেগে ঝরণা যাচ্ছে বয়ে। যাচ্ছে তমসার অনন্তধারায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে।

ঘড়ির দিকে তাকাই—নটা বাজে। মনে হচ্ছে তালুকা থেকে মাইলখানেক এগিয়েছি। আজ আমাদের যাত্রাপথের দূরত্ব কম। তালুকা থেকে ওসলা ৮ মাইল। খুব একটা চড়াই-পথ নয়। কারণ আট মাইলে মাত্র উনিশশ' ফুট ওপরে উঠতে হবে—৬,৫০০ থেকে ৮,৪০০ফুটে। এটি অবশ্যি ওসলা বিশ্রামগৃহের উচ্চতা। গ্রামটি আরও শ'পাঁচেক ফুট ওপরে অবস্থিত। কিন্তু ওসলার কথা এখন নয়, এখন পথের কথা হোক্—তালুকা থেকে ওসলার পথ।

পুল পেরিয়েই একফালি দূর্বা-ছাওয়া প্রায় সমতল প্রান্তর। পণ্ডিত ও প্রাণেশ বসে আছে সেখানে। আর দেশাই, নির্মল ও সুশীল ঝরণার তীরে পাথর কুড়োতে লেগে গেছে। ভারী সুন্দর সুন্দর পাথর পড়ে রয়েছে ওখানে—যেমন মসৃণ, তেমনি রঙিন।

তবু ওদের কাণ্ড দেখে হাসি পাচ্ছে আমার। আমরা চলেছি দূর-দুর্গম হিমালয়ে। সেখানে নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বইতেই প্রায় প্রাণান্ত হবে। বাধ্য হয়ে একদিন রুক্‌স্যাকের ওজন হালকা করতে ওদের এই সব পাথর ফেলে দিতে হবে। এত সাধের পাথর সেদিন ঠাঁই পাবে কোন প্রস্তরময় গ্রাবরেখা কিংবা তুষারাবৃত হিমবাহে।

তাহলেও বাধা দিই না। ভাবি, যদি কোনমতে এর একটুকরো পাথরও কলকাতায় নিয়ে যেতে পারে, তবে সেটি যে ওদের ভবিষ্যতের অক্ষয় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

পণ্ডিত ও প্রাণেশ প্রান্তরের প্রান্তে গিয়ে বসেছে—বিশ্রাম করছে আর অনভিজ্ঞ অভিযাত্রীদের ছেলেমানুষী দেখছে। আমি ওদের পাশে এসে বসি।

বিশ্রাম হয়ে যায় কিন্তু প্রতীক্ষার অবসান হয় না। আমরা এখন আমাদের জুওলজিস্ট দিলীপ মণ্ডলের জন্য প্রতীক্ষারত। তারই পথ চেয়ে বসে থাকি।

বেশিক্ষণ বসতে হয় না। কিছুক্ষণ বাদেই দিলীপকুমার খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হয়। এসেই একেবারে ধপাস করে বসে পড়ে পণ্ডিতের পাশে। তারপরে একটু দম নিয়ে করুণ কণ্ঠে বলে, "ভাই পণ্ডিত! আমি তো জ্ঞানতঃ তোমার কোন ক্ষতি করি নি। তাহলে কেন তুমি আমাকে এই বিপদে ফেললে?"

"কেন, কি হল আবার?" সহাস্যে প্রশ্ন করি।

"কি আর হতে বাকি রইল দাদা?" মণ্ডল পাল্টা প্রশ্ন করে। তারপরে আবার বলে, "সত্যি বলছি শঙ্কুদা, আমি আর পারছি না।"

"পায়ের ব্যথা কমে নি?"

"খানিকটা কমেছে কিন্তু আরেকটা বিপদ হয়েছে।"

"কি?"

"জুতোর ঘষায় ফোস্কাগুলো গলে গিয়ে ঘা-য়ের মতো হয়ে গিয়েছে।"

"জুতো খুলে ফেল তো, দেখি কি হয়েছে!" আমি কিছু বলতে পারার আগেই পণ্ডিত বলে ওঠে।

"দেখো, তোমাকে আমি একেবারে বিশ্বেস করি না। তোমার জন্যই আজ আমার এই অবস্থা।" একবার থামে মণ্ডল। তারপরে অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলে, "তবে বলছ যখন, জুতো খুলছি। কিন্তু সাবধান কোন ডাক্তারী করতে যেও না যেন।"

পণ্ডিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী করে। সে তার রুক্‌স্যাক থেকে 'ফার্স্ট এইড বক্স' বের করে। মণ্ডলের পায়ের গলে-যাওয়া ফোস্কার পাতলা চাওড়া কেটে ফেলে দেয়। তারপরে ওষুধ দিয়ে 'লিউকোপ্লাস্ট' লাগায়।

মণ্ডল জুতো পরে, কয়েক পা হাঁটে। তারপরেই খুশিভরা স্বরে বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ পণ্ডিত! তুমি তোমার পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করলে।"

"অকৃতজ্ঞ কোথাকার!"

আমরা পণ্ডিতের মন্তব্যে হেসে উঠি। কিন্তু মণ্ডল মোটেই মূল্য দেয় না। সে হ্যাভারস্যাক পিঠে তুলে আইস-এক্স হাতে নেয়। পাকা পর্বতারোহীর ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁক ছাড়ে, "বচন্?"

"জী সাব্।" বচন কাছে আসে।

"কালেকশান করেগা।"

"ঠিক হ্যায় সাব্। বচন নিজের রুক্স্যাকের গা থেকে প্রজাপতি ধরার জালটি খুলে মণ্ডলের হাতে দেয়। জাল হাতে পেয়েই দিলীপকুমার প্রজাপতির পেছনে ছুটতে থাকে।

"আমরা এগিয়ে যাচ্ছি মণ্ডলদা।" প্রাণেশ চলতে শুরু করে।

মণ্ডল মাথা নাড়ে। তার এখন কথা বলার ফুরসৎ নেই।

"বেশি দেরি করো না যেন, পথে হট লাঞ্চ-য়ের ব্যবস্থা হয়েছে।" প্রাণেশের পেছনে পেছনে চলতে চলতে পণ্ডিত মণ্ডলকে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু মণ্ডল নিরুত্তর। সে যে ইতিমধ্যেই একটি প্রজাপতিকে প্রায় বাগে এনে ফেলেছে।

আমরা এগিয়ে চলি। গত তিন দিন আমি সাধারণতঃ মণ্ডলের সঙ্গে পথ চলেছি। কিন্তু আজ অত আস্তে হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। আর তার দরকারই বা কি? মণ্ডলের সঙ্গে বচন সিং রয়েছে। তাদের পিছনেই কুলিরা আসছে। সুতরাং নিশ্চিন্তে পথ চলতে থাকি।

পথ বন্ধ। ধস নেমেছে পাশের পাহাড় থেকে। পথের অনেকখানি অংশ তার শিকার হয়েছে—তমসায় আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু মানুষ যে পথিকৃৎ। তারা দূর-দুর্গমের বুকে পথ তৈরি করে এখানেও তাই করেছে। স্থানীয়রা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে ধস পেরোবার পথ তৈরি করে নিয়েছে—সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ। তবে দুর্গম এবং শ্রমসাপেক্ষ।

সেই পথের গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা—জগন্নাথ, বিভাস ও বঙ্কিমবাবু, মামা, ভাগনে ও দাদু। কর্তব্যপরায়ণ পর্বতারোহীরা সহযাত্রীদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভাঙের লোভ বিসর্জন দিয়েছে।

কাছে আসতেই বিভাস বলে, "কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে একটু 'পাইন এ্যাপ্‌ল জুস্' খেয়ে নিন। চড়াইটা বেশ কঠিন।"

নেতার নির্দেশ পালন করি। ফলের রসের টিনটা হাতে নিয়ে খানিকটা রস গলায় ঢেলে দিই। আনারসের রস তো নয়, অমৃত—সকল শ্রান্তি দূর হয়ে গেল।

কিন্তু রওনা হতে পারি না। দিলীপের দেখা নেই। এখানে পথের যা অবস্থা, তাতে একা বচনের ভরসায় তাকে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।

আধ ঘণ্টা কেটে যায় কিন্তু কোথায় দিলীপকুমার! একে দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার ওপরে পিঠে মাল নিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বড়ই খারাপ লাগছে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। না দিলীপ নয়—সেতীরাম এসেছে। সে অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। তার দায়িত্বে মণ্ডলকে রেখে আমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যেতে পারি।

তাই করে বিভাস। সেতীরামের হাতে অবশিষ্ট ফলের রসটুকু দিয়ে সে বলে, "সাব্ এলে তাকে একটু বিশ্রাম করতে বলবি। তারপরে ফলের রস খাইয়ে খুব সাবধানে নিয়ে যাবি ওসলা। সব সময় তুই তার পেছনে থাকবি। দেখিস, সাব্ কিন্তু আর কখনও হিমালয়ে আসেন নি।"

"ঠিক হ্যায় সাব্।" সেতী মাথা নাড়ে।

"কেয়া ঠিক হ্যায় ?"

"বিলকুল।"

"তোম ব্লাডি ফুল !"

"ঠিক হ্যায় সাব্।"

আমরা হাসতে হাসতে চড়াই ভাঙতে শুরু করি। অনুগত প্রহরী সেতীরাম সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ। দু'পাশে ঝোপঝাড় ও কাঁটাগাছ। সারি বেঁধে একের পেছনে অপরকে ওপরে উঠতে হচ্ছে।

আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়—বেশ কঠিন এবং বিপজ্জনক পথ। মাঝে মাঝেই পিঠের রুক্‌স্যাক ঝোপঝাড়ে বেধে যাচ্ছে। খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে। কারণ পা ফসকালে আর রক্ষে নেই—সোজাসুজি প্রায় হাজার খানেক ফুট নিচে তমসার বুকে বিলীন হয়ে যেতে হবে। হলে মন্দ হয় না কিন্তু, সুন্দরী তমসা মুহূর্তে আমার জীবনযন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবে। এবং তার চেয়ে গৌরবময় মৃত্যু আর কিছুই হতে পারে না।

তবু সাবধানে পথ চলি—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

ধস পেরিয়ে আবার খুঁজে পেয়েছি পুরনো প্রশস্ত পথকে। আর তার সঙ্গে দেখা হতেই চলার গতিবেগ বেড়ে যায় আমাদের। এখন বেলা সাড়ে এগারোটা।

ঠিক বারোটার সময় আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনস্থলীতে উপস্থিত হলাম। এক ফালি সবুজ সমতল প্রান্তরের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা। তারই তীরে কামির অস্থায়ী রসুইখানা। আমরা তাড়াতাড়ি বসে পড়ি।

দাদু কিন্তু মোটেই হোস্ট-য়ের কর্তব্য পালন করছে না। আমাদের খাওয়ার তদারকি না করে সে কিনা ভাঙ শুকোতে দিচ্ছে! তবে কাকে আর এ সব বলা! স্বয়ং সহ-নেতাই যে ঐ এক পথের পথিক। সে এবং মামা খেতে না বসে রুক্‌স্যাক থেকে প্ল্যাস্টিক-সীট্ বের করে ফেলেছে। সংগৃহীত ভাঙের পাতাগুলিকে সযত্নে শুকোতে দিচ্ছে তার ওপরে। এখানে যে ঝকঝকে রোদ রয়েছে।

খাওয়া শেষ হয়েছে, কিন্তু চলা শুরু করা যাচ্ছে না। না, ভাঙ শুকোবার জন্য নয়, মণ্ডলের জন্য। সে যে এখনও এসে পৌঁছল না। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সেতীকে রেখে এসেছি। দরকার হলে সে দিলীপকুমারকে কাঁধে করে নিয়ে আসতে পারবে।

তবু আমরা দিলীপের জন্য দেরি করছি। সত্যি বলতে কি, সে সঙ্গে না থাকলে পথ-চলাটাই কেমন পানসে হয়ে ওঠে। তার মতো সঙ্গী পাওয়া যে-কোন পদযাত্রীর পরম সৌভাগ্য।

না, দিলীপকুমারের সঙ্গলাভের প্রত্যাশায় আর বসে থাকা সম্ভব হল না। জয় বাহাদুরের কাছে মণ্ডল, বচন ও সেতীর খাবার রেখে আমরা ওসলার পথে রওনা হলাম।

কয়েক পা এগিয়েই কাঠের একটি ছোট পুল, যে ঝরণার তীরে বসে খাবার খেয়েছি, তারই মূলধারাটির উপরে। পুল পেরিয়েই পাহাড়। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। বাঁ দিকের প্রায় সমতল পথটি তমসার তীরে দিয়ে ওসলা হয়ে হরকিদুন পর্যন্ত প্রসারিত। আর ডানদিকের চড়াই পথটি পাহাড়ের গা-বেয়ে ঢাট্‌মির গ্রামে চলে গিয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে ঢাট্‌মির তমসা উপত্যকার বৃহত্তম গ্রাম। সত্তরটি ঘরে প্রায় চার'শ লোক বাস করেন। আয়তন কিন্তু বেশি নয়, মাত্র শ'খানেক একর জমি নিয়ে গ্রাম।

আমরা বাঁ দিকের পথে এগিয়ে চলি। মাত্র মিনিট পনেরো চলার পরেই নদীর ওপারে, বেশ খানিকটা ওপরে, বড় একটি গ্রাম দেখতে পাচ্ছি—গ্রামটির নাম গঙ্গাড়।

পথের পাশেই খানিকটা নিচুতে, একফালি সমতল জায়গা, সেখানেও গুটি কয়েক ঘর রয়েছে। আর তারই ভেতরে একটি ঘর, অবিকল মন্দিরের মতো।

ছোট একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। তাকে ইশারায় কাছে ডাকি। ছেলেটি খাড়া পাথরের গা বেয়ে সোজা উঠে আসে কাছে। পথ দিয়ে আসতে হলে তাকে যে খানিকটা ঘুরতে হত।

ছেলেটির হাতে একটি 'টফি' গুঁজে দিই। খুশিভরা স্বরে সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দীতে বলে, "ঠিকই ভেবেছেন, এটি একটি মন্দির—কালীমন্দির।"

"কালীমন্দির!" আমরা রীতিমত বিস্মিত।

"জী সাব।"

এবারে ভাবি বিস্ময়ের কি আছে? তমসা উপত্যকা দুর্যোধন এবং কর্ণের সাম্রাজ্য বলে এখানকার অধিবাসীরা করালবদনা লোলরসনা মুণ্ডমালাশোভিতা মহাকালীর আরাধনা করতে পারবেন না, এ কেমন ভাবনা। তাছাড়া মহাবীর দুর্যোধন এবং কর্ণ যে কালীভক্ত ছিলেন না এমন কোন প্রমাণ তো আমাদের হাতে নেই।

সুতরাং আদ্যাশক্তি মহামায়ার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলি। আমাদের নজর কিন্তু বাঁ দিকে। ডান দিকে যে খাড়া পাহাড়, দেখবার কিছুই নেই। এই পাহাড়টার আরেক পাশে ঢাট্‌মির—দেখা যায় না এখান থেকে।

বাঁ দিকের সেই সমতল জায়গাটুকু ছাড়িয়ে একটি কাঠের পুল—তমসা পারাপারের জন্য। তমসার ওপারে অনেকটা উঁচুতে গঙ্গাড়—বেশ বড় গ্রাম। জনসংখ্যার দিক থেকে ওটি তমসা উপত্যকার তৃতীয় গ্রাম। গুটি ষাটেক বাড়িতে সওয়া তিন'শর মতো মানুষ বাস করেন। শ'দেড়েক একর জমির ওপরে গ্রাম।

জনসংখ্যার বিচারে এই উপত্যকায় গঙ্গাড়ের পরেই ওসলার স্থান। কিন্তু ওসলার কথা এখন নয়, আমরা তো সেখানেই চলেছি। অতএব গঙ্গাড়কে দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলি।

আধ ঘন্টা চড়াই ভাঙার পরে পথটি আবার উৎরাই হল। নেমে এলাম তমসার তীরে। বেলাভূমির ওপর দিয়ে পথ। এখন আমরা সকলেই একসঙ্গে চলেছি। লালু চলেছে সবার আগে আগে। সেই আজ আমাদের পথ-প্রদর্শক।

আচ্ছা, লালু কি আর জারমোলা ফিরে যাবে না? মনে পড়ছে প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও হিমালয়-প্রেমিক জে. টি. এম. গিব্‌সনের সেই কাহিনী। সেবারে এই অঞ্চলে পর্বতাভিযানের সময় তাঁদের সঙ্গেও একটি স্থানীয় কুকুর যোগদান করেছিল। কুকুরটি পাকা পর্বতারোহীর মতো বিশ হাজার ফুটের ওপর পর্যন্ত আরোহণ করে। শেরপারা

কিন্তু তাকে মোটেই পছন্দ করত না। কারণ, '..it made off with ·nything wo.ıld get its teeth into–including a tin of butter. At nigl.. it would creep into someone's tent, and was not more popular there even or the warmth it gave out, for this was counter-balanced by the fleas. Yet we all became rather fond of it, and wondered if it descended from pandavas dog.'*

লালুকে অবশ্য আমাদের শেরপারা খুবই ভালবাসে এবং ওপরে গিয়ে তাকে সঙ্গে শুতে নিতে কারও তেমন আপত্তি হবে বলে মনে হয় না। কারণ তার গায়ে নীল মাছি নেই। তবে তাকেও আমরা যুধিষ্ঠিরের সেই স্বর্গসাথী সারমেয়ের উত্তর-পুরুষ বলে মনে করছি।

এখন আমরা সবাই একসঙ্গে পথ চলেছি। না, ভুল বললাম, মণ্ডল ছাড়া অন্য সব সদস্য একসঙ্গে চলেছি। বিভাস দাদু ও মামা অবশ্য মাঝে মাঝেই ভাঙ তোলার জন্য এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। তাদের জন্য থেমে থেমে পথ চলতে হচ্ছে আমাদের। এর চেয়ে বোধ করি মণ্ডলের সঙ্গে থাকাই ঢের ভাল ছিল। কারণ তার প্রজাপতির পেছনে ছোটার উদ্দেশ্য বুঝতে পারি, কিন্তু এদের ভাঙ কালেক্‌শনের কারণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। এত ভাঙ দিয়ে এরা কি করবে?

হিমালয়ের হিমেল হাওয়া আজই প্রথম গায়ে লাগছে। দু'বছর বাদে আমি এই স্নেহমধুর স্নিগ্ধ-শীতল পরশ পাচ্ছি। গত বছর আমার হিমালয়ে আসা হয় নি। এ বছরও হয়তো হত না। মানে আসব না বলেই ঠিক করেছিলাম।

এই সময় এক দিন অমূল্য বিভাস ও পণ্ডিত আমার বাড়িতে এলো, আমাকে এই অভিযানে অংশ নেবার আমন্ত্রণ জানালো। আমি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম।

কথাটা বাবার কানে গেল। ওরা চলে যাবার পর তিনি আমাকে বললেন—অমূল্যরা যখন এত করে বলছে, যাও না—ঘুরে এসো।

তাঁকে বললাম নিজের অসুবিধের কথা। তিনি বললেন—কোন লেখকেরই লেখার কাজ কোনদিন শেষ হয় না। কিন্তু তারই মাঝে তাকে অন্য কাজ করতে হয়। আর বাইরে না বেরুলে লিখবে কি? লেখার প্রয়োজনেই লেখককে খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে দেশভ্রমণ করতে হয়।

দূতাগারের দপ্তরে গিয়ে সম্মতি জানিয়ে এলাম। অফিস ও প্রকাশকদের কাছ থেকে ছুটি নিলাম। যাবার আয়োজন আরম্ভ করলাম। এমন সময় সহসা..

হ্যাঁ, আজ থেকে ঠিক এক মাস আগে বাবা সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখটা দিন দিন বেড়েই চলল। ভাবলাম—বাবাই যেতে বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার জন্যই এবারে আর হিমালয়ে যাওয়া হল না আমার। তাঁকে এভাবে অসুস্থ রেখে কলকাতা ছাড়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

ভগবান বোধ করি আমার সমস্যাটিকে তলিয়ে দেখে থাকবেন। তাই ২৯শে আগস্ট রাতে বাবার খুবই বাড়াবাড়ি শুরু হল। ৩০শে সকালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। এবং ১লা সেপ্টেম্বর রাতে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। নিজের জীবনের

বিনিময়ে বাবা আমার হিমালয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর শেষ কাজ শেষ হল। আর সেদিনই 'বিগলিতি-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' মিনার বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করল। মাত্র পনেরো দিনের জন্য বাবা আমার গল্পের ছবি দেখে যেতে পারলেন না।

সকলের সকল আপত্তিকে উপেক্ষা করে আমি ১৯ শে সেপ্টেম্বর রেলে উঠে বসলাম। আত্মীয়স্বজনরা বিস্মিত হয়েছেন, কারণ কালাশৌচের মধ্যে নাকি এমন দুর্গম পদযাত্রায় অংশ নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি জানি, বাবার আদেশ পালন করতেই আমি এবারে হিমালয়ে এসেছি। এবং তাঁর আশীর্বাদেই আমাদের সকল বিপদ দূর হয়ে যাবে। সুতরাং আজকের এই হিমেল হাওয়ায় আমি আমার স্নেহপ্রবণ পিতার মধুর স্পর্শ পাচ্ছি। আমার মন ও প্রাণ এক অনির্বচনীয় বেদনাবিধুর আনন্দে ভরে উঠেছে। কেবলি সেই পরম পবিত্র শ্লোকটি মনে পড়ছে—

'পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥'

ওর দিকে নজর পড়তেই আমার ভাবনা থেমে যায়। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ছেলেটির দিকে তাকাই। আহা, মুখখানি শুকনো। হয়তো খিদে পেয়েছে। কতই বা বয়স হবে, বড় জোর বছর বারো। গায়ে কম্বলের কোট-প্যান্ট, পায়ে কাপড়ের জুতো, পিঠে হ্যাভারস্যাক।

পণ্ডিতই প্রথম আলাপ করে, "তোমার ঘর কোথায় ?"

"ওসলা গাঁয়ে।" ছেলেটি সপ্রতিভ স্বরে উত্তর দেয়।

"কোথায় চলেছো ?"

"নৈটয়ার।" হ্যাভারস্যাক দেখিয়ে বলে, "পশম দিয়ে দু' কেজি তেল আনতে।"

"কবে ফিরবে ?"

"পরশু।"

"পারবে ?"

একটু হাসে ছেলেটি। বলে, "পারব না কেন ? আজ সন্ধ্যার আগেই শাঁকড়ি চলে যাবে। কাল সকালে শাঁকড়ি থেকে রওনা হয়ে নৈটয়ার গিয়ে তেল নিয়ে আবার শাঁকড়ি ফিরে আসব। পরশু শাঁকড়ি থেকে ওসলা।"

যেন কিছুই নয়। একটা বারো বছরের ছেলে আড়াই দিনে চল্লিশ মাইল চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে তেল নিয়ে আসছে। তবু তার কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কোন কষ্টবোধ পর্যন্ত নেই।

ছেলেটিকে আর আটকে রাখা সমীচীন নয়। এখান থেকে শাঁকড়ি এগারো-বারো মাইল। বেলা একটা বেজে গিয়েছে। জঙ্গলের পথ। সন্ধ্যার আগেই তার শাঁকড়ি পৌঁছনো দরকার। সুতরাং পকেট থেকে একটি টফি বের করে ছেলেটির হাতে দিই। টফিটি মুখে পুরে দেয় ছেলেটি, তারপরে সেলাম করে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলে আপন পথে।

চলতে চলতে পণ্ডিত বলে, "ব্যাপারখানা দেখলেন শঙ্কুদা ? দু'কেজি সরষের তেল আনার জন্য বাপ-মা এতটুকু ছেলেটাকে একা-একা বিশ মাইল দূরে পাঠিয়েছে। আমি তো দাদা, সারা জন্ম তেল না খেলেও এ পরিশ্রম করতে পারতাম না।"

সহাস্যে বলি, "তাই তো তুই শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে জন্মেছিস আর ঐ ছেলেটি

জন্মেছে ন'হাজার ফুট উঁচু ওসলা গ্রামে।"

তমসার ওপারে অনেকটা উঁচুতে ওসলা গ্রাম দেখা গেল। আমাদের অবশ্য ওপারে যাবার দরকার নেই। অত উঁচুতে উঠতেও হবে না আজ। শুনেছি গ্রামটি ওপারে হলেও বন-বিশ্রামগৃহটি নদীর এপারে এবং একেবারে পথের ধারে। আমরা এখনও তমসার বাঁ তীর দিয়ে পথ চলেছি।

পথ-চলা থামাতে হল। পথের ডান দিকে একফালি সমতল জায়গা। তার খানিকটা জুড়ে রামদানার ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝে টিন আর পাথরের একটি বাড়ি। এদেশের বিচারে বেশ বড় বাড়ি বলতে হবে। বাড়িটার খানিকটা অংশ ভেঙে গেছে, তাহলেও পুরনো নয়। সামনের দেওয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে কেউ লিখে রেখেছে—

'Child is the father of man.'

'Welcome your visit. Sir,'

কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়েছিলেন পথের ধারে। সম্ভবত আমাদের দেখেই তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন এখানে। তাঁদেরই একজন জানালেন—আমার অনুমান সত্য। এটি ওসলা গ্রামের মাইনর স্কুল। এখন পরিত্যক্ত।

"কেন?"

"শিক্ষক নেই বলে স্কুল বন্ধ।"

বিস্ময়কর! যে দেশে গ্রাজুয়েট ছেলে-মেয়েকে পেটের দায়ে চুরি করতে হচ্ছে, দেহোপজীবিনী হতে হচ্ছে, সে দেশে শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না!

বোধ করি আমার সংশয় দূর করবার জন্যই লোকটি আবার বলেন, "সাব্, একে তো কোন শিক্ষিত লোক এখানে আসতে চান না, মন টেকে না—তার ওপরে সরকার যে মাইনে দেন, তাতে কোন বাইরের লোকের পক্ষে এখানে এসে চাকরি করা সম্ভব নয়। ফলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের একটু লেখাপড়া শেখাতে পারছি না।"

মনটা ভারী হয়ে ওঠে। তারপরেই মনে পড়ে—এ তো আমার কোন নতুন অভিজ্ঞতা নয়। আর এ দুর্ভাগ্য তো শুধু ওসলা গ্রামের মানুষদের নয়, এ যে হিমালয়ের হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে চরম সত্য। আমরা পরমাণু বোমার সফল বিস্ফারণ ঘটিয়েছি, কিন্তু দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে পারি নি।

॥ নয় ॥

গতকাল বেলা তিনটে নাগাদ আমরা ওসলা বন-বিশ্রামগৃহে পৌঁচেছি। পথের ডানদিকে বিশ্রামগৃহ। সামনে টিনের পরিচয়পত্র—

বন-বিশ্রামগৃহ, ওসলা। উচ্চতা ৮,৪০০

হরকিদুন—৬মাইল। তালুকা—৮মাইল।

পাশে আরেকটি সাইনবোর্ড—

'Game Sanctuary'–গোবিন্দ পশুবিহার।

বিশ্রামগৃহের ঠিক বিপরীত দিকে, তমসার ওপারে বেশ উঁচুতে ওসলা গ্রাম। জনসংখ্যার বিচারে ওসলা তমসা উপত্যকার চতুর্থ জনপদ। প্রায় পঞ্চান্নখানি ঘর ও শ'দেড়েক একর জমি নিয়ে গ্রাম। শ'তিনেক মানুষের বাস। বিশ্রামগৃহ থেকে গ্রামটিকে অবিকল একখানি রঙিন ছবি বলে মনে হচ্ছে।

এপারে ঘন বনময় পাহাড়। কিন্তু ওপারে বড় গাছপালা দেখছি না। তবে গাঁয়ের চারিদিকেই ক্ষেত রয়েছে। বিশ্রামগৃহ থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই পুল পাওয়া যাবে। একটি নয়, দু'টি পুল। বেশ পুরনো। ১৯৪৮-খ্রীষ্টাব্দে গিব্‌সন প্রথম যখন হরকিদুন আসেন, তখনও তিনি দু'টি পুলই দেখেছিলেন, এই পুল এবং ওসলা সম্পর্কে ১৯৫৪ সালে তিনি লিখেছেন:—

'Oshla is a village high above the right bank of the Tons and a good place to engage porters, if further progress by mules is impossible. There is a permanent bridge a mile or so down the river and a temporary one just above it. The latter is liable to be washed away or removed when the rains start and cannot be relied upon.'*

পুল পেরিয়ে চড়াই পথে মাইলখানেক এগিয়ে গ্রাম—ওসলা গ্রাম। কম করে আরও শ'পাঁচেক ফুট ওপরে উঠতে হবে। অর্থাৎ গ্রামের উচ্চতা ন'হাজার ফুটের মতো। কাল বিশ্রামগৃহের আঙ্গিনায় বসে আমরা গ্রামটিকে দেখছিলাম বারে বারে। আজও তাই দেখছি। বড় ভাল লাগছে দেখতে।

গতকাল বিকেলে স্কুলের সামনে যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁরা আমাদের সঙ্গে বিশ্রামগৃহ পর্যন্ত এসেছিলেন। তাঁদেরই একজন অনুরোধ করেছেন—আপনারা একটু বসুন সাব্। চৌকিদার এতক্ষণে নিশ্চয় খবর পেয়ে গেছে। এসে যাবে এখুনি।

না বসে উপায় ছিল না। কারণ তখন বিশ্রামগৃহ বন্ধ। সুতরাং পথ থেকে উঠে এসে বিশ্রামগৃহের সামনের এই ছোট তৃণাচ্ছাদিত আঙ্গিনায় বসে পড়েছি। বসে বসে ওসলা গ্রামটিকে দেখেছি আর চৌকিদারের প্রতীক্ষা করেছি। চৌকিদার ওসলা গ্রামেরই বাসিন্দা। সে নাকি ঘরে বসেই দেখতে পাবে আমাদের। এবং কেউ খবর না দিলেও বুঝতে পারবে, আমরা তার অতিথি। কারণ সাব্‌রা সবাই এখানে এসে বিশ্রামগৃহে বাস করেন। সুতরাং সে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবে।

ঠিকই বলেছিলেন লোকটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল চৌকিদার। এসেই সে সবিনয়ে সেলাম করল। জানালো—তার নাম ভজন সিং।

পকেট থেকে নৈটয়ার ফরেস্ট রেঞ্জারের চিঠিখানি বের করে ভজনের হাতে দিই। একবার চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভজন বিশ্রামগৃহ খুলে দিল।

তালুকার থেকেও ছোট এই বিশ্রামগৃহটি। তবে আমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। সামনে সুপ্রশস্ত বারান্দা। ভেতরে পাশাপাশি দু'খানা ঘর। 'ফায়ারপ্লেস' এবং লাগোয়া বাথরুম রয়েছে। পেছনের বারান্দাটি ঘেরা—ঘর হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটু নিচে রান্নাঘর এবং বাবুর্চিদের বাসগৃহ। কাল সেখানে শেরপারা ও কয়েকজন

* 'The Harki Doon' by J. T. M. Gibson. (Himalayan Journal, Vol. 18, 1954)

কুলি বাসা বেঁধেছিল। বাকি কুলিরা রাত কাটিয়েছে বিশ্রামগৃহের বারান্দায়—মালপত্রের সঙ্গে।

তমসার উপত্যকার কোথাও জ্বালানী কাঠের অভাব নেই। সুতরাং গতকাল চৌকিদার এসে রান্নাঘরের দরজা খুলে দেবার পরেই আমাদের শেরপা পাচক কামি উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু চা তখনও এসে পৌঁছয় নি। চা চিনি ও দুধ ছিল কুলির পিঠে। তারা ওসলা পৌঁচেছে বেশ কিছুক্ষণ বাদে। সুতরাং সময়টা ভাল কাটে নি। দিনের শেষে দুর্গম পথযাত্রার প্রান্তে পৌঁছে চা না পেলে প্রত্যেক পদযাত্রীরই মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

আমরাও তাই বিক্ষুব্ধ মনে এবং সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলাম ফেলে আসা পথের দিকে, প্রতীক্ষা করেছিলাম সেই চা ও চায়ের সরঞ্জাম বহনকারী বাহকটির জন্য। আর ভাবছিলাম—গত তিনদিন দিলীপকুমারের সঙ্গে পথ চলে ভালই করেছি। সবার শেষে গন্তব্যস্থলে পৌঁচেছি। ফলে পৌঁছনোমাত্র চা পেয়েছি। আগে পৌঁছবার জন্য গতকাল তখন তাই বড়ই আপসোস হচ্ছিল।

কিন্তু কোন আপসোস করে নি আমাদের হোস্ট্ শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মল্লিক ওরফে দাদু এবং তার দুই শিষ্য জগন্নাথ ও বিভাস ওরফে মামা-ভাগনে। অবসর পেয়ে ওরা তখন মনের আনন্দে ভাঙ কালেক্‌শন করছিল। ওসলা বিশ্রামগৃহের চারিদিকেও যে প্রচুর ভাঙ গাছ।

আরও একজন কোন আপসোস করে নি। সে প্রাণেশ—পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তী। গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে সে গল্প জুড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ধূমধার-কান্দি সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয় নি। কারণ তাঁরা কেউ ওমুখো হন নি। তবে তাঁদের গাঁয়ের জনদুয়েক লোক নাকি ধূমধার-কান্দি অতিক্রম করেছে। প্রাণেশ অনুরোধ করেছে—তাঁদের অন্তত একজনকে আগামী কাল ধরে আনুন এখানে।

গ্রামবাসীরা সম্মত হয়ে বিদায় নিয়েছেন।

চায়ের প্রত্যাশায় কিন্তু খুব বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় নি আমাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুলিরা আসতে শুরু করেছে এবং ততক্ষণে কোয়ার্টার মাস্টারের ভাঙ সংগ্রহ এবং শুকোতে দেওয়া শেষ। সুতরাং চারটের মধ্যেই চা-বিস্কুট পাওয়া গিয়েছে।

অথচ আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি নি। তখনও মণ্ডলের পাত্তা পাওয়া যায় নি। কুলিদের কারও সঙ্গে দেখা হয় নি তার। তবে কয়েকজন কুলি জানিয়েছে, সেতী ফলের রস নিয়ে এবং জয় বাহাদুর খিচুড়ি নিয়ে যথাস্থানে বসে রয়েছে তার পথ চেয়ে।

প্রাণেশ ও বিভাস কিন্তু কাল আমাদের সে দুশ্চিন্তার অংশীদার হয় নি। বেশি ভয় ও ভাবনা থাকলে পর্বতারোহী হওয়া যায় না। আমার প্রশ্নের উত্তরে বিভাস শুধু বলেছিল—মিথ্যে মন খারাপ করবেন না। মণ্ডল ঠিক এসে যাবে।

ওরা দুজনে তখন বসে বসে আজকের কর্মসূচী ঠিক করছিল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করল—আজ সকালে ব্রেক-ফাস্ট করে এবং 'প্যাকড্-লাঞ্চ' নিয়ে ওরা এগিয়ে যাবে ধূমধারের দিকে। ওদের সঙ্গে যাবে দেশাই নির্মল সুশীল শেরপা পাসাং ও দোরজি এবং কুলি তুল বাহাদুর। কারণ তুল বাহাদুর গতবার ইণ্ডিয়ান মিলিটারি আকাদেমীর

সফলকাম বান্দরপুঁছ (ব্ল্যাক পিক বা কৃষ্ণচূড়া) অভিযানের সঙ্গে গিয়েছিল।

বচন, বিজীন্দর ও সেতীরামকে বাদ দিলে আমরা মোট একচল্লিশজন কুলি নিয়ে এসেছি। তার মধ্যে দু'জন কিচেনে কাজ করছে এবং তিনজনকে নৈটয়ার রেখে আসা হয়েছে। আরও তিনজন কুলিকে আজ নৈটয়ার পাঠাতে হবে—সেই বাড়তি মাল নিয়ে আসার জন্য। সুতরাং তেত্রিশজন কুলি আজ মাল নিয়ে যাবে ওদের সঙ্গে। খুব বেশি দূর যাবে না। সকাল নটা নাগাদ রওনা হয়ে ঘণ্টা পাঁচেক হাঁটবে। যাতে কুলিরা মাল রেখে সন্ধ্যের আগেই ওসলায় ফিরে আসতে পারে। শেরপা এবং সদস্যরা অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন শিবির স্থাপন করে সেখানেই থেকে যাবে। আগামীকাল তারা তালাও পর্যন্ত অগ্রসর হবে। তালাও মানে জলাশয়। কৃষ্ণচূড়ার পাদদেশে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ফুট উঁচুতে সমতল একটি তৃণাচ্ছাদিত সুবিশাল প্রান্তর। তারই একাংশ জুড়ে এক চমৎকার তালাও। শম্ভু বলেছে—১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জে. টি. এম. গিব্‌সন নাকি সেখানে তাঁর কৃষ্ণচূড়া (২০,৯৫৬) অভিযানের মূল শিবির স্থাপন করেছিলেন।

অভিযানের পর তাঁরা সেই শিবির থেকেই স্বর্গারোহিণীর গিরিশিরা অতিক্রম করে হরকিদুন গিয়েছিলেন। আর তুল বাহাদুর বলছে—গত বছর (১৯৭১) মিলিটারি আকাদেমীর অভিযাত্রীরাও সেখানেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের মূল শিবির। অতএব আমাদেরও সেখানে একটি শিবির স্থাপন করতে হবে। সেই শিবির থেকে বিভাস প্রাণেশ ও তাদের সঙ্গীরা ধুমধারের পথ খুঁজতে থাকবে। আমরা ওসলা থেকে এক এক করে সমস্ত মাল সেখানে পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে অমূল্যরা এসে যাবে। তারপরে নেতার সঙ্গে আমরাও রওনা হব তালাও শিবিরের পথে।

ওসলা তমসা উপত্যকার শেষ জনপদ। আগেই বলেছি স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গ নিঃসৃত হরকিদুন নালা এবং বান্দরপুঁছ পর্বতশ্রেণী থেকে নির্গত রুঁইসারা গাডের মিলিত ধারা এই তমসা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ওসলাই তমসার জন্মভূমি। এই বিশ্রামগৃহ থেকে খানিকটা পূবে এগিয়ে গেলেই সেই সঙ্গম—তমসার জন্মস্থান। আমাদের গন্তব্যস্থল ধুমধার-কান্দি অর্থাৎ রুঁইসারা গাডের ডান তীর ধরে দক্ষিণ-পূবে।

আর হরকিদুনের পথ হল হরকিদুন নালার ডান তীর দিয়ে উত্তর-পূবে। এই দুই নদীর মাঝখানেই স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গমালা। সুতরাং আমাদের মতো সাধারণ পদযাত্রীদের কাছে হরকিদুনও ধুমধারের পৃথক পথ। এ অভিযানের পরিকল্পনায় তাই হরকিদুন যাবার কোন কর্মসূচী নেই।

অথচ শুনেছি জায়গাটি নাকি চমৎকার। তাই গিব্‌সন বহুবার তাঁর ছাত্রদের হরকিদুনে নিয়ে এসেছেন। ভাবলাম আমাকে তো দু-তিন দিন থাকতেই হবে এখানে—বসে থাকতে হবে। এই সুযোগে অনায়াসে একবার ঘুরে আসা যায় হরকিদুন থেকে। শেষ পর্যন্ত কাল তাই বিভাসের কাছে আরজিটা পেশ করেছিলাম।

সহনেতা সে-আবেদন অনুমোদন করে নি। বলেছে—যারা ওসলাতে থাকবে, তারা ইচ্ছে করলে হরকিদুন থেকে ঘুরে আসতে পারে। তবে আপনাকে আমি ছাড়তে পারব না।

—কারণ ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছি।

বিভাস নির্বিকার স্বরে উত্তর দিয়েছে—অমূল্যদা আপনাকে ছাড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন।

আর কোন প্রশ্ন করি নি বিভাসকে। কারণ তা করার নিয়ম নেই। নিয়মানুবর্তিতা পর্বতাভিযানের প্রথম কথা এবং নেতার সিদ্ধান্ত এখানে শেষ কথা।

বসে বসে তখন নেতার কথাই ভেবেছি। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও অমূল্য আমার নেতা। তার সঙ্গে আমি কয়েকবার হিমালয় অভিযানে এসেছি। প্রত্যেক বারেই দেখেছি আমার প্রতি তার নজরটা যেন একটু বেশি। কেদারনাথ পর্বত (২২,৭৭০) এবং সতপন্থ (২৩,২১৩) অভিযানের সময়েও সে আমাকে অগ্রবর্তী মূল শিবিরের ওপরে যেতে দেয় নি। আর এবারে তো মাত্র কয়েকদিন আগে আমি বাবাকে হারিয়েছি। সুতরাং এবারে যে সে আমাকে আরও বেশি নজরবন্দী করে রাখবে, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

ভাবনা থেমে গেল। জয় বাহাদুর আসছে। কিন্তু দিলীপকুমার কোথায়? নিশ্চয় পেছনে। তাড়াতাড়ি বাবান্দা থেকে পথে নেমে গিয়েছি।

জয় বাহাদুর কাছে এসেছে। প্রশ্ন করেছি—মণ্ডলসাব্ কিধর?

—নহী জানতা। তার কণ্ঠস্বরে রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

পাবারই কথা। মণ্ডলের খাবার নিয়ে বেচারা বহুক্ষণ একা একা বসে ছিল সেই জনহীন প্রান্তরে। কিন্তু মণ্ডল আসে নি।

গেল কোথায়? দু'ঘন্টার ওপরে আমরা তখন ওসলা পৌঁছে গিয়েছি। অতক্ষণ তো দেরি হওয়া উচিত ছিল না। সুতরাং দুশ্চিন্তায় পড়েছি।

তারপরেই মনে পড়ল কথাটা—সেতীরামকেও তো রেখে আসা হয়েছে। সে কেবল কুলির সর্দার নয়, একজন সুদক্ষ পর্বতারোহী। অতএব মণ্ডলের জন্য চিন্তা করা অর্থহীন। বরং দুঃখ হয়েছে সেতীর কথা ভেবে। মণ্ডলের জন্য তাকেও অভুক্ত থাকতে হল। ওরা না আসায় জয় বাহাদুর ওদের খাবার কুলিদের দিয়ে ওসলা চলে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত মণ্ডল ওসলা পৌঁছল। তবে তখন সন্ধ্যার সামান্যই বাকি। আমাদের সোচ্চার অভিনন্দনের মাঝে অভিযাত্রী দিলীপকুমার খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিশ্রামগৃহে উঠে আসে। পণ্ডিত পিঠ থেকে হ্যাভারস্যাক্‌টা খুলে নিতেই সে সটান শুয়ে পড়ে একখানি খাটিয়ায়। প্রাণেশ তাড়াতাড়ি জুতো খুলে দেয়। দাদু কফি বিস্কুট ও বাদাম নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ বাদে মণ্ডল একটু প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাধ্য হয়ে বচনকে সেতীর কথা জিজ্ঞেস করতে হয়। বচন বিস্মিত হয়।

বলে—সেতী! সেতীর সঙ্গে তো দেখা হয় নি আমাদের!

—তাহলে তোমরা কি সোজাপথে আসো নি?

—না সাব্। আমরা এসেছি খচ্চরের পথে।

—খচ্চরের পথে!

—জী সাব্। পথে ধস নেমেছে শুনে মণ্ডলসাব্ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে খচ্চররা কোন্ পথে যাতায়াত করছে? বললাম, সেই চাট্‌মির হয়ে চড়াই এবং ঘোরাপথে। মণ্ডলসাব্ তখন বললেন, হামলোগ উসি খচ্চরকা রাস্তাসেই যায়গা।

সুতরাং অনুগত বচন কয়েক মাইল বেশি চড়াই-উৎরাই ভেঙে তার সাহেবকে নিয়ে সেই খচ্চরদের রাস্তা দিয়েই এসেছে এবং মানুষদের পথে প্রতীক্ষারত সেতীরামের সঙ্গে দেখা হয় নি তাদের।

শ্রান্ত সেতীরাম সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ বাদে বিশ্রামগৃহে পৌঁছল। আমরা তখন বার দু'য়েক কফি শেষ করে আগুনের সামনে বসে আজকের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করছি।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই মেঝেতে বসে পড়ল সেতী। ছোট ছেলের মতই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকল সে।

অনেক কষ্টে তার কান্না থামালাম। জিজ্ঞেস করলাম—কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন?

—নহী মিলা সাব্, মণ্ডলসাব্ নহী মিলা। উনকো জরুর সের খা লিয়া। ম্যায় ফির যাউঙ্গা, মুঝকো চার টর্চ দিজীয়ে। ম্যায় আট কুল্লি লেকর যাউঙ্গা। মণ্ডলসাব্‌কো জরুর লেকর আউঙ্গা।

তার মানে যে ভাবেই হোক বাঘের পেট থেকে মণ্ডলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে সেতী।

হাসি পেল, কিন্তু হাসতে পারি নি। গম্ভীর স্বরে প্রাণেশ বলে—পাশের ঘরে সুশীল রয়েছে, তার কাছ থেকে টর্চ নিয়ে আয়।

চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় সেতী। সে ধীর পায়ে পাশের ঘরে ঢোকে। ঢুকেই দেখতে পায় মণ্ডলকে—খাটিয়ায় ঘুমোচ্ছে। নিজেকে আর সামলাতে পারে না সে। সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে—আপ্ আগয়ে সাব!

মন্ডলের ঘুম ভেঙে যায়। সে পাল্টা প্রশ্ন করে—সেতী এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কখন এলে?

—থোরা আগে সাব্। পশুপতিনাথজীকা কিরপা আপ আগয়ে সাব্! তার কণ্ঠস্বরে পরম প্রশান্তির প্রলেপ।

আশ্চর্য হলাম সেই অভুক্ত ও শ্রান্ত সর্দারের আচরণ দেখে। একবারও সে মণ্ডলকে বলল না নিজের কষ্টের কথা। বলল না যে মণ্ডলের জন্যই তাকে সারাদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে, অন্ধকার দুর্গম পথে আলো ছাড়াই ছুটে আসতে হয়েছে।

একটু বাদে সেতী ফিরে আসে আমাদের ঘরে। সানন্দে বলে—মণ্ডলসাব্ বহুৎ হুঁশিয়ার আদমী, ঠিক চলা আয়া। বঢ়ী খুশীকা বাত্।

সেতী তখন আনন্দে একেবারে উপছে পড়ছে—তার মণ্ডলসাব্‌কে ফিরে পাবার আনন্দে। কে বলবে মাত্র কয়েক মিনিট আগেও সে শিশুর মতো কান্নাকাটি করছিল।

মামা জিজ্ঞেস করে—তোম খুশ হ্যায় সেতী?

—জী সাব্।

—তোম ব্লাডি ফুল?

—জী সাব্।

আমরা সমস্বরে হেসে উঠেছি। এবং সেতীও সানন্দে সেই অট্টহাসতে যোগ দিয়েছে।

কালকের কথা বলা শেষ হল, এবার আজকের কথা শুরু করা যাক। আজ আঠাশে সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ কলকাতা থেকে রওনা হবার দশদিন পরে আজ আমাদের ঘুম ভেঙেছে তমসা তীরের শেষ জনপদে।

সকাল ছটায় বেড-টি এসেছে। কিন্তু চা শেষ করেও আমরা স্লীপিং-ব্যাগ ছাড়ি নি। আমি আজ এখানেই থাকছি।

আমি শুয়ে রয়েছি কিন্তু শুয়ে থাকতে পারে নি বিভাস প্রাণেশ নির্মল সুশীল ও

দেশাই। ওরা যে আজ আমাদের ছেড়ে যাত্রা করছে ধূমধারের দিকে।

পর্বতাভিযানে এসে এইটেই সব চেয়ে বেশি বেদনাদায়ক। একসঙ্গে এসে যাত্রাপথের বাঁকে বাঁকে বিদায় দিতে হয় সহযাত্রীদের। তারা দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে এগিয়ে যায়। বুকভরা অস্থিরতা ও উদ্বেগ নিয়ে তাদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করতে হয় আর অজানা আশঙ্কায় দুলতে হয় অবিরত।

এবারে অবশ্য অতখানি উদ্বেগাকুল হবার কারণ ঘটবে না। এবারে আমরা কোন শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করছি না। প্রকৃতি সহায় হলে বান্দরপূঁছ গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত, ১৮,৪০০ফুট উঁচু ধূমধার-কান্দি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে, তমসা উপত্যকা থেকে ভাগীরথী উপত্যকায় উপনীত হব। একই সঙ্গে সকলে অতিক্রম করব সেই গিরিবর্ত্ম। ওরা শুধু তার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে আজ এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ওদের সঙ্গে আমাদের এই বিচ্ছেদ সাময়িক।

তবু বিদায়বেলায় চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। যেখানে পথের প্রতি বাঁকে বিপদ ওৎ পেতে বসে আছে, সেখানে সহযাত্রীকে বিদায় জানাতে ভয় হয় বৈকি।

বেলা নটা নাগাদ রওনা হল ওরা। খানিকটা দূর অবধি আমরা এগিয়ে দিলাম ওদের। বার বার বিভাস ও প্রাণেশকে মনে করিয়ে দিলাম—সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজানা অঞ্চল। কোন কারণেই কখনও মাত্রাহীন ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।

ওরা সম্মতি জানিয়ে এগিয়ে চলে, আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তমসার তীরে। একসময় গাছে-ছাওয়া চড়াইপথের বাঁকে ওদের চলমান দেহগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা ফিরে আসি বিশ্রামগৃহে।

আসতেই কোয়ার্টার-মাস্টার হুকুম করে, "আড্ডা না মেরে এসো তো, মালগুলো 'রি-প্যাকিং' করে ফেলা যাক।"

এ হুকুম অবহেলা করার উপায় নেই। কারণ 'প্যাকিং' বা বস্তা-বন্দীকরণ পর্বতাভিযানের একটি অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। প্রথমতঃ প্রত্যেকটি প্যাকেজের ওজন ও আকারের একটা নিয়ম আছে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি বাক্স, 'ক্রেট্' কিংবা বস্তা 'ওয়াটার প্রুফ' হওয়া দরকার। তৃতীয়তঃ বিশদ 'প্যাকিং-লিস্ট' থাকা প্রয়োজন যাতে বাক্সের নম্বর দেখলেই ভেতরে কি আছে বুঝতে পারা যায়। সর্বশেষে এমনভাবে প্যাকিং করা উচিত যাতে দু-চারটি বাক্স খুললেই সব রকমের কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায়। পর্বতাভিযানের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে প্যাকিং-য়ের ওপরে।

আমাদের দেশে বে-সরকারী পর্বতাভিযান মানেই হল শত শত দুয়ারে ঘুরে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং রসদ সংগ্রহ করা। 'ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন' এবং রাজ্য সরকার কিছু অর্থ সাহাস্য করেন বটে কিন্তু সে সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আনন্দের কথা এদেশে বেশ কিছু পর্বতপ্রেমিক মানুষ ও প্রতিষ্ঠান আছেন। তাঁরা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু নিজেদের চাকরি বজায় রেখে তাঁদের সাহায্য সংগ্রহ করতে সব সময়েই দেরি হয়ে যায়। এবারেও সময়াভাবে আমরা কলকাতা থেকে মালপত্র ঠিক মতো প্যাক্ করে আনতে পারি নি। উত্তরকাশী ও পুরৌলায় বসে কিছু প্যাকিং করা হয়েছে। অভিজ্ঞ কোয়ার্টার-মাস্টার আজ বাকি প্যাকিং সেরে ফেলতে চাইছে। আমরা তার সঙ্গে হাত লাগাই।

একটানা পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রমের পরে প্যাকিং শেষ হল। কোয়ার্টার-মাস্টার অবশ্য

'লাঞ্চ-রিসেস্ স্যাংক্শান্' করেছিল। ভর-পেট ভাত ডাল তরকারি ও চাটনী খেতে পেয়েছি।

তরকারির সমস্যাটা মোটামুটি সমাধান হয়েছে। চৌকিদার দু'মণ আলু বেচেছে আমাদের কাছে—চমৎকার আলু। এখানে টাকার কোন দাম নেই। তাই টাকার বিনিময়ে কেউ কিছু বেচতে চায় না।

গত দু'দিন বিকেলের দিকে আবহাওয়া খারাপ হয়েছিল। কিন্তু আজ এখনও মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। চারিদিকে ঝক্‌ঝকে রোদ। রোদে বসেই সারাদিন কাজ করেছি আমরা। মাঝে মাঝেই গাঁয়ের মানুষরা এসে ভিড় জমিয়েছে—নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সকলেই। সকলের একই প্রার্থনা—সাব্, আপকে পাস দাওয়া হোগা!

এ প্রার্থনা নতুন কিছু নয়। যাঁরা দুর্গম হিমালয়ের যে কোন জনপদে এসেছেন, তাঁরাই এ প্রার্থনায় সম্মুখীন হয়েছেন। তাই আমরা হিমালয়ে আসার আগে বিভিন্ন ওষুধ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে কিছু ওষুধ নিয়ে আসি এবং ডাক্তারের সাহায্যে গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করে যাই।

অনিবার্য কারণে ডাক্তার এবারে আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি। সুতরাং আমরা আসার পথে কাউকে চিকিৎসা করতে পারি নি। তবে এক বাক্স ওষুধ রেখে এসেছি পুরৌলায়। যাতে ডাক্তার আসার পথে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করতে পারে।

সেই কথাই বলতে হয় ওসলা গ্রামের সমবেত অধিবাসীদের। তাঁরা আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফেরেন। আমাদের আশ্বাস দিয়ে যান—ছবি তোলার ব্যাপারে সুশান্তবাবুকে তাঁরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন এবং আমাদের দু'জন পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে দেবেন।

বেলা তখন পাঁচটা হবে। হঠাৎ কামি ছুটে আসে কিচেন থেকে। বলে, "সাব্, আদমী!"

"কিধর ? উপর ?"

"নহী সাব্, নিচে। নিচেসে কোই আদমী আরহা হ্যায়। মালুম, হামারাহী আদমী হোগা।"

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি। কামি ঠিকই বলেছে—পিঠে রুক্‌স্যাক্ ও হাতে আইস-এ্যাক্স নিয়ে একজন লোক এদিকেই আসছে। তার মাথায টুপি গায়ে উইন্ডপ্রুফ-জ্যাকেট।

আমরা পথে নেমে আসি। এগিয়ে চলি আগন্তুকের দিকে।

এবারে চিনতে পারি—শম্ভু, আমাদের অভিযানের সমীক্ষক শম্ভুনাথ দাস। কিন্তু শম্ভু হঠাৎ একা একা আজই চলে এলো কেন ? তাকে তো আমরা সুশান্তবাবুর সঙ্গে নৈটয়ারে রেখে এসেছিলাম। কথা ছিল ছবি তোলার কাজ শেষ হলে তারা সেখানে অমূল্যদের জন্য অপেক্ষা করবে।

পণ্ডিত শম্ভুর রুক্‌স্যাক্ কাঁধে তুলে নেয়। শ্রান্ত শম্ভু পথের পাশে একখানি পাথরের ওপর বসে পড়ে। একটু বাদে বলে, "চা ও খাবার দিয়ে জনতিনেক কুলি পাঠাও। ডাক্তার ও পান্নার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছে। ওরা হাঁটতে পারছে না।"

ডাক্তার ও পান্না। আমরা বিস্মিত। তাহলে কি অমূল্যরা এসে গিয়েছে ? কিন্তু ওরা তো আমাদের তিনদিন পরে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে। ওরা কি চারদিনের হাঁটাপথ দু'দিনে এসেছে ?

শম্ভু মাথা নাড়ে।

তাহলে তো ডাক্তার ও পান্নার পায়ে ব্যথা হতেই পারে। ওরা এই প্রথম হিমালয়-অভিযানে এসেছে।

কিন্তু আমাদের এখানে যে এখন কোন কুলি নেই। এমন কি সেতী পর্যন্ত ওপরে গিয়েছে মাল রেখে আসতে।

বিশ্রামগৃহে এসে কামিকে বলি, "তাড়াতাড়ি এক ফ্লাস্ক চা তৈরি করে কিছু বিস্কুটসহ জয় বাহাদুরকে নিচে পাঠিয়ে দাও। আমরা ওদের নিয়ে আসতে যাচ্ছি।"

পণ্ডিত ও মামার সঙ্গে ছুটে চলি নিচে। শম্ভুও সঙ্গী হয় আমাদের।

প্রায় মাইলখানেক ছুটে এসে দেখা পাই ওদের। ডাক্তার ও পান্না বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। হবারই কথা।

পান্না আমার পূর্বপরিচিত। সে আমাদের হিমালয়ান ফেডারেশনের সদস্য। প্রকৃতপক্ষে আমিই তাকে বিভাসদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

পরিচয় নেই ডাক্তার সুব্রত সেনগুপ্তের সঙ্গে। তার নাম জানলেও তার সঙ্গে এই আমাদের প্রথম দেখা। অমূল্য ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। ছোটখাটো রোগা মানুষটি। বয়স বড় জোর বছর তিরিশ। তার বাবা এবং দিদিও ডাক্তার। অর্থাৎ আমাদের ডাক্তার একজন ডাক্তার পরিবারের ডাক্তার। সে ১৯৬৬ সালে এম. বি. বি. এস. পাস করেছে। এখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একজন মেডিক্যাল অফিসার। তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হই।

জয় বাহাদুর চা-বিস্কুট নিয়ে আসে। গরম চা খেয়ে ওরা একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পণ্ডিত এবং মামা ডাক্তার ও পান্নার বুকস্যাক্ কাঁধে তুলে নেয়।

ধীরে ধীরে হেঁটে আমরা বিশ্রামগৃহে পৌঁছই। সকালে ওরা পাঁচজন চলে যাবার পরে বিশ্রামগৃহ যেমন খালি হয়ে গিয়েছিল ; অমূল্যরা ছ'জন এসে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে দিল। সব চেয়ে বড় কথা আজ নেতা এবং ডাক্তার এসে গিয়েছে। কাজেই হাসি আর গানে বিশ্রামগৃহ মুখরিত হয়ে উঠল।

ভেবেছিলাম আজ আর আবহাওয়া খারাপ হবে না। কিন্তু সে অনুমান মিথ্যে হল। সহসা, কোথা থেকে একদল মেঘ এসে সারা আকাশটাকে ছেয়ে ফেলল। প্রবল বাতাস উঠল। আর সেই সঙ্গে শুরু হল তুষারপাত। এখানকার উচ্চতা মাত্র ৮,৪০০ফুট, এখনও সেপ্টেম্বর মাস, অথচ প্রচুর বরফ পড়ছে। বুঝতে পারছি অবস্থানের জন্যই এটি হচ্ছে। উচ্চতা যাই হোক, ওসলা যে চিরতুষার-রেখার খুবই কাছে।

তবে ভাগ্য ভাল বলতে হবে। সন্ধ্যার আগেই তুষারপাত থেমে গেল। ফলে কুলিরা সবাই নিরাপদে ফিরে এলো। ওপরের খবর ভালই। পথ এখন পর্যন্ত খারাপ নয়। মনে হচ্ছে তালাও পর্যন্ত কোন অসুবিধে হবে না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে আলোচনা আরম্ভ হল। অমূল্যকে গত কয়েক দিনের রিপোর্ট দিলাম। সে খুব খুশি হল না। তার হিসাবে আজই তালাও-শিবির স্থাপন করা উচিত ছিল।

অমূল্য পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণ করে। আগামীকাল আমরা সবাই এখানে থাকব। সুশান্তবাবু ওসলা গ্রাম এবং গ্রামবাসীদের ছবি তুলবেন। ডাক্তার ও অমূল্য তার সঙ্গে যাবে। ডাক্তার গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করবে। কাল সব কুলিরা মাল নিয়ে ওপরে যাবে।

অর্ধেক কুলি ফিরে আসবে, বাকি অর্ধেক ওপরে থেকে যাবে। তারা পরশু অন্তবর্তীকালীন শিবির থেকে তালাও শিবিরে মাল ফেরি করবে।

যে-সব কুলিরা কাল এখানে ফিরে আসবে, তারা পরশু আবার মাল নিয়ে যাবে ওপরে। তাদের সঙ্গে যাবে মামা ও পণ্ডিত।

তরশু এখানকার পাঠ গুটিয়ে আমরা সোজা তালাও-শিবিরে চলে যাব।

"কাল এবং পরশু শম্ভু দিলীপ ও আমার কোন কাজ নেই?" প্রশ্ন করি অমূল্যকে।

সে উত্তর দেয়, "না।"

"তাহলে আমরা একবার হরকিদুন থেকে ঘুরে আসি না?"

কি যেন একটু ভাবে অমূল্য। তারপরে জিজ্ঞেস করে, 'রাস্তা কেমন?"

"খুব ভাল।" শম্ভু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "মিউল-ট্র্যাক্।"

আমি বলি, "ওখানেও বিশ্রামগৃহ আছে।"

অমূল্য আবার জিজ্ঞেস করে, "কে কে যাবে?"

"আমি ও শম্ভু।" ইচ্ছে করেই মণ্ডলের নামটা বলি না। তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে। সে নিশ্চয়ই এই বাড়তি পদযাত্রার ঝামেলা নেবে না।

কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে মণ্ডল বলে ওঠে, "সে কি শঙ্কুদা! আমাকে বাদ দিচ্ছেন কেন?"

"তুমি আবার কোথায় যাবে?" অমূল্যও বোধহয় বিস্মিত।

"হরকিদুন।" মণ্ডল উত্তর দেয়।

"তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে?"

"কেন, স্পিশিজ্ কালেক্শন!"

"ড্যাম ইয়োর কালেক্শন!" অমূল্য কৃত্রিম ধমক লাগায়। জিজ্ঞেস কর, "তার আগে বল, কলকাতা থেকে রওনা হবার পরে এ পর্যন্ত অনুরাধাকে ক'খানা চিঠি লিখেছো?"

স্বাভাবিক কারণেই ঘাবড়ে যায় মণ্ডল। কারণ আজও সে কুলিদের হাতে ডাকে দেবার জন্য অনুরাধাকে লেখা একখানি চিঠি নৈটয়ার পাঠিয়েছে। তাই সে কোনমতে জবাব দেয়, "আজ্ঞে তিনখানা। একখানা উত্তরকাশী থেকে, একখানা নৈটয়ার..."

"সেইটেই তো আমার জিজ্ঞাস্য।" অমূল্য তাকে শেষ করতে দেয় না। বলে, 'আজ তুমি দশদিন হল বাড়ি ছেড়েছো, আর অনুরাধাকে মাত্র তিনখানি চিঠি দিয়েছো! নো নো, দিস ইজ্ ভেরি ব্যাড্ মণ্ডল...ভেরি ব্যাড,। আই টেল্ ইউ মণ্ডল, এখন থেকে একদিন অন্তর তুমি অনুরাধাকে একখানি করে চিঠি লিখবে।"

"তা না হয় লিখলাম," মণ্ডল সামলে নিয়েছে নিজেকে। সে স্বাভাবিক স্বরে নেতাকে জিজ্ঞেস কর, "কিন্তু 'লীডার', একটা কথা আমি কিছুতে বুঝে উঠতে পারছি না।"

"কি কথা?"

"আপনি ওর...মানে আমার স্ত্রীর নাম জানলেন কেমন করে?"

"Because she was my friend, I mean girl-friend...of course before her marriage."

মণ্ডল আর কোন কথা বলতে পারে না। কেমন করেই বা বলবে? নিজের

বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহোত্তর জীবনের অপর কারও গার্ল-ফ্রেন্ড্ ছিল, এ সংবাদ হজম করতে পারার মতো সাহসী স্বামী আমাদের সমাজে খুবই দুর্লভ।

কিন্তু আমরা যারা প্রাণময়-পর্বতারোহী এবং সুরসিক অমূল্য সেনকে জানি, তারা মোটেই বিস্মিত হই না। আর এও জানি যে দিলীপকুমারের অনুরাধা অমূল্যের অপরিচিতা। দিলীপের সঙ্গেই তো সেদিন হাওড়া স্টেশনে অমূল্যের প্রথম পরিচয় হয়েছে। এবং প্রাণ-খুলে কথাবার্তা আজই প্রথম।

আসল ব্যাপার—যে কুলিদের কাছে মিসেস অনুরাধা মন্ডলের ঠিকানা লেখা চিঠিখানা দিলীপ ডাকে দেবার জন্য দিয়েছে, তাদের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে অমূল্যদের। কুলিরা নিশ্চয়ই নেতাকে চিঠিপত্র সব দেখিয়ে থাকবে। ফলে অমূল্য অনুরাধার নামটি জেনে ফেলেছে।

তাহলেও কথাটা ফাঁস করে দিই না। কেবল নিজের কথাটি পাকা করে নিতে চাই। বলি, "শম্ভু ও দিলীপের সঙ্গে আমি তবে কাল হরকিদুন যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ।" নেতা অনুমতি দেয়। বলে, "সঙ্গে বচন ও তিনজন কুলি যাবে।"

"তিনজন!"

"হ্যাঁ।" সাতজন লোকের দু'বেলার রেশন, তোমাদের ম্যাট্রেস্ ও স্লীপিং-ব্যাগ, কুলিদের বিছানাপত্র—দু'জন কুলির পক্ষে ভারী হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি চাই যে তোমরা একটু fast move করো, so that you may come back by next-day noon.

কি বলছে অমূল্য ? পরশু দুপুরেই ফিরে আসতে হবে ! আমি তো ভেবেছিলাম দুপুর পর্যন্ত ওখানে থেকে সন্ধ্যে-নাগাদ এখানে আসব। কিন্তু নেতার নির্দেশ, চুপ করে থাকি।

অমূল্য আবার বলে, "কাল ব্রেকফাস্টের পরে প্যাক্-লাঞ্চ নিয়ে তোমরা বেরিয়ে পড়বে। সঙ্গে একটা ফার্স্ট-এইড বক্স নিও।"

আমরা মাথা নাড়ি।

নেতা পুনরায় নির্দেশ দেয়, গ্রOne thing Soncuda! All of you must return here day after tomorrow by twelve noon sharp"

"As you please Leader!"

॥ দশ ॥

রওনা দিতে কিন্তু দেরি হয়ে গেল। মোট তো ছ'মাইল পথ। তাই আর তাড়াহুড়া করি নি। তাছাড়া গোছগাছ করতেও নেহাত কম সময় লাগল না। সাবধানী নেতার নির্দেশ মানতে গিয়ে প্রচুর জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে হয়েছে।

সকাল সাড়ে দশটায় আমরা নেমে এলাম ওসলা বিশ্রামগৃহ থেকে। এগিয়ে চললাম পুবে। তমসার তীর দিয়ে পথ—উৎরাই পথ।

অনেকটা নেমে এসে পুল। অমূল্য মামা সুশান্তবাবু সুব্রত পন্ডিত পান্না ও সেতী আমাদের সঙ্গে পুলের গোড়া পর্যন্ত এল। কেবল দাদু আসে নি। আসবে কেমন করে ?

সে যে রান্নাঘর নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে।

অমূল্য দাঁড়িয়ে থাকে তমসার তীরে, আমরা এগিয়ে চলি। ওরা লাঞ্চ সেরে ওসলা গাঁয়ে যাবে। সুশান্তবাবু মন্দির ও মানুষের ছবি তুলবেন। সুব্রত গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করবে।

আমরা পুলের ওপরে উঠে এলাম—কাঠের ঝুলন্ত পুল। মোরিতে তমসার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে ওসলা পর্যন্ত আমরা তমসার বাঁ তীর দিয়ে পথ চলেছি, এবারে ডান তীর দিয়ে চলতে হবে।

পুলটা ভীষণভাবে দুলছে, ছিঁড়ে পড়বে নাকি! তলা দিয়ে যে দুর্বার বেগে বয়ে যাচ্ছে তমসা। না। দোদুল্যমানা হলেও, তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ গিব্‌সনের ভাষায় এটিই স্থায়ী পুল। অস্থায়ী পুলটি সামনে বেশ খানিকটা দূরে। ওখানে কোন গ্রাম নেই। তবু কেন ওটি তৈরী করা হল বুঝতে পারছি না। এখানে তো পুল তৈরি করা মোটেই সহজসাধ্য নয়।

অথচ গিব্‌সনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়—১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই এখানে দুটি পুল রয়েছে। গিব্‌সন সাধারণতঃ চাক্‌রাতা থেকে মান্দালী, রিঙ্গালী ও জারমোলা হয়ে এখানে আসতেন। তখন ঐ পথে হরকিদুন আসতে সাতদিন হাঁটতে হত। এখন অবশ্য চাক্‌রাতা থেকে এখানে আসতে হলে আর জারমোলা যেতে হয় না। বাসে করে সোজা তিউনি, সেখান থেকে জীপে কিংবা হেঁটে মোরি। ভবিষ্যতে এ পথেও হয়তো বাস চলবে। আর শুধু তাই বা বলি কেন, অদূর ভবিষ্যতে তো তালুকা পর্যন্তই বাস-চলাচল করবে।

কিন্তু মোরি-চাক্‌রাতা পথের কথা আর নয়। এবারে ওসলা-হরকিদুন পথে ফিরে আসা যাক। আমরা পুল পেরিয়ে এলাম। পুলের এপারে দুটি পথ, দু'দিকে উঠে গেছে। বাঁ দিকেরটি ওসলা গাঁয়ের পথ, আর ডান দিকের পথটি চলে গিয়েছে হরকিদুন। আমরা সপ্তরথী সেই চড়াইপথ বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। সংকীর্ণ হলেও এ পথে খচ্চর চলতে পারে। কাজেই হরকিদুন পর্যন্ত মাল পরিবহনের আর কোন অসুবিধে নেই এখন।

সপ্তরথী বলছি কারণ আমরা এখন সাতজন। আমি শম্ভু মণ্ডল ও বচন এবং তিনজন কুলি। তমসার ডান তীর দিয়ে উত্তর-পূর্বে এগিয়ে চলেছি। পথের চারিদিকে সুন্দরের বন্যা, কিন্তু পথটি মোটেই সুগম নয়। একে চড়াই, তার ওপরে বড় বড় পাথরে বোঝাই।

আধমাইল চড়াই ভেঙে একটি প্রায়-সমতল প্রান্তরে পৌঁছলাম। প্রান্তরের বুকে বয়ে যাচ্ছে ঝরণা। গাঁয়ের মেয়েরা কাঠের বোঝা পাশে রেখে বিশ্রাম করছে। ছেলে-মেয়েরা ছাগল-ভেড়া চরাচ্ছে। আমরাও বসে পড়ি।

সহসা একটা কলরব কানে এল। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরি। সে কি! ওরা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে! অমূল্যরা পুলের ওপার থেকে হাত নেড়ে অভিনন্দিত করছে আমাদের।

এটি আমার জীবনের একটি নতুন ঘটনা। এতদিন পর্বতাভিযানে এসে মূল কিংবা অগ্রবর্তী মূল-শিবির থেকে আমাকেই অমনি হাত নেড়ে বিদায় জানাতে হয়েছে অগ্রগামী পর্বতারোহী বন্ধুদের। আমাকে কেউ কখনও বিদায় জানায় নি। আজ আমি চলেছি এগিয়ে। আর পঞ্চচুলি (২০,৭১০), চন্দ্রপর্বত (২২,০৭৩), কেদারনাথ ডোম (২২,৪১০)

ও রাধানাথ পর্বত (২১,৭২০´) বিজয়ী অমূল্য সেন দূর থেকে আমাকে অভিনন্দিত করছে। এমন একটি অবিশ্বাস্য মুহূর্ত আমার জীবনে সত্য হতে পারে, এ কখনই কল্পনা করি নি। আজ আমার সত্যি সুদিন।

আঁকাবাঁকা প্রায় সমতল পথটি দিয়ে চলেছি এগিয়ে। অমূল্যরা হারিয়ে গিয়েছে। পুলটা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ফিরে গিয়েছে বিশ্রামগৃহে।

অমূল্যদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বিভাসদের চলে যাওয়ার পথটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ওপারের সেই পায়ে-চলা পথটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ভাবতে ভাল লাগছে—পরশুদিন ঐ পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাব ধুমধার-কান্দির দিকে।

এপারের ক্ষেত শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ওপারে এখনও ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি। গাছপালাও ওপারেই বেশি। এপারে এখন শুধুই তৃণভূমি।

মণ্ডল এতক্ষণ নীরবে পথ চলছিল। এবারে কথা বলে, "একটু আস্তে হাঁটুন শম্ভুদা, আমি খানিকটা স্যুইপ করে নিই।"

স্যুইপ মানে ঝাঁট দেওয়া। অর্থাৎ মণ্ডল এখন তার জালটি দিয়ে ঝেঁটিয়ে প্রজাপতি ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ পাকড়াও করবে।

যেমনি বলা, তেমনি কাজ। মণ্ডল জাল হাতে নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল বচন, "সাব্ ইধর নহী, আগে হোগা।"

"কাহেকো!" মণ্ডল চেঁচিয়ে ওঠে। সে রীতিমত রেগে গিয়েছে।

বচন বিনীতভাবে উত্তর দেয়। "ইধর পত্থর গিরতা।"

তাই তো। একদম খেয়াল করি নি যে! আমাদের বাঁ দিকেই খাড়া পাহাড়টার গায়ে অসংখ্য আলগা পাথর। যে-কোন সময়ে সেগুলি গড়িয়ে পড়তে পারে। হিমালয়ের পথে প্রস্তর পতনের মতো মারাত্মক বিপদ খুব কমই আছে। অনিমাদি এইভাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমিও সেবারে কীর্তি হিমবাহ থেকেই তপোবনে ফিরে আসার পথে প্রস্তর পতনের মাঝে পড়ে গিয়েছিলাম। সৌভাগ্যবশত তেমন কোন বড় বিপদ ঘটে নি।

কিন্তু কাকে এসব বলা! সে আমাদের কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ করে চলে—জাল নিয়ে প্রজাপতির পেছনে ছুটতে থাকে।

বাধ্য হয়ে বলতে হয়, "ভাই মণ্ডল! এ জায়গাটাতে বরং তোমার 'স্যুইপার' হয়ে দরকার নেই, কারণ এখানে দেরি করলে আমরাই 'স্যুইপিংস' হয়ে যেতে পারি।"

এতক্ষণে মণ্ডল ব্যাপারটা বুঝতে পারে। অনিচ্ছাকৃতভাবে সে তার জালটি গুটিয়ে আমাদের সঙ্গে চলতে থাকে। আপসোস করে, "জায়গাটি কিন্তু আইডিঅ্যাল স্পট্ ফর্ কালেক্‌শন অব্ লেপিডপ্‌টেরা।"

বাঁ দিকে পাহাড়টা অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। এখন আর মাথায় পাথর পড়ার ভয় নেই। জায়গাটাও মোটামুটি সমতল। শম্ভু ও আমি বসে পড়ি পথের পাশে।

মণ্ডলও শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পথের ধারে ঝোপঝাড় রয়েছে। সে বিশ্রাম করবে কেমন করে? সে জাল খুলে খুলে স্যুইপ শুরু করে দেয়।

আমরা গল্প করতে থাকি—হরকিদুনের গল্প। হরকিদুনের প্রকৃত আবিষ্কারক জে. টি. এম. গিব্‌সন। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম এখানে আসনে। সেবার তিনি প্রবীণ ভারতীয় পর্বতারোহী গুরুদয়াল সিংহের সঙ্গে ভাগীরথী উপত্যকায় পথ-পরিক্রমা করছিলেন। কাজ ছিল বলে গুরুদয়াল হরশিল থেকে চলে গেলেন। গিব্‌সন কয়েকজন

স্থানীয় কুলি যোগাড় করে লামখাগা গিরিবর্ত্ম (১৭,৩৩০´) অতিক্রম করে বাসপা উপত্যকার চিত্‌কলে (হিমাচল) পৌঁছলেন। সেখান থেকে বোরাসু গিরিবর্ত্ম (১৯,১৯০´) অতিক্রম করে হরকিদুনে উপস্থিত হলেন। এই পরম রমণীয় স্থানের আবিষ্কারক রূপে গিব্‌সনের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু গিব্‌সন নিজে এ সম্পর্কে লিখেছেন—'The Harki Doon has long been known to Shikaris and I have seen a Painting belonging to Mrs, Quarry of Dehra Doon done there by her brother well back in the nineteenth century and very similar in composition and colour to a photograph I took last year (1953). I was credited by the local press with having discovered the Harki Doon which amused Mrs. Quarry, who produced this picture as evidence that I had not ' (Himalayan Journal–1954).

তাহলেও আমরা গিব্‌সনকেই হরকিদুনের প্রকৃত আবিষ্কারক বলব। কারণ তিনিই এই রূপতীর্থের কথা বিশ্বের দরবারে প্রথম পৌঁছে দেন এবং একে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। গিব্‌সন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বহুবার হরকিদুনে এসেছেন। তার মধ্যে ১৯৫৩ সালের অভিযানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সেবারে গিব্‌সন তাঁর তরুণ ও অনভিজ্ঞ ছাত্রদের নিয়ে স্বর্গারোহিণী ও কৃষ্ণচূড়া আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন। ১৭ই জুন তিনি স্বর্গারোহিণী শিখরে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযাত্রীরা সকাল সাড়ে সাতটায় শেষ শিবির থেকে যাত্রা করে বেলা সাড়ে বারোটায় ১৫,৯০০ফুট উঁচু একটি 'কল'-য়ে পৌঁছান।*

কিন্তু আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। কারণ, গিব্‌সনের ভাষায় – 'Beyond them there seemed to be a sharp drop and then a steep ice-wall that might be impossible.'

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব এবং দলীয় দুর্বলতার জন্যই গিব্‌সন স্বর্গারোহিণী শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর সেই সমীক্ষা আজও অমূল্য বলে বিবেচিত। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা বিগত বিশ বছরে কোন অভিযাত্রীদল স্বর্গারোহিণী আরোহণের চেষ্টা করেন নি।

স্বর্গারোহিণী অভিযানে বিফল হয়ে গিব্‌সন ২১শে জুন যমুনোত্রী গিরিবর্ত্ম (১৬,৪০০´) অতিক্রম করে ১৭,০০০ফুট উঁচু একটি নামহীন শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তারপরে নেমে যান স্বর্গারোহিণীর পাদদেশে। সেখানে বান্দরপূঁছ হিমবাহের ডানদিকে ১৪,৬০০ফুটে শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫শে জুন শেরপা পেম্বা ও সতেরো বছরের ছাত্র চীমাকে নিয়ে বান্দরপূঁছ পর্বতমালার উচ্চতম শৃঙ্গ ব্ল্যাক পিক্ বা কৃষ্ণচূড়া (২০,৯৫৬´) শিখরে আরোহণের চেষ্টা করেন। প্রতিকূল আবহাওয়া ও অনভিজ্ঞ সহযাত্রীর ভুলের জন্য মাত্র শ'খানেক ফুটের জন্য গিব্‌সনের সেই দুঃসাহসিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু তাঁর সেই আরোহণ আজও পর্বতারোহীদের পরম বিস্ময়। একদিনে তাঁরা দশ হাজার ফুট আরোহণ ও অবরোহণ করেছিলেন।

*Col–a depression in a mountain range : পর্বতমালার মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথ।

গিব্‌সন হিমালয়ের এ অঞ্চলটিকে খুবই পছন্দ করতেন। তিনি হরকিদুন নালা এবং রুঁইসার গাড্‌ দ্বারা বিধৌত দু'টি উপত্যকা সম্পর্কেই বলেছেন—..'Both valleys are excellent centres for climbing and skiing and both are full of wonderful sites for comfortable low altitude base camp between 11000 and 18000 feet with plentiful water and wood..'

"স্পাইডার শঙ্কুদা, স্পাইডার শম্ভুদা,...স্পাইডার...রেয়ার কালেক্‌শন..."

মণ্ডলের চিৎকারে আমাদের আলোচনা থেমে যায়। তার দিকে তাকাই। সে যেন সযত্নে মাটি থেকে কি তুলছে! তাড়াতাড়ি তার কাছে আসি।

মাকড়সা। মণ্ডল একটি মৃত লাল মাকড়সা পেয়েছে। সগর্বে সেটি সে আমাদের দেখায়। বলে, "রেয়ার জুওলজিক্যাল স্পিশিজ্‌।"

হলেই ভাল। কিন্তু মণ্ডল মাকড়সা দিয়ে কি করবে? সে তো এসেছে প্রজাপতি ধরতে!

আমার সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে মণ্ডল নোটবইতে লিখে চলেছে, 'Tableland strewn with boulders...'

বোধহয় ঐ অমূল্য সম্পদপ্রাপ্তির স্থানটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাইছে। মণ্ডলকে এগোতে বলে আমরা এগিয়ে চলি।

কিছুদূর এগিয়েই পথের ডানদিকে, খানিকটা নিচুতে দু'খানি ঘর। কিন্তু কোন মানুষ নেই। বচন বলে, "তারা ক্ষেতে কিংবা বনে গিয়েছে। বিকেলে ঘরে ফিরে আসবে।"

বচন বোধহয় ঠিকই বলছে। এরা তো আর বাঙালী মধ্যবিত্ত নয় যে একজন অফিসে যাবে, বাকি সবাই ঘরে থাকবে! এরা সবাই মিলে ঘরে-বাইরে কাজ করে। তাই কাজে বেরুবার সময় শিশুসন্তানদের পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যায়।

এখান থেকে বান্দরপূঁছ পর্বতশ্রেণীকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। সে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের দক্ষিণ-পূর্বে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে আমাদের। তার এই আন্তরিক আমন্ত্রণে আমরা পুলকিত হয়ে উঠছি। আমরা যে কয়েক দিনের মধ্যেই তার কাছে যাব।

একটা ঝরণার তীরে বসে লাঞ্চ সেরে নেওয়া গেল—দাদুর দেওয়া রুটি ও আলু-সেদ্ধ। খিদের পেটে তাই অমৃত।

খাওয়া শেষ হলে শুরু হয় পথ-চলা। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারি না। অল্প একটু চড়াই পেরিয়েই দেখতে পাই সেই অপরূপকে—যার স্বরূপ প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। শুধু জানি সে সুন্দর—পরম সুন্দর। হরকিদুন নালা ও রুঁইসারা গাডের সঙ্গম—তমসার জন্মস্থান।

আমরা মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। রুঁইসারা এসেছে বাঁ দিক থেকে আর হরকিদুন ডান দিক থেকে। দুইয়ের মাঝে স্বর্গারোহিণী গিরিশ্রেণী—পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত। এই গিরিশ্রেণীর উত্তরে হরকিদুন, দক্ষিণে ধুমধার-কান্দি।

কিন্তু ধুমধার-কান্দির কথা এখন থাক্, এখন হরকিদুনের পথটিকে দু'চোখ ভরে দেখে নেওয়া যাক্‌। তমসার জন্মস্থান ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। পেরিয়েছি একটা সাইনবোর্ড—গোবিন্দ পশু-বিহার। সেই সঙ্গে শেষ হয়েছে তৃণভূমি, শুরু হয়েছে বনভূমি—দুর্গম পাহাড়ী পথ।

হরকিদুন নালার তীর দিয়ে পথ। তাহলে কি তমসার তীরে তীরে আমার পথ-চলা শেষ হয়ে গেল?

না। বান্দরপূঁছ ও স্বর্গারোহিণীর অমৃতধারা তমসা। হরকিদুন নালা ও রুঁইসারা গাড দু'টি স্থানীয় নাম মাত্র। আমি তাদের পৃথক সত্তাকে স্বীকার করি না। আমার কাছে এরাও তমসা—শুধুই তমসা। আমরা এখনও তমসার তীরে তীরে পথ-পরিক্রমা করছি।

পথের দু'পাশেই ঘন জঙ্গল। বাঁ দিকে ঢালু জমি—নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ডান দিকে খাড়া পাহাড়। দু'দিকেই তারকাঁটার বেড়া। বোধহয় বেড়া দিয়ে পথটিকে নিরাপদ করা হয়েছে। গোবিন্দ পশু-বিহার যে বন্য পশুর স্বাধীন দেশ।

ওপরে কি ঘটছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু নিচের জঙ্গলটা মাঝে মাঝেই নড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে কেউ বা কারা যেন চলা-ফেরা করছে।

"না না, মানুষ নয়। ওখানে মানুষ যাবে কেমন করে?" বচন একটু হাসে। তারপরে বলে, "শের-টের হবে হয়তো।"

"শের!" মণ্ডল আঁতকে ওঠে, "তার মানে তো বাঘ?"

"হ্যাঁ," বচন কিছু বলতে পারার আগেই শম্ভু বলে ওঠে, "অবাক হচ্ছ কেন? এখানকার বনে যেমন প্রচুর বানর ও হরিণ আছে, তেমনি আছে বাঘ, ভালুক ও শুয়োর।"

মণ্ডল অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়। সে সবিশেষ বিচলিত।

কিন্তু অবিচলিত বচন ভরসা দেয়, "ওরা আদমীকে বড় একটা কিছু বলে না, বরং একটু ভয়ই করে। তাহলেও এ সব জায়গায় সবাই সাধারণত দল বেঁধে শব্দ করতে করতে পথ চলে। যাতে জানোয়াররা মানুষ আসছে জানতে পেরে পথ থেকে সরে যাবার সুযোগ পায়।"

"আমরা তো শব্দ করে পথ চলছি না?" বচন থামতেই মণ্ডল প্রশ্ন করে।

বচন উত্তর দেয়, "তা করা যেতে পারে বৈকি।"

ব্যাস, আর যায় কোথায়? দিলীপকুমার গলা ছেড়ে গান শুরু করে দিল—"দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারবার..."

ভাগ্যিস বাঘরা নজরুল-গীতি বুঝতে পারে না। নইলে যে তারা এতক্ষণে ছুটে এসে এই গানের জন্যই দিলীপকুমারের ঘাড় মটকাত!

পথের বাঁ-দিকে চমৎকার একটি জলপ্রপাত—অনেক ওপর থেকে সোজা নেমে এসেছে। তারপরে পাহাড়ী ঝরণা হয়ে বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে তমসায় মিশেছে।

ঝরণার ওপরে ছোট একটি কাঠের পুল। শম্ভু সেখানে দাঁড়িয়ে জলপ্রপাতের ছবি নেয়।

চড়াই পথ বেয়ে আবার চলেছি এগিয়ে। পথের দুপাশেই রডোডেনড্রন ভূজ ও জামনের জঙ্গল। আজ সেপ্টেম্বরের শেষ দিন। হিমালয়ের ফুল ফোটে বর্ষাকালে অর্থাৎ জুলাই-আগস্টে! সুতরাং রডোডেনড্রন গুচ্ছের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে না, তারা ঝরে গিয়েছে। শুধু অনুমান করতে পারছি—এই বনে যখন ফুল ফোটে, তখন পথিক পাগল হয়।

ফুল নেই কিন্তু ফল আছে—জামন ফল। ছোট ছোট রসালো ফল। মণ্ডল বলছে—এগুলি নাকি অনেকটা আমাদের বঁইচির মতো।

হতে পারে, মণ্ডলের বট্যানীতে যথেষ্ট জ্ঞান আছে আর আমি কখনও বঁইচি দেখি নি।

না দেখলেও বঁইচি আমার অপরিচিত নয়। আমি বঁইচির কথা পড়েছি। মনে আছে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের সেই কথোপকথন। শ্রীকান্তের শ্মশানে যাওয়া বন্ধ করবার জন্য রাজলক্ষ্মী বলছেন—'তুমি ভাবচ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্টই দিয়েচি। কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মারধোর করেচি...'

শ্রীকান্তর মতো ভাগ্যবান আমরা নই। জামন ফল পেড়ে দেবার জন্য কোন রাজলক্ষ্মী আজ এখানে নেই।

তাহলেও জামন ফল খেতে পাচ্ছি আমরা। এখানে যেমন রাজলক্ষ্মী নেই, তেমনি আবার কাঁটা নেই জামন গাছে। কুলিরা অক্লেশে গাছে উঠে জামন ফল পাড়ছে। আমরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছি। খেতে মন্দ নয়--একটু কষাটে হলেও বেশ মিষ্টি। সবচেয়ে বড় কথা—তৃষ্ণা মিটছে। জানি না রাজলক্ষ্মীর সেই বঁইচির মালা শ্রীকান্তের আরও বেশী তৃষ্ণা মিটিয়েছিল কি না?

আড়াইটে বাজে। তার মানে আমরা চার ঘন্টা হল ওসলা থেকে রওনা হয়েছি। মাত্র ছ'মাইল পথ। এতক্ষণে হরকিদুন পৌঁছনো উচিত ছিল।

তবে হরকিদুন আর খুব দূরে নয়। সামনে একখানি ঘর দেখতে পাচ্ছি। না, না, এটি বিশ্রামগৃহ নয়—বন-বিভাগের মজুরদের অস্থায়ী আস্তানা। শীত আসছে—কাঠ কাটার সময় শেষ। সুতরাং ঘরটিতে মানুষ নেই এখন।

ঘরখানিকে ডানদিকে রেখে আমরা চড়াইপথে চললাম এগিয়ে। মনে হচ্ছে সামনের ঐ গাছে-ছাওয়া পাহাড়টার মাথায় উঠতে পারলেই দেখা হবে তার সঙ্গে—সেই পরম রমণীয় হরকিদুনের সঙ্গে।

কিন্তু আমরা যে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পা-দু'টি আর বইতে পারছে না আমার এই দেহখানিকে। তাহলেও ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকি। আমাকে যে পৌঁছতেই হবে হর-পার্বতীর সেই অপার্থিক লীলাভূমিতে।

চড়াই ফুরিয়ে গেল, কিন্তু খুশি হতে পারলাম না। এখন বুঝতে পারছি গাছে-ছাওয়া পাহাড়টির সঙ্গে আগের চড়াই পথটুকুর কোন সম্পর্ক নেই, ওটা একেবারেই আলাদা একটি পাহাড়। এবারে আমাদের নেমে যেতে হবে একটি ঝরণার তীরে। সেখানে একটা কাঠের পুল পেরিয়ে চড়াই ভেঙে উঠতে হবে ঐ গাছে-ছাওয়া পাহাড়ে।

আবার শুরু হল চড়াই। চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, তাহলেও এগিয়ে চলি। আর ভাবি—এটুকুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম? তমসাকে দেখেও আমার ক্লান্তির অবসান হচ্ছে না! সে যে কখনই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে না! যুগ-যুগান্ত ধরে ক্লান্তিহীন চরণে স্বর্গারোহিণীর অমৃতধারাকে বহন করে নিয়ে চলেছে মর্ত্যলোকে। আমরা তাহলে কেন পৌঁছুতে পারব না মানুষের পৃথিবী থেকে দেবলোকের দ্বারে—স্বর্গারোহিণীর পদপ্রান্তে?

পারব বৈকি, নিশ্চয়ই পারব। ঐ তো স্বর্গারোহিণী আর এই তো হরকিদুন।

ইতিমধ্যে আমরা উঠে এসেছি সেই গাছে-ছাওয়া পাহাড়টির ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে রূপতীর্থের অবগুণ্ঠনখানি খসে পড়েছে। আমার দৃষ্টি হয়েছে প্রসারিত, সকল শ্রান্তি হয়েছে দূর। চোখ দুটি চরিতার্থ হল। সার্থক হল পদ-যাত্রা—আমি ধন্য হলাম।

সামনে চমৎকার একটি তৃণাচ্ছাদিত উপত্যকা। মনে হচ্ছে কেউ যেন সবুজ ও সুবিশাল একখানি কোমল গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। তার বুকে একটি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা—পাহাড়ী স্রোতস্বিনী মোরিণ্ডা।

জানি না কে এই পাহাড়ী নদীটির নাম রেখেছেন? কাব্যরসিক পর্বতারোহী জে. টি. এম. গিব্‌সন, না কোন ইংরেজ শিকারী? বচন অবশ্য বলছে অন্য কথা। সে বলছে—মোরিন্দা এক ধরনের পাহাড়ী গাছ। যে পাহাড়টির ভেতর দিয়ে নদীটি এখানে এসেছে, সেই পাহাড়ে নাকি প্রচুর মোরিন্দা গাছ রয়েছে। তাই মোরিন্দা বন-বিধৌত এই স্রোতস্বিনীর নাম মোরিন্দা গাড়্।

সবুজ প্রান্তর পেরিয়ে মোরিণ্ডা গিয়ে হরকিদুন নালায় মিলিত হয়েছে। সে এসেছে বোরাসু গিরিবর্ত্ম থেকে। ১৯৪৮ সালে গিব্‌সন এই মোরিণ্ডার প্রবাহ ধরেই হরকিদুনে পৌঁছেছিলেন। আর তারই ফলে জগৎবাসী জানতে পেরেছিল এই অপরূপ রূপতীর্থের কথা।

সবুজ গালিচার মতো কোমল সেই তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরটি আস্তে আস্তে নিচে নেমে গিয়ে মোরিণ্ডায় মিশেছে। তারপরে আবার তেমনি ধীরে ধীরে উঠে গিয়েছে ওপরে। সেখানেই টিলার মতো উঁচু একফালি সমতলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্রামগৃহ—হরকিদুন দর্শনার্থীর একমাত্র আশ্রয়।

আমরা মোরিণ্ডার তীরে নেমে আসি। খানিকটা দূরে আরেকটি নদী এসে মোরিন্ডায় মিশেছে। ঐ নদীটির নাম মাতা-কি-গাড়্। মোরিণ্ডা এসেছে উত্তর থেকে আর মাতা এসেছে উত্তর-পূর্ব থেকে। তার উৎস যমদ্বার হিমবাহের উত্তরে অবস্থিত ছোট একটি হিমবাহ। যমদ্বারকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে।

মনে পড়ছে কাব্যরসিক পর্বতারোহী গিব্‌সনের সেই কবিতাটি। ১৯৫৩ সালের ২৮শে জুন এখানে বসেই তিনি সেটি রচনা করেছিলেন। এই নদী আর এই অপরূপ রূপতীর্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সেই কবিতায় লিখেছেন—

'Here, next the milky water from Borasu Pass
Flowing between the mountain and moraine
We dump our loads. Enormous boulders
Perch on the ridge, and ancient trees
Gnarled and fantastic, garlanded with moss...'

মোরিণ্ডা পেরিয়ে উঠে আসি বিশ্রামগৃহের কাছে। এটি বিশ্রামগৃহের পেছন দিক। পথের ধারে হিন্দী সাইনবোর্ড—

'বন বিশ্রামগৃহ, হরকিদুন।
সমুদ্র সমতা থেকে উচ্চতা ১১,২০০ফুট
দূরত্ব ওসলা থেকে ৬মাইল।'

সাইনবোর্ড ছাড়িয়ে উঠে আসি ওপরে। প্রথমেই রান্নাঘর, তারপরে চৌকিদারের কোয়ার্টার। চৌকিদার যদিও এখানে থাকে না। এখন হরকিদুনের জন্য আলাদা কোন চৌকিদারও নেই। ওসলার চৌকিদারের কাছেই এই বিশ্রামগৃহের চাবি থাকে। পর্যটকরা তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে এখানে আসেন, ফেরার পথে ফেরত দিয়ে যান।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে সংকীর্ণ চড়াইপথ বেয়ে আমরা বিশ্রামগৃহের সামনে উঠে আসি। সঙ্গে সঙ্গে কোন এক অদৃশ্য যাদুকর যেন অকস্মাৎ হিমালয়ের অন্তরলোকের অন্তহীন অবিনশ্বর রূপটি আমার সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন।

আমি তাকে দেখি—দু'চোখ ভরে দেখি। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি সেই অনন্ত-সুন্দরের দিকে। ভাবি—হিমালয় তুমি সুন্দর। আমি সুন্দর, আমরা সুন্দর। তোমার এই

অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিকে আজ আমি প্রত্যক্ষ করতে পারলাম। সুন্দরের সংস্পর্শে এসে আমরাও সুন্দর হলাম।

বিশ্রামগৃহের সামনে পাথর আর ঘাসে-ছাওয়া ছোট একফালি সমতল। তারপরেই ভূখণ্ডটি আস্তে আস্তে নেমে গেছে নদীর বেলাভূমির কাছে।

বেলাভূমি তো নয়, যেন শ্বেতপাথরের টাইল্‌স দিয়ে বাঁধানো সুপ্রশস্ত উপত্যকা। তার বুক জুড়ে বয়ে যাচ্ছে তমসা—একটি নয়, কয়েকটি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা, অবিকল আলপনার মতো।

এপারের ভূখন্ডটি আস্তে আস্তে বেলাভূমিতে নেমে গিয়েছে, কিন্তু ওপারটা নদীর গা থেকে খাড়া ওপরে উঠে গেছে।

এপারে বনভূমি, ওপারে স্বর্গারোহিণী—সত্যই স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত দেবতাত্মা হিমালয়ের এক অপরূপা মূর্তি। সে ত্রিভুজাকৃতি। তার গায়ের রঙ ধূসর আর বাদামী, মুখের রঙ সাদা আর কালো—বরফ এবং পাথর।

শুধু সারা দেহে স্বর্গের শোভা ধারণ করেই দাঁড়িয়ে নেই স্বর্গারোহিণী, সে সমস্ত অন্তর দিয়ে অভিনন্দিত করছে আমাদের। আমরা যে তার ডাকে সাড়া দিয়ে আজ তার কাছে এসেছি।

কাছে, সত্যই কাছে। এই তো সে নদীর ওপারে। মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যাবে তাকে। শুধু কাছে বলেই নয়, দূর থেকেও এমন সুন্দর শৃঙ্গ দর্শনের সৌভাগ্য সকলের হয় না। গিব্‌সন ঠিকই বলেছেনে—

'...Swargarohini the most beautiful 20,000 feet peak that I know that remains unclimbed and the legendary path to Heaven of the Pandavas. Draupadi and their dog.'*

গিব্‌সন বিশ বছর আগে কৃষ্ণচূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন। সেই দুঃসাহসিক অভিযানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় পর্বতারোহীরা তিনবার কৃষ্ণচূড়ায় জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছেন। অথচ গিব্‌সন সেই একই বছরে স্বর্গারোহিণী আরোহণেরও চেষ্টা করেছিলেন। চার বছর আগে পর্বতারোহীদের প্রিয় পত্রিকায় তাঁর এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু আজও কোন পর্বতারোহী এই শৃঙ্গারোহণের চেষ্টা করলেন না। অথচ সংগঠকদের পক্ষে কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ খুব অল্প সময়ে এবং কম খরচে এই শৃঙ্গে অভিযান চালানো সম্ভব। অদূর ভবিষ্যতে তালুকা পর্যন্ত বাস চলবে। তখন দেরাদুন থেকে তালুকা আসতে মাত্র দু'দিন লাগবে। সুতরাং তরুণ ভারতীয় পর্বতারোহীদের আমি অবিলম্বে এই অনিন্দ্যসুন্দর অপরাজিত শৃঙ্গটির দিকে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ করছি।

ভরসা করি অদূর ভষ্যিতে ভারতীয় পর্বতারোহীদের নজর পড়বে স্বর্গারোহিণীর দিকে, তার তুষার-কিরীটে আমাদের জাতীয় পতাকা প্রোথিত হবে। ভাবীকালের সেই সফলকাম অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি আজই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। **

এখানে এই স্বর্গারোহিণীর পাদদেশে দাঁড়িয়ে একজনের উদ্দেশে আমাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে হবে—তিনি আমার সদ্য-পরলোকগত পরমারাধ্য পিতৃদেব। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে আমি আজ আসতে পেরেছি এখানে।

আচ্ছা, বাবা কি জানতেন তিনিও ইতিমধ্যে যাত্রা করবেন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থানের পথে, আসবেন এই স্বর্গারোহিণীর শুভ্র শিখরে ?

নিশ্চয়ই জানতেন। নইলে তিনি তো অমন করে আর কখনও আমাকে আসতে বলেন নি হিমালয়ে !

আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমার সর্বসত্তায় তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি। তিনি আছেন, আছেন এখানে, আমার খুবই কাছে—ঐ স্বর্গারোহিণীর স্বর্ণ-সিংহাসনে। আমি তাঁকে প্রণাম করি।

॥ এগারো ॥

বন্ধ ঘরে বসে কাচের জানালা দিয়ে যে হিমালয়ের অন্তরলোকের এমন অন্তহীন অপরূপ রূপ দর্শন করা যায়, তা এর আগে জানা ছিল না আমার। এতদিন ধারণা ছিল, গাড়োয়াল-কুমায়ুঁতে হিমবাহ ও তুষারাবৃত শৃঙ্গ দর্শনের সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর পথ, পিণ্ডারী হিমবাহের পথ। আর তাই পিণ্ডারী হিমবাহ মেয়েদের এত প্রিয়।

কিন্তু আজ জানতে পারলাম, পিণ্ডারী নয়—হরকিদুন। এ পথ সে পথের চেয়ে অনেক সহজ এবং সুন্দর। সবচেয়ে বড় কথা, সে-পথের শেষ বিশ্রামগৃহ ফুরকিয়ায় বসে হিমালয়ের এমন শাশ্বত-সুন্দর রূপ দর্শন করা যায় না।

তাহলে এ পথে সে পথের মতো পর্যটকদের ভিড় নেই কেন ?

নেই, কারণ এ পথের কথা কেউ তেমন করে বলে নি রূপ-পিয়াসীদের কাছে।

নইলে যেখানে প্রতি বছর হাজার যাত্রী যমুনোত্রী আসছেন, সেখানে বছরে একশো দর্শনার্থীও এখানে আসেন না কেন ?

সেকালের রাজারা তমসা উপত্যকাকে অবহেলা করেছেন বলেই বোধহয় একালের স্বাধীন সরকারও একে উপেক্ষা করে চলেছেন। পর্যটন দপ্তর ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তমসা উপত্যকা সম্পর্কে আশ্চর্য উদাসীন। তাঁরা এ অঞ্চলকে জনপ্রিয় করবার ব্যাপারে একেবারেই নীরব।

আর তাঁদের দোষ দিয়েই বা কি হবে ? তাঁরা যাঁদের আজ্ঞাবহ, যাঁরা এই বিশাল ভারতের বৈষয়িক উন্নতির জন্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করছেন, তাঁরাই তো জানেন না যে হিমালয় আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। এতগুলো পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হল, কিন্তু আজও হিমালয়ের বন-সম্পদ, ঔষধি-সম্পদ, জল-

এসোসিয়েশনের চঞ্চল মুখোপাধ্যায়, স্বপন দত্ত এবং অশোক মুখোপাধ্যায় ও দু'জন শেরপা প্রদীপ্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালের ৮ই অক্টোবর স্বর্গারোহিণী শিখরে প্রথম জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন।

সম্পদ ও ধাতু-সম্পদের উন্নয়ন এবং আহরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা হল না কেন?

সুইজারল্যাণ্ড প্রতি বছর বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার আয় করে থাকে। হিমালয়ের সাহায্যে ভারত তার চেয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। কিন্তু আমরা দীর্ঘকাল হিমালয়ের দ্বারে অর্গল এঁটে রেখেছিলাম। প্রতিরক্ষার নামে তাড়াহুড়া করে যে-সব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, তার যে অধিকাংশই অর্থহীন, এটা ভেবে দেখতে আমাদের বারো বছর লেগেছে।

আমরা মনে রাখছি না, যে হিমালয়ে বাস করেন আমার দেশের লক্ষ লক্ষ সৎ এবং শ্রমশীল মানুষ, তাঁদের জীবনকে উন্নত না করতে পারলে ভারতের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। হিমালয়ের আশীর্বাদ ছাড়া যে ভাবতের সমৃদ্ধি সম্ভব নয়, এই সহজ সত্যটা আমরা আজও উপলব্ধি করতে পারছি না।

যাক গে সেকথা। আবার হরকিদুনের কথায় ফিরে আসা যাক। এখানকার বিশ্রামগৃহটি ওসলার চেয়েও ছোট। সামনে ছোট একটি বারান্দা। তার দু'-পাশে দু'খানি ঘর ও বাথরুম। মেঝেতে দড়ির ম্যাট্। কয়েকখানি দড়ির খাটিয়া ও বাসনপত্র রয়েছে ঘরে। আর বারান্দায় রয়েছে খানকয়েক চেয়ার। তারই একখানিতে বসে আমি হরকিদুনকে দেখছি। হরকিদুনের উচ্চতা খুব বেশি নয়, মাত্র এগারো হাজার দুশো ফুট। কিন্তু হিমবাহ ও তুষারাবৃত শিখরের সংলগ্ন বলে এখানে ঠাণ্ডাটা কিছু বেশি। তাই কর্তৃপক্ষ এই বারান্দায় কাচের জানালা করে দিয়েছেন।

সেই জানালা দিয়েই আমরা দেখছি স্বর্গারোহিণী আর যমদ্বার হিমবাহের গ্রাবরেখা। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে—তমসার আঁকাবাঁকা ধারাগুলো সেই অজানা ও রহস্যময়ের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে।

সত্যই রহস্যময়, যমদ্বার শুনেছি বড়ই রহস্যময়। সেই রহস্যময়ের দিকে তাকিয়ে বার বার আমার গিব্‌সনের কথাই মনে পড়ছে। তাঁর পরে আর কেউ যায় নি ওখানে, ঐ যমদ্বারে। আমাদের যাওয়া হবে না। কারণ এখান থেকে যমদ্বার প্রায় ৪ মাইল। কাল সকালেই ছুটতে হবে ওসলা—নেতার নির্দেশ। নইলে অনায়াসে নদীর উৎসটিকে দর্শন করে আসা যেত।

নিরাশ হৃদয়ে তাই মনে করে চলেছি গিব্‌সনের সেই বর্ণনা—'Harki Doon means the valley of Har, God Shiv. To the south it is enclosed by a ridge some ten miles long from which rise the peaks of Swargarohini. In the valley meet three mountain torrents draining a basin of some 60 square miles surrounded by peaks...which offer wonderful climbing between 16000 and 19000 feet. The main torrent rises from Jamdar Bamak, the glacier of the door to the God of dead. In the centre is Mata-Ki Gad and from Borasu pass in the north descends the Morinda Gad.

মণ্ডলের ডাকে বাস্তবে ফিরে আসি। মণ্ডল আমার পাশে বসে রয়েছে। আমি তার দিকে তাকাই। মণ্ডল বলে, "চা খেয়ে নিন।"

আরে তাই তো! বচন যে চা-বিস্কুট পরিবেশন করছে। না, লোকটা সত্যি খুব কাজের। এরই মধ্যে চা তৈরি করে ফেলেছে। অবশ্য এখানে অসুবিধে নেই কোন। চমৎকার রান্নাঘর, প্রচুর কাঠ, কাছেই জল। বাসনপত্র সবই রয়েছে। সুতরাং দেরি হবে কেন?

তবে যাবার সময় বাসনপত্রগুলো ধুইয়ে-মুছিয়ে রেখে যেতে হবে। না রাখলে এমন কি চুরি করে বাড়ি নিয়ে গেলেও এখানে দেখবার কোন লোক নেই। কিন্তু স্বর্গারোহিণীর স্বর্গীয় প্রভাবে এখানে এসে সবাই সৎ হয়ে যায়। তাই জিনিসগুলো রয়েছে এবং আশা করি এমনি ঝক্‌ঝকে হয়েই থাকবে চিরকাল।

বাসনপত্র রাখার এই ব্যবস্থা এখানে কবে থেকে চালু হয়েছে জানি না, তবে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশ সরকারের উপমন্ত্রী (বন-বিভাগ) জগমোহন সিং নেগী এই বিশ্রামগৃহের শিলান্যাস করেন। শ্রীনেগী ও তাঁর সরকারকে ধন্যবাদ। তাঁরা আমাদের এমন একটি আশ্রয় উপহার দিয়েছেন।

দাদু সঙ্গে আসে নি, কিন্তু কোন জিনিসের জন্য যাতে আমাদের অসুবিধে না হয় সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। শম্ভু বস্তা খুলে বচনকে সব বুঝিয়ে দিল। বচন রাতের রান্না করতে চলে গেল। আর ঠিক তখুনি অকস্মাৎ বৃষ্টি নামল।

এখানে বৃষ্টি নামলে টাপুর টুপুর জল পড়ে না, ঝুমুর-ঝুমুর তুষার ঝরে। আর সেই তুষারের ওডনায় সামনে পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে সব কিছু যেতে চায় হারিয়ে, হয়ে উঠতে চায় মোহময়।

বিশ্রামগৃহের বারান্দায় বসে গরম চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে আমরা সেই মোহময় জগৎকে দেখি। দিনান্তের ক্লান্ত আলো আর তুষারের ওড়নায় স্বর্গারোহিণী ও তমসা মোহময়ী হয়ে উঠেছে। দুঃখ হচ্ছে সহযাত্রীদের জন্য—এমন মনোরম মুহূর্তটি ওরা উপভোগ করতে পারল না!

তুষারপাত থামল। কিন্তু ইতিমধ্যে অস্তমিত অংশুমানের শেষ শিখাটি গিয়েছে হারিয়ে। আঁধার নেমে এসেছে যমদ্বারের জগতে আর স্বর্গারোহিণীর সারা শরীরে।

না, তার মুখখানি যায় নি মিলিয়ে। যাবে কেমন করে? সে যে আমার স্নেহময় পিতার প্রতিভূ হয়ে সারারাত জেগে রইবে আমার শিয়রে।

আর জেগে রইবে তমসা। যার তীরে তীরে পথ চলে আমি আজ স্বর্গারোহিণীর পদপ্রান্তে পৌঁচেছি। সে ঘুমিয়ে পড়লে যে আমি পথ হারিয়ে ফেলব। তাই তো সেই সদাচঞ্চল স্রোতস্বিনী এখন একটি রূপোলী রেখায় রূপান্তরিত।

মণ্ডল মোম জ্বালায়। ঘরের আঁধার ঘুচে যায়। স্বর্গারোহিণী তো অনেকক্ষণ আগেই আমার মনের আঁধার দিয়েছে ঘুচিয়ে।

কুলি কালুরাম কাঠ নিয়ে আসে। আমরা উঠে দাঁড়াই—বারান্দা থেকে ঘুরে আসি। কালুরাম ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালে, মণ্ডল গান ধরে—'আগুনের পরশমণি...'

আমি বাধা দিই। বলি, "এখন গান নয়, গান হবে ডিনারের পরে।"

"এখন তাহলে কি?" মণ্ডল প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই, "গল্প।"

"কিসের গল্প?"

"স্বর্গারোহিণী আর তমসা উপত্যকার গল্প। শম্ভু বলবে।"

বিস্মিত শম্ভু আমার দিকে তাকায়। কিন্তু কিছু বলতে পারার আগেই মণ্ডল তাগিদ লাগাল, "শুরু করুন, শম্ভুদা!"

সুতরাং শম্ভুকে শুরু করতে হয়—"তোমরা জানো, তমসা উপত্যকার অধিবাসীরা দুর্যোধন-ভক্ত। কিন্তু তাদের স্থিরবিশ্বাস, পাণ্ডবরা এই পথেই স্বর্গারোহণ করেছিলেন।

তাই স্বর্গারোহিণী শিখরে অভিযান চালাবার সময় গিব্‌সন যখন প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার ফুটে কোন অদৃশ্য কুকুরের পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন, তখন কুলিরা গিব্‌সনকে ফেলে পালিয়ে গেল।

"খুবই স্বাভাবিক। পাণ্ডবদের কুকুর বাগে পেলে দুর্যোধন-ভক্তদের কামড়ে দেবে, তাতে আর সন্দেহ কি ?.."

"একসকিউজ মি শম্ভুদা !" মণ্ডলের কথায় শম্ভুকে থামতে হয়। মণ্ডল জিজ্ঞেস করে, "আপনি কুকুরটাকে অদৃশ্য বললেন কেন ?"

"তাকে কেউ দেখতে পায় নি বলে।" আমি উত্তর দিই। "শুধু তাই নয়, রাতে তাঁদের তাঁবুটা প্রচণ্ডভাবে নড়তে থাকল, অথচ তখন সেখানে কোন ঝড় ওঠে নি।"

"ভারী ইন্টারেস্টিং তো !" মণ্ডল মন্তব্য করে।

"সেখানেই শেষ নয়," শম্ভু মৃদু হেসে যোগ করে, "তারপরে তাঁদের তাঁবুর ওপরে পাথর পড়তে আরম্ভ করল, অথচ গিব্‌সন যেখানে তাঁবু ফেলেছিলেন, সেখানে পাথর পড়ার কথা নয়। আসল ব্যাপারটা কি জান ?"

"কি ?"

"যমদূতরা যমদ্বার হিমবাহে বসে অতন্দ্র প্রহরীর মতো স্বর্গের প্রবেশদ্বার পাহারা দিচ্ছে। হয়তো তারাই অনধিকার-প্রবেশকারীদের ভয় দেখাচ্ছিল।" একটু হাসে শম্ভু। তারপর বলতে থাকে, "সে যাই হোক, দুর্যোধন-ভক্তদের রাজ্যের ভেতর দিয়ে পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের কাহিনী নিঃসন্দেহে অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আমার মনে হয়, পরাজিত দুর্যোধনপক্ষীয়দের আস্থা অর্জনের জন্যই পাণ্ডবরা পরে একবার এ অঞ্চলে এসেছিলেন। লোককথায় তাই এ অঞ্চলটি পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর তারই ফলে এই সুদুর্গম শিখরের নাম হয়েছে স্বর্গারোহিণী।

"ঘটনা যা-ই ঘটে থাকুক, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে উচ্চ এবং নিম্ন তমসার তীরে তীরে আজও দু'টুকরো মহাভারতীয় সমাজ বেঁচে আছে। আজও এ অঞ্চলের অনেক মেয়ে দ্রৌপদীর মতো বহু পতি নিয়ে সুখে সংসার করছেন।

"বড় ভাই বিয়ে করে আনে, কিন্তু অন্যান্য ভাইরাও সমানভাবে স্বামীত্বের অধিকার পায়। বয়সের পার্থক্য খুব বেশি হলে ছোট ভাই যৌবনে পদার্পণ করবার পরে বড় ভাই আবার বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারে। নববধূর ওপরেও কিন্তু সব ভাইদের সমান অধিকার থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য দ্বিতীয়া প্রথমার বোন হয়। এতে পারিবারিক শান্তি বজায় থাকে।

"এ অঞ্চলে বিবাহিতা মেয়েদের দুটি রূপ—স্বামীগৃহে তারা রতিরূপা 'রান্তী'। সেখানে তাদের মেলা-মেশার সুযোগ সীমিত। কিন্তু মাতৃগৃহে তারা পূর্ব-প্রেমিকদের ধ্যানের 'ধ্যান্তী'। সেখানে তারা সবার সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশা করতে পারে।"

"তাহলে এদের সমাজেও কোর্ট-শিপ্ আছে ?" মণ্ডল মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে। শম্ভু উত্তর দেয়, "আছে বৈকি।"

"শম্ভুদা, আচ্ছা আপনি পিতৃগৃহ না বলে মাতৃগৃহ বললেন কেন ?"

"কারণ এদের সমাজে মাতাই সংসারের মধ্যমণি। অধিকাংশ বাড়িতে গিয়েই তুমি দেখবে ছেলেমেয়েদের একজন মা, কিন্তু বাবা কয়েকজন। তাছাড়া এদের সমাজে মেয়েদের মূল্যও অনেক বেশি। এখানে বরপণ নয়, কনেপণ। বেশ কিছু টাকা মেয়ের

মাকে দিয়ে তবে বউ ঘরে আনতে পারা যায়। তাহলেও এদের সমাজ কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক।"

"একটা কথা আমি যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না শম্ভুদা!"

"কি?" শম্ভু জিজ্ঞেস করে।

মণ্ডল বলে, "বহুপতি-প্রথা আজও এদের সমাজে বেঁচে থাকার কারণ কি? এখানে কি মেয়েদের সংখ্যা কম?"

"সামান্য কম, হাজাব পুরুষে সাড়ে ন'শো'র মতো নারী। কিন্তু সেটা ঠিক কারণ নয়। খবর নিয়ে জানা গেছে শতকরা ৩০ জন মেয়ে এখানে অবিবাহিতা থাকে এবং দশ জন স্বামীর মৃত্যু কিংবা বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে সঙ্গীহীনা থেকে যায়। আমার মতে এই বহুপতি প্রথার প্রকৃত কারণ ভূসম্পত্তির বিভাজন বন্ধ এবং সামাজিক জীবনকে সংঘবদ্ধ করা।"

"আরেকটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে।"

শম্ভু মন্ডলের দিকে তাকায়। মণ্ডল জিজ্ঞেস করে, "সেদিন তহশিলদার পুরৌলাতে বসে বিবাহিতা যুবতীদের যে সেবক রাখার কথা বললেন, সেটা কি সত্যি?"

"আংশিক সত্য সন্দেহ নেই। তমসা উপত্যকা সহ গাড়োয়াল ও কুমায়ুঁর বহুস্থানে নানাভাবে এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। স্থানীয় ভাষায় একে বলে 'ঠেকা' নেওয়া। পশুপালন ও কৃষিকার্যের জন্য সন্তান চাই, প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার জন্য সন্তান চাই। এই চাওয়া চিরন্তন, জগতের প্রাচীনতম ও পবিত্রতম কামনা। তাই এখানে স্বামী অক্ষম হলে স্ত্রী পরপুরুষের ক্ষেত্রজ সন্তান লাভ করতে পারে। বিধবারা স্বর্গীয় স্বামীর নামে সেবক দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে থাকে। সন্তান-ধারণ-ক্ষমতাহীনা নারী এদের সমাজে নিগৃহীতা। বিবাহ কিংবা পুনর্বিবাহের সময় অন্তঃসত্ত্বা নারীদের পণ অনেক বেশি। এই ধরনের স-সন্তান বিবাহকে বলে 'স্যাচেলা'। বলা বাহুল্য, সব সন্তানই এদের সমাজে বৈধ সন্তানের মর্যাদা পেয়ে থাকে।"

"আশ্চর্য তো!" শম্ভু থামতেই মণ্ডল বলে ওঠে।

"না।" শম্ভু বলে, "আশ্চর্যের কিছুই নেই। উচ্চ এবং নিম্ন তমসা উপত্যকার অধিবাসীরা মহাভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার উত্তর-সাধক মাত্র।"

"আপনি উচ্চ ও নিম্ন তমসা বলতে কোন্ অঞ্চল দুটি বোঝাতে চাইছেন?"

"ওসলা থেকে মোরি পর্যন্ত উচ্চ তমসা উপত্যকা, আর মোরি থেকে সঙ্গম অর্থাৎ জালালিয়া বা হরিপুর ব্যাস পর্যন্ত নিম্ন তমসা উপত্যকা।"

"নিম্ন তমসা উপত্যকার অধিবাসীরা তো পাণ্ডব-ভক্ত?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তাদের মধ্যেও বহুপতি-প্রথা প্রচলিত রয়েছে। প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রী কে. এম. মুন্সীও তমসা-তীরের সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন..'a fossil of the age of Mahabharata.' ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও সমাজবিদ্‌দের এই নিয়ে গবেষণা করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।"

*   *   *   *

কামি সঙ্গে আসে নি, কাজেই কেউ আজ আঁধার মিলিয়ে যাবার আগেই ঘুম ভাঙিয়ে বলে নি—'সাব্, বেড-টি।' নিজে নিজেই উঠতে হয়েছে ঠিক পাঁচটায়। পাশের

ঘরে গিয়ে বচন সিংয়ের ঘুম ভাঙাতে হয়েছে। সে কাল রাতেই বলে রেখেছিল—সকালে উঠে বেড-টি বানাতে তার আপত্তি নেই কোন, কিন্তু সে ঘুমকাতুরে মানুষ। তার ঘুমটি ভাঙিয়ে দিতে হবে।

তাই দিয়েছি। এবং সেজন্য কোন অসুবিধে হয় নি। এমনিতেই আমার ঘুম একটু কম। তার ওপরে কাল গরম-গরম খিচুড়ি, আলুভাজা ও আচার দিয়ে ডিনার সেরে সন্ধ্যে সাতটার সময় শুয়ে পড়েছিলাম।

বচন কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকা শেরপা পাচকের মত বেড-টি নিয়ে এল। চা শেষ করেই আমরা স্লীপিং-ব্যাগ ছেড়ে উঠে বসলাম। গোছগাছ করে নিতে সময় কম লাগবে না। ব্রেকফাস্টের পরে আবার বাসনপত্র মাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার হাঙ্গামা রয়েছে।

সবার আগে প্রাতঃকৃত্য সেরে এল শম্ভু। তারপরে আমি বাথরুমে ঢুকি।

বেরিয়ে এসে দেখি—শম্ভু ঘরে নেই, মণ্ডল মৃত প্রজাপতিদের পরিচর্যা করছে। মণ্ডল জানাল, "শম্ভুদা জামা-জুতো পরে আইস্-অ্যাক্স হাতে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। যাবার সময় শুধু বললেন—আমি আটটা নাগাদ ফিরে আসব। তোমরা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিও।"

অবাক হলাম। শম্ভু ট্রেনিং-প্রাপ্ত অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিক। এরকম অচেনা ও দুর্গম হিমবাহ অঞ্চলে যে কারও একা কোথাও যাওয়া উচিত নয়, একথা তার অজানা থাকার কথা নয়। এভাবেই আমরা দুঃসাহসী পর্বতারোহী গৌরাঙ্গ চৌধুরীকে হারিয়েছি।

কোথায় গেল শম্ভু ? কেনই বা এমন একা একা বেরিয়ে গেল ? আমরা তিনজন কুলি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তারা তো বসে আছে। তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত। কাজটা ভাল করেনি সে।

যাক গে, এখন এ-সব ভাবনা অর্থহীন। সে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক।

মণ্ডল বাথরুমে ঢোকে। আমি জামা-জুতো পরে বেরিয়ে আসি বাইরে। প্রভাতী সূর্যের সোনালী পরশে হরকিদুন উৎসবের সাজে সেজেছে। যমদ্বারের দিকটা দিনের আলোতেও তেমনি রহস্যময়। তমসা তেমনি যৌবন চঞ্চলা, কিন্তু সে কালকের চেয়ে আজ আরও সুন্দরী। তার রূপোলী অঙ্গে সোনালী আকুলি। তবে স্বর্গারোহিণী আর তার দুই সহচরী সবাইকে হার মানিয়েছে। তাদের শিখর সোনার খনিতে রূপান্তরিত, আমি মুগ্ধ আবেশে সেই সোনাঝরা সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকি।

স্বর্গারোহিণী একাকিনী নয়। তার পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি তুষারধবল শৃঙ্গ—স্বর্গারোহিণীর দুই সহচরী। পুবের শৃঙ্গটি ১৭,৫৭৩ফুট উঁচু, আর পশ্চিমেরটি ২০,৩৭০ফুট। এ শৃঙ্গ দুটিও অপরাজিতা।

মনে হচ্ছে একটি গিরিশিরার ওপরেই তিনটি শৃঙ্গ। একই অভিযানকালে আরোহণ করা বোধ হয় সম্ভব। গিরিশিরাটি পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত। সিয়াম হিমবাহের কাছে গিয়ে বান্দরপূঁছ গিরিশিবার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেই মিলনস্থলের দক্ষিণ-পূর্বে বান্দরপূঁছ গিরিশিরার ওপরেই ধুমধার-কান্দি গিরিবর্ত্ম—আমাদের লক্ষ্যস্থল।

কিন্তু ধুমধারের কথা নয়, এখন হরকিদুনের কথা হোক্। সত্যই আশ্চর্য-সুন্দর অবস্থান এই বিশ্রামগৃহটির। তিনটি শৃঙ্গকেই চমৎকার দেখা যাচ্ছে। স্থান নির্বাচনের জন্য কর্তৃপক্ষকে আবারও ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে।

না, পাচক হিসেবে বচনের প্রশংসা করতেই হবে। তার রান্না শেষ। কুলিদের সঙ্গে

খাবার নিয়ে সে বিশ্রামগৃহে ফিরে এল।

কিন্তু শম্ভু ফিরে এল না যে! প্রায় ঘন্টাখানেক হল সে নিরুদ্দেশ। কোথায় গেল মানুষটা?

বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকতে হল না। আটটার কয়েক মিনিট আগেই শম্ভু ফিরে এল। শ্রান্ত পদক্ষেপে প্রায় টলতে টলতে ঘরে ঢুকল সে। আইস-এক্স্‌খানি কোনমতে একপাশে রেখে দিয়ে সে খাটিয়ার ওপরে বসে পড়ল। তার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। মুখখানি কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি কাছে আসি। উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করি, "কি ব্যাপার?

কোথায় গিয়েছিলে?"

ক্লান্ত কণ্ঠে শম্ভু বলে, "আমার একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল শঙ্কুদা!"

"কি হয়েছিল?" মণ্ডল প্রশ্ন করে, "খাদে-টাদে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি?"

শম্ভু উত্তর দেয়, "না।"

"তুষার-মানব দেখেছেন?"

"না" একবার থামে শম্ভু। তারপরে বলে, "হায়না।"

"হায়না!" আমরা আঁতকে উঠি।

"হ্যাঁ দাদা, হায়না। প্রকাণ্ড একটা হায়নার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম।"

"কোথায়?" জিজ্ঞেস করি।

"নদীর বেলাভূমিতে নেমে যাবার পথে।"

"তা তুমি হঠাৎ একা একা ওদিকে গিয়েছিলে কেন?"

"ভাবলাম—আর হয়তো কখনও আসা হবে না। সময় যখন রয়েছে, এক বার ঘুরে আসি হরকিদুন নালার তীরভূমি থেকে। সম্ভব হলে, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে যমদ্বারকে একটু দেখে আসি।" থামে শম্ভু। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে, "পারলাম না শঙ্কুদা! যমদ্বারকে দেখা তো দূরের কথা, বেলাভূমি পর্যন্তই পৌঁছতে পারলাম না। পথেই দেখা হল তার সঙ্গে, পালিয়ে এলাম তোমাদের কাছে।"

"তা শুভদৃষ্টিটা কিভাবে হল শম্ভুদা?" মণ্ডল মজা পেয়েছে। গতকাল শম্ভু তাকে বাঘের ভয় দেখিয়েছে। আজ সে নিজেই প্রায় হায়নার হাতে পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং মণ্ডল তাকে ছেড়ে দেবে কেন?

তাহলেও শম্ভু ইতিমধ্যে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। মৃদু হেসে সে উত্তর দেয়, "শুভদৃষ্টি! হ্যাঁ, তা বলতে পারো বৈকি, শুভদৃষ্টি তো বটেই।" একটু থামে সে। তারপরে আবার বলতে থাকে, "এখান থেকে বেরিয়ে সোজা পথে পাথর ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে নেমে চললাম নিচে। মনের আনন্দে পথ চলেছিলাম। ভাবছিলাম—ফিরে এসে তোমাদের কাছে বেশ খানিকটা বাহাদুরি নেওয়া যাবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সে সুযোগ আর পেলাম না। তার আগেই দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে.."

"কি রকম ভাবে হল?" মণ্ডল বোধহয় আর কৌতূহল দমন করতে পারছে না।

"বলছি ভাই, বলছি। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?" শম্ভু তাকে আশ্বস্ত করে। বলে, "মনের আনন্দে পথ চলেছিলাম। হঠাৎ একখানা বড় পাথর পেরোতেই দেখতে পেলাম তাকে। মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়েছিল সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আমাকে। আমি না পারছিলাম এগোতে, না পারছিলাম পেছোতে! কারণ মৃত্যুর মুখোমুখি

দাঁড়িয়েও ভুলে যাই নি যে পেছনে ফিরলেই সে একলাফে আমার ঘাড়ে পড়বে এবং আমি তখন আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পাব না। আমি তাই দাঁড়িয়ে রইলাম, সে-ও রইল দাঁড়িয়ে। আমি তাকে দেখলাম, সে-ও আমাকে দেখল। সেভাবে কতক্ষণ কেটেছে তা বলতে পারব না। হঠাৎ দেখলাম সে নড়ে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। ভাবলাম—আমার অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। কিন্তু না, সে পেছন ফিরল। একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোন্ দিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আর নিচের দিকে যাওয়া উচিত হবে না। বুঝতে পারলাম, সেখানে অপেক্ষা করাও সমীচীন নয়। তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম তোমাদের কাছে।"

ঘটনা যাই ঘটে থাকুক, শম্ভু সত্যই ভাগ্যবান। গোবিন্দ পশুবিহারের একজন বাসিন্দাকে দর্শন করে এসেছে সে। তার ভাগ্যকে ঈর্ষা না করে পারছি না।

অবশেষে অন্তিম মুহূর্তটি সমাগত হল, এল বিদায়ের পালা।

আমরা বিদায় নিলাম হরকিদুনের কাছ থেকে।

না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে না আমার। রূপতীর্থ-হরিকিদুনের মধুর স্মৃতি আমার অন্তরে অক্ষয় হয়ে রইবে। স্বর্গারোহিণীর স্বর্গীয় মূর্তির মাঝে আমি সারাজীবন ধরে আমার স্বর্গগত স্নেহময় পিতার স্মৃতি-তর্পণ করতে পারব।

আমি তাঁকে প্রণাম করি।

॥ বারো ॥

পাখির কাকলি আর তমসার কলতান। পথ চলতে ভালই লাগছে। বেশ চড়া রোদ উঠেছে আজ। পোকা-মাকড়ের মেলা বসেছে চারিদিকে। মণ্ডল কালেক্শনের মহোৎসবে মেতে উঠেছে।

.কথাটা প্রথম খেয়াল হয় শম্ভুর। বলে, "মণ্ডল যদি এই হারে কালেক্শন করতে থাকে, তাহলে যে ওসলা পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। এদিকে অমূল্য বার বার বলে দিয়েছে বারোটার আগে ফিরে যেতে।..তার চেয়ে এক কাজ করো।"

"কি?" প্রশ্ন করি।

কি যেন একটু ভাবে শম্ভু, তারপর বলে, "থাক্ গে, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করার, আমিই করছি। তুমি শুধু চুপ করে থেকো।"

আমি মাথা নাড়ি। শম্ভু দাঁড়িয়ে পড়ে। আমিও চলা বন্ধ করি। কিছুক্ষণ বাদে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে জাল হাতে নিয়ে মণ্ডল আমাদের কাছে আসে। শম্ভু শুরু করে, "এই যে মণ্ডল, কি রকম কালেক্শন হচ্ছে?"

"ভালই, শম্ভুদা!"

"আচ্ছা, একটা কথা—তুমি কেবল কালেক্শন-ই করে যাচ্ছ আর আমরা শুধু দেখেই যাচ্ছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। আর ব্যাপারটা তুমি একটু বুঝিয়ে না দিলে, বুঝবই বা কেমন করে?"

মণ্ডল চুপ করে রয়েছে। তার মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না।

শম্ভু আবার বলে, "তাই বলছিলাম, কালেক্‌শন তো অনেক হল, গতকাল যাবার সময়েও এপথে কালেক্‌শন করেছো। আজ আর কালেক্‌শন না করে, সে সম্পর্কে কিছু বলো। সেই সঙ্গে যদি এ অঞ্চলের গাছপালার সামান্য কিছু সংবাদ দেও, তাহলে সময়টা ভাল কাটে।"

কাজ হয়। মণ্ডল জালটি গুটিয়ে বচনের হাতে দেয়। তারপরে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, "কোন্ জায়গা থেকে শুরু করব?"

"গোড়া থেকে হলেই তো ভাল, কি বল?" শম্ভু আমার দিকে তাকায়।

আমি মাথা নাড়ি।

মণ্ডল চলতে চলতে বলতে শুরু করে। আমরা দু'জনে তার দু'পাশে হাঁটতে থাকি। মণ্ডল বলে, "উত্তরকাশী থেকে পুরৌলা আসার সময় সামান্যই কালেক্‌শন করতে পেরেছি। তাহলেও ওপথে বাস রাস্তার ধারে তিন থেকে চার হাজার ফুট উঁচুতে, উচ্চিংড়া জাতীয় ক্ষুদ্র শুঁড় বিশিষ্ট ও ফড়িং জাতীয় প্রজাপতি এবং রেশম কীট জাতীয় প্রজাপতি সংগ্রহ করতে পেরেছি। আপনারা জানেন, এ অঞ্চলটি বড় বড় গাছে বোঝাই।"

আমরা মাথা নাড়ি।

মণ্ডল বলতে থাকে, "পুরৌলা থেকে জারমোলার পথে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে, মৌমাছি বোলতা জাতীয় প্রজাপতি, কুকুরের গায়ের উকুন ও প্রজাপতি পেয়েছি। ঐ অঞ্চলে শ্যাওলা মস পাইন দেওদার ফার ধান ঘাস জোয়ার বজরা ও আখরোট প্রভৃতি গাছ দেখেছি। জারমোলা থেকে নৈটয়ারের পথে আমি অনেক প্রজাপতি পেয়েছি।"

"যেমন?" শম্ভু প্রশ্ন করে।

মণ্ডল উত্তর দে, "ক্ষুদ্র শুঁড় বিশিষ্ট উচ্চিংড়া, মৌমাছি, বোলতা, মশা-মাছি, গোবরকীট ছারপোকা কুকুরের গায়ের উকুন এবং প্রজাপতি।" একটু থেমে মণ্ডল আবার বলে, "এ অঞ্চলের উচ্চতা সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছ'হাজার ফুট। এখানে আমরা ধানক্ষেত তৃণভূমি এবং বড় বড় গাছ দেখেছি।"

ঘাড় নাড়ি। মণ্ডল বলে চলে, "নৈটয়ারর থেকে তালুকার পথেও আমার বেশ ভাল কালেক্‌শন হয়েছে। এই অঞ্চলে আমি উচ্চিংড়া গোবরকীট মৌমাছি-বোলতা, বিষধর সাপ ও প্রজাপতি পেয়েছি। এই এলাকা গভীর বনময়, উচ্চতা সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছয় হাজার ফুট।"

"তালুকা থেকে ওসলার পথে অর্থাৎ সাড়ে ছয় থেকে ন'হাজার ফুট উচুঁতে আমি উচ্চিংড়া মৌমাছি-বোলতা, মশা-মাছি, গোবরকীট ছারপোকা সাপ ও প্রজাপতি পেয়েছি। এই অঞ্চলের গাছপালা লক্ষ্য করবার মতো—কোথাও ঘন-আর্দ্র গভীর বন, কোথাও বা ধান বার্লি রামদানা ও আলুর ক্ষেত। কোথাও শ্যাওলা মস ফার্ন ধূপ ও ক্যাকটাস আবার কোথাও বা ভুজ ওক্ দারুচিনি নাসপাতি ও আখরোট।"

মণ্ডল থামতেই শম্ভু প্রশ্ন করে, "আর এ অঞ্চলে, এই ওসলা ও হরকিদুনের পথে কি রকম কালেক্‌শন করলে?"

"না।" মণ্ডলের স্বরে হতাশা, "মোটেই ভাল কালেক্‌শন হয় নি। তবে কাল যে লাল মাকড়সাটা পেয়েছি, সেটা এখন পর্যন্ত এ যাত্রায় আমার বেস্ট-কালেক্‌শন।

কয়েকটা মশা-মাছি, মৌমাছি-বোলতা ও গোবরকীট মাত্র পেয়েছি।"

"সেকি! প্রজাপতি পাও নি?" সবিস্ময়ে বলি।

বিমর্ষ মণ্ডল করুণ কণ্ঠে উত্তর দেয়, "না।"

"তাহলে কাল অত স্যুইপ্ করলে কি?"

"স্যুইপ করাই সার হয়েছে, তেমন কিছুই কালেক্শন করতে পারি নি।"

"তা এ অঞ্চলে কি কি গাছপালা দেখলে?" শম্ভু জিজ্ঞেস করে।

মণ্ডল উত্তর দেয়, "ভুজ ধূপ ঘাস রডোডেনড্রন কাঁটাঝোপ আর কিছু বড় বড় গাছ যেমন.."

না, শম্ভুকে বাহাদুর বলতে হবে। সারা পথটাই সে মণ্ডলকে অন্যমনস্ক করে রাখল। অবশ্য তার পোকামাকড়ের ফর্দ শুনতে গিয়ে আমরা আজ আর পথের প্রকৃতির দিকে নজর দেবার অবকাশ পাই নি।

মনে হচ্ছে মণ্ডল বক্তৃতার মোহে তার কালেক্শনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। সত্যি বলতে কি আমরা আজ খুবই তাড়াতাড়ি পথ চলেছি। তাহলেও বেলা বারোটার আগে ওসলা বিশ্রামগৃহে পৌঁছানো সম্ভব হল না। কারণ অমূল্যর সেই সময়সীমা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত।

বিশ্রামগৃহকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে এখন। দেখা যাচ্ছে তমসার পুল এবং ওসলা গ্রাম। তাহলেও পৌঁছতে অন্ততঃ আধঘন্টা লাগবে। আমরা জোর কদমে এগিয়ে চলি।

গ্রামটিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে, মনে হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি খেলাঘর। সত্যই তাই। কারণ ঘর মানেই তো খেলাঘর—হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মিলন আর বিরহের খেলা।

একবার গেলে হত। নেতার আদেশে কাল সকালেই হয়তো যাত্রা করতে হবে তালাও শিবিরের পথে। এখন না গেলে আর ঐ বিরহ-মিলনের মেলা দেখার সুযোগ না-ও পেতে পারি।

কথাটা শুনে শম্ভুও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, "যেতে পারলে তো খুবই ভাল হয়। সুশান্তদা ও সুব্রত বোধ হয় এখন গ্রামেই রয়েছে।"

"তাই ভাল।" মণ্ডল বলে, "একেবারে ওনাদের সঙ্গে বিশ্রামগৃহে ফেরা যাবে।" সে তার সহকারীকে নির্দেশ দেয়, "বচন!"

"জী সাব!"

"তোম্ কুলি লেকর ডাকবাংলোমে চলা যাও। হামলোগ 'ভিলেজ' দেখকর আপোস আয়েগা।"

"ভিলিজ?" বচন বুঝতে পারে না।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ভিলেজ..গাঁও, ওসলা গাঁও.."

"ঠিক হ্যায় সাব।" বচন মাথা নাড়ে। এবারে বুঝতে পেরেছে সে।

কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারি নি। কারণ তার আগেই আমরা দেখতে পাই তাকে—জয় বাহাদুরকে।

পথটি যেখানে দু'টি ভাগ হয়েছে। এক ভাগ সোজা চলে গিয়েছে ওসলা গাঁয়ের দিকে, আরেক ভাগ নেমে গিয়েছে পুলে—বিশ্রামগৃহের দিকে, ঠিক সেখানেই একখানি পাথরের ওপরে বসে রয়েছে সে। আমরা তার কাছে আসি।

জয় বাহাদুর উঠে দাঁড়ায়। সেলাম করে। তার এক হাতে এক বোতল অরেঞ্জ স্কোয়াশের সরবত, আরেক হাতে কিছু বিস্কুট ও চানাচুর।

বুঝতে পারছি সাবধানী নেতা আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। ভালই করেছে—চড়াই-উৎরাই করে ব্রেকফাস্ট হজম হয়ে গেছে। গ্রাম দেখে বিশ্রামগৃহে ফিরতে কম করেও ঘন্টা দেড়েক লেগে যাবে।

খাওয়া শেষ হলে জয় বাহাদুরকে বলি, "তুমি বিশ্রামগৃহে ফিরে যাও। লীডার সাব্‌কে বোলো, আমরা একটু গ্রাম থেকে ঘুরে আসছি।"

"লীডার সাব্‌ও গাঁয়ে গিয়েছেন।" জয় বাহাদুর জানায়।

তাহলে সুশান্তবাবু এবং ডাক্তারের সঙ্গে অমূল্যও গ্রামে গিয়েছে। ভালই হয়েছে, সেখানেই দেখা হবে তার সঙ্গে।

"সাব্‌! লীডার সাব আপনাদের এটা দিয়েছেন।" জয় বাহাদুর তার প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে আমাকে দেয়। খুলে দেখি চিঠি—নেতার নির্দেশ..

'Soncuda/Sombhuda/Mandol.

You should have returned by 12 noon.

You are not obeying your Leader.

amulya sen

নেতা বেলা বারোটার মধ্যে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিল, আমরা সে নির্দেশ পালন করতে পারি নি। পর্বতারোহণে এটি অমার্জনীয় অপরাধ।

জয় বাহাদুর যোগ করে, "লীডার সাব্‌, আপনাদের তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরে খেয়ে নিতে বলেছেন।"

শম্ভুর দিকে তাকাই। একটু শুকনো হেসে শম্ভু বলে, "তাহলে তো এখন আর গ্রামে যাওয়া চলে না।"

আমি মাথা নাড়ি।

সিদ্ধান্তটি মন্ডলের মনঃপূত হয় না। সে বলে ওঠে, "তবে যে ওসলা দেখাই হবে না আমাদের!" সে রীতিমত মর্মাহত।

"না হলেও উপায় নেই ভাই!" শম্ভু শান্তস্বরে উত্তর দেয়। বলে, "অমূল্যর অবাধ্য হওয়া উচিত হবে না।"

"এ অমূল্যদার অন্যায় আদেশ, একে লীডারশিপ্‌ না বলে ডিক্টেটরশিপ্‌ বলাই উচিত।"

"তা বলতে পারো বৈকি।" মৃদু হেসে মণ্ডলকে বলি, "পর্বতাভিযানের সময় সব নেতাকেই ডিক্টেটর হতে হয়।"

"সদস্যদের বিনা প্রতিবাদে সেই ডিক্‌টেশন মেনে নেওয়া উচিত।" শম্ভু যোগ করে।

"আমি সত্যি দুঃখিত।" মণ্ডল তার ভুল বুঝতে পারে। "আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।" তার কণ্ঠে অনুশোচনা।

"না, না। ক্ষমা করার মতো কোন অন্যায় করো নি তুমি।" শম্ভু তাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে, "চলো এবারে যাওয়া যাক্‌।"

"চলুন।" মণ্ডল পথ চলা শুরু কর। আমরা তাকে অনুসরণ করি। উৎরাই বেয়ে

নেমে চলেছি পুলের দিকে, ফিরে চলেছি বিশ্রামগৃহে। শান্তির নীড় ওসলায় আর যাওয়া হল না আমাদের, দেখা হল না দুর্যোধনের মন্দির। শান্ত ও উদার ঐ পাহাড়ী পল্লীটি হয়তো চিরকালের তরে রয়ে গেল আমার পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে

ডিনারের পর আলোচনার আসর বসল। আজ সকালে কুলিদের সঙ্গে মামা ও পণ্ডিত ওপরে চলে গিয়েছে। কাজেই ওসলা বিশ্রামগৃহে এখন আমরা সাতজন—অমূল্য সুশান্তবাবু শম্ভু ডাক্তার মণ্ডল ও পান্না দাদু ও আমি। কামি এবং সেতী সহ জন বিশেক কুলি রয়েছে এখানে। তারা কাল এখানকার সব মাল ওপরে নিয়ে যেতে পারবে। কাল সকালেই আমরা ওসলার পাট চুকিয়ে তালাও শিবিরে চলে যাব। তার মানে যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই সত্য হল। ওসলা গাঁয়ে আর যাওয়া হ'ল না আমার।

ফতে সিং ও রূপা সিং নামে দুজন পথ-প্রদর্শক পাওয়া গেছে। ফতে নাকি বছর দু'য়েক আগে ধুমধার-কান্দি পেরিয়ে হরশিল গিয়েছিল। রূপা ধুমধার পেরোয় নি তবে ভেড়া চড়াতে গিরিবর্ত্মটির পাদদেশ পর্যন্ত গিয়েছে। ওদের শুধু জুতো-মোজা দিতে হবে। জামা কাপড় সবই নাকি আছে। খাওয়া ও দৈনিক দশ টাকা পারিশ্রমিক দিলেই চলবে।

কথায় কথায় অমূল্য বলে, "মণ্ডল, কাল থেকে তুমি আর বচনকে পাচ্ছ না।"

"কেন?" মণ্ডল যেন আঁতকে ওঠে।

"তার বদলে তোমাকে অন্য একজন কুলি দেওয়া হবে।" গম্ভীর স্বরে অমূল্য জানায়।

"কিন্তু আমি বচনকে কেন পাচ্ছি না অমূল্যদা?"

"বচন কাল সকালেই ডাক নিয়ে উত্তরকাশী চলে যাচ্ছে।"

"ডাক পাঠাবার জন্য তো যে-কোন একজন কুলিকেই উত্তরকাশী পাঠালে চলত।" মণ্ডলের কণ্ঠে প্রতিবাদ।

"না মণ্ডল, চলত না। কারণ এই ডাকের সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী টেলিগ্রাম যাচ্ছে।" অমূল্য একটু থেমে আবার বলে, "হিসেব করে দেখলাম, উত্তরকাশী পৌঁছে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা না পেলে আমরা কুলি ও শেরপাদের মজুরি মেটাতে পারব না।"

"পাঁচ হাজার টাকাই ঘাটতি পড়ে গেল?" মণ্ডলের স্বরে বিস্ময়।

"না, না, পাঁচ হাজার ঘাটতি নয়। তার মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে থেকে সাহায্য বাবদ তিন হাজার টাকা আমরা পেয়ে গিয়েছি। আসার আগে চেক্‌টা ক্যাশ হয় নি। ক্লাবের ক্যাশিয়ার অসীম নিশ্চয় এতদিনে টাকাটা হাতে পেয়ে গেছে।"

"বাকি দু'হাজারের কি হবে? ক্লাবের ফাণ্ডে রয়েছে নিশ্চয়?"

মণ্ডলের প্রশ্ন শুনে অমূল্য হেসে দেয়। বলে, "মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের ফাণ্ডে ক্রেডিট্ ব্যালান্স বড় একটা থাকে না মণ্ডল!"

"তাহলে?"

"আছে, মণ্ডল উপায় আছে। টাকা না থাকলেও একটি মানুষ আছে, সে যেমন করেই হোক্ টাকা যোগাড় করে পাঠাবে।"

"কে সে?"

কিন্তু অমূল্য মণ্ডলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার আগেই পান্না বলে ওঠে, "আমি বলব অমূল্যদা?"

আমরা তার মুখের দিকে তাকাই। অমূল্য অনুমতি দেয়, "বল দেখি।"

পান্না সহাস্যে বলে, "তাঁর নাম দাশরথি সরকার।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" অমূল্য পান্নার অনুমান অনুমোদন করে। বলে, 'দাশুদাকেও তাই একটা টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি। ঠিক কথা শঙ্কুদা, তুমি 'নিউজ ড্রাফট' করেছো?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"দেখি।"

টেলিগ্রামগুলো অমূল্যর হাতে দিই। অমূল্য জোরে জোরে পড়তে থাকে—

'BASECAMP ESTABLISHED 28TH SEPTEMBER ABOVE SOURCE RUINSARAGAD APPROXIMATELY AT 12000 FEET STOP ALL WELL.

SONCUMOHARAJ'

কাগজগুলো আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অমূল্য বলে, "ঠিক আছ। কাকে পাঠাচ্ছ?"

উত্তর দিই, "প্রেস ট্রাস্টের শ্রীবসাক, যুগান্তরের অসীম মিত্র, বসুমতীর সুবীর সিন্‌হা, ভ্রমণবার্তার প্রমোদ মল্লিক ও মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনকে।"

একটু ভেবে অমূল্য বলে, "অসীম, দাশুদা, প্রবোধদা এবং আমাদের ক্লাবের ঠিকানায়ও একটা করে কপি পাঠিয়ে দাও।"

"প্রবোধদা! লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল?" ডাক্তার মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" অমূল্য উত্তর দেয়, "যাঁর আশীর্বাদ ছাড়া বাংলার কোন পর্বতাভিযান সফল হতে পারে না।"

"দাশুবাবু বুঝি খুব বড়লোক?" অমূল্য থামতেই মণ্ডল জিজ্ঞেস করে। একটু হেসে উত্তর দেয় অমূল্য, "মোটেই বড়লোক নয়। বরং তাকে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বলতে পার। নিতান্তই চাকুরিজীবী সংসারী মানুষ।"

"তাহলে তিনি কেমন করে টাকা পাঠাবেন?"

"ধার করে, প্রয়োজন হলে বৌদির গয়না বন্ধক দিওে দাশুদা টাকা পাঠাবে।"

"অদ্ভুত লোক তো!" মণ্ডল বিস্মিত।

পান্না বলে, "সত্যি অদ্ভুত লোক দাশুদা। ছোটখাটো মানুষটি। যেমন কর্মক্ষম ও বুদ্ধিমান, তেমনি পরিশ্রম করতে পারেন।"

"কি রকম লোক জানো?" মণ্ডল কিছু বলতে পারার আগেই অমূল্য প্রশ্ন করে।

"কি রকম?" মণ্ডল পাল্টা প্রশ্ন করে।

অমূল্য উত্তর দেয়, "যেমন ধর, আরা টেলিগ্রামে লিখছি, পাঁচ হাজার টাকা ১০ই অক্টোবরের মধ্যে উত্তরকাশীতে পৌঁছানো দরকার। এই টেলিগ্রাম পেতে তার অন্তত ৪/৫ তারিখ হয়ে যাবে। টাকা যোগাড় করতে আরও ২/৩ দিন। তখন দাশুদা খোঁজ করে দেখবে, টি. এম. ও. কিংবা ব্যাংক ট্রান্সফার করলে টাকাটা দশ তারিখের ভেতরে উত্তরকাশী আসবে কিনা। যদি জানতে পারে টাকা পৌঁছবে না, তাহলে টাকাগুলো কোমরে বেঁধে নিয়ে সে প্রথমে যে ট্রেন পাবে, তারই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সাধারণ কামরায় ভিড় ঠেলে উঠবে—ঋষিকেশ রওনা হবে। মোট কথা, টাকা নির্দিষ্ট দিনে উত্তরকাশী পৌঁছবেই।"

সুশান্তবাবু আমার দিকে তাকান। আমি বলি, "অমূল্য ঠিকই বলছে--দাশুর মতো সৎ এবং নিঃস্বার্থ হিমালয়-প্রেমিক এদেশে খুব বেশি নেই। বিগত পাঁচ-ছয় বছরে

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যতগুলো পর্বতাভিযান আয়োজিত হয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটির সংগঠনে দাশরথির অবদান অসামান্য। অথচ সে নিজে এর একটি অভিযানেও অংশ নেয় নি।"

"দাশরথিবাবু বুঝি হিমালয়ে আসেন না?" ডাক্তার প্রশ্ন করে।

অমূল্য উত্তর দেয়, "আসবে না কেন? সে কেদার-বদ্রী, যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী ও গোমুখী, অমরনাথ ও রূপকুন্ড প্রভৃতি দর্শন করেছে। এই তো কিছুদিন হল সস্ত্রীক কাশ্মীর থেকে বেড়িয়ে এলো।" থামে অমূল্য। কিন্তু তার পরেই কথাটা মনে পড়ে তার। বলে, "১৯৫৪ সালে দাশুদা আমাদের 'ট্রেল্‌স' গিরিবর্ত্ম অভিযানের সদস্য ছিল।"

"মানে, যে অভিযানে অণিমাদেবী শহীদ হয়েছেন?"

"হ্যাঁ। দাশুদাই অণিমা সেনগুপ্তা মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদক। তাছাড়া সে তো গত বছরও হিমালয়ে এসেছে।"

"কোথায়?"

"লাহুল ও স্পিতিতে। গুরুপদ সঞ্জিত ও কমলদার সঙ্গে গিয়েছিল করচা নালার তীরে, যেখানে সুজয়াবৌদি ও কমলা শহীদ হয়েছে। দর্শন করে এসেছে ইস্তিংরি?"

"লাহুল উপত্যকার সদর কেলং-য়ের মহাশ্মশান, যেখানে সুজয়াবৌদির শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হয়েছে।"

কেউ কোন কথা বলছে না। সবার সব প্রশ্নই বুঝি বা শেষ হয়ে গেছে। একটা আকস্মিক অসাড় নীরবতা সারা ঘরখানিকে গ্রাস করে ফেলেছে।

"শঙ্কুদা!" দাদুর ডাকে চমকে উঠি। নীরবতার অবসান ঘটিয়ে সে বলে, "বলতে ভুলে গিয়েছি, কালকের ডাকে তোমার একখানা চিঠি এসেছে।"

যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করি, "কোথায়?"

দাদু পকেট থেকে পোস্টকার্ডখানা বের করে আমার হাতে দেয়।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে আলোর কাছে আসি। এ যে দেখছি প্রবোধদার চিঠি। তিনি কিছুদিন হল কলকাতার বাইরে গিয়েছেন। সেখানে বসেই বোধহয় বৌদির চিঠিতে জানতে পেরেছেন দুঃসংবাদটা। আবার বাড়ি থেকে ঠিকানা কেটে চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। প্রবোধদা লিখেছেন—

'কল্যাণবরেষু শঙ্কু,

তোমার পিতৃবিয়োগের সংবাদ শুনলুম।

তোমাকে যারা ভালবাসে এবং তোমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে যাদের মন জড়িয়ে থাকে, তাদের পক্ষে এই সংবাদ খুবই বেদনাদায়ক। তোমার শোকসন্তপ্ত মন আপন শক্তিতে আবার উঠে দাঁড়াক, এই কামনা।

আমার দু'চোখ আবার ঝাপসা হয়ে ওঠে।

॥ তেরো ॥

রোদ ওঠার আগেই ওসলার পাট ওঠাতে হল। আমরা সবাই আজ তালাও শিবিরে চলে যাচ্ছি।

সকাল সাড়ে সাতটায় বিশ্রামগৃহের বাইরে আসি। একবার ভাল করে দেখে নিই বিগত চারদিনের আশ্রয়স্থলটিকে। জীবনে আর হয়তো কোনদিন আসা হবে না এখানে, বাস করব না এই রমণীয় নিবাসে। দেখে নিই তমসাকে আর তার ওপারে ছবির মতো সুন্দর ঐ গ্রামটিকে। কোনদিন বোধহয় আর দেখব না ওসলাকে।

ঢালু পথ বেয়ে এগিয়ে চলি পুবে। এখানে রোদ নেই। কিন্তু সামনের স্বর্গারোহিণী শিখরে সোনালী রোদের ছড়াছড়ি। রোদ রয়েছে ওপরে—দূরের ঐ সবুজ বনানীর সারা গায়ে।

সেই কথাই বার বার বলছে অমূল্য। নেতা বলছে, "তাড়াতাড়ি পা চালাও, ওপরে গেলেই রোদ পাবে। দেড়ঘন্টার মধ্যে আমি তোমাদের রোদ দেব। কিন্তু এই দেড়ঘন্টায় কেউ বসতে পারবে না।"

না পারি ক্ষতি নেই, কিন্তু তারপরে তো রোদ পাবো। সে পাওয়া যে অনেকখানি। যাঁরা উচ্চ-হিমালয়ে এসেছেন, তাঁরা সবাই জানেন এখানে রোদের আরেক নাম জীবন।

আমরা তাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছি। মৃত্যুর শীতলতা থেকে জীবনের উষ্ণতায় পৌঁছতে চাইছি।

আজ আমরা দশজন। দু'জন গাইড ও আটজন সদস্য—অমূল্য সুশান্তবাবু শম্ভু সুব্রত দাদু পান্না রামনাথ ও আমি। ওসলা গাঁয়ে ফলে সিং ও রূপা সিং আমাদের পথপ্রদর্শক। খাওয়া ও জনপ্রতি দৈনিক দশ টাকা করে দিতে হবে ওদের। আর দিতে হয়েছে দু'জোড়া মোজা ও হান্টার শু।

ফতে এই পথে ধূমধার পেরিয়ে হরশিল গিয়েছে। শান্ত-শিষ্ট শক্ত-পোক্ত বেঁটে মানুষটি। বয়স বছর চল্লিশ। পরনে কম্বলের কোট-প্যান্ট, মাথায় গাড়োয়ালী টুপি, পিঠে নিজের বিছানাপত্র আর একখানি লাঠি। সে দাদুর সঙ্গে গল্প করতে করতে পথ চলেছে।

আর রূপা চলেছে আমার পাশে পাশে। বাইশ বছরের বলিষ্ঠ তরুণ—যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রূপ। তমসা উপত্যকার অধিবাসীরা প্রায় প্রত্যেকেই সুন্দর, কিন্তু রূপার মতো রূপবান ওদের মধ্যেও খুব বেশি নেই।

তার পোশাকও ফতে সিং-য়ের মতো। সে-ও আমাদের দেওয়া হান্টার-শু পরে নিয়েছে। তবে তার কোমরে একটা মস্ত দড়ি জড়ানো আর হাতে লাঠির বদলে একখানি কুড়াল। পিঠে একখানি মাত্র কম্বল। আশ্চর্য! একখানি কম্বল সম্বল করে ছেলেটা সাড়ে আঠারো হাজার ফুটে চলেছে!

রূপা কখনও ধূমধার-কান্দি গিরিখাত পার হয় নি। একবার শুধু ভেড়া চরাবার সময় ধূমধারের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল। সুতরাং সে আমাদের পথ-প্রদর্শক হয়ে আসে নি, এসেছে ফতে সিং-য়ের সহকারী রূপে। মজুরী কিন্তু দু'জনেরই সমান—দৈনিক দশ টাকা। ফতে একা একা আসতে রাজী হচ্ছিল না বলেই আমরা ওকে সঙ্গে আনতে বাধ্য হয়েছি। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, ছেলেটাকে সঙ্গে এনে ভালই করেছি। ওকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। সব চেয়ে বড় কথা এমন সদাহাস্যময় প্রাণচঞ্চল যুবক বড় বেশি দেখা যায় না।

বিশ্রামগৃহ থেকে উৎরাই পথ বেয়ে নেমে এলাম পুলের কাছে। পুলের গোড়া থেকে শুরু হল নতুন পায়ে-চলা পথ। খচ্চর চলাচলের উপযোগী পথটি বাঁ দিকের পুল পেরিয়ে চলে গিয়েছে হরকিদুন।

খচ্চরের পথ থেকে আমরা নেমে এলাম মানুষের পথে। এখন মানুষের, এর পরে হবে অমানুষের পথ।

পথের বাঁয়ে তমসা। অর্থাৎ আমরা তমসার ডানতীর দিয়ে এগিয়ে চলেছি দক্ষিণ-পূর্বে—স্বর্গারোহিণীর দিকে।

কিছুক্ষণ বাদে দিক পরিবর্তন করতে হয়। পথের প্রকৃতিও পরিবর্তিত। ডানদিকের চড়াই পথ ধরতে হল। ভালই হল, শরীরটা গরম হবে।

ওপারে হরকিদুনের পথটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে—সেদিন যেমন এই পথটিকে সুন্দর দেখাচ্ছিল ঐ পথ থেকে। সেদিন ভাবছিলাম আজকের কথা, আর আজ ভাবছি সেদিনের কথা।

বড্ড শীত-শীত করছে। করবেই তো। একে ঘন বনময় স্যাঁতসেঁতে পথ আর ঠান্ডা হাওয়া, তার ওপরে রোদ নেই। ডান দিকের গিরিশিরাটি এখনও সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ চড়াই ভেঙে সকাল সাড়ে আটটার সময় একটা উঁচু সমতল প্রান্তরে পৌঁছলাম। সকলেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু সমতল পেয়েও বিশ্রামের অবকাশ পেলাম না। নেতার নির্দেশ—"কেউ বসবে না, দেড়ঘন্টা হয় নি এখনও। তাছাড়া এখানে বসে কি-ই বা লাভ? এগিয়ে চলো, একেবারে রোদে গিয়ে বসবে।"

অতএব এগিয়ে চলি। প্রান্তরটি শুধু সমতল নয়, সবুজ ঘাসে ছাওয়া। তার দু'দিকেই পাইন দেওদার ফার ও আখরোটের বন। ওরা যেন এই সুন্দর সমতলের সদাজাগ্রত প্রহরী।

তমসার তীর থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছি। দেখতেও পাচ্ছি না তাকে। তবে তার শব্দটি কখনই হারিয়ে যাচ্ছে না। এই শব্দ শুনতে শুনতেই সেদিন গিয়েছিলাম যমদ্বার হিমবাহের সামনে, আজ চলেছি বান্দরপূঁছ হিমবাহে—তমসার প্রধান ধারা বুঁইসারা গাডের উৎসে।

প্রান্তরের যেখান দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি, সেখানে বড় গাছপালা কম, ঝোপঝাড়ই বেশি। সুতরাং তেমন স্যাঁতসেঁতে নয়। তবে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট ঝরণা পেরোতে হচ্ছে। ডান দিকের পাহাড়ী থেকে নেমে এসে বাঁ দিকের তমসায় গিয়ে পড়েছে।

রোদটাকে মনে হচ্ছে মরীচিকার মত—কাছে ডাকছে আর ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। অমূল্যর সঙ্গে সম্ভবতঃ সূর্যদেবের কোন গোপন চুক্তি হয়েছে—দেড়ঘন্টা পথ চলা শেষ হবার আগে তিনি কিছুতেই তাঁর কিরণমালাকে আসতে দেবেন না আমাদের কাছে।

বিশ্রামগৃহের বাইরে এসেই দেখা হয়েছিল স্বর্গারোহিণীর সঙ্গে। বনময় চড়াই পথে পা দেবার পূর্ব পর্যন্ত সে ছিল আমাদের সামনে। তার পরেই সে গিয়েছিল হারিয়ে। এখন আবার দেখতে পাচ্ছি তাকে। সে তেমনি কাছে ডাকছে আমাকে। ডাকবেই তো, আমি যে আজ আবার তার কাছে চলেছি।

আশ্চর্য, ওসলা থেকে রওনা হবার ঠিক দেড়ঘন্টা পরে দেখা হল রোদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে অমূল্য হেঁকে উঠল, "হল্ট!"

আমরা যে যেখানে পারলাম বসে পড়লাম।

বসল না কেবল মণ্ডল। কেমন করে বসবে? একে সমতল, তার ওপরে রৌদ্রস্নাত তৃণভূমি। সুতরাং সে বচনের বদলি সহকারী দিল বাহাদুরকে আদেশ করে, "নেট নিকালো!"

জাল হাতে পেয়েই মণ্ডল স্যুইপ্ শুরু করে দেয়। সে যে জুওলজিস্ট—ভারত সরকারের একজন কর্তব্যপরায়ণ গেজেটেড অফিসার।

দিলীপকুমারের কিন্তু ছুটোছুটি করাই সার হল, একটিও প্রজাপতি খুঁজে পেল না। অবশেষে ব্যর্থ জুওলজিস্ট এসে বসে পড়ে আমার পাশে, হতাশ স্বরে বলে, "হিমালয়ের প্রজাপতিগুলি দেখছি ভারী কুঁড়ে, বেলা বারোটার আগে ঘুম ভাঙে না বাবুদের।"

জয় বাহাদুর পাশের ঝরণা থেকে জল নিয়ে এলো। বিশ্রামের পরে জল খেয়ে সুস্থ হলাম। ইতিমধ্যে কুলিরাও এসে গিয়েছে। সবার শেষে এসে পৌঁছল ডাক্তার। হিমালয়ের দুর্গম পথে এই তার প্রথম পদযাত্রা। স্বভাবতই সে একটু ধীরে পথে চলেছে।

আবার শুরু হল পথ-চলা। সবার আগে চলেছে রামনাথ। রুক্‌স্যাকের 'বাকল'-এর সঙ্গে সে এল্যুমিনিয়ামের মগটি বেঁধে নিয়েছে। ফলে চলার সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ঘোড়ার গলায় ঘন্টা বাজছে।

রামনাথ। সুশান্তবাবুর সহকারী, বয়স বছর চল্লিশ। বিশ বছরের ওপর সে তাঁর সঙ্গে রয়েছে। সুশান্তবাবুর সঙ্গে সে-ও সারা ভারত ঘুরেছে। ক্যামেরায় ফিল্ম ভরা থেকে রান্না করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ রামনাথের নখদর্পণে। আদি বাড়ি বেনারস, এখন প্রায় বাঙালী হয়ে গেছে। লোকটি যেমন কর্মঠ, তেমনি উৎসাহী। তার মতো অনুগত সহকারী খুব বেশি পাওয়া যায় না।

বেশ বড় একটা পাহাড়ী নালা পেরোতে হল। না, জুতো ভেজাতে হয় নি। বিভাসরা বোধ হয় সেদিন যাবার সময় কয়েকখানি বড়-বড় পাথর ফেলে রেখে গিয়েছে। তারই ওপরে পা দিয়ে নির্বিঘ্নে ঝরণাটি পেরিয়ে এলাম।

স্বর্গারোহিণীকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে। সে-ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। কি ভাবছে কে জানে? কিন্তু আমি কি কোন কালে জানতে পারব না তার মনের কথা?

যাঁরা ভাবেন পাহাড় মূক, তার মুখে ভাষা নেই, আমি তাঁদের দলে নই। পাহাড় প্রতিনিয়ত কথা বলে। সে কথা বলে অমৃতলোকের কানে কানে। যাঁরা একবার সেই কথা শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা আর ঘরে ফিরতে পারেন নি। আমার দুর্ভাগ্য, আমি আজও হিমালয়ের সেই শাশ্বতবাণী অনুধাবন করতে পারলাম না। আর তাই বারে বারে আমাকে ফিরে যেতে হয় ঘরে। অসীমের অন্বেষণ ছেড়ে সীমার মাঝে, মুক্তির অনন্তলোক থেকে বন্ধনের বাহুডোরে।

পরশুদিন হরকিদুনের পথে যেমন বন-বিভাগের ঘর দেখেছিলাম, তেমনি দু'খানি খড় ও কাঠের ঘর হয়েছে এখানে। এ দু'খানিও জনহীন। একই কারণ, শীত আসছে, কুলিরা নিচে নেমে গিয়েছে।

এখানকার কাজ শেষ করে ওরা নেমে গেছে মোরি কিংবা তিউনি। শীতের কয়েক মাস সেখানেই কাজ করবে। সেখানেও যে ওদের এখন অনেক কাজ। সারা গ্রীষ্মকাল বসে ওরা এ অঞ্চলে যত কাঠ কেটেছে, তমসা সব বয়ে নিয়ে গিয়েছে সেখানে। এখন

সেগুলি চালান দেওয়া হচ্ছে।

স্বর্গারোহিণী মুখ লুকিয়েছে, আর সেই সঙ্গে ঘোমটা সরিয়েছে বান্দরপূঁছ পর্বতমালার উচ্চতম শৃঙ্গ ব্ল্যাক্ পিক্ বা কৃষ্ণচূড়া। ওরা কি লুকোচুরি খেলছে নাকি ?

কে এ প্রশ্নের জবাব দেবে আমাকে ? তার চেয়ে ওকেই দেখা যাক্—এ যাত্রায় তার সঙ্গে এই আমার দ্বিতীয় দেখা। সেদিন হরকিদুন যাবার সময় প্রথম দেখা হয়েছিল। তখন থেকেই সে কাছে ডাকছে আমাকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আজ আমি চলেছি তার কাছে।

সে-ও সুন্দর। কিন্তু স্বর্গারোহিণীর সঙ্গে এর সৌন্দর্যের পার্থক্য আছে। স্বর্গারোহিণী কমনীয়া, কৃষ্ণচূড়া করালী। সে স্নিগ্ধ, এ সমীহ। সে সুন্দর, এ সুমহান। কৃষ্ণচূড়া বিশাল ব্যাপক ও বিরাট।

সহজ ও সুগম পথ এখানেই শেষ হয়ে গেল। এবারে পাহাড়ের গা দিয়ে খাড়া উৎরাই পথে নিচে নামতে হবে। বনের ভেতর দিয়ে পথ। পথের মাটি নরম ও স্যাঁতসেঁতে। একটু অন্যমনস্ক হলেই আছাড় খাবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাবধানে নামতে হচ্ছে।

শ'তিনেক ফুট একটানা উৎরাই ভেঙে তমসার তীরে নেমে এলাম। সঙ্গমকে পেছনে ফেলে এসেছি। সুতরাং স্থানীয়দের কাছে এটি তমসা নয়, বুঁইসারা গাড়্। কিন্তু আমার কাছে তমসা শুধুই তমসা—যমুনার সখী তমসা, গাড়োয়াল হিমালয়ের অপরূপা উপনদী তমসা।

উৎরাই পথটি এসে শেষ হয়েছে একটি কাঠের পুলের গোড়ায়। সেই দোদুল্যমান পুলটি পেরিয়ে আমরা তমসার ডান তীরে এলাম। এলাম বুঁইসারা ও হরকিদুন নদীব মাঝখানের পার্বত্যময় ভূখণ্ডে। এই ভূখণ্ডেই স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গমালা। বান্দরপূঁছ পর্বতশ্রেণী ওপারে অর্থাৎ আমরা যে পারে ছিলাম এতক্ষণ।

ওপারে খাড়া পাহাড়, কিন্তু এপারে পাহাড় খানিকটা দূরে। তীরভূমি প্রায় সমতল। সুতরাং ভেড়াওয়ালারা এই পথেই ভেড়া চরাতে যায়।

সাড়ে দশটা বাজে। রূপা বলল—আমরা তিন মাইল এসেছি। তিন ঘন্টায় তিন মাইল—ভালই এসেছি। এবারে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক্। বাধা দেবার মতো কেউ নেইও এখানে। অমূল্য পেছিয়ে পড়েছে। সে ডাক্তার ও মণ্ডলকে নিয়ে আসছে।

পুলের গোড়ায় বড় একখানা পাথরে বসে পড়ি। রূপা জল আনতে যায়। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে তমসাকে দেখি। সত্যিই অপূর্ব ! একদিকে ঝোপঝাড় বোঝাই বনভূমি, আরেক দিকে বনময় খাড়া পাহাড়। তারই ভেতর দিয়ে তমসা নাচতে নাচতে নিচে চলেছে। সে যে ওপরে থেকে নিচে নামছে, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সে যে কৃষ্ণচূড়ার করুণাধারা, তাও বেশ বুঝতে পারছি।

জল খেয়ে যাত্রা করি। তমসার তীরে তীরে পথ। কখনও প্রস্তরময় বেলাভূমির ওপর দিয়ে, আবার কখনও বা খানিকটা উঠে এসে ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে। রূপা কুড়ুল নিয়ে আগে আগে চলেছে। গাছপালা কেটে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

তমসার তরঙ্গের মতই আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু পথ। উঠছি আর নামছি। আগেই বলেছি এদিকের পাহাড়গুলি দূরে বলে ভেড়াওয়ালারা এদিক দিয়েই যাওয়া-আসা করে। তাদের চরণরেখা ধরেই আমাদের পথ। পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরাও এই পথে এসেছেন। এসেছেন গিব্‌সন, এসেছেন গত বছরের কৃষ্ণচূড়া বিজয়ী ভারতীয় প্রতিরক্ষা আকাদেমীর অভিযাত্রীরা।

কৃষ্ণচূড়াকে সব সময়ে দেখতে পাচ্ছি। সে যেন আমাদের কাছে ডাকছে আর নিজে পেছিয়ে যাচ্ছে। আমরা তার মোহিনী মায়ায় মোহিত হয়ে মোহগ্রস্তের মতো চলেছি এগিয়ে।

সংকীর্ণ পথরেখার দু'পাশেই কাঁটাবন। রূপা তেমনি পথ পরিষ্কার করতে করতে চলেছে সবার আগে। সে পাহাড়ী নওজওয়ান, মোটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে নি। তবু ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়, "এবারে তুমি আমার রুক্‌স্যাকটা ধর, আর তোমার কুড়ালখানি আমাকে দাও।"

"কাহে কো?" রূপা কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। বলি, "না, মানে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।"

একটু হাসে রূপা। বলে, "এত সহজে পরেশান হয়ে পড়লে যে রোটি জুটবে না সাব্! আর আমি থাকতে আপনারা কেন জঙ্গল সাফ করবেন?"

সে তার নিজের কাজ করে চলে।

বাধা দিয়ে যখন কোন লাভ হবে না, তখন নীরবে ওকে অনুসরণ করাই ভাল। তাই করি। তবে রূপার ভাবনা মনে থেকে মুছে ফেলতে পারি না। ওর কথা ভাবতে ভাবতেই ওর প্রদর্শিত পথে এগিয়ে চলি।

রূপা শুধু সুদর্শন তরুণ নয়, সামান্য কিছু লেখাপড়াও জানে। সে ওসলার স্কুলে হিন্দী ও ইংরেজী লিখতে ও পড়তে শিখেছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এখন আর চর্চা করার সুযোগ পাচ্ছে না।

প্রশ্ন করেছিলাম—কেন, সময় পাচ্ছ না বুঝি?

রূপা জবাব দিয়েছে—না সাব, ফুরসত পাবো না কেন? ফুরসতের ঘটতী নেই।

—তাহলে? জিজ্ঞেস করেছি।

—পড়বার কিতাব পাই নি। স্কুলের মাস্টারজী যতদিন ছিলেন, ততদিন দু-একখানা কিতাব পেতাম, কিন্তু তিনি চলে যাবার পর থেকে আর পড়াশুনা করতে পারি নি।

কথাটা শুনে একদিকে যেমন জ্ঞানলাভের প্রতি রূপার আগ্রহের কথা জেনে খুশি হয়েছি, আরেক দিকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতি দেখে শিউরে উঠেছি।

ভারত একটি অনুন্নত ও দরিদ্র দেশ। এবং স্বাধীন হবার পরে জাতীয় আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবার পরেও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য কিছুমাত্র কমে নি। আর তার কারণ অশিক্ষা। একটি উন্নতিকামী দেশের প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা। সাধারণ মানুষের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষার সলতেটিকে সর্বদা জ্বালিয়ে রাখতে না পারলে, দেশের কোনরকম উন্নতি সম্ভব নয়।

অথচ এর জন্য খুব একটা অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না ওসলা গাঁয়ের কথাই ধরা যাক্। একজন শিক্ষাক ও ছোট একটি সাধারণ পাঠাগার হলেই এখানকার মানুষগুলো প্রকৃত স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

"ওরে ভাই, একটু জল খাওয়াতে পারিস?"

দাদুর কথায় রূপার ভাবনা হারিয়ে যায়। সে রূপাকেই বলছে কথাটা।

পথ পরিষ্কার করা বন্ধ করে রূপা তমসার দিকে তাকায়। কি যেন ভাবে একটু, তারপরে বলে, "নদী যে বহু নীচে। ওখানে নেমে জল আনতে গেলে, কম করেও আধঘন্টা লেগে যাবে। তার চাইতে একটু এগিয়ে চলুন। সামনে একটা ধারা আছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। আমরা ইতিমধ্যে তমসার তীর থেকে অনেকটা উপরে উঠে এসেছি।

মিনিট পনেরো হেঁটে একটি গুহার সামনে এলাম। রূপা জানায়, "ভেড়াওয়ালারা যাতায়াতের পথে এখানে রাত্রিবাস করে।"

তার প্রমাণও পাচ্ছি—গুহার বাইরে এখনও কিছু পোড়াকাঠ পড়ে আছে।

সে যাক্ গে। কিন্তু জল কোথায় ?

রূপা আশ্বাস দেয়, "থোড়া দূর।"

দূরত্বের ব্যাপারে ওদের এই 'থোড়া' শব্দটা একেবারেই অর্থহীন। তাছাড়া শুধু তো পিপাসা পায় নি, খিদেও পেয়েছে বেশ। বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে। অমূল্য নিশ্চয়ই পথে হট্ লাঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কোথায় ?

এখনও যে উনুনের ধোঁয়া পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি। না, ধোঁয়া নয়, ধারা। তাই বা কম কিসের ? পিপাসায় যে কণ্ঠনালি শুকিয়ে গিয়েছে।

পথের বাঁ পাশের পাহাড় থেকে একটি জলধারা নেমে এসেছে পথে। আমরা প্রাণভরে জল খেয়ে নিলাম। দাদুর ওয়াটার বট্‌লে 'অরেঞ্জ-স্কোয়াশ' ছিল। তার সঙ্গে জল মিশিযে কয়েক ঢোক খেয়ে নেওয়া গেল। শরীরটা সুস্থ হল।

দাদু পান্না রামনাথ ও আমি আগে আগে চলেছি। রূপা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। শুধু পথপ্রদর্শক নয়, সে এখনও পথিকৃৎ। পথ তৈরি করতে করতে পথ চলেছে। তার শ্রান্তি নেই, সে সদাহাস্যময়। বড় ভাল লাগছে ছেলেটাকে।

বান্দরপূঁছকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। সামনের কালো পাহাড়টা তাকে আড়াল করে রেখেছে।

মন খারাপের কিছু নেই। কতক্ষণ আর সে লুকিয়ে রাখবে কৃষ্ণচূড়াকে ? আমরা তো এখন তার কাছেই চলেছি।

আবার তেমনি খাড়া চড়াই। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে পথ। পাশে রডোডেনড্রনের জঙ্গল। কিন্তু পরশুর মতো আজও রডোডেনড্রন-গুচ্ছের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। নিজেদের দুর্ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিযে এগিয়ে চলি।

এখন বেলা সাড়ে বারোটা। পথের ধারে আরেকটি গুহা। এটিতেও মনুষ্যবাসের নিদর্শন পাচ্ছি। ওপরের চারণভূমিতে যাতায়াতের পথে মেষপালকরা নিশ্চয়ই রাত্রিবাস করে এখানে। তারা ছাড়া আর কারাই বা থাকবে এ গুহায় ? এ পথ তো সাধু-সন্ন্যেসীদের জন্য নয়।

এখন আর জলের কোন অভাব নেই। মাঝে মাঝেই ঝরণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে। সুতরাং পিপাসা পেলেই জল খেয়ে নিচ্ছি। উচ্চ হিমালয়ে পিপাসা বেশি পায়।

বেলা দেড়টা নাগাদ অর্থাৎ পুরো ছ'ঘন্টা পদচারণার পরে মামাদের পরিত্যক্ত অন্তর্বর্তী শিবিরে এলাম। ২৮শে সেপ্টেম্বর ওসলা থেকে রওনা হয়ে বিভাসরা এখানে এসে যাত্রার যতি টেনেছিল। কুলিরা সেদিন এখান থেকে ওসলা ফিরে গিয়েছিল। পরে এখান থেকেই তালাও শিবিরে মাল ফেরী করা হয়েছে। গতকাল রাতেও পণ্ডিত এবং মামা ওসলা থেকে এই পর্যন্ত এসেছিল। এখানে রাত্রিবাস করে আজ সকালে শিবির গুটিয়ে তারা তালাও শিবিরে চলে গিয়েছে। আমরা কিন্তু আজ আর তাঁবু ফেলব না

এখানে। এগিয়ে যাব তালাও শিবিরে।

সবই তো বুঝলাম কিন্তু হট্-লাঞ্চ কোথায় ? অমূল্য যে বলেছিল, এখানে ভরপেট ডাল-ভাত পাওয়া যাবে ! না, কাছাকাছি কোথাও রান্নার আয়োজন দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে কি লাঞ্চয়ের কথাটাও সেই রোদ দেবার মতো ব্যাপার নাকি ?

কাকে জিজ্ঞেস করি ? ডাক্তার ও মণ্ডলকে নিয়ে আসছে অমূল্য। সে অনেক পেছনে পড়ে গেছে। কিন্তু এদিকে যে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

ওপর থেকে একটা লোক আসছে দেখতে পাচ্ছি। কে ? আমাদের লোক কি ? এখানে এখন অন্য কে-ই বা হতে পারে ?

হ্যাঁ, আমাদেব লোক। জয় বাহাদুর বিস্কুট ডালমুট ও চা নিয়ে এসেছে। পোড়া পেটের জ্বালা নিবৃত্ত হবে না এতে। তাহলেও হাত বাড়াই। বিস্কুট ও ডালমুট বিতরণ করে জয় বাহাদুর চা গরম করার আয়োজনে লেগে যায়।

চা খাওয়া হয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াই। অমূল্যরা এসে পৌঁছয় নি এখনও। জয় বাহাদুরকে রেখে রওনা হই আমরা। বেলা দু'টো বেজে গিয়েছে।

তেমনি ঘাস আর কাঁটাবনে ছাওয়া চড়াই পথ। পথিকৃৎ রূপা যথারীতি তার কাজ করে যাচ্ছে। সে চলেছে সবার আগে।

রডোডেনড্রন ক্রমেই কমে আসছে, তার জায়গা দখল করছে ভুজগাছ। অর্থাৎ আমরা দশ হাজার ফুটের ওপরে এসে গিয়েছি।

কৃষ্ণচূড়া কিন্তু দেখা দিয়েছে অনেকক্ষণ। তাকে দেখে দেখেই পথ চলছি। তার প্রেরণা না পেলে বোধ হয় এতটা পথ আসতে পারতাম না একদিকে।

ইতিমধ্যে পথের প্রকৃতি পালটে গিয়েছে। ঘাসবন নয়, বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে পথ চলেছি এখন—বনপথ।

বনের সীমা শেষ, শুরু হল তৃণভূমি। সামনে সুবিশাল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গিয়ে একটি প্রায় সমতল উপত্যকায় মিশেছে। সে-ও তৃণাচ্ছাদিত। তারই কেন্দ্রস্থলে তালাও বা হ্রদ। চতুর্ভুজাকৃতি একটি পরম রমণীয় সরোবর। তার একদিকে সবুজ পাহাড়, একদিকে সবুজ বন আর দু'দিকে সবুজ সমতল। সমতল গিয়ে তমসায় শেষ হয়েছে। পাশের পাহাড় থেকে কয়েকটি ঝরণা এসে সরোবরে পড়েছে আর সরোবর থেকে একটি ধারা গিয়ে তমসায় পড়ছে।

তমসার ওপারে খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় মাথায় তুষারের প্রলেপ। আর তাদের সবার মাথায় ওপরে উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া—ভয়ঙ্কর ও সুন্দরের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। মনে হচ্ছে সাদা-কালোয় মেশানো একটা প্রকাণ্ড ঈগল ঠোঁট ফাঁক করে বসে আছে, এখুনি শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সরোবরের শান্ত সলিলে তার প্রতিবিম্ব পড়েছে।

হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি কৃষ্ণচূড়ার দিকে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম কিরণে তার শুভ্র শিখর সোনালী রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে।

সোনা শুধু কৃষ্ণচূড়ার শিখরে নয়, সোনা ছড়িয়ে রয়েছে বাঁ দিকের স্বর্গারোহিণীর শৃঙ্গমালার শিখরে শিখরে। বহুক্ষণ বাদে আবার দেখা হল স্বর্গারোহিণীর সঙ্গে। তারই গিরিশিরা ছুঁয়ে আমাদের আগামীকালের পথ।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা পরে হবে, এখন বর্তমানের কথা হোক্। চমক ভাঙার পরে

আবার পথ চলা শুরু করি। সবুজ গালিচার মতো কোমল দূর্বাদলের ওপর দিয়ে পথ। রঙ-বেরঙের ছোট ছোট ফুলে-ভরা প্রান্তর। এ প্রান্তরটির নামও বুঁইসারা, উচ্চতা ১১,৫০০ ফুট।

দূরে উপত্যকার শেষে তমসার কাছে আমাদের তাঁবু পড়েছে। একটি বড় ও গুটিছয়েক ছোট ছোট তাঁবু। বড়টি মেস টেন্ট, নিজেদের তৈরি সাদা রঙের তাঁবু। ছোটগুলি রঙিন—উত্তরকাশীর 'ডায়াস মেমোরিয়াল ফান্ড' থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে।

অপেক্ষামান অভিযাত্রীরা দেখতে পায় আমাদের। তারা হাত নাড়ে, আমরা হাত নাড়ি। তারা চিৎকার করে, আমরাও চিৎকার করি।

রঙিন উইন্ড-প্রুফ পরে তিনজন সহযাত্রী ছুটে আসছে এদিকে। না, তিনজন নয়, চারজন। লালুও আসছে ওদের সঙ্গে। না, ঠিক সঙ্গে নয়। সে আসছে ওদের অনেক আগে, বিদ্যুৎবেগে ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে।

এসে পড়ে সে। আর এসেই গায়ে লাফিয়ে উঠে আমাদের আদর করতে শুরু করে—গাল চাটতে থাকে। আনন্দে ও উত্তেজনায় সে প্রায় পাগলের মতো করছে। কেনই বা করবে না? আজ যে চারদিন বাদে সে দেখা পেল আমাদের। বিভাসের সঙ্গে লালু এসেছিল এখানে।

মামা পন্ডিত ও সুশীল কাছে আসে। তারা আমাদের রুক্স্যাক কাঁধে নেয়। কুশল বিনিময়ের পরে এগিয়ে চলি শিবিরের দিকে—তালাও শিবিরে।

ন'ঘন্টায় দশ মাইল পদচারণার পরে শিবিরে পৌঁছলাম। বিভাস ও প্রাণেশ আমাদের সহাস্যে আমন্ত্রণ জানায়। অমূল্যরা এসে গেছে শুনে বিভাস নিশ্চিন্ত হয়। হবারই কথা, তার নেতৃত্বের দায়িত্ব শেষ হল।

সুশান্তবাবু সহসা বলে উঠলেন, "Ideal Camp site!"

পান্না সমর্থন করে তাঁকে, "ঠিকই বলেছেন।"

আমিও মাথা নাড়ি। বিভাসকে বলি, "সত্যি তোকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো, ভেবে উঠতে পাচ্ছি না। তোরই জন্য আজ এমন একটি চমৎকার জায়গায় আসতে পারলাম।"

বিভাস নীরবে হাসছে। হয়তো বা গৌরবের হাসি। সে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতেই পারে। কারণ তারই পরিকল্পনায় আয়োজিত হয়েছে এই অভিযান—তমসা উপত্যকা অভিযান!

॥ চোদ্দ ॥

সকালে ঘুম ভাঙল সেতীর চিৎকারে। সে তো কখনও এত জোরে কথা বলে না। তাড়াতাড়ি উঠে বসি।

সবই শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। এক পক্ষের নেতা সেতীরাম অপর পক্ষের একমাত্র বক্তা দাদু—আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার-কাম-স্টোর কিপার।

দাদু বলছে—তুই বিশ্বেস কর্ সেতী। দৈনিক এক বান্ডিলের বেশি বিড়ি দিলে পরে

টান পড়ে যাবে।

সেতী রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করছে—এক বাণ্ডিল বিড়ি আমি কেমন করে এতগুলো লোকের মধ্যে ভাগ করে দেব ?

—সিগারেট দে। দাদু পরামর্শ দিচ্ছে—আমি বিশ প্যাকেট সিগারেট দিচ্ছি।

—সিগারেট খেতে পারে না ওরা। সেতী দাদুর প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। —সিগারেট খেলে 'খাশি' হয়।

সিগারেট যে বিড়ির চেয়ে ফুসফুসের বেশি ক্ষতি করে সে খবর ওদের জানার কথা নয়। ওরা জানে না যে বিড়িতে বেশি নিকোটিন থাকার জন্য জোরে টানা যায় না। সিগারেটে বিড়ির চেয়ে নিকোটিন কম কিন্তু শর্করা বেশি। ফলে সিগারেটের টান গভীরতর হয় এবং নিকোটিন ভেতরে গিয়ে ফুসফুসের ক্ষতি করে। ওরা শুধু জানে সিগারেট খেলে 'খাশি' হয়।

জামা-জুতো পরে বাইরে বেরিয়ে আসি। সেতীকে বলি, "বিড়ির সঙ্গে মাঝে মাঝে সিগারেট খেতে বল কুলিদের। কাশি হলে ডাক্তার ওষুধ দেবে'খন।"

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় কুলিদের। ওরা যে 'কফ্ সিরাপ' খেতে বড়ই ভালোবাসে। তাই সানন্দে সিগারেট গ্রহণ করে। নিশ্চিন্ত হই।

না। নিশ্চিন্ত হওয়া বোধহয় আজ আর অদৃষ্টে নেই। এক সমস্যার সমাধান হতেই আরেক সমস্যা। এবারে মণ্ডল।

মণ্ডল সহসা আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। করুণকণ্ঠে বলে, "শঙ্কুদা, প্রাণেশদাকে একটু বলে দিন না, আমার এই উইন্ডপ্রুফ্ আর স্লীপিং-ব্যাগটা পালটে দেবেন!"

"কেন বলো তো ?"

"আজ্ঞে একদম শীত মানছে না, তার ওপরে এয়ার-ম্যাট্রেসটা ফুটো।"

"ওর কাছে ভাল কিছু আছে কি ?"

"কাছে হয়তো নেই। উনি সবই সদস্যদের দিয়ে দিয়েছেন।"

"তাহলে ?"

"মানে কারও কাছে থেকে আমার দুটোর বদলে যদি দু'টো ভাল জিনিস পাওয়া যায় আর এয়ার-ম্যাট্রেসের ফুটোটা একটু সারিতে দেওয়া হয়।"

প্রথম অনুরোধটা একটু অযৌক্তিক, তাহলেও মণ্ডলকে কথা দিই, "প্রাণেশ কুলিদের মাল ঠিক করছে, সে তাঁবুতে এলে আমি বলছি তাকে।"

"থ্যাঙ্ক্ ইউ শঙ্কুদা।"

"কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।" আমি বলি।

"কি বলুন তো ?" মণ্ডল জিজ্ঞেস করে।

"তোমার অফিস থেকে কি তোমাকে এসব কিছুই দিয়ে দেয় নি ?"

"না।" মণ্ডল ঠোঁট উল্টে জবাব দেয়।

"কিন্তু আমি জানি—এগুলি সবই আছে তোমাদের।"

"তা আছে। কিন্তু আমাকে দেয় নি।"

"কেন ? তোমার সঙ্গে কি স্টোর-কিপারের ঝগড়া-টগড়া আছে নাকি ?"

"না, না। ঝগড়া থাকবে কেন ?" মণ্ডল প্রতিবাদ করে, "মানে আসার আগে তাড়াহুড়ার জন্য আমি এদিকটায় ঠিক খেয়াল রাখতে পারি নি। ওরা যা দিয়েছে, তাই

নিয়ে চলে এসেছি।"

"তাহলে তাঁরা অতবড দু'টো ট্রাঙ্কে কি দিয়েছেন?"

মণ্ডলের সঙ্গে তার দপ্তরের নাম-লেখা দুটি বড় বড় ট্রাঙ্ক রয়েছে। এখন পর্যন্ত তাকে সে দুটি খুলতে দেখি নি। কিন্তু ট্রাঙ্ক দুটির দিকে তার নজর কিছু কম নয়। বিভাসকে বলে দু'জন জওয়ান কুলির ব্যবস্থা করেছে। প্রতিদিন সকালে রওনা হবার সময় সে তাদের সাবধান করে—"দেখো ভাই, ইয়ে বাকস মত গিড়ায়গা। অন্দরমে বহুত ঠুনকো চিজ হ্যায়। টুঠ জায়েগা তো হমরা ডিরেকটর সাব্ হমকো শূলমে চড়ায়গা।"

সে যা-ই হোক, মণ্ডল কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারে না। শুধু মাথা নেড়ে বলে, "মানে, এই আমার কালেক্শনের সাজ-সরঞ্জাম ও কাগজপত্র রয়েছে! তবু এ নিয়ে আর প্রশ্ন করি না। মণ্ডল খুশি হয়।

তালাও শিবির মূল শিবির নয়। এটিকে আমরা অন্তর্বর্তী শিবির বা 'ইন্টারমিডিয়েট ক্যাম্প্' বলছি। অবশ্য এ অভিযানে সব শিবিরকেই অন্তর্বর্তী শিবির বলা যেতে পারে। তাহলেও কাজের সুবিধার জন্য আমরা যথারীতি শিবিরগুলোর নামকরণ করে যাবো। আমাদের মূল-শিবির বা 'বেস্ ক্যাম্প' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বুঁইসারা গাড্ বা তমসার উৎসের কিছু ওপরে, প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচুতে। বিভাসরা সেখানে একরাত কাটিয়ে আবার নেমে এসেছে এখানে। আজ এখানকার শিবির গুটিয়ে সবাই চলে যাচ্ছি সেখানে। আজ ২রা অক্টোবর।

বাংলার বে-সরকারী পর্বতারোহণে আজকের তারিখটির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে—আনন্দ ও বেদনা মিশ্রিত ভূমিকা। আট বছর আগে আজকের দিনেই শহীদ হয়েছেন অণিমাদি। আর দশ বছর আগে আজকের তারিখেই নন্দনকাননে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের নীলগিরি (গাড়োয়াল) পর্বতাভিযানের মূল-শিবির।

সে অভিযান সফল হয়েছে। * সেই সফলকাম অভিযানের নেতা অমূল্যই আজও আমার নেতা।

আজ সেই একই তারিখে আমরা সকলে একসঙ্গে মূল-শিবিরে যাচ্ছি। আমাদের এ অভিযানও সফল হবে। আমরা নিশ্চয়ই নিরাপদে ধুমধার-কান্দি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে পৌঁছব হরশিল।

কিন্তু আজকের তারিখেই যে অণিমাদি—। না, সেকথা ভাবব না এখন। দুর্ঘটনার কাহিনী দুর্গমের অভিযাত্রীকে দুর্বল করে দেয়। দুর্বলের জন্য হিমালয়ের পথ নয়।

ঘি ও আচার সহযোগে খিচুড়ি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করা গেল। তারপরে বেরিয়ে পড়লাম মূল-শিবিরের পথে। এখন সকাল সোয়া ন'টা।

সুশান্তবাবু ছবি নিলেন। আমরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। বড বড ঘাসে-ছাওয়া চড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠছি। ডাইনে স্বর্গারোহিণীর গিরিশিরা, বাঁয়ে তমসা। তমসার ওপারে কৃষ্ণচূড়া, চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে।

স্বর্গারোহিণীকে দেখতে পাচ্ছি না। অথচ তারই গা ছুঁয়ে আমাদের পথ। কাছে বলেই হয়তো তাকে দেখা যাচ্ছে না। খুব কাছের জিনিস যে দেখা যায় না অনেক সময়—চেনা তো দূরের কথা।

তালাও এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলটিকে কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে। আমরা তাই মাঝে মাঝেই পেছনে তাকাচ্ছি। যদিও জানি, পর্বতাভিযাত্রীদের পক্ষে

পেছুটান থাকা সুখকর নয়।

উত্তর-পূর্ব দিকেই এগিয়ে চলেছি। তমসার তীরে তীরে পথ চলা এখনও শেষ হয় নি আমার। তবে মাত্র ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই আমরা তার উৎসে পৌঁছে যাব। সেই সঙ্গে শেষ হবে তমসার তীরে তীরে পথ চলা।

যথারীতি রূপা রয়েছে সামনে। আজ অবশ্য তাকে আর কুড়ুল চালাতে হচ্ছে না। গতকাল তালাও-য়ের তীরে আমরা বনভূমিকে বিদায় দিয়েছি। এখন ঘাসের ওপর দিয়ে পথ। আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে যাওয়া একটা তৃণাচ্ছাদিত টিলার ওপরে উঠছি।

এখনও ঘাস আর মাটি রয়েছে। এর পরে আসবে পাথর—শুধুই পাথর। আর অবশেষে বরফ—অন্তহীন বরফ।

প্রাণেশ বিভাস শম্ভু নির্মল দেশাই ও সুশীল এগিয়ে গেছে শেরপাদের সঙ্গে। লালুও গিয়েছে ওদের দলে। সে সর্বদা প্রথম সারির সদস্য। আমার সঙ্গে রয়েছে দাদু রামনাথ পণ্ডিত মামা পান্না সুশান্তবাবু ও মণ্ডল। অমূল্য ও বিজীন্দর ডাক্তারকে নিয়ে পেছনে আসছে। ডাক্তারের পায়ের ব্যথাটা আজও কমে নি। সে আস্তে আস্তে হাঁটছে।

আমরাও ধীরে ধীরে পথ চলেছি। সুশান্তবাবু তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি নৃতত্ত্ববিদ নই। তবে বিগত বিশ বছর যাবৎ নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগে ক্যামেরাম্যানের চাকরি করছি। চাকরির প্রয়োজনে ভারত-ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে আমার। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার ছবিই বেশি করেছি।

"এই অভিযানে অংশ নিয়ে অবশ্য দু রকমের কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছি। একটি তমসা উপত্যকার মানুষদের নিয়ে ছবি করার, আরেকটি পর্বতাভিযানের ছবি করবার। দুটি সুযোগেরই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করছি।

"তমসাতীরের মানুষদের কথা বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের জীবনযাত্রার যথেষ্ট মিল রয়েছে। চেহারা পোশাক বাড়িঘর, চাষের কাজ, পশুপালন প্রভৃতির পদ্ধতি গাড়োয়ালের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের মতই। কিন্তু আপনারা জানেন, এদের লৌকিক দেবতারা ভিন্ন। দুর্যোধন এবং কর্ণ এই উচ্চ-তমসা উপত্যকার প্রধান লৌকিক দেবতা।"

আমরা মাথা নাড়ি। সুশান্তবাবু বলতে থাকেন, "কর্ণের মন্দির কিন্তু মাত্র একটি—নৈটয়ারের কাছে দেওড়া গ্রামে। আর নৈটয়ার ছাড়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই রয়েছে দুর্যোধনের মন্দির। এঁরা দুর্যোধনকে বলে সুযোধন।

"হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতই উচ্চ-তমসা উপত্যকার মানুষরাও দরিদ্র। তবে খাওয়া-পরার জন্য এঁরা সমতলের খুব একটা মুখাপেক্ষী নয়। ধান যব গম রামদানা মন্ডুয়া প্রভৃতির ফসল বেশ ভালই এখানে। নুন চিনি কেরোসিন ও রান্নার তেল ছাড়া আর বড় একটা কিছু দরকার হয় না ওদের।"

"আচ্ছা, কোন তৈলবীজই কি হয় না এখানে?" মাঝখান থেকে পান্না প্রশ্ন করে সুশান্তবাবুকে।

সুশান্তবাবু বলেন, "হয়। হবে তা পরিমাণে অত্যন্ত কম এবং তেল তৈরি করাও প্রচুর শ্রমসাপেক্ষ।"

"তার নাম কি?"

"চল্লি। দেখতে অনেকটা সরষেরই মতো।"

"কেমন করে তেল তৈরি করতে হয় ?"

"প্রথমে চল্লির দানাগুলাকে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নেয়। তারপরে গরম জল মিশিয়ে একটা 'কেক্' তৈরি করে। সেই কেক্‌টিকে একটি কাঠের পাত্রে রেখে অল্প অল্প গরম জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দু'হাতে ডলতে থাকে।"

"তেলটা কেমন ?"

"খুবই ভাল, বিশেষ করে গায়ের চামড়ার পক্ষে। তাই ওঁরা সাধারণতঃ নবজাত শিশুদের এই তেল মাখান।" একবার থেমে সুশান্তবাবু আবার বলতে থাকেন, "হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতই তমসা উপত্যকার সব চেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষা ও চিকিৎসা। এই উপত্যকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে অবিলম্বে অন্তত ডজনখানেক স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার।"

থামতে হল সুশান্তবাবুকে। সামনে একটা ভয়ানক ধস ! যে তৃণাচ্ছাদিত টিলাটির ওপর দিয়ে আমরা এতক্ষণ পথ চলেছিলাম, সেটি এখানে সহসা শেষ হয়ে গেছে। এখান থেকে শুরু হয়েছে প্রশস্ত ও গভীর একটা খাদ। সেই খাদ পেরিয়ে ওপারের গিরিশিরায় গিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু যে জায়গাটি দিয়ে খাদে নামব, সেটি সম্পূর্ণ ধসে গিয়েছে। শুধু এপারে নয়, ওপারেও ধস নেমেছে।

প্রাণেশ বিভাস ও শেরপারা এগিয়ে গিয়েছে, অমূল্য ও সেতীরাম রয়েছে পেছনে। কার সাহায্যে আমরা এখন এই ধস পেরিয়ে যাই !

সহসা রূপা উঠে আসে নিচের থেকে। বলে, "সাব্, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে।" তার কণ্ঠে অনুশোচনা।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। তাই প্রশ্ন করি, "কি ভুল ?"

"আমি আগেই নেমে গিয়েছিলাম, আপনাদের কথা একেবারে খেয়াল ছিল না। আপনারা যারা ধস পেরোতে পারবেন না, তাঁদের এক এক করে পিঠে নিয়ে আমি ওপারে পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

ওর কথা শুনে হাসি পাচ্ছে আমাদের। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারার আগেই সে আমার সামনে এসে বসে পড়ে। বলে, "আপনিই প্রথম আসুন সাব্। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি এসে ক্যামরা সাব্‌কে নিয়ে যাচ্ছি।"

ক্যামরা সাব্ মানে সুশান্তবাবু।

আমরা দুজন যে দুর্বলতম সদস্য, এটা বুঝতে বাকি নেই রূপার। তাই হেসে বলি, "ওরে পাগল, পিঠে নিতে হবে না, একখানা হাত ধরলেই আমরা অনায়াসে ধস পেরোতে পারব।"

"গির্ যায়েগা সাব্।"

"না, না, পড়ব না।"

অনেক বলা-কওয়ার পরে রূপা শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়। তার হাত ধরে আমরা একে একে সেই ভয়ানক ধস পেরিয়ে আসি।

এপারে মাটি নেই। শুধুই পাথর। পাথর ডিঙিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা গ্রাবরেখার উপর দিয়ে চলেছি। মাটি নেই, কিন্তু ঘাস আছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়েছে।

তমসার তীর থেকে অনেকখানি বাঁয়ে সরে এসেছি। তবে তার শব্দটি এখনও যায়

নি হারিয়ে। আজ আটদিন ধরে সর্বক্ষণ শব্দটা শুনে আসছি। কিন্তু আর কিছুক্ষণ বাদেই এই সুমধুর ধ্বনিটি স্তব্ধ হয়ে যাবে। ভাবলেই মনটা কেমন ভারী হয়ে ওঠে।

বাঁয়ে বান্দরপূঁছ, ডাইনে স্বর্গারোহিণী—দুই তুষারাবৃত গিরিশ্রেণী। কিন্তু কোন একটি শিখরকেই এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। মেঘের ওড়নায় মুখ ঢেকে আছে। অথচ এখানে বেশ কড়া রোদ।

রূপার সঙ্গে আমি এবং পান্না এগিয়ে এসেছি। সুশান্তবাবুরা আস্তে আস্তে পেছনে আসছেন।

পান্না অর্থাৎ আমাদের সহকারী কোয়ার্টার মাস্টার পান্নালাল ভদ্র এই প্রথম পর্বতাভিযানে এলো। তেত্রিশ বছরের বিচক্ষণ ও উৎসাহী যুবক। সে একজন ব্যবসায়ী এবং 'বেঙ্গল স্পাইস ডিলার্স এসোসিয়শনে'র যুগ্ম সম্পাদক। পান্না বিবাহিত ও একটি পুত্রের পিতা। সে শিবপুরে থাকে।

বছর দুয়েক আগে রমা ঘোষ দস্তিদার নামে আমার এক পর্বতারোহিণী ভাইঝি ওকে আমার অফিসে নিয়ে আসে। পান্নার স্ত্রী সবিতা মাতৃহারা রমার মাসি হয়। পান্নার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভাল লাগে আমার। আমি ওকে দাশরথির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। দাশুর মারফতে অমূল্য বিভাস এবং পন্ডিতের্র সঙ্গে পান্নার পরিচয় হয়। নিজের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা দিয়ে সে নিজেকে এই অভিযানের দলভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে।

চলতে চলতে প্রশ্ন করি পান্নাকে, "আচ্ছা, তুমি পর্বতাভিযানের প্রতি আকৃষ্ট হলে কেন?"

"আপনাদের বই পড়ে ও হিমালয়কে দেখে।"

"তুমি কবে প্রথম হিমালয়কে দেখ?"

"খুব ছোটবেলায়। বাবার সঙ্গে সেবারে হিমালয়ে এসেছিলাম। তাঁরই হাত ধরে পথ চলার সময় দূরের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম—'আমি কি কখনও যেতে পারব না ওদের কাছে!' সেই থেকেই আমি পর্বতারোহণের প্রতি একটি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে আসছি।"

"অভিযানে এসে তোমার কেমন লাগছে?"

"খুব ভাল। হিমালয় সুন্দর কিন্তু সুন্দরতর তার মানুষ। তমসার উপত্যকার এই অতিথিপরায়ণ সহজ ও সরল মানুষগুলোর কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হব না। বিস্মৃত হব না এই রোমাঞ্চকর পদযাত্রার কথা ও কাহিনীকে।"

"তাহলে তোমার মনে এই অভিযানের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে?"

"নিশ্চয়ই।" পান্না পুলকিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, "দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও হতাশায় এই অভিযানের মধুর স্মৃতি আমার মনে প্রতিনিয়ত প্রেরণা যোগাবে। তমসা উপত্যকার অপরূপ রূপ আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।"

আর কোন প্রশ্ন করতে পারি না পান্নাকে। সামনের দিকে নজর পড়তেই শিবির দেখতে পাই—আমাদের মূল-শিবির।

কথায় কথায় কখন যে তমসার উৎস ছাড়িয়ে এসেছি খেয়াল করি নি। এখন আর তার সেই সুমধুর প্রণবধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না। মনটা খারাপ হয়ে যায়। বিদায় বেলায় দেখা হল না তার সঙ্গে। আর কি তাহলে সেই অপরূপা উপনদীর সঙ্গে দেখা হবে না আমার?

না। আমরা তো আর ফিরে যাব না তার তীরে। ধুমধার-কান্দি পেরিয়ে ভাগীরথী উপত্যকায় উপনীত হব। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মানুষ আমরা তাই গঙ্গার তীর ধরে ঘরে ফিরে যাব।

কিন্তু তমসা কিংবা গঙ্গার কথা ভাবার আর সময় পাই না। দূর থেকে দেখতে পেয়েই লালু ছুটে এসেছে কাছে। বার বার লাফিয়ে গায়ে উঠছে! আদরে আদরে সে আমাকে অস্থির করে তুলেছে।

স্বর্গারোহিণীর ঢালু গিরিশিরা বেয়ে আমরা এখন তার পাদদেশে পৌঁচেছি। ছোট একটি প্রায় সমতল পাথুরে প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূল-শিবির। রূপা বলছে এ জায়গাটির নাম কেয়ার-কোটি। উচ্চতা ১২,০০০ফুটের মতো।

আমাদের বাঁয়ে স্বর্গারোহিণী, ডাইনে বান্দরপূঁছ হিমবাহ। কিন্তু তাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না এখান থেকে। হিমবাহ বাহিত শিলাস্তূপের প্রাচীর আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। বান্দরপূঁছ হিমবাহ অর্থাৎ যে তুষার-সমুদ্র তার হৃৎপিণ্ড গলিয়ে সৃষ্টি করেছে তমসার উচ্ছ্বসিত ধারাকে, তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বান্দরপূঁছ পর্বতমালা ও তার গিরিশিরাকে। এই গিরিশিরার ওপর দিয়েই ধুমধারের পথ—আমাদের পথ।

দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণচূড়া ও স্বর্গারোহিণী। তাদের উভয়েরই মাথায় মেঘের ঘোমটা। উভয়েই অতন্দ্র-প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের শিবিরের দু'পাশে।

এখন বেলা সাড়ে বারোটা। তার মানে তালাও থেকে এখানে আসতে আমাদের পৌনে চার ঘণ্টা লেগেছে। দূরত্ব চার থেকে পাঁচ মাইল। কুলির অভাবের জন্যই এত কাছাকাছি শিবির করতে বাধ্য হয়েছি। পনেরোটি বোঝা পড়ে রয়েছে তালাও শিবিরে! যে কুলিরা প্রথম মাল নিয়ে আসবে, ডবল মজুরির লোভ দেখিয়ে তাদের আবার পাঠাতে হবে সেই মাল আনতে।

বেশ কড়া রোদ উঠেছে। রৌদ্রস্নাত শিবিরে শুধু কামি ও শম্ভু রয়েছে। কামি চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত আর শম্ভু বসে রয়েছে তাঁবুর সামনে। দোরজি ও পাসাংকে নিয়ে প্রাণেশ ও বিভাস রাস্তা দেখতে ওপরে গিয়েছে।

শম্ভুর পাশে এসে বসি। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল স্বর্গারোহিণীর দিকে। জিজ্ঞেস করি, "কি দেখছ?"

মুখ ঘোরায় শম্ভু। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, "দেখছিলাম –How the clouds are kissing the peaks and how the peaks are trying to kiss the sky."

প্রাণেশরা ফিরে এলো ওপর থেকে। নিচের থেকেও একে একে আসছে সকলে। মণ্ডল এবং সুশান্তবাবু এসে গেলেন। বিজীন্দর ও রূপা তাঁদের সঙ্গে ছিল। কুলিরাও আসতে আরম্ভ করেছে। কেবল আসছে না অমূল্য। ডাক্তারকে নিয়ে আসছে সে। ডাক্তার কি অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি?

কাউকে পাঠানো দরকার। কিন্তু কে যাবে? সকলেই শ্রান্ত।

কথাটা কানে যেতেই লাফিয়ে উঠল রূপা। বলল, "আমি যাচ্ছি সাব্! ডাক্তারসাবকে নিয়ে আসছি।"

যেমনি বলা তেমনি কাজ। একখানি আইস-এক্স নিয়ে সে লাফাতে লাফাতে নিচে

নেমে গেল।

চা-বিস্কুট ও বিড়ি ঘুষ দিয়ে বিভাস ও প্রাণেশ শেষ পর্যন্ত কুলিদের মানভঞ্জন করতে সমর্থ হল। তারা ফেলে আসা মাল ও জ্বালানী কাঠ আনতে চলে গেল।

একটা 'মেস্-টেন্ট' ও চারটি 'থ্রি-মেন টেন্ট' টাঙানো হয়েছে। তৈরী করা হয়েছে দু'টি ত্রিপলের ছাউনি—কুলিদের রাতের আস্তানা।

বেলা আড়াইটের সময় অমূল্যরা এসে পৌঁছল। না, বৃথাকে বৃথাই পাঠানো হয়েছিল। ডাক্তার মোটেই অসুস্থ হয়ে পড়ে নি। পায়ের ব্যথার জন্য আস্তে আস্তে পথ চলেছে মাত্র।

ব্যাপারটা অমূল্যর চোখ এড়ায় না। প্রাণেশকে জিজ্ঞেস করে সে, "তোমার উইন্ড-প্রুফ কোথায় ?"

"মণ্ডলদাকে দিয়েছি।"

"কেন মণ্ডলের উইন্ড-প্রুফ নেই ?"

"আছে। সেটা একটু পুরনো বলে আমারটা দিয়েছি। রাতে আমি ওনারটা নিয়ে নেবো।"

"কেন অফিস থেকে মণ্ডলকে ইকুইপ্‌মেন্ট দেয় নি ?"

"না।"

"তা তো হতে পারে না, তাকে 'ডিপার্টমেন্ট অফিসিয়ালি ডেপিউট' করেছে।" একটু থেমে কি যেন ভাবে অমূল্য। তারপরে জিজ্ঞেস করে "তোমরা কি ওর ট্রাঙ্ক খুলে দেখেছো ?"

"না।" প্রাণেশ উত্তর দেয়।

"মণ্ডল!" অমূল্য হাঁক দেয়।

মেস্-টেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে মণ্ডল। অমূল্যর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "আমাকে ডাকছেন অমূল্যদা ?"

"হ্যাঁ, তোমার ট্রাঙ্ক দুটো একটু খোলো তো।"

অমূল্যর অনুমান মিথ্যে নয়। মণ্ডল শুধু ট্রাঙ্ক দু'টির তদারকি করেছে এতদিন, ভেতরে কি আছে খুলে দেখে নি একবারও। একটি ট্রাঙ্কে এয়ারম্যাট্রেস, স্লীপিং-ব্যাগ, উইন্ড-প্রুফ ও ফেদার জ্যাকেট প্রভৃতি পর্বতারোহীর যাবতীয় পোশাক পাওয়া গেল।

আরেকটিতে বই কাগজ এবং ওষুধপত্রের সঙ্গে পাওয়া গেল—'পেপারওয়েট', 'ব্লটার' ও জুতোর ব্রাশ প্রভৃতি যা আজ পর্যন্ত কোন পর্বতারোহী পর্বতারোহণের সময় ব্যবহার করেছে বলে জানা নেই আমার। কিন্তু মণ্ডলকে নিয়ে বেশিক্ষণ ব্যস্ত থাকার সুযোগ পাওয়া গেল না। সহসা স্বর্গরোহিণীর শীর্ষে কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। তার সারা মুখখানি ঢাকা পড়ল সেই মেঘের পর্দায়। এবং তারপরেই শুরু হল তুষারপাত। কাঁচা পেঁপের বীচির মতো সাদা তুষারকণা নেমে আসছে ধোঁয়াটে আকাশের বুক থেকে। ঝিরঝির শব্দে তারা পড়ছে তাঁবু ও মালপত্রের ওপরে। পড়ছে আমাদের গায়ে। ভালই লাগছে।

এ যাত্রায় এই আমার তৃতীয় তুষারপাত দর্শন। কিন্তু আগের দু'দিনের সঙ্গে আজকের পার্থক্য আছে। আগের দু'দিন ওসলা ও হরকিদুনের বিশ্রামগৃহে বসে কাচের জানালা দিয়ে তুষারপাতের সৌন্দর্য উপভোগ করেছি আর আজ মুক্তোর মতো নিটোল

তুষারকণা আমার গায়ে ঝরছে।

যে কোন হিমালয়যাত্রীর কাছে তুষারপাত দেবতাত্মা নগাধিরাজের পরম প্রসাদ। তারা উল্লসিতচিত্তে বরণ করে এই করুণাধারাকে। হিমালয়ে এসে তুষারপাত না দেখতে পেলে হিমালয়-দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কিন্তু অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা উচ্চ হিমালয়ে তুষারপাতকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ এখানে তুষারপাতের যেমন কোন নিয়ম নেই, তেমনি নেই তার সময়-সীমা। দীর্ঘস্থায়ী তুষারপাত পর্বতারোহীদের কাছে সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

তাই অমূল্য বিভাস প্রাণেশ পণ্ডিত ও মামা, আমাদের মতো হৈ-হুল্লোড় না করে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মালপত্রগুলোকে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখছে। ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেবার জন্য কুলিদের নির্দেশ দিচ্ছে।

কুলিরা কাঠ নিয়ে এসেছে। দাদু মামা পণ্ডিত ও পান্না তাদের রেশন দিচ্ছে। তুষারপাত থামে নি, বরং বেড়েছে। এখন আর পেঁপের বীচি নয়, পেঁজা তুলোর মতো হাল্কা তুষার ঝরছে। এই তুষার ধারাকে ইংরেজীতে বলে 'ফ্লেক্স'। এ ধরনের তুষারপাত সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর তাই বোধহয় অমূল্যর সদাহাস্যময় মুখখানি একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

পাঁচটা বেজে গিয়েছে, তুষারপাত এখনও চলেছে। যে পনেরোজন কুলি মাল আনতে নিচে গিয়েছে, তারা এখনও ফিরে আসে নি। আমরা তাঁবুতে বসে তাদের কথাই ভাবছি বারে বারে।

সহসা লালু ডেকে উঠল। তাঁবুর দোরগোড়ায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। ব্যাপার কি ?

ঠিকই দেখেছে লালু। কুলিরা ফিরে এসেছে। আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান হল।

॥ পনেরো ॥

"ভবানীপুরের পণ্ডিত পরিবারের ছেলে আমি ?" আমার প্রশ্নের উত্তরে রবীন বলে চলেছে। গতকাল রাতে আমি ও রবীন এক তাঁবুতে শুয়েছি। একটু আগে রূপা ঘুম ভাঙিয়ে বেড্-টি দিয়ে গিয়েছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প করছি আমরা।

রবীন বলছে, "আমাদের পরিবারে সামান্য কিছু খ্যাতি আছে কিন্তু সে খ্যাতি সমাজসেবা, শিল্পকলা ও সঙ্গীতচর্চার জন্য। আমার ঠাকুরদাদা একজন ভাল ভাস্কর ছিলেন, আমার বাবা খুব ভাল তবলা ও বেহালা বাজাতেন। তবে তাঁর খুব বেড়াবার শখ ছিল। তিনি ১৯২০ সালে কেদার-বদ্রী গিয়েছিলেন। আর আমার হিমালয়-প্রীতি সম্ভবত সেই উত্তরাধিকার-সূত্রেই এসেছে।

"আমি হিমালয়কে প্রথম দেখি নেপালে। তারপরে একে একে গিয়েছি অমরনাথ, গোমুখী ও যমুনোত্রী এবং পিণ্ডারী ও কাফ্‌নী হিমবাহে। অবশেষে ১৯৭০ সালে দূতাগারের যোগীন অভিযানে যোগদান করলাম। সেই আমার পর্বতারোহণের হাতেখড়ি। তবে আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর পর্বতপ্রেমিক

শ্রীতারকেশ্বর চক্রবর্তীর উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে আমি হয়তো কোনদিনই পর্বতারোহণে উৎসাহী হয়ে উঠতাম না।"

"শঙ্কুদা, ঘুমোচ্ছ নাকি ?" কোয়ার্টার মাস্টার দাদু ডাকছে আমাকে।

আমি সাড়া দিই, "না।"

দাদু বলে, "কিচেনে যাও, কামি গরম জল করে রেখেছে, হাত-মুখ ধুয়ে ব্রেক-ফাস্ট খেয়ে নাও। তোমার ব্রেক-ফাস্ট রেডি।"

"শঙ্কুদা কি একাই ব্রেক-ফাস্ট করবে ?" পণ্ডিত হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

"না, সবাই করবে। তবে এখনও আমাদের খাবার তৈরি হয় নি, শঙ্কুদারটা হয়ে গেছে।" দাদু উত্তর দেয়।

"শঙ্কুদার কি আলাদা খাবার নাকি ?" পণ্ডিত বিস্মিত। আমিও তাই।

"হ্যাঁ, আজ যে ওর একাদশী।"

কথাটা একেবারেই খেয়াল ছিল না। আজ যে একাদশী, তাও তো জানা নেই আমার। কিন্তু দাদুর ঠিক খেয়াল আছে। সে জানে আমার কালাশৌচ চলেছে, আমাকে একাদশী করতেই হবে। তাই সে এত কাজের মধ্যেও তিথিটার ঠিক হিসেব রেখেছে। কাজটা সহজ নয়। দুর্গম হিমালয়ে এসে তারিখ আর বারের কথাই মনে থাকে না, সেখানে তিথি !

কঠিন হলেও দাদু ঠিক হিসেব রেখেছে। তাকে তো হিসেব রাখতেই হবে। সে যে আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার—'মাদার অব্ দা এক্সপিডিশান।' বাড়িতে যে মা-ই আমাকে একাদশীর কথা মনে করিয়ে দেন।

বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। এখনও এখানে রোদ এসে পৌঁছায় নি, তবে রোদ পড়েছে বান্দরপূঁছ ও স্বর্গারোহিণীর শিখরে। তাকালে চোখ ঝলসে যেতে চায়। তবু তাকাই। বার বার দেখি ওদের। এ দেখার শেষ হয় না।

গতকালের তুষার প্রায় সবই রয়ে গিয়েছে এখনও। রাতের ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে আছে। তারই ওপর দিয়ে হাঁটা-চলা করছি—মচ্ মচ্ শব্দ হচ্ছে। বেশ মজা লাগছে।

আজকের পথ অতিশয় দুর্গম। আজ আর দু'বার মাল ফেরি করানো যাবে না। একবারেই সব মাল ওপরে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য বাড়তি বোঝা নেবার জন্য পনেরোটা কুলির মজুরি ওদের চল্লিশজনকে ভাগ করে দিতে হবে। কাজেই বিভাস প্রাণেশ সেতী ও শেরপারা মালের বোঝা ঠিক করতে ব্যস্ত।

সকাল ঠিক সাড়ে ন'টার সময় রওনা হলাম। প্রাণেশ চলেছে আমার সঙ্গে। আজ সে আর অগ্রবর্তী দলে যায় নি। অগ্রবর্তী দলে গিয়েছে বিভাস শম্ভু নির্মল দেশাই সুশীল দোরজি পাসাং ও ফতে সিং। সুশান্তবাবু মণ্ডল ও ডাক্তারকে নিয়ে অমূল্য পেছনে আসছে। আমরা রয়েছি মাঝখানে।

সেই ঘাসে-ছাওয়া গ্রাবরেখার ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্বে এগিয়ে চলেছি। বহু দূরের একটা কালো পাথরকে দেখিয়ে বৃপা বলছে—ঐ হচ্ছে ধার, ধুমধার। গাড়োয়ালী ভাষায় গিরিবর্ত্মকে ধার বলে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখি। সত্যই বিস্ময়কর—চারিদিকে সাদার মাঝে বেশ বড় একটি কালো বৃত্ত। ওখানে এমন একখানি মসৃণ ও খাড়া পাথর রয়েছে, যার ওপরে কখনই তুষার জমতে পারে না। তাই সে সব সময়ে কালো থেকে পদযাত্রীকে আলো দেখায়।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সব মাল নিয়ে আসা যায় নি। পাঁচ-ছটি বোঝা ফেলে আসতে হয়েছে কেয়ারকোটিতে। যতটা সম্ভব রেশন এবং পর্বতোরোহণের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসেছি। ফেলে আসতে হয়েছে কিছু রেশন, টিন-ফুড, ওষুধপত্র, ফিক্সড-রোপ ও একখানা ত্রিপল। বূপা সেই ত্রিপল দিয়ে মালগুলি ঢেকে রেখে এসেছে। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—সুবিধেমতো ওসলা থেকে এসে জিনিসগুলো নিয়ে যাবে ঘরে। আগামী গ্রীষ্মে এলেও ক্ষতি নেই। প্রকৃতির এই হিমঘরে কোন জিনিস নষ্ট হয় না।

অবশ্য নিজের ঘর বলতে যা বোঝায়, এখনও তা হয় নি বূপার—তবে হবে। এই অভিযান থেকে ফিরেই ঘর বাঁধতে পারবে বূপা। সত্যি কথা বলতে কি, ঘর বাঁধার জন্যই এবারে ঘর ছেড়েছে সে। আর শ'খানেক টাকা হলেই মেয়েটিকে বিয়ে করে আনতে পারবে বূপা। সেই টাকাটা তার এবার যোগাড় হয়ে যাবে।

আমাদের গাঁয়ে স্বর্গারোহিণী, ডাইনে বান্দরপূঁছ হিমবাহ—খানিকটা দূরে বান্দরপূঁছ গিরিশিরা। প্রখর রোদ উঠেছে। গতকালের তুষার গলে পথ পিছল হয়ে আছে। একজন কুলি মাল নিয়ে আছাড় খেলো। তাড়াতাড়ি টেনে তুলি তাকে।

পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে পথ চলছি এখন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তাহলেও শীত লাগছে না, রোদ রয়েছে যে।

একটানা আধ ঘণ্টা পথ চলার পরে প্রাণেশ বিশ্রাম মঞ্জুর করে। একখানা পাথরের ওপরে বসে পড়ি। দাদু রুকস্যাক থেকে ম্যাঙ্গোজুশ-য়ের টিন বের করে।

আমের রস ফুরিয়ে যেতেই প্রাণেশ তাগিদ দেয়, "দশটা বেজে গেছে, চলুন এবারে রওনা দেওয়া যাক্।"

সে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ডানদিকে চলতে শুরু করে। একটু অবাক হই। আমরা যাব সামনে—উত্তর-পূর্বে, সে দক্ষিণে চলেছে কেন? তাহলেও কোন প্রশ্ন করি না, নিঃশব্দে প্রাণেশকে অনুসরণ করি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চড়াই বেয়ে উঠে আসি গিরিশিরা সদৃশ বান্দরপূঁছ হিমবাহের সেই প্রান্তিক গ্রাবরেখায়। ডানদিকে প্রায় হাজার খানেক ফুট নিচে বান্দরপূঁছ হিমবাহ আর বাঁয়ে কয়েকশো ফুট নিচে সেই তৃণাচ্ছাদিত প্রস্তরময় প্রান্তর।

প্রান্তিক গ্রাবরেখার উপরিভাগ সংকীর্ণ—বড় জোর দু-তিন-ফুট চওড়া। তারই ওপর দিয়ে পূবে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, যেতে হবে খুবই সাবধানে। কারণ একটু অন্যমনস্ক হলেই হোঁচট খাবার সম্ভাবনা এবং হোঁচট খেলে হয়তো আর ফেরা হবে না কলকাতায়।

প্রথমে দাদু তারপরে আমি, আমার পেছনে প্রাণেশ। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, আমরা কেউ পড়ে গেলে যাতে সে ধরতে পারে সময়মতো।

ঘণ্টাখানেক পদচারণার পরে সেই প্রান্তিক গ্রাবরেখার প্রান্তে পৌঁছলাম। পথটা একটু বিপজ্জনক হলেও নিঃসন্দেহে সহজ। ফলে যারা আমাদের সঙ্গে রওনা হয়েছিল, তাদের ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি আমরা। জায়গাটা উঁচু বলে সবাইকে দেখাও যাচ্ছে না এখান থেকে।

কিন্তু এবার নামতে হবে নিচে, যেতে হবে পুরনো পথে।

পাথর ডিঙিয়ে নেমে আসি আগের সেই তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে। বূপা যোগ দেয় সঙ্গে। আর ছুটে আসে লালু। সে কেন যেন আজ আর অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যায় নি।

তাই বলে সে কিন্তু আমাদের পেছনে রইল না, চললো আগে আগে। আমরা বেশি পেছিয়ে পড়লে অবিশ্যি সে চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকছে। তার কাছে পৌঁছলেই আবার চলতে শুরু করছে।

যে প্রান্তরটির ওপর দিয়ে আমরা এতক্ষণ পথ চলেছি, সেটি শেষ হয়ে গেল এখানে। এবারে প্রস্তরময় একটা ঢাল বেয়ে নেমে যেতে হবে প্রায় শ'পাঁচেক ফুট।

পর্বতারোহণে এসে পাঁচশ' ফুট নিচে নামা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, কঠিন হচ্ছে নামবার পথটি। সারা ঢালটাই আলগা পাথরে বোঝাই। নামতে গেলেই পাথর গড়াতে শুরু করবে। যার পায়ে গড়াবে তার থেকেও বড় বিপদ হবে যে তার নিচে থাকবে। সুতরাং একের অনেক পেছনে নামতে হবে অপরকে এবং এক সারিতে নামা চলবে না।

সেই ভাবেই নামতে থাকি! কিন্তু দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাই না। কারও পদভারে খসে পড়া একটা পাথর এসে আঘাত করে দাদুর পায়ে, অতর্কিত আঘাতে দাদু গড়িয়ে পড়ে খানিকটা। কিন্তু তারপরেই কোনমতে সামলে নেয় নিজেকে।

নিচে নেমে কিছুক্ষণ ধরে দাদুর পা ম্যাসেজ করে দিই। তারপরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এগিয়ে চলে সামনে।

তৃণাচ্ছাদিত ঢাল বেয়ে উঠে আসি আরেকটি গিরিশিরার ওপরে। শুধু তৃণ নয়, অসংখ্য ব্রহ্মকমল শুকিয়ে আছে সর্বত্র। দুঃখ হচ্ছে, মাসখানেক আগে এলেই বোধ হয় এই নামহীন নন্দন-কাননের অপরূপ রূপ দর্শন করার সৌভাগ্য হত আমার।

এ গিরিশিরাটি আগের সেই প্রান্তিক গ্রাবরেখার মত প্রশস্ত কিংবা সমতল নয়। কাজেই তার ঠিক ওপর দিয়ে পথ চলা যাচ্ছে না। গা বেয়েই আড়াআড়ি ভাবে এগিয়ে যেতে হচ্ছে সামনে।

কিন্তু এভাবে এগিয়ে গেলে তো আমরা হিমবাহের ভেতরে চলে যাবো! তাছাড়া রূপা ও লালুই বা কোথায় গেল? তারা তো একটু আগেই এখানে এসেছে!

প্রাণেশ বলে, "আপনারা বরং একটু দাঁড়ান এখানে। আমি খানিকটা এগিয়ে দেখি ক্যাম্পসাইট্ কোথায়?"

প্রাণেশ অক্লেশে এগিয়ে যায়। আমরা কোন রকমে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকি আলগা পাথরে বোঝাই সেই গিরিশিরার ঢালে।

শিবিরের জায়গা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি পেছিয়ে পড়া সহযাত্রীদের। পিঁপড়ের সারির মতো তারা এগিয়ে আসছে এদিকে। আর দেখা যাচ্ছে আমাদের ফেলে আসা পথকে। পথ নয়, পাহাড়ের ঢেউ। সেই ঢেউয়ের উচ্চতম বিন্দুগুলিতে কুলিরা পথের নিশানা দেবার জন্যে আগুন জ্বালিয়েছে। আগুন নয়, ধোঁয়া। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে মিলিয়ে যাবার আগে যে ধোঁয়ার মালটি রচনা করছে, সেটি দেখবার মতো।

"দোরজি!" প্রাণেশ সহসা চিৎকার করে ওঠে।

দোরজি! কোথায় দোরজি?

দোরজি সাড়া দিয়েছে।

সামনে তাকাই। হ্যাঁ, ঐ তো দোরজি। ওপাশের ঢাল থেকে গিরিশিরার ওপরে উঠে আসছে।

প্রাণেশ নির্দেশ দেয়, "ওখানটায় চলে আসুন।" সে ইশারায় একটি ঢালু জায়গা

দেখিয়ে দিচ্ছে। নিজেও এগিয়ে আসছে সেখানে।

তার নির্দেশ পালন করি। আর সেখানে এসেই দেখতে পাই নিচে—চমৎকার একফালি তৃণাচ্ছাদিত সমতল প্রান্তর। প্রান্তরের একপ্রান্তে ছোট একটি জলাশয়। জলাশয়ের তীরে রঙীন উইন্ড-প্রুফ পরে কে একজন বসে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেকজন।

দাঁড়িয়ে আছে বোধহয় রূপা। কারণ লালুকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বসে আছে কে ? সম্ভবত অগ্রবর্তী দলের কোন সদস্য। কিন্তু একজন কেন ? আর সবাই কোথায় গেল ?

ওখানে পৌঁছলেই জানা যাবে।

প্রাণেশ ও দোরজির হাত ধরে আলগা পাথর বেয়ে নেমে আসি নিচে। প্রান্তর পেরিয়ে পৌঁছই ছোট জলাশয়টির তীরে। এখন বেলা দেড়টা। তার মানে মূল-শিবির থেকে রওনা হবার চার ঘণ্টা পরে পৌঁছলাম এক নম্বর শিবিরে। পরিশ্রম যতই হয়ে থাক, পাঁচ মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করেছি বলে মনে হচ্ছে না।

রঙিন উইন্ড-প্রুফ পরে বসে রয়েছে শম্ভু। সে জানায়, "ওরা সবাই ওপরে গেছে পথ তৈরি করতে। তোমাদের এখানে থামাবার জন্য আমাকে ও দোরজিকে রেখে গিয়েছে। আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে এবং পরের ক্যাম্পসাইট অনেকটা দূরে বলে আজ এখানেই তাঁবু ফেলতে হল।"

আবহাওয়া সত্যি খারাপ হচ্ছে। সকালের রোদ কোথায় যেন গেছে হারিয়ে। তার পরিবর্তে নেমে আসছে মেঘ। ইতিমধ্যেই তারা ছেয়ে ফেলেছে দূরের আকাশ আর বান্দরপূঁছ ও স্বর্গারোহিণীর শিখরমালাকে।

আমরাও শম্ভুর পাশে, সেই ছোট জলাশয়টির তীরে বসে পড়ি। পেছনের পাহাড় থেকে একটি ঝরণা নেমে এসে সৃষ্টি করেছে জলাশয়টি। ছোট এবং অগভীর হলেও ভারী সুন্দর টলটলে জল! রুক্‌স্যাক্ নামিয়ে মগ বের করি। প্রাণভরে জল খেয়ে নিই।

প্রাণেশ বলে, "আমি আর রূপা গিরিশিরার ওপরে চলে যাচ্ছি।"

"ওদের সাহায্য করতে ?" প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ। দোরজির একার পক্ষে এতগুলো মানুষকে নামানো সম্ভব নয়। আপনারা এখন এখানেই বসুন, তুষারপাত শুরু হলে ঐ পাথরের ঝোপড়াটায় চলে যাবেন।"

তাকিয়ে দেখি, খানিকটা দূরে সত্যি একটা ছোট ঝোপড়া রয়েছে—মেষপালকদের ঝোপড়া। গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের এ-সব অঞ্চলে প্রচুর ঘাস জন্মায়। শত শত ভেড়া নিয়ে মেষপালকরা আসে, কয়েকটি সপ্তাহ কাটিয়ে যায়। তারা রাত্রিবাসের জন্য পাথরের ঝোপড়া বানা। তারই একটি রয়েছে এখানে।

রুক্‌স্যাক্ ও কম্বল রেখে প্রাণেশ এবং রূপা গিরিশিরার দিকে চলে যায়। বলা বাহুল্য, লালু তাদের সঙ্গী হয়। আমরা নীরবে বসে থাকি। নীরব প্রকৃতি। মনে হচ্ছে সে যেন একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়বার প্রতীক্ষায় রয়েছে। কেমন একটা গুমোট ভাব ক্রমে ক্রমে মূর্ত হয়ে উঠছে চারিদিকে।

গুমোট প্রকৃতি যাতে আমাদের মনকে গুমোট না করে তুলতে পারে, তাই শম্ভু বলে, "চুপচাপ বসে না থেকে গল্প বলো।" সে আমার দিকে তাকায়।

প্রশ্ন করি, "কিসের গল্প ?"

"কিসের আবার, হিমালয়ের!" দাদু শম্ভুর হয়ে জবাব দেয়।

একটু ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করি, "যমুনোত্রী মন্দিরের পেছনে অর্থাৎ পুবে বান্দরপূঁছ পর্বতামালা। সেখান থেকে অবশ্য শুধু ২০,৭২০ ফুট উঁচু হোয়াইট পিক্ বা শ্বেতশিখরটিকেই দেখা যায়। কৃষ্ণচূড়া এবং ২০,০২০ ফুট উঁচু বান্দরপূঁছ পর্বতমালার অপর শৃঙ্গটি সেখান থেকে দেখা যায় না, যেমন এখান থেকে কেবল কৃষ্ণচূড়াকে দেখা যাচ্ছে। তোমরা জানো যে, গিব্‌সন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্বেতশিখরে আরোহণ করেন। আর কৃষ্ণচূড়া প্রথম বিজিত হয়েছে ১৯৫৯ সালের ৭ই ও ৮ই জুন। ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং-য়ের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছ'জন অভিযাত্রী এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তারপরে ১৯৫৯ সালের ১৪ই জুন শ্রীহরি দাং-য়ের নেতৃত্বে আবার এই শৃঙ্গ বিজিত হয়। অবশেষে ১৯৫৯ সালের ১২ই জুন প্রখ্যাত প্রবীণ পর্বতারোহী শ্রীগুরু দয়াল সিং-য়ের নেতৃত্বে দেরাদুনের মিলিটারি আকাদেমীর একদল ভারতীয় ছাত্র এই পর্বতশিখরে আরোহণ করেছেন।

"সে যাই হোক, ১৯৫০ সালের অভিযাত্রীরা সকলে ২৯শে মে ওসলা পৌঁছান। অগ্রবর্তী দল তার আগেই তালাও-য়ের তীরে মূল-শিবির স্থাপন করেছিলেন। ৫ই জুন তাঁরা ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে এক নম্বর শিবির স্থাপন করেন। ৬ই জুন দু'নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচিত হয়। কিন্তু হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় শিখরাভিযাত্রীরা ১১ই জুনের আগে দু'নম্বর শিবিরে যেতে পারেন না।

"পরদিন ১২ই জুন। সাতজনের এক শিখরাভিযাত্রীদল সকাল সাড়ে পাঁচটায় শিবির থেকে যাত্রা করে বেলা সাড়ে দশটার সময় কৃষ্ণচূড়া শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করতে সমর্থ হন। সেদিন বিকেলেই তাঁরা সুস্থ শরীরে এক নম্বর শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন।"

একবার থামি। পেছনে তাকাই। কোথায়? সহযাত্রীদের কেউ আসে নি এখনও। আবার শুরু করি, "বান্দরপূঁছ পর্বতমালার উত্তর এবং পশ্চিম দুদিকের হিমবাহকেই বান্দরপূঁছ বামক বলে।..."

"বামক মানে তো হিমবাহ?" মাঝখান থেকে দাদু প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই। বলতে থাকি, "উত্তর দিকের বান্দরপূঁছ বামক থেকে সৃষ্ট হয়েছে তমসা, আমরা এখন রয়েছি যেদিকে। আর পশ্চিম দিকের বান্দরপূঁছ বামকে জন্ম হয়েছে যমুনার। দু'টি নদীর উপত্যকাদ্বয়েব মাঝখানে রয়েছে বান্দরপূঁছ গিরিশিরা। গিরিশিরার ঐ অংশে ১৭,৫০০ ও ১৭,১৮০ ফুট উঁচু দু'টি শৃঙ্গ রয়েছে। দ্বিতীয় শৃঙ্গটিকেই যমুনোত্রী শৃঙ্গ বলে।"

"ঐ শৃঙ্গের পশ্চিমে একটি গিরিখাত আছে। সেটি অতিক্রম করে সোজাসুজি তালাও-য়ের ওপারে এসে নামা যায়। সে-পথে যমুনোত্রী থেকে ওসলা আসতে দিন তিনেক সময় লাগে। এবং পথটিও তেমন দুর্গম নয়, তবে সংকীর্ণ বলে খচ্চর আসতে পারে না।"

আমাদের আশঙ্কা সত্য হল। সহযাত্রীরা এমন কি কুলিরা পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি, কিন্তু শুরু হল তুষারপাত। আমি ও দাদু ছুটে এলাম সেই পাথরের ঝোপড়ায়। পাছে সহযাত্রীরা এখানে পৌঁছে কাউকে না দেখতে পেয়ে ওপরে চলে যায় তাই শম্ভু বসে রইল জলাশয়ের ধারে। তুষারপাতের ভেতরে সে আমাদের শিবিরস্থলীর জীবন্ত নিশানা হয়ে রইল।

ঝোপড়াটি খুবই ছোট। কোনমতে গুটিচারেক মানুষ মাথা গুঁজে বসে থাকতে পারে। দরজা-জানলার পরিবর্তে একদিকের দেওয়ালের খানিকটা অংশ ফাঁকা। সেখানে একটা পাথর রাখা রয়েছে। পাথরখানি সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে আসি। জড়সড় হয়ে বসে থাকি।

বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। তুষার পড়ছে অবিশ্রান্ত ধারায়। শুধু বাইরে নয়, ঝোপড়ার ভেতরেও বরফ পড়ছে ওপরের ছোট গর্তটি দিয়ে। ওটি যে ঝোপড়ার ভেন্টিলেটার।

তাহলেও আশ্রয়টি উন্মুক্ত প্রান্তরের চেয়ে অনেক ভাল। চিন্তা হচ্ছে সহযাত্রীদের জন্য। এই তুষারপাতের মধ্যেও পথ চলতে হচ্ছে তাদের। দুশ্চিন্তা হচ্ছে কুলিদের কথা ভেবে। তারা না এলে যে তাঁবু টাঙানো যাবে না।

"শঙ্কুদা, দা..দু.."

একটা আর্তকণ্ঠ ভেসে আসে। তাড়াতাড়ি সাড়া দেই, "এসো। পাথরটা সরিয়ে হামগুড়ি দিয়ে ভেতর চলে এসো।"

মণ্ডল ও তার নতুন সহকারী দিল বাহাদুর ভেতরে ঢোকে।

বরফ ঝেড়ে পাশে বসে মণ্ডল। শীতে সে ঠকঠক করে কাঁপছে।

একটু বাদে কাঁপুনি থামার পরে মণ্ডল যথারীতি পণ্ডিতকে গালাগালি শুরু করে দিল। তারই জন্য আজ ওর প্রাণটা বেঘোরে যেতে বসেছে।

"শুধু কি তাই," মণ্ডল বলে চলে, "আমার কথা ছেড়ে দিন! আমি তো এমনিতেই আধমরা, মরে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু অমূল্যদা..."

"অমূল্য!"

"হ্যাঁ, শঙ্কুদা, আজ আরেকটু হলেই আমরা নেতাহীন হয়ে যেতাম।"

"সে কি! অমূল্য দুর্ঘটনায় পড়েছিল?"

"না, পড়েন নি।" মণ্ডল উত্তর দেয়, "বলে বড়ই অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন।"

স্বস্তিরর নিঃশ্বাস ফেলি। জিজ্ঞেস করি, "কি হয়েছিল?"

মণ্ডল উত্তর দেয়, "আপনারা নিশ্চয় পাথর-ঝুলে-থাকা খাড়া ঢালটার কথা ভুলে যান নি!"

"না।" দাদু বলে।

মণ্ডল বলতে থাকে, "তখন সেই ঢাল বেয়েই নামছিলেন অমূল্যদা। তাঁর সামনে ডাক্তার, পেছনে পান্না। নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে তিন সারিতে নামছিলেন ওঁরা। সহসা পান্না দেখতে পায় বড় একটা কাঠের বাক্স ওপর থেকে বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে আসছে। বুঝতে পারে কোন কুলি পিঠ থেকে বাক্সটা খুলে গিরিশিরার ওপরে রেখে বিশ্রাম করছিল। যে কোন ভাবেই হোক্ সেটি স্থানচ্যুত হয়েছে। কিন্তু বাক্সটা যে সোজা অমূল্যদার দিকে নেমে যাচ্ছে! আর ভাবতে পারে না পান্না, সে চিৎকার করে ওঠে—অমূল্যদা!

"চমকে পেছন ফেরেন অমূল্যদা, আর এই পেছনে ফেরার জন্য তাঁকে খানিকটা পাশে সরে যেতে হয়। ঠিক তখুনি, অমূল্যদা, এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিলেন, সেখান দিয়েই বাক্সটা বিদ্যুৎ বেগে নিচে পড়ে যায়। পেছন ফেরার জন্য পাশে না ফিরলে, বাক্সটা অমূল্যদার মাথায় পড়ত।...আজ বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছেন অমূল্যদা!"

"কিসের বাক্স বললে, কাঠের ?"

"হ্যাঁ।" দাদুর প্রশ্নের উত্তরে মণ্ডল জানায়।

"কত নম্বর বলতে পার ?" দাদু আবার জিজ্ঞেস করে। করবেই তো, সে-ই যে ওসলাতে বসে মালপত্র সব রি-প্যাক্ করেছে। কোন্ বাক্সে কি আছে, সবই তার নখদপর্ণে।

মণ্ডল দিল বাহাদুরের দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, "আজ জো বাক্স্ গির গিয়া, উসকা কেতনা নম্বর থা ?"

"জী, চৌবিশ।"

"চব্বিশ !" দাদু যেন আঁতকে উঠেছে।

"জী !"

"কোন্ কুলির কাছে ছিল, রাম বাহাদুর ?"

"জী, হাঁ।"

"তোমরা বাক্সটা তুলে আনবার চেষ্টা করলে না ?"

"না।"

"না !" দাদু ভেংচি কাটে। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "কেন করলে না ?"

শান্ত-শিষ্ট দাদুর এই অশান্ত আচরণে আমরা বিস্মিত। তাহলেও শান্ত স্বরে মণ্ডল উত্তর দেয়, "বাক্সটা অমূল্যদার পাশ দিয়ে একেবারে সোজা গিয়ে হিমবাহের ভেতরে গড়িয়ে পড়েছে। সেখান থেকে তুলে আনা সম্ভব নয়। আর বিভাস বললে যে তার দরকারও নেই।"

"বিভাস ! বিভাস বললে এ কথা ?" দাদু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। বলল, ওর ভেতরে নাকি অতিরিক্ত ওষুধপত্র ছিল, কাজেই ওটা না হলেও চলবে।"

"মূর্খ !" দাদু মন্তব্য করে, "হতভাগা জানে না তার কি সর্বনাশ হয়ে গেল।" এবারে দাদুর কণ্ঠস্বরে কান্নার পরশ।

"কেন কি হয়েছে ?" আমি ও মণ্ডল সমস্বরে প্রশ্ন করি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দাদু বলে, "শঙ্কুদা আমাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেল।"

"আরে খুলেই বলুন না কি হয়েছে ?" মণ্ডল ধৈর্যহীন। ওষুধ ছাড়া আর কি ছিল ঐ বাক্সে ?"

দাদুর চোখ দুটি বোধ করি ঝাপসা হয়ে উঠেছে। সে চোখ মুছে বিকৃত কণ্ঠে কোনমতে উত্তর দেয়, "ভাঙ। মামা, বিভাস ও আমার সংগৃহীত সমস্ত ভাঙটুকু শুকিয়ে পলিথিনের ব্যাগে পুরে আমি ঐ কাঠের বাক্সে ভরে দিয়েছিলাম।"

আর কিছু বলতে পারে না সে। বলার দরকারও নেই কোন। মামা ভাগনে ও দাদুর ভাঙ কালেক্শান বিফলে গেল। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিই বা হতে পারে ?

॥ ষোল ॥

সকালে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে দেখি তুষারপাত থেমেছে। তবে চারিদিকেই নরম তুষার। কে বলবে এটিই গতকাল দুপুরেরই সেই তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। কোনকালে যে এখানে বরফ ছাড়া আর কিছু ছিল, বোঝার সাধ্যি নেই। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু সাদা—অন্তহীন সাদার মাঝে আমরা কয়েকটি কালো মানুষ রঙিন পোশাক পরে পায়চারি করছি।

গতকাল রাতে যতক্ষণ জেগে ছিলাম, ততক্ষণ তুষারপাতের শব্দ শুনেছি। তুষারপাতের ভেতরই সহযাত্রী ও কুলিরা সবাই নির্বিঘ্নে এখানে এসে পৌঁচেছে। তুষারপাতের ভেতরেই তাঁবু টাঙানো, মালপত্র গোছানো ও রান্না করা হয়েছে। এবং সেই তুষারপাতের ভেতরেই দাদু ও আলুসিদ্ধ ও দুধ-সাবুর বন্দোবস্ত করে আমার একাদশী পালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বরফ না পড়লেও রোদ ওঠে নি আজ। উঠবে বলে মনেও হচ্ছে না। মেঘে-ঢাকা আকাশ। যে কোন সময়ে আবার তুষারপাত শুরু হতে পারে! তাহলেও সাব্যস্ত হয়েছে, আমরা আজ এগিয়ে যাবো।

কিন্তু হিমালয়ের দুর্গম পথে তো যাবো বললেই যাওয়া যায় না। সেতীরাম এসে জানালো—কয়েকজন কুলি বরফ দেখে ঘাবড়ে গেছে, তারা আর ওপরে যেতে চাইছে না।

আঁতকে উঠি। কারণ পর্বতারোহণে এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ খুব কমই আছে। আর সংবাদটা একেবারেই আকস্মিক। এই তো একটু আগেই ওরা সবাই অত উৎসাহের সঙ্গে তাঁবু গোটালো, মালপত্র গোছগাছ করল। তারপরে হঠাৎ কি হল? কেন ওরা অকস্মাৎ এভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল?

একটু ভেবে নিয়ে অমূল্য বলে, "বিভাস আর প্রাণেশ একবার যাও তো। বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওদের মত পরিবর্তনের চেষ্টা কর। সুশান্তদা মণ্ডল শম্ভুদা ডাক্তার ও পান্নাকে নিয়ে আমি রওনা হচ্ছি। মণ্ডল ও ডাক্তার জোরে হাঁটতে পারে না। দেরি করলে কালকের মতো অসুবিধায় পড়তে হবে। আজও তুষারপাত হবে।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "ঠিক কথা, ফতে সিং এবং শেরপারা তিনজনেই আজ আমার সঙ্গে ওপরে চলে যাবে। কিছু কুলি যদি সত্যি সত্যি এখান থেকে চলে যায়, তাহলে দু'দিনে সব মাল দু'নম্বর শিবিরে নিতে হবে। কাল শেরপারা সেখান থেকে তিন নম্বরের পথ তৈরি করবে।"

ব্রেক-ফাস্ট করে অমূল্যরা রওনা হয়ে গেল। রামনাথ এবং বীজেন্দ্রও নেতার সঙ্গী হল। ওদের বিদায় দিয়ে আমরা কুলিদের কাছে আসি।

না, বিভাস ও প্রাণেশের বক্তৃতা মাঠেই মারা গেছে। তারা কুলিদের বরফ 'ফোবিয়া' দূর করতে পারে নি।

শেষ পর্যন্ত উনিশজন কুলি মালপত্র ফেলে নিচে নেমে গেল। সেতীরামকে তিরস্কার করা বৃথা। সে কুলির সর্দার কিন্তু কুলিরা তার ক্রীতদাস নয়। তাছাড়া সংসারে পয়সা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হলেও সবাই পয়সাকে সমান ভালোবাসে না। কেউ যদি পয়সার জন্য জীবনের ঝুঁকি না নিতে চায়, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া অন্যায়।

কিন্তু এখন আমাদের কি উপায় হবে? এমনিতেই কুলির অভাবে মূলশিবিরে কিছু

মাল ফেলে আসা হয়েছে। এখন যে কুলির সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল।

উপায় একটা কিছু করতেই হবে। তবে তার আগে ওপরে যারা চলে গিয়েছে, তাদের কথা ভাবা দরকার। ওদের তাঁবু বিছানা ও খাবার আগে পাঠাতে হবে।

কিচেনের কুলিদেরও মাল ফেরি করার কাজে লাগানো হল। বাইশজন মালবাহক ওপরে চলে গেল। ওরা মাল পৌঁছে দিয়ে আজই ফিরে আসবে। আগামী কাল সব মাল সহ আমরাও ওপরে চলে যাবো।

আবার মেস্-টেন্ট্ টাঙানো হল। আমরা ভেতরে আসি। দাদু নির্মলকে নিয়ে রান্নার আয়োজনে লেগে যায়। জলাশয়টির ওপরে বরফ পড়ে ঢেকে গেলেও নিচে জল রয়েছে। সুতরাং কফি বানাতে খুব একটা সময় লাগল না। আর গরম কফির চেয়ে প্রিয়তর বস্তু যে এ সংসারে আর কিছু থাকতে পারে, এখন সে ধারণা করা অসম্ভব।

লালু কিন্তু অমূল্যদের সঙ্গেই চলে গিয়েছে। এই বরফ ভেঙে সে কেমন করে ওপরে যাবে, বুঝতে পারছি না। তবে এখনও সে যখন ফিরে আসে নি, আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না।

লালু চলে গিয়েছে, কিন্তু মণ্ডল রয়ে গেছে এখানে। তার পক্ষে অমূল্যদের সঙ্গী হওয়া সম্ভব হয় নি।

কেমন করে হবে ? তার যে আবার প্রাতঃকৃত্য সারতে সময় একটু বেশি লাগে। এই বরফের ভেতরেও তাকে গামছা পরতে হয়েছিল। গামছা না পরলে নাকি ওর কোষ্ঠসাফ হয় না। পায়ে পান্টার, গায়ে উইন্ডপ্রুফ-জ্যাকেট আর পরনে হাওড়া হাটের গামছা ! মণ্ডলকে তখন বেশ দেখাচ্ছিল কিন্তু।

মণ্ডলই প্রথম প্রস্তাবটা করে, "শঙ্কুদা, আপনি তো 'মধু বৃন্দাবনে' বইতে বহু কীর্তনের উল্লেখ করেছেন। তার একটা ধরুন না। ভগবানের নাম করলে হয়তো বা রোদ উঠলেও উঠতে পারে।"

কথাটা মিথ্যে বলে নি মণ্ডল। তাই বলি, "ধরতে আপত্তি নেই আমার, তবে তোমাদেরও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাইতে হবে।"

"বেশ গাইব।" সকলে সমস্বরে সম্মতি জানায়।

আমি শুরু করি—

"কৃষ্ণ জিন্‌কা নাম হ্যাঁয়,
গোকুল জিন্‌কা ধাম হ্যাঁয়,
এয়সে শ্রীভগবানকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
যশোদা জিন্‌কা মাইয়া হ্যাঁয়,
নন্দজী বাপাইয়া হ্যাঁয়,
এয়সে শ্রীগোপালকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
রাধা জিন্‌কী প্যারী হ্যাঁয়,
কৃষ্ণজী-মুরারি হ্যাঁয়,
এয়সে শ্রীঘনশ্যামকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয়।..."

মানুষ যে কত ছোট, কত দুর্বল, কত অসহায়—হিমালয়ের অন্তরলোকে এলে তার প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে। আর তাই সে এখানে দ্বিধাহীন চিত্তে সর্বশক্তিমানের কাছে আশ্রয় নিতে পারে। আমরাও নিয়েছি। এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে পারলে তার একটা

ফল পাওয়াই যায়। আমরাও পেলাম। আমাদের সকল শঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করে সূর্য উঠল আকাশে। তার স্নিগ্ধ ও মধুর রোদে ছেয়ে গেল চারিদিক। আশার আলো মন থেকে নিরাশার আঁধারকে দূর করে দিল।

আড়াইটার সময় কুলিরা ফিরে এলো। তারা জানলো—ওদের তিনটা তাঁবু গিয়েছে, কিন্তু খুঁটি বা 'পোল' গেছে দু'টোর।

তাহলে তো অমূল্যরা খুবই মুশকিলে পড়বে। দু'টো তাঁবুতে ছ'জন লোক শুতে পারে। ওরা সেখানে বারোজন।

বাড়তি মজুরীর লোভ দেখাবার পরেও কুলিরা কেউ খুঁটিটা নিয়ে ওপরে যেতে রাজী হল না। আজ রাতে অমূল্যদের বড়ই কষ্ট হবে।

কিছুক্ষণ বাদে নির্মল তাঁবুতে আসে। বলে, "প্রাণেশদা একবার কিচেনে চলুন।"

"কেন বল তো ?"

"ভাল প্রেসার-কুকারটা ওপরে পাঠানো হয়েছে। আরেকটার কি যেন হয়েছে। চাল-ডাল কিছুতেই সেদ্ধ হচ্ছে না।"

পর্বতারোহীকে শৈলারোহণ থেকে রন্ধন পর্যন্ত সব-কিছুই জানতে হয়। অতএব প্রাণেশ বিনা বাক্যব্যয়ে নির্মলের সঙ্গে কিচেনে চলে যায়।

মণ্ডল তার নতুন সহকারী দিলবাহাদুরকে নিয়ে প্রজাপতির পরিচর্যা শুরু করেছে। মামা ক্যামেরায় ফিল্ম ভরছে, পণ্ডিত চিঠি লিখছে, সুশীল বিভাস ও দোরজি মালপত্র ঠিকঠাক করছে। দেশাই চলে গিয়েছে রান্নাঘরে। সবাই কিছু-না-কিছু করছে, কেবল আমিই বেকার।

না, আর একজনও বেকার বসে আছে—আমাদের জুনিয়ার গাইড রূপা সিং। সে তাঁবুর এক কোণে চুপচাপ বসে আছে। তাকে কাছে ডাকি। হেসে জিজ্ঞেস করি, "কার কথা ভাবছিস বসে বসে ?"

কে যেন রূপার ফর্সা মুখখানিতে খানিকটা সিঁদুর মাখিয়ে দিল। বুঝতে পারে সে ধরা পড়ে গিয়েছে। মনের কথা গোপন করে না সে। বলে, "এত আগে এদিকে বরফ পড়া শুরু হয় না। তবু রওনা হবার আগের দিন বিকেলে গিরিকা বলেছে—পথে নিশ্চয়ই বরফ পড়বে। থাক্ তোমার বরং গিয়ে কাজ নেই। সে কেমন করে জানতে পারল ?"

প্রশ্ন করলেও রূপা আমার কাছে কোন উত্তর চায় নি। তবু আমি মনে মনে ওদের দু'জনের কথাই ভেবে চলি—

মনের মানুষ চলে যাচ্ছে দূর-দুর্গমের পথে। চিন্তা হয় বৈকি। গভীর ভালোবাসা প্রিয়জনের দুঃখ-কষ্টের কথা যে আগের থেকেই জানিয়ে দেয়। এরা দরিদ্র এবং অশিক্ষিত হলেও মানুষ। এদের ভালোবাসার গভীরতা কিছু কম নয়, বরং বেশি। তাই হয়তো মেয়েটির মন আগের থেকেই বুঝতে পেরেছে পথে তুষারপাত হবে। রূপার কষ্ট হবে। তাই সে তাকে আসতে দিতে চায় নি।

কিন্তু রূপা সে নিষেধ শোনে নি। সে এসেছে আমাদের সঙ্গে। নিজের জন্য নয়, এসেছে সেই মেয়েটির জন্যই। আরও একশ টাকা যোগাড় করতে না পারলে যে গিরিকার মা মেয়ে দেবে না রূপাকে।

কথায় কথায় রূপা বলে যায় সব কথা। বলে—গিরিকা তাদেরই গাঁয়ের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই ওরা দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছে। কৈশোরের খেলার সাথীকে রূপা

যৌবনে জীবন-সাথী করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কনেপণ না হলে বিয়ে করা যায় না ওদের সমাজে। চারশ' টাকা না পেলে গিরিকার মা মেয়ে দেবে না রূপার হাতে। গত তিন বছরের চেষ্টায় রূপা তিনশ' টাকা যোগাড় করেছে কোনমতে। তাই সে ফতে সিংকে বলে তাকে সঙ্গী করতে রাজী করিয়েছে, গিরিকার নিষেধ অমান্য করে এই দুর্গম পথে এসেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রূপা আবার বলে, "সাব্, জানি না আপনাদের সঙ্গে আমাকে কদিন থাকতে হবে! তবে আপনারা আমাকে অন্ততঃ দশ দিন সঙ্গে রাখবেন।"

"কেন বল তো?"

"আরও একশ' টাকা না হলে যে আমি ওকে ঘরে আনতে পারব না।"

একটু হেসে আশ্বস্ত করি ওকে। বলি, "নিশ্চিন্ত থাকো, তুমি যাতে অন্তত একশ' টাকা হাতে নিয়ে ঘরে ফিরতে পার, সে ব্যবস্থা আমি করব।"

রূপা চুপ করে থাকে। আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি, "আচ্ছা, তোমাদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না?"

"হয়। তবে গ্রামের মোড়ল এবং গুরুজনরা স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া নিষ্পত্তি করে দেবার চেষ্টা করেন। না পারলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।"

"তখন কি এই কনেপণের টাকা ফেরত দিতে হয়?"

"স্ত্রীর অনুরোধে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে, তাকে দ্বিগুণ টাকা ফেরত দিতে হয় স্বামীকে। কিন্তু স্বামী যদি স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়, তাহলে সে কোন টাকা পায় না।"

আবার বরফ পড়তে শুরু হয়ে গেল। একটু বাদে শেরপা দোরজি তাঁবুতে ঢোকে, তার সঙ্গে ফতে সিং। ভালই হয়েছে। রাতে অমূল্যদের শোবার কষ্টটা একটু কম হবে। তাই বোধহয় সে ওদের দু'জনকে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে।

দোরজি অমূল্যর চিঠি দেয়। নেতা লিখেছে—

'শঙ্কুদা/বিভাস/প্রাণেশ,

এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলছে না, উইন্ডপ্রুফ-জ্যাকেটগুলো অত্যন্ত পুরনো, হাওয়া মানছে না। কাপোকের স্লীপিং-ব্যাগ ভিজে ঢোল হয়ে গিয়েছে, মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশানকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও—Equipment are unfit for high altitude. সেই সঙ্গে একটা রিপোর্টও পাঠিয়ে দিও।

আরেকটা কথা, মণ্ডলকে বলো সে না এলেও তার ট্রাঙ্ক দু'টো এখানে এসে গেছে। সুতরাং সে যেন নিশ্চিন্ত থাকে।

আমাদের জন্য চিন্তা করো না। আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। তোমরা সাবধানে থেকো। কাল সকালেই শিবির গুটিয়ে সব মালপত্র নিয়ে এখানে চলে এসো।

তোমরা আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

প্রজাপতির পরিচর্যা শেষ করে মণ্ডল এগিয়ে আসে আমার কাছে। সে মনোযোগ দিয়ে অমূল্যর চিঠিটা পড়ে। তারপরে জিজ্ঞেস করে, "ডাকে পাঠাবেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কবে ?"

"কাল।"

"তাহলে আমি একটা চিঠি দিতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই।"

খুশি হয়েই বোধ করি চুপ করে আছে মণ্ডল। খুশি হবারই কথা। এই প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যেও ঘরনীকে চিঠি লেখা। নিঃসন্দেহে গভীর প্রেমের পরিচায়ক।

কিন্তু ঘরের কথা ভাবার সময় দিই না ওকে। বলি, "সেদিন হরকিদুন থেকে ফেরার পথে তুমি তোমার সমীক্ষার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলে। তারপরেও তো বহু কীটপতঙ্গ হত্যা করলে, তাদের কথা কিছু বলবে কি ?"

"না।" বেশ চড়া স্বরে মণ্ডল জবাব দেয়।

ওর অভিমানের কারণটা বুঝতে পারি। হেসে বলি, "আচ্ছা, আর 'হত্যা' শব্দটি ব্যবহার করব না। ওসলা থেকে রওনা হবার পর থেকে তোমার সংগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত হিসেব দাও দেখি।"

মণ্ডল শান্ত হয়। সে শুরু করে, "আমরা ওসলা থেকে রওনা হয়েছি ১লা অক্টোবর, গত চারদিনে আর কালেক্‌শানের পরিমাণ মোটেই বেশি নয়। তাহলেও বলছি—

"ওসলা থেকে তালাও শিবির অর্থাৎ সাড়ে আট থেকে সাড়ে এগারো হাজার ফুট উচ্চতায় আমি উচ্চিংড়া, মৌমাছি, মশা-মাছি, ছারপোকা, মাকর, সাপ ও প্রজাপতি পেয়েছি। এই অঞ্চলের মাটি এবং বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। তবু নিচের দিকে একোনাইট ভূজ ম্যাগনোলিয়া এবং রডোডেনড্রন প্রভৃতি প্রচুর গাছ এবং ওপরের দিকে ঘন সবুজ ঘাস দেখেছি। আপনারা জানেন যে সুপিন বনবিভাগটির সীমা ঐ তালাও পর্যন্ত। বিরাট এই বনাঞ্চল। নৈটয়ার থেকে হরকিদুন সহ প্রায় সমস্ত অঞ্চল জুড়েই—আয়তন প্রায় ২৭০.২০ বর্গমাইল। বাৎসরিক আয় দু'লক্ষ টাকার মতো।"

"মাত্র ?" আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি। "সিংঘুর বনবিভাগের গড় বাৎসরিক আয় যে শুনেছি পনেরো লক্ষ টাকার ওপরে ! সুপিন তো তার চেয়ে অনেক বড় প্রায় সাড়ে চারগুণ !"

"হ্যাঁ, সিংঘুর বন-বিভাগের আয়তন মাত্র ৬১.৪৩ বর্গমাইল। অর্থাৎ আয়তনে প্রায় সাড়ে চারগুণ হওয়া সত্ত্বেও সুপিনের আয় সিংঘুরের এক অষ্টমাংশ—অন্ততঃ পুরৌলার ডিভিশ্যনাল ফরেস্ট অফিসার শ্রী এস. চন্দ্র আমাকে যা বলেছেন। এর কারণ স্বরূপ তিনি আমাকে বলেছেন—"This is because most of the forests of Supin Range are covered with snow and the others are still commercially unexploitable for want of communication and transport facilities. Another reason for the high revenue of Singhur is that it contains mostly Chir forests which are tapped for resin also in adition to timber, whereas there are only a few Chir forests in Supin Range."

একবার থামে মণ্ডল। তারপরে আবার বলতে থাকে, "যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম—তালাও থেকে মূল-শিবির পর্যন্ত অর্থাৎ সাড়ে এগারো থেকে বারো হাজার ফুটে শুধু কয়েকটা প্রজাপতি পেয়েছি। আপনারা জানেন এ পথে ঘাস ছাড়া আর কোন গাছপালা পাই নি।"

আমরা মাথা নাড়ি। মণ্ডল বলে চলে, "অথচ গতকাল মূল-শিবির থেকে এই এক নম্বর শিবিরে আসার পথে অর্থাৎ বারো থেকে সাড়ে তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় আমি কিন্তু অনেক প্রজাপতি পেয়েছি।"

"যেমন ?"

"পেয়েছি উচ্চিংড়া, মৌমাছি ও বোলতা। পেয়েছি, মশা-মাছি, গোবরকীট ও প্রজাপতি। তবে এখানেই বোধহয় আমার কালেক্‌শান শেষ।"

"কেন ?" পণ্ডিত মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে বসে।

আর যায় কোথায় ! মণ্ডল চেঁচিয়ে ওঠে, "কেন বুঝতে পারছ না ? দিবারাত্র বরফ পড়ছে, গাছপালা কিছ্ নেই, এখানে কীট-পতঙ্গ আসবে কেন ? কেউ আসে না। নেহাৎ আমার অদৃষ্ট মন্দ বলে তোমার ভাঁওতায় ভুলে চলে এসেছি। এবার ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যেতে পারলে বেঁচে যাই।"

পণ্ডিত মণ্ডলকে আর ঘাঁটাতে সাহস পায় না। আমি নিঃশব্দে কাগজ কলম নিয়ে বসতে চাই। কিন্তু পারি না, দাদু তাঁবুতে ঢোকে। লাঞ্চ এসে গেছে।

শেষ পর্যন্ত দু' চামচ গরম খিচুড়ি পাওয়া গেল। ঠিকমতো সেদ্ধ হয় নি অবশ্য, তাহলেও অমৃত।

তাছাড়া সুসেদ্ধ হবেই বা কেমন করে ? একটি স্টোভ, কামি নেই, প্রেসার কুকারটাও গোলমাল করছে, তার ওপরে এই আবহাওয়া—আবার তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে।

হোক্ গে। হিমালয়ের আকাশে যত বরফ আছে, সব ঝরে পড়ুক। কেবল কাল সকাল থেকে যেন আবহাওয়াটা ভাল হয়।

রূপা বলেছে, তাই নাকি হবে। তার ভাষায়—কাল সবেরে মৌসম সাফ হো জায়গা। কারণ সে দুর্যোধনের কাছে ভেড়া মানত করেছে। মানে দুর্যোধন যদি আগামী কয়েক দিনের আবহাওয়া ভাল করে দিতে পারেন, আমরা যদি নির্বিঘ্নে ধুমধার পেরিয়ে ওপারে চলে যেতে পারি, তাহলে রূপাকে একটি ভেড়ার দাম দিতে হবে—অন্তত শ'খানেক টাকা। সেই টাকা দিয়ে সে একটি ভেড়া কিনে ওসলা গাঁয়ের দুর্যোধন মন্দিরে বলি দেবে।

অতএব কাল সকাল থেকে আবহাওয়া যে ভাল হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজ যত ইচ্ছে তুষারপাত হতে পারে, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

কেবল কোয়ার্টার মাস্টার এই তুষারপাতকে বরদাস্ত করতে পারছে না। খাওয়া শেষ হবার পরে তাই সে বলে বসল, "এভাবে তুষারপাত চলতে থাকলে বিকেলে আর পরোটা দিতে পারব না। চা ও বিস্কুট দিয়েই ডিনার সারতে হবে।"

তাই সারব। কিন্তু কাল যেন আবহাওয়া ভাল হয়।

খেয়ে নিয়ে সবাই স্লীপিং-ব্যাগে ঢুকে পড়ল। কেবল আমাকে বসে থাকতে হল। আমি নেতার নির্দেশ পালন করছি। রিপোর্ট লিখছি—

'On 2nd October the whole team moved to camp I (13.500) situated on the lateral moraine of Bandarpunch Bamak just at the foot of Swargarohini.

'On 3rd October the party moved further up in the N. E. direction and established camp II (14,500) near a glacial tarn. The gain in altitude was not

much but the biting air and crossing three moraine ridges were difficult amidst snowfall.

'On 4 th October the team suffered a serious porter trouble, almost half of the porters fled away. The team was divided into two parties. The first party established camp III at 16,500 ft. The second party will join them on 5th and if the Weather God permits the Dumdhar Kandi pass will be crossed on 6th October ...

॥ সতেরো ॥

গতরাতে একরকম জেগেই কাটাতে হয়েছে। একে তো এয়ার-ম্যাট্রেস ফোলে নি, তার ওপর সারা গায়ে অসহ্য চুলকুনি, নাক-মুখ ঠোঁট ও পা ফেটে চৌচির। রাতে শুয়ে পড়লেই সেগুলি বেশি সজীব হয়ে ওঠে। সব চেয়ে বড় কথা সারারাত সমানে তুষারপাত চলেছে। মাঝে মাঝেই বরফের ভারে তাঁবু ঝুলে পড়েছে। বার বার তাঁবু পরিষ্কার করতে হয়েছে। কাজটা অবশ্য করেছে বিভাস ও প্রাণেশ। ওরা প্রবল তুষারপাত ও প্রচন্ড শীতকে অগ্রাহ্য করে বাইরে বেরিয়ে আইস-এক্স দিয়ে তাঁবুর ওপরকার বরফ সাফ করেছে। আমরা শুধু জেগে থেকে ওদের মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েছি। কিন্তু তারও একটা প্রয়োজন ছিল। ওরা পর্বতারোহী হলেও রক্ত-মাংসের মানুষ তো বটেই!

সকালে তাই ঘুম ভাঙার পরেও স্লীপিং-ব্যাগ ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু দাদুর কথা শুনে আর শুয়ে থাকা সম্ভব হল না। যথারীতি দাদু আজও সবার আগে উঠেছে। পাশের তাঁবুতে গিয়ে দোরজি ও রূপার ঘুম ভাঙিয়েছে। তাদের চা-এর বন্দোবস্ত করতে বলে তাঁবুতে ফিরে এসেছে। আর এসেই ঘোষণা করেছে, "আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে একটু বাদেই রোদ উঠবে।"

তাড়াতাড়ি উঠে বসেছি। জুতো পরে বাইরে এসেছি। দাদু ঠিকই বলেছে—মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ। মনে মনে বীরশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনকে প্রণাম করি। হয়তো তারই করুণায় প্রকৃতি আজ এমন করুণাময়ী।

চারিপাশের পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকাই। তাদের সবার শিরে সোনালী রোদের আভা। স্বর্গারোহিণী সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের পশ্চিমে। আশ্চর্য, এত তুষারপাতের পরেও সে সম্পূর্ণ সাদা হয় নি! সাদা আর কালো মিলিয়ে তার অপরূপ অবয়ব। তাই সে এমন অনিন্দ্যসুন্দরী।

কালোর জন্যই কিন্তু সে এত সুন্দর। অন্তহীন সাদার মাঝেই কেবল কালোর কমনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। শুধু স্বর্গারোহিণী নয়, সুন্দর লাগছে ধুমধার-কান্দিকে। তুষারপাত তার শরীরে সাদার প্রলেপ বোলাতে পারে নি। সে-ও সাদার মাঝে কালো থেকে প্রতিনিয়ত আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। তাই তো চলেছি তার কাছে। প্রকৃতি সহায় থাকলে আগামীকালই আমরা পৌঁছব ঐ আলোময় কালোর কাছে।

না, রূপাদের দুর্যোধন সত্যই শক্তিমান। আরও আগে তাঁর করুণা ভিক্ষা করা উচিত

ছিল। তাহলে বিগত দু'দিনের পথকষ্ট যেমন বেঁচে যেত, তেমনি কুলিরা এভাবে আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যেত না।

যাক্ গে, যা হবার হয়েছে। এভাবে ভালোয় ভালোয় ধুমধার পেরিয়ে ওপারে যেতে পারলেই সকল শ্রম সার্থক হয়।

বিভাস দোরজিকে বলল, "এখানে আর রান্না-বান্না নয়। আরেকবার চা বানাও সবার জন্যে। চা-বিস্কুট খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

গতকাল দুপুরের সেই দু-চামচ খিচুড়ির পরে চা-বিস্কুট ছাড়া আর কিছু পেটে পড়ে নি। তাহলেও কেউ সহ-নেতার নির্দেশের প্রতিবাদ করে না। বিভাস অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। সে প্রতি বছর হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করছে। সে উত্তরকাশী পর্বতারোহণ বিদ্যালয় থেকে 'বেসিক ট্রেনিং' নিয়েছে। এটি নিয়ে সে তিনটি অভিযানের সহ-নেতৃত্ব করছে।

চা-বিস্কুট না পাওয়া পর্যন্ত কুলিরা কেউ তাঁবু থেকে বের হল না। কাজেই তাদের তাঁবুর বাইরে আনতে বেলা আটটা বেজে গেল। ভরসার কথা গতকালের তুষারপাত ওদের মত পরিবর্তন করতে সমর্থ হয় নি। ওপরে যেতে কোন আপত্তি নেই ওদের, তবে দৈনিক একটাকা করে বাড়তি মজুরি দিতে হবে, এবং তাদের এ দাবী আমরা গতকালই মেনে নিয়েছি।

শেষ পর্যন্ত তাঁবু গোটানো হল। মালপত্র গোছানো গেল। কাজগুলো সহজ নয় কোনমতেই। ছ'ইঞ্চির ওপরে বরফ জমে আছে সর্বত্র। সেই তুষারের কাদা ভেঙে কাজ করা খুবই কঠিন।

তাঁবু খোলার পরেও আমরা কিন্তু তাঁবুর জায়গাগুলোতেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। চারিদিকে বরফের ভেতরে এই কয়েক টুকরো মাটির যে এখন অনেক দাম আমাদের কাছে।

কুলিদের কিন্তু শুধু চা-বিস্কুটে হল না। বিভাসকে ওষুধের বাক্স খুলতে হল। মাথাধরা ও কাশির ওষুধ দিয়ে মাল-বাহকদের চাঙ্গা করে তুলতে হল।

এবং তারপরেও বাকি ছিল। তুষারাবৃত পথ, রঙ্গিন চশমা ছাড়া এ পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমাদের পরিবেশনের জন্য প্রতীক্ষা করল না ওরা। নিজেরাই বাক্স খুলে চশমাগুলো ভাগ করে নিল।

আর তারই ফলে দেখা গেল একজন কুলি চশমা পায় নি। প্রাণেশ তার অভিযোগ শুনল মন দিয়ে। তারপরে নিজের চশমাটি দিয়ে দিল তাকে।

আঁতকে উঠি! খালি চোখে তুষারাবৃত পথ চললে মানুষ তুষারান্ধ হয়ে যায়। সেই সাময়িক অন্ধত্ব তিন-চারদিন স্থায়ী হলেও অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক। তাড়াতাড়ি ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, "চশমা ছাড়া তোর চলবে কেমন করে?"

"মণ্ডলদার বাক্সে একজোড় চশমা দেখেছি।" প্রাণেশ শান্তস্বরে উত্তর দেয়।

"সে বাক্স তো ওপরে চলে গিয়েছে। এখন কি চোখে দিয়ে ওপরে যাবি?"

"আমার একখানা পাতলা লাল কাপড়ের রুমাল রয়েছে, সেটা চোখে বেঁধে নেব।"

"চোখে রুমাল বেঁধে এই দুর্গম তুষারাবৃত পথ পেরোবি?"

"আপনি ঘাবড়াবেন না তো শঙ্কুদা! আমি ঠিক চলে যাবো। কুলিদের সুখ-সুবিধা সবার আগে। ওরা না হলে যে আমরা অচল।"

এত তোয়াজের পরেও দেখা গেল, পাঁচটি বোঝা পড়ে রয়েছে। সদস্যরা সবাই যথাসাধ্য মাল নিয়েছে। তাদের পক্ষে আর মাল নেওয়া সম্ভব নয়। কুলিরাও একই কথা বলছে। বিভাস ও প্রাণেশ অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকায়।

শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই। সেতীকে কাছে ডাকি। বলি, "এ মাল ফেলে গেলে ওপরে গিয়ে খানা মিলবে না।"

"লেকিন সাব্, সব কুল্লি ডবল লোড লিয়া। কোই আউর জায়দা সমান লেনা নহী সক্‌তা।"

"নহী সক্‌তা ?"

"জী সাব্।"

"কটা বোঝা পড়ে আছে ?"

"পাঁচ।"

"পাঁচজন কুলির একদিনের মজুরি কত ?"

মনে মনে হিসেব করে সেতী উত্তর দেয়, "পঞ্চাশ রুপেয়া।"

"বেশ পঞ্চাশ টাকা পাবি, মাল কটা ওপরে নিয়ে চল্।"

"সাব্ ?" সেতী বোধ হয় বুঝতে পারে না আমার কথা।

"এই মাল ক'টা আজ ওপরে নিয়ে গেলে, আমি তোদের অগ্রিম বাড়তি পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত দেব। কুলিদের জিজ্ঞেস কর্, তারা রাজী আছে কিনা ?"

বলা বাহুল্য তারা রাজী হয়। পঞ্চাশ টাকা হাতে পেয়ে মাল ভাগ করে নিয়ে নেয়। কে বলবে একটু আগেও এই মাল নেওয়া তাদের সাধ্যাতীত ছিল !

ডাক-রাণারকে নিচে রওনা করে দিয়ে বেলা ঠিক দশটার সময় আমাদের যাত্রা শুরু হল। দুটি তুষারাবৃত গিরিশিরার মাঝখান দিয়ে তুষারাবৃত সংকীর্ণ চড়াই পথ। নরম তুষার পেরিয়ে চলতে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে। পা টেনে তুলতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলেও চলতে পারছি। কারণ অসুবিধেয় পড়লেই প্রাণেশ, দোরজি কিংবা রূপা সাহায্য করছে আমাকে।

বেশ ঝক্‌ঝকে রোদ উঠেছে চারিদিকে। সোনালী সূর্য আজ আমাদের মনের আলো দিয়েছে জ্বালিয়ে। মনে হচ্ছে আমরা পারব। পারব ঐ দুর্গম ধুমধার পেরিয়ে ওপারে যেতে। ওপারে হয়তো তুষারপাত হয় নি। সেখানে জল আছে, কাঠ আছে এবং বরফ নেই। আমরা যাবো—কালই ওপারে যাব।

আমি আর বিভাস পাশাপাশি পথ চলেছি। কথায় কথায় বিভাসকে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে তুই হঠাৎ এই তমসা উপত্যকায় অভিযানের আয়োজন করলি কেন ?"

"গোড়া থেকেই ইচ্ছে ছিল, এবারে একটি অজানা ও অপরিচিত অঞ্চলে অভিযান করতে হবে। তাই যখন শুনলাম বাংলা থেকে এখন পর্যন্ত তমসা উপত্যকায় কেউ আসে নি এবং কোন পর্বতারোহী দল আজ পর্যন্ত ধুমধার-কান্দি অতিক্রম করে নি, তখন আমি এই অঞ্চলকেই নির্বাচিত করলাম।"

"তোর কি মনে হচ্ছে, সে নির্বাচন সার্থক হয়েছে ?"

"নিশ্চয়।" বিভাস অকম্পিত কণ্ঠে বলে, "পদযাত্রার আদর্শ ক্ষেত্র এই তমসা উপত্যকা। অনেক আগেই আমাদের এ অঞ্চলে আসা উচিত ছিল। তবে পর্বতাভিযানের

দিক থেকে এ অঞ্চলে কিছু অসুবিধে রয়েছে।"

"যেমন ?"

"এখানকার হিমবাহ অঞ্চলের বিরাটত্বের তুলনায় শিখরের সংখ্যা বড়ই কম। তাছাড়া কুলি এবং পথে দোকানপাটের অভাবটাও ভেবে দেখবার মতো। আরও একটি অসুবিধে রয়েছে।"

"কি ?"

"স্থানীয় অধিবাসীরা হিমবাহ অঞ্চল সম্পর্কে বড়ই অনভিজ্ঞ। অবশ্য পর্বতারোহীরা এ অঞ্চলে আসে না বলেই এমন হয়েছে। জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব অসুবিধে দূর হয়ে যাবে।"

প্রায় ঘন্টা তিনেক পদচারণার পরে সেই সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট ছাড়িয়ে আমরা উঠে এলাম একটি প্রশস্ত প্রান্তরে—তুষারাবৃত প্রান্তর। তবে গত কয়েক ঘন্টার রোদে কিছু বরফ গলে গিয়েছে। এখানে-ওখানে জল জমে আছে। পথ রীতিমত পিচ্ছিল। তাহলেও বরফ কমে যাবার জন্য আমরা বেশ জোরে চলতে পারছি। একটু সাবধানে চলতে হচ্ছে এই যা।

প্রান্তরটি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গিয়েছে। আমরা সেই ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে

ঢালের শেষে প্রান্তরটি প্রায় সমতল। সেখানে পৌঁছেই দেখতে পেলাম রঙিন তাঁবু আর রঙিন পোশাক পরা সহযাত্রীদের। ওরা চিৎকার করছে, আমরাও চিৎকার করে সাড়া দিলাম। ওরা ছুটে আসছে, আমরাও ছুটে চললাম।

সবার আগে এসে পৌঁছল লালু। তারপরে অমূল্য পান্না রামনাথ বীজেন্দ্র ও পাসাং। ওরা আমাদের বুকস্যাক কেড়ে নিল। লালুর প্রদর্শিত পথে আমরা এগিয়ে চললাম।

সুশান্তবাবু শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে 'মুভি' নিচ্ছেন। ডাক্তার ও শম্ভু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অবশেষে আমরা উঠে আসি শিবিরে। প্রান্তরটির উচ্চতম স্থানে স্থাপিত হয়েছে আমাদের এই দু'নম্বর শিবির। সেই চিরকালের কালো পাথরখানিকে আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি তার দিকে—মোহময় ধুমধারের দিকে।

আমরা আজ পৌঁছে গিয়েছি সাফল্যের সিংহদ্বারে। এ রকম আবহাওয়া পেলে আগামীকাল নিশ্চয়ই ধুমধার পেরিয়ে বান্দরপূঁছ গিরিশিরার ওপারে চলো যাবো—তমসা উপত্যকা থেকে ভাগীরথী উপত্যকায় উপনীত হব।

ডাক্তারও সেই কথা বলে। সে গতকাল থেকে দেখছে ধুমধারকে। তার যে আর তর সইছে না। সে বলে, "এসে গিয়েছি শঙ্কুদা! খানিকটা এগিয়ে গিয়েই ধুমধারের সোজা পথ—তার গা থেকে নেমে আসা হিমবাহ বান্দরপূঁছ হিমবাহের সঙ্গমে আমাদের এই শিবির হয়েছে।"

আর কিছু বলতে পারে না সুব্রত। পান্না গ্লুকোজ-ওয়াটার নিয়ে আসে। প্রাণভরে পান করি। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

পান্না ভরসা দেয়, "একটু বাদে চা ও চিঁড়েভাজা আসছে।"

না, ছেলেটা সত্যি বেশ কাজের। বিস্কুটের বদলে চিঁড়েভাজার ব্যবস্থা করেছে। দুর্যোধন ওর মঙ্গল করুন।

একে একে কুলিরা মাল নিয়ে আসছে। একজন কুলি পথে অসুস্থ হয়েছে। অন্যরা তার মাল বয়ে এনেছে। ডাক্তার অসুস্থ কুলিকে ওষুধ দেয়।

চশমা পেয়েও কয়েকজন কুলি চশমা পরে নি। ফলে তাদের চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে। সর্বনাশ, এমনিতেই কুলির সংখ্যা অর্ধেকের চেয়েও কম। এর পরে যদি কেউ আবার তুষারান্ধ হয়ে যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! সুতরাং ডাক্তারকে সতর্ক করি। সে তাদের চিকিৎসা শুরু করে দেয়।

ডাক্তারটি আমাদের বড়ই ভালো হয়েছে। যেমন সুন্দর স্বভাব, তেমনি কাজের ছেলে। এমনিই হয়, শেষ দিকে ডাক্তার খুঁজে পাওয়াই এ অভিযানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। যে ডাক্তার আসবে বলে ঠিক হয়েছিল, অনিবার্য কারণে সে এলো না সঙ্গে। আর তার না-আসার খবরটা পাওয়া গেল রওনা হবার মাত্র চারদিন আগে, বাবার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পর আমি যেদিন প্রথম দূতাগার অফিসে গিয়েছি।

খবরটা শুনেই যোগাযোগ করলাম শুভেন্দুর সঙ্গে—পর্বতপ্রেমিক অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সে নিজে ডাক্তার। কাজেই ডাক্তর যোগাড় করতে তেমন বেগ পেতে হয় নি তার। কিন্তু এমন ভাল ছেলে যে আমাদের অদৃষ্টে জুটবে, তা সুব্রতকে দেখার আগ ভাবতেও পারি নি।

নিজের পায়ের ব্যথা বিস্মৃত হয়ে সে সমানে আমাদের পায়ের দিকে নজর রাখছে। কেবলই সাবধান করছে, "ভুলে যাবেন না, আমাদের অধিকাংশেরই পায়ে হান্টার-শু। হান্টার পাথুরে পথে যতই ভাল হক, বরফে একেবারে অচল। ভিজে জুতো, ভিজে মোজা পরে বরফ ভাঙলে ফ্রস্ট-বাইট হবেই। তাড়াতাড়ি জুতো-মোজা খুলে ক্যাম্প-শু পরে নিন। রোদ উঠেছে। যতোটা পারেন, জুতো-মোজা শুকিয়ে নিন।"

আমরা অক্ষরে অক্ষরে তার নির্দেশ পালন করি। শুধু আমরা নই, কুলিরাও তার কথা শোনে। শুধু শোনে না রূপা। সে হেসে ডাক্তারকে বলে, "ডগদার সাব, আমরা ববফে জন্মাই, বরফে মারা যাই। বরফ আমাদের জনম-মরণের সাথী। বরফ কখনও বেইমানি করে না আমাদের সঙ্গে।"

তাঁবু টাঙানোর পরে মালপত্র বাছাই শুরু হয়। কুলি কম। আগামীকাল থেকে আর মাল ফেরি করা সম্ভব হবে না। কুলিদের নিয়ে একবারেই এগিয়ে যেতে হবে ধুমধারের দিকে। তার মানে তিনদিনের মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছে যাব হরশিল। সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চারদিনের প্রয়োজনীয় খাবার, কেরোসিন এবং ওষুধ শুধু সঙ্গে নেবো। বাকি সব ফেলে যেতে হবে এখানে।

অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে কেবল মণ্ডলের বাক্স দু'টি। সে দুটিকে ফেলে গেলে নাকি ওর ডিরেক্টর ওকে শূলে চড়াবেন।

তা সত্ত্বেও অমূল্য বলেছে, "এখানে নয়, ধুমধারের ওপর থেকে ফেলে দেওয়া হবে ও-দুটোকে।"

"সেই সঙ্গে দয়া করে আমাকেও ফেলে দেবেন অমূল্যদা!" মণ্ডল করুণ কণ্ঠে আবেদন রেখেছে।

অমূল্য সে আবেদন মঞ্জুর করে নি। গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করেছে, "অনুরাধার এত বড় সর্বনাশ আমি কিছুতেই করতে পারব না।"

আমরা সোচ্চার স্বরে হেসে উঠেছি। এবং মণ্ডলও সে অট্টহাসিতে যোগদান

করেছে।

পেটভরা খিচুড়ির সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ ও আচার পাওয়া গেছে আজ। খাবার পরে ওরা মালপত্র ঠিক করছে আর আমি গল্প করছি সুশান্তবাবু শম্ভু ডাক্তার ও অমূল্যর সঙ্গে।

অমূল্য বলছে গতকাল রাতের কথা। কাল রাতটা আমাদের চেয়েও খারাপ কেটেছে ওদের। একে তো ছ'জনের তাঁবুতে দশজন। তার ওপর সারারাতই প্রবল তুষারপাত হয়েছে—সেই সঙ্গে ছিল ঝড়ো হাওয়া। মাঝে মাঝেই যেমন বাইরে বেরিয়ে তাঁবুর ওপরের বরফ ফেলতে হয়েছে, তেমনি ভেতরে বসে তাঁবুর তলার দিকটা চেপে রাখতে হয়েছে, যাতে উড়ে না যায়।

অথচ আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে কার সাধ্য বলে, এই উদার ও মহিমময়ী প্রকৃতি কাল এমন অকরুণ হয়েছিল! সাড়ে পাঁচটা বাজে কিন্তু চারিদিকে খটখটে রোদ। কৃষ্ণচূড়া ও স্বর্গারোহিণী এবং তাদের সতীর্থদের সারা গায়ে এখনও সোনার ছড়াছড়ি।

দুপুরে আমরা যখন এখানে এসেছিলাম, তখন সমস্ত অঞ্চলটা সাদা হয়ে ছিল। এখন তার অনেকটাই কালো এবং সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রান্তরটির এখানে-ওখানে বড় বড় পাথর জেগে উঠেছে। ওরা যেন ঘুমিয়েছিল তুষারশয্যায়। এবারে উঠে বসে আমাদের আশার বাণী শোনাচ্ছে।

কালকের দিনটা যেমন খারাপ গিয়েছে, আজকের দিনটি তেমনি ভাল কাটল। গতকাল বলতে গেলে না-খেয়ে থেকেছি, আর আজ অতি-ভোজনের পাল্লায় পড়েছি। একটু আগে পান্না আবার চা ও বিস্কুট পরিবেশন করে গিয়েছে। বিস্কুট নিতে আপত্তি করায় সে ধমক লাগিয়েছে। বলেছে, "কাল অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! আজ পাচ্ছেন, খেয়ে নিন! না খেলে তো ফেলে যেতে হবে।"

সুতরাং খেয়েছি। খেতে খেতে এই দুটি দিনের কথাই ভেবেছি—৪ঠা ও ৫ই অক্টোবরের কথা। পাশাপাশি দু'টি দিন, কিন্তু কত তফাৎ! কাল কুলিরা চলে গিয়েছে, সহযাত্রীদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। আজ মিলিত হয়েছি। কাল সারাদিন বরফ পড়েছে, আজ সারাদিন রোদ রয়েছে। আজ শুধু আকাশ মেঘমুক্ত নয়, আজ আমাদের মন থেকে নিরাশার মেঘ মুছে গিয়েছে।

"ইউরেকা!" মণ্ডলের চিৎকারে আলোচনা থেমে যায়। একটু বাদেই বুঝতে পারি ব্যাপারটা—প্রাণেশ তাকে একটা পোকা ধরে দিয়েছে। এই উচ্চতায়, এত বরফে জীবন্ত পোকা! চেঁচিয়ে ওঠার অধিকার মণ্ডলের অবশ্যই আছে।

শম্ভুকে চুপ করে থাকতে দেখে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে "কি ভাবছেন শম্ভুদা?"

"ভাবছি!" শম্ভু একটু থামে, তারপরে বলে, "আবহাওয়া ভাল হলেই যে আমরা ধুমধার পেরোতে পারব, তার কোন মানে নেই।"

"হঠাৎ এমন কথা?" ডাক্তার বিস্মিত।

শম্ভু উত্তর দেয়, "হঠাৎ নয় ভাই। তুমি তো জানো, এ-পথ একেবারেই অচেনা, আমরা জানি না ধুমধার কোথায়! তুষারপাতের জন্য সব কিছু পালটে গিয়েছে। ফতে সিং শুধু বলছে, ঐ কালো পাথরটার কাছেই ধুমধার-কান্দি। কিন্তু কোন্ পথে সেখানে পৌঁছব, সে কথা সে-ও বলতে পারছে না। কেমন করে বলবে? সে যখন ওপারে গেছে, তখন তো বরফ ছিল না। তাই সে শুধু বলছে—আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন, আমি

আপনাদের ওপারে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা, কোন অভিযাত্রী কি ধুমধারের কোন বিবরণ রেখে যান নি?"

"না, কেমন করে রাখবেন! কোন অভিযাত্রী যে আজ পর্যন্ত এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন নি। কেবল যমুনা নদীর উৎসের আবিষ্কারক এবং যমুযোত্রী অঞ্চলের প্রথম য়ুরোপীয় অভিযাত্রী ডাব্‌লু ফ্রেজার লিখে গেছেন—

'Dhumdhar, a very lofty and wild range to the north of Bundarpounch; and along which there is a very alarming road leading to remote parts of Rewaeen.

"কিন্তু এই বিবরণও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল নয়। ১৮১৫ সালের জু২ মাসে যমুনোত্রী থেকে ধরালীর পথে তিনি বাণসারু গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তখন তিনি স্থানীয় লোকদের কাছে ধুমধারের কথা জানতে পারেন।"

"কত সাল বললেন শম্ভুদা, ১৮১৫?" শম্ভু থামতেই ডাক্তার প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" শম্ভু উত্তর দেয়, "ফ্রেজারের বর্ণনার বয়স দেড়শ' বছরেরও বেশি। সুতরাং নিয়ত পরিবর্তনশীল হিমালয়ের কাছে তার কোন মূল্য নেই। কিন্তু এই বর্ণনা থেকে আমরা একটা জিনিস ধরে নিতে পারি, ধুমধার পর্বতারোহীদের অচেনা হলেও অজানা নয় স্থানীয়দের কাছে। আম আমাদের ফতে সিং বোধ হয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।"

শম্ভু থামতেই অমূল্য উঠে দাঁড়ায়, বলে, "আমি একবার কিচেন থেকে ঘুরে আসি। আজ আটটায় ডিনার। ডিনারের পরেই শুয়ে পড়বে সবাই। কাল পাঁচটায় বেড্-টি, সাড়ে ছ'টায় মার্চ। একটা কথা মনে রেখো, কাল আমাদের ধুমধার পেরোতেই হবে। ওপারে যেতে পারলেই আর বরফ ভাঙতে হবে না, জল ও জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাবে।"

অমূল্য চলে যায় কিন্তু আমি তার শেষের কথাগুলো ভাবতে থাকি—কাল আমরা ধুমধার পেরুবো, জলা ও জ্বালানী পাবো। ভাবতেও ভাল লাগছে।

একে একে সুশান্তবাবু আর শম্ভুও চলে গেল তাঁবুর ভেতরে। ডাক্তার ও আমি শুধু বসে আছি বাইরে। বসে বসে ডাক্তারের কথা শুনছি।

ডাক্তার আমার দেশী মানুষ। তারও বাড়ি ছিল বরিশাল জেলায়। পিতা ডাঃ সুধাংশু সেনগুপ্ত খড়্গপুরে প্র্যাকটিস করেন। ওঁরা দু বোন এক ভাই। সুব্রত সবার ছোট। বড়দির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছোড়দিও ডাক্তার।

সুব্রত বলছে নিজের কথা, "শঙ্কুদা, ভাবতে অবাক লাগছে, যাদের বই পড়ে আমি প্রথম হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তাঁদেরই একজনকে আমি আমার প্রথম হিমালয় যাত্রার সঙ্গী রূপে পাশে পেয়েছি।"

ডাক্তার থামলেও আমি চুপ করে থাকি। আমাকে নীরব দেখেই বোধ হয় সে আবার বলতে থাকে, "আপনাদের বই পড়েছি আর হিমালয়কে ভালোবেসেছি। ভেবেছি, কবে আমি আসতে পারব এই দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘতার মাঝে, এই ভয়ঙ্কর ও সুন্দরের মাঝে, এই বিস্ময় ও রহস্যের মাঝে!

"সেই সুযোগই আমি পেয়েছি এই অভিযানে এসে। গত কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কোন শৈলাবাসে মাসাধিকাল কাটালেও হিমালয়কে এত নিবিড় করে পাওয়া হত না আমার। কারণ সেখানে তো বিপদ আর সৌন্দর্যের এমন বিস্ময়কর সহাবস্থান সম্ভব নয়। কাজেই আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, বরং ভাল লাগছে—ভীষণ ভাল।"

হিমেল হাওয়ার পরশে আমাদের চমক ভাঙে। তাকিয়ে দেখি রোদের শেষ ছায়াটুকু মিলিয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার চূড়া থেকে। সূর্য গেছে অস্তাচলে।

আর বাইরে বসে থাকা সমীচীন হবে না। কারণ উচ্চ হিমালয়ের জীবন মানেই সূর্য। সূর্য বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নেমে আসে মৃত্যুর শীতলতা।

তাঁবুতে এসে দেখি সহযাত্রীরা বেশ মজলিশী চালে গোল হয়ে বসেছে। হাতে তাদের গরম কফির মগ। আমাদের ভাগ্যেও দু'টি মগ জুটল।

প্রস্তাবটা প্রথম করেন সুশান্তবাবু, "শঙ্কুবাবু! কাল নাকি আপনি মধু-বৃন্দাবনে'-র কীর্তন করেছেন?"

সুশান্তবাবু আমার 'মধু-বৃন্দাবনে' পড়েছেন।

হেসে বলি, "আমি একা নই, সবাই মিলে করেছি।"

"বেশ আজও সবাই মিলে করা যাবে। আপনি আরম্ভ করুন।"

সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের নাম নেওয়া ভালই। বিশেষ করে কৃষ্ণ-ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতি যখন আজ আমাদের প্রতি সদয়া হয়েছেন।

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে মগটা পাশে রাখি। শুরু করি--

'......লুট লুট দধি মাখন খায়ো,
গোয়ালবাল সঙ্গ ধেনু চরায়ো,
এয়সে লীলাধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
দ্রুপদসুতাকী লাজ বচায়ো,
গজ আউর গ্রাহকে ফন্দ ছুঁড়ায়ো,
এয়সে কৃপাধাম্‌কো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥
কুরু পাণ্ডবকো যুদ্ধ মচায়ো,
অর্জুনকো উপদেশ শুনায়ো,
এয়সে দীননাথকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয ॥
কৃষ্ণ জিন্‌কা নাম হ্যাঁয়,
গোকুল জিন্‌কা ধাম হ্যাঁয,
এয়সে শ্রীভগবানকো বারম্বার প্রণাম হ্যাঁয় ॥'

॥ আঠারো ॥

অমূল্যর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখি। মোটে চারটে বাজে। কাল তো সে বলেছিল—পাঁচটায় বেড-টি! এত সকালে ডাকাডাকি শুরু করেছে কেন?

ডাকুক গে। আজ আমরা নেতার আদেশ অমান্য করব—বেড-টি না এলে স্লীপিং-ব্যাগ ছাড়ব না।

কাল রাতে অমূল্য শম্ভু ডাক্তার ও পান্না এক তাঁবুতে শুয়েছে। সুশান্তবাবু ও রামনাথ এক তাঁবুতে। আর আমরা দশজন এবং রূপা ও লালু এক তাঁবুতে মানে মেস-

টেন্টে। ফতে ও বীজেন্দ্র রাত কাটিয়েছে শেরপাদের সঙ্গে।

শুধু অমূল্যরা নয়, মনে হচ্ছে সুশান্তবাবুরাও উঠে পড়েছেন। উঠুন গে, আমরা বাবা বেড-টি না এলে উঠে বসছি না।

"না, এটার জন্য রাতে ঘুমোবার উপায় নেই।"

বিভাসের কথায় আমার ভাবনার প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়। সে সত্যি ওর ওপর বিরক্ত হয়েছে। হবারই কথা। বেচারী পরশু রাতে ঘুমাতে পারে নি। কালও লালু তাকে ঘুমোতে দেয় নি।

প্রতি সন্ধ্যায় আমরা খালি বস্তা পেতে লালুর বিছানা করে দিই। সে সুবোধ শিশুর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে তার ওপরে শুয়ে পড়ে। গোটা দু'য়েক ফেদারজ্যাকেট ওর গায়ের ওপর চাপা দিই। ভাবি লালু সেখানেই সারারাত নাক ডেকে ঘুমোবে। কিন্তু সকালে দেখতে পাই সে দু'জন সদস্যের মাঝখানে ঢুকে এয়ার-ম্যাট্রেসের ওপরে এবং স্লীপিং-ব্যাগের নিচে শুয়ে আছে। বিভাসকে পেলে সে তারই পাশে গিয়ে শোয়। গতকালও তাই করেছে।

লালু তাহলে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল আমাদের সঙ্গে। এতদূর যখন আসতে পেরেছে, তখন সে ধুমধার পেরিয়ে হরশিলে যেতে পারবে। কি আর করব ? রূপাদের সঙ্গে ওকে বাসে করে পুরৌলা পাঠিয়ে দেব। ওসলার পথে ওরা লালুকে জারমোলায় রেখে আসবে।

তা না হয় হল কিন্তু এখন ওর অনশন ভঙ্গ করি কেমন করে ? পরশুবিকেল থেকে অর্থাৎ তুষারপাত শুরু হবার পর থেকেই সে কিছু মুখে দিচ্ছে না, কেবলি জল খেতে চাইছে। আমরাই সারাদিনে মাত্র এক মগ চা, কফি, হরলিক্‌স কিংবা জল ভাগে পাচ্ছি। তার বেশি জল ওকে দিই কেমন করে ? অরুচি বা ক্ষুধামান্দ্য হিমালয়ের অন্যতম 'অলটিচ্যুড্‌ সিক্‌নেস' বা উচ্চতাজনিত রোগ। অভিযাত্রীদের তাই উচ্চ-হিমালয়ে এসে জোর করে খেতে হয়। কিন্তু লালু কিছুতেই কথা শুনছে না। অথচ না খেয়ে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্বল দেহে এত বরফ ভেঙে সে কেমন করে ধুমধার পেরোবে ?

পাঁচটার একটু আগেই কামি বেড-টি নিয়ে আসে। আর শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। স্লীপিং-ব্যাগের জিপ খুলে উঠে বসি। চা-য়ের মগ হাতে নিই।

চা খেয়ে জুতো পরা শুরু করি। কাজটা কোনমতেই সহজ নয়। হান্টার-শু বরফে অচল। সেই অচল জুতো পরেই বরফে নিজেদের সচল রাখতে হচ্ছে। ভেজা জুতোর জল রাতের ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। কাপড়ের জুতো লোহার মতো শক্ত হয়ে আছে। তাকে বাগে আনা রীতিমত কঠিন কাজ।

ডাবিন (Dubbin) মাখিয়ে বহু কসরত করে শেষ পর্যন্ত জুতোয় পা গলানো গেল। তারপরে উইন্ড-প্রুফ গায়ে দিয়ে দস্তানা ও টুপি পরলাম। এয়ার-ম্যাট্রেস ও স্লীপিং-ব্যাগ গুটিয়ে রুকস্যাক্‌ গুছিয়ে বাইরে আসতে ছ'টা বেজে গেল। অমূল্যরা তখন দ্বিতীয় মগ চা ও বিস্কুট দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট করছে।

ব্রেক-ফাস্ট শেষ হলে অমূল্য বলে, "ফতে সিং, পাসাং ও দোরজিকে নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তার পান্না ও সুশান্তদা আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে তোমরা রওনা হও। দেরি করো না। আজ আমাদের ধুমধার পেরোতেই হবে।"

সকাল ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় অমূল্যরা রওনা হল। আজ ৬ই অক্টোবর। শেষ

শিবির থেকে শুরু হল আমাদের চূড়ান্ত সংগ্রাম।

নরম তুষারের কাদা ভেঙে ওরা এক সারিতে এগিয়ে চলেছে। সবার আগে পাসাং ও দোরজি। তারা পথ তেরি করছে। তাদের পরেই লালু। নেতার অনুমতি ছাড়াই সে তার সঙ্গী হয়েছে।

কালো পাথরটা কিন্তু আর মোটেই দূরে নয়। বরফ না থাকলে বোধ হয় ঘন্টা দুয়েকের পথ। জানি না এখন ক'ঘন্টা লাগবে। তবে ফতে বলেছে, ওখানে পৌঁছতে পারলেই আমাদের সকল শ্রম সফল হবে।

সাদা বরফের ওপর দিয়ে রঙিন পোশাক পরে ওরা সেই চিরকালের কালোর দিকে চলেছে এগিয়ে। আমরাও একটু বাদে রওনা হব ঐ কালোর কাছে। এখানে এখন তারই আয়োজন চলেছে।

কিন্তু সূর্য উঠছে না কেন? আজ কি আবার আবহাওয়া খারাপ হবে নাকি?

না, না, এখুনি সূর্য উঠবে। নইলে পুবের আকাশে অমন উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়বে কেন? মনে হচ্ছে কুয়াশার জন্যই সূর্যের মুখ দেখতে দেরি হচ্ছে আমাদের। দুর্যোধনের কৃপায় আজ আবহাওয়া নিশ্চয়ই ভাল থাকবে। বৃপা তাঁর কাছে ভেড়া মানত করেছে।

যথাসম্ভব মালপত্র কমাবার পরেও দেখা গেল তিনটি বোঝা বেশি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তিরিশটি টাকা সেতীরামের হাতে গুঁজে দিতে হল।

অমূল্যরা রওনা হয়ে যাবার ঠিক দেড়ঘণ্টা পরে অর্থাৎ সকাল আটটার সময় কুলিদের সঙ্গে নিয়ে ধুমধারের পথে রওনা হলাম আমরা। না, সূর্য ওঠে নি এখনও। উঠবে কিনা ঠিক বুঝতেও পারছি না।

অগ্রগামী অভিযাত্রীদের পদচিহ্ন ধরেই আমাদের পথ। ঠিক চিহ্ন নয়, গর্ত। ওদের পায়ের চাপে নরম তুষারে একসারি গর্ত হয়ে আছে। কোন কোনটি প্রায় দু'ফুট পর্যন্ত গভীর। তারই ভেতরে পা দিয়ে চড়াই ভাঙছি। মাঝে মাঝে কোমর পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ তুষারপাত শুরু হল। হিমালয়! তুমি আর কত পরীক্ষা করবে?

আমরা তোমার করুণাপ্রার্থী সন্দেহ নেই। তবু তুমি জেনে রাখো, মানুষের অসাধ্য না হলে আমরা আজ তোমার সকল বাধাকে উপেক্ষা করে ধুমধার-কান্দি অতিক্রম করবই করব!

তুষারপাতের বেগ বাড়ছে। বুঝতে পারছি, দুর্যোধনও আমাদের প্রতি হিমালয়ের মতই অকরুণ। হোন্ গে, আমরা তবু এগিয়ে যাবো। আজ যে আমাদের ধুমধার পেরোতেই হবে।

জুতো মোজা ও প্যান্ট্ ভিজে গেছে। উইন্ড-প্রুফের ফাঁক দিয়ে তুষারকণা গায়ে ঢুকছে। চশমা কেবলি ঝাপসা হয়ে উঠছে। চশমা খুলে পুঁছে নিতে হচ্ছে বার বার। তুষারকণা তীরের মতো চোখে-মুখে আঘাত করছে অবিরত।

সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে ও নিচে সর্বত্র শুধুই সাদা। আকাশ মাটি পথ ও প্রান্তর, পাহাড় এবং হিমবাহ সবই সাদা। সাদা ছাড়া আর কোন রঙ নেই এই দুর্গমের জগতে।

মাঝে মাঝেই হাওয়ার বেগ বাড়ছে, তুষার-ঝড় উঠছে। বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

এই দাঁড়িয়ে থাকাটাই সবচেয়ে কষ্টকর। চলতেও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু চলার সময় শরীরটা গরম থাকছে, দেহের ভারসাম্য বজায় রইছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেই শীতে সর্বশরীর জমে যেতে চাইছে, দেহের ভারে নরম তুষারে তলিয়ে যাচ্ছি। মামা কিন্তু এ অবস্থায়ও সমানে ছবি তুলে যাচ্ছে।

তার ওপর বিভাস প্রাণেশ ও কামি ক্রমাগত হুঁশিয়ার করছে—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন না কেউ। দাঁড়াতে হলেই হাত-পায়ের আঙ্গুল নাড়ান। নইলে ফ্রস্ট-বাইট হয়ে যাবে।

বাতাসের বেগ একটু কমলে আবার চলা শুরু করছি। প্রতিবার পা ফেলার সময় মনে রাখতে হচ্ছে—এই একটিমাত্র পদক্ষেপের ওপরে আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। মুহূর্তের অসাবধানতা আমার জীবনের যতি টেনে দিতে পারে।

আগের সহযাত্রী যেখানে পা দিয়ে গিয়েছে, ঠিক সেখানেই পা ফেলে আমাকেও যেতে হবে এগিয়ে। এক ইঞ্চি এধার-ওধার হলে আমার আর কলকাতায় ফেরা না-ও হতে পারে।

না, না, এ ভাবনা অযৌক্তিক। বাবার আশীর্বাদ রয়েছে আমার সঙ্গে। আমরা সকলে নিশ্চয়ই সুস্থ শরীরে কলকাতায় ফিরে যাবো।

প্রতিদিনের মতো আজও উইন্ড-প্রুফের পকেটে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বেরিয়েছি। কিন্তু আজ আর পথের কথা লিখে রাখার অবকাশ পাচ্ছি না।

তবে ভরসা করি, যদি এই মৃত্যুপথ পাড়ি দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারি, তাহলে ঘরে বসেই এ পথের কথা স্পষ্ট মনে করতে পারব। এমন পথের কথা কেউ কি কখনও ভুলে যেতে পারে?

প্রাণেশ রয়েছে আমরা পেছনে, তার পেছনে মণ্ডল। আমরা দু'জন দুর্বল বলেই বোধ হয় প্রাণেশ আমাদের সঙ্গী হয়েছে। মাঝে মাঝেই সে হাত ধরে দুর্গমতর জায়গাগুলো পার করিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ বিপাক পথে হাত ধরে চলার কায়দাটি জানিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এখন আমার প্রাণেশকে গুরু বলতে আপত্তি নেই কোন।

সবচেয়ে বিস্ময়কর এরই মধ্যে সে আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেশাইকে 'টপোগ্রাফী' বুঝিয়ে দিচ্ছে—'We have just crossed a dangerous scree of neraly 200ft.' অথবা 'We are now marching over the crevasses. The glacier, coming down the pass, has ended here..'

সাবাস? শুধু সে নয়, সাবাস আমরাও। মনে পড়ছে দশ বছর আগের কথা। আমরা তখন গাড়োয়ালে নীলগিরি পর্বতাভিযানের (২১,২৬৪) আয়োজন করছি। উত্তরপাড়ার একটি লাজুক ও স্বল্পবাক তরুণ একদিন এসে আমাদের সংস্থার সদস্য হল। প্রতিদিন বিকেলে সে অভিযানের দপ্তরে আসতে শুরু করল। নিঃশব্দে সে আমাদের দিস্তে দিস্তে চিঠি টাইপ করে দিতে থাকল। সে-ই প্রাণেশ।

ভাবতে ভাল লাগছে—'টাইপিং'-য়ের সঙ্গে 'মাউন্টেনিয়ারিং'-য়ের কোন সম্পর্ক নেই জেনেও এবং প্রবীণ সদস্যদের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করে, সেদিন যারা অনভিজ্ঞ প্রাণেশ চক্রবর্তীকে অভিযাত্রীদের দলভুক্ত করেছিল, আমি তাদের অন্যতম। প্রাণেশ প্রমাণ করেছে, আমাদের সেদিনকার নির্বাচন নির্ভুল হয়েছিল। সে আজ ভারতের একজন প্রথম সারির পর্বতাভিযাত্রী।

চ্যুংগাম্ চুষতে চুষতে মুখ ব্যথা হয়ে গেছে তবু তেষ্টা কমছে না। জল ছাড়া এ

তৃষ্ণা মেটে না। কিন্তু কোথায় জল ? জল নেই। সকাল ও সন্ধ্যায় আধ মগ করে হরলিক্‌স চা কফি কিংবা জল বরাদ্দ করেছে কামি। তার বেশি জল কোথায় পাবে সে ? এক সসপ্যান বরফ গলিয়ে আধ সসপ্যান জল তৈরি করতে দু'টো স্টোভের এক ঘন্টার বেশি সময় লাগে।

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে চাইছে। বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে পথে বসে পড়ে গরুর মতো জিভ দিয়ে বরফ চাটছি। প্রাণেশ সাবধান করে, "বার বার বরফ খাবেন না, ঠান্ডা লেগে যাবে।"

মৃত্যুর হাতছানি উপেক্ষা করে চার ঘন্টা বরফ ভাঙার পরে অমূল্যদের দেখতে পেলাম। যে তুষারাবৃত গিরিশিরাটির ওপর দিয়ে আমরা দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে চলেছি, তারই সর্বোচ্চ বিন্দুতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ওখান থেকে কালো পাথরটার দূরত্ব সামান্যই। উচ্চতার পার্থক্য'ও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তা হলে কি সাফল্য করায়ত্ত ? ফতে সিং বলেছে, ওপারে পৌঁছতে পারলেই প্রাণভরে জল খেতে পারব।

আবার তুষারপাতের তীব্রতা বেড়ে গেল। অমূল্যদের ঝাপসা দেখাচ্ছে, ছায়ামূর্তির মতো মনে হচ্ছে। কালো পাথরটা হারিয়ে গেল তুষারের আবরণে। অমূল্যরাও মিলিয়ে গিয়েছে। তবু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। মাঝে মাঝে অমূল্যদের দেখতে পাচ্ছি, তারপরেই ওরা আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য আধ ঘণ্টা চলার পরেই মনে হচ্ছে অমূল্যদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমছে। ওরা কি দাঁড়িয়ে আছে ?

না। ওরা নেমে আসছে! তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন ? ওরা নেমে আসছে কেন ?

আমরা চলা বন্ধ করি।

কিন্তু এই তুষারপাতের ভেতর হান্টার-শু পরে কোমর সমান বরফে দাঁড়িয়ে থাকলে তো তুষারক্ষত অবধারিত। প্রাণেশকে সেকথা বলি। সে শান্তস্বরে জবাব দেয়, "একটু দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতোর ভেতরে পায়ের আঙ্গুলগুলো নাড়া-চাড়া করুন। ওরা এসে পড়বে এখুনি।"

তুষারপাতের তীব্রতা বাড়ছে। অমূল্যদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমছে। কিন্তু ওরা এখনও ঝাপসা, অনেকটা ছায়ামূর্তির মতো। আবার মিলিয়ে গেল ওরা। আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি।

আবার দেখতে পেয়েছি ওদের। না, ওদের নয়, ওকে। একটিমাত্র ছায়ামূর্তি এদিকে আসছে।

একটু বাদেই চিনতে পারি তাকে—ফতে সিং, আমাদের পথ-প্রদর্শক।

সে কাছে আসে। বলে, "লীডারসাব্‌ ওয়াপস জানে বোলা।"

"কাহে কো ?"

"উপারমে কুছ দেখাই নহী পড়তা। চলনে নহী সক্‌তা।"

অর্থাৎ 'ভিজিবিলিটি' বা চক্ষুগ্রাহ্যতা একেবারে শূন্যে পর্যবসিত। বাধ্য হয়ে ফিরে আসছে ওরা। অমূল্য আমাদের ফিরে যেতে বলেছে।

কিন্তু কোথায় যাবো ? কাছাকাছি তাঁবু ফেলার মতো জায়গা দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

তাহলেও নেমে চলি। পা-দুখানি যে আর দেহভার বইতে পারছে না। তবু প্রাণের দায়ে চলতে হচ্ছে। কতদূর নামতে হবে কে জানে?

খুব বেশিদূর নামতে হল না। প্রায় সমতল একফালি জায়গা পাওয়া গেল। মেস-টেন্ট্ ও গুটি চারেক ছোট তাঁবু ফেলার মতো জায়গা রয়েছে এখানে।

কিন্তু এ জায়গাটি কি? কোন উপত্যকা, হিমবাহ কিংবা গিরিশিরা? 'আইস-ফল' কিংবা 'এ-ভ্যালান্শ পয়েন্ট'?

ভাবনাটা বোধহয় ওদের মনকে স্পর্শ করে নি। ওরা মানে ক্লাইম্বিং বুট পরিহিত পর্বতারোহী সহযাত্রী ও শেরপারা। ওরা পা দিয়ে সেই কোমল ও অসমতল তুষারক্ষেত্রকে কঠিন ও সমতল করতে লেগে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ধান মাড়াই করছে কিংবা আমরা গড়ের মাঠে বসে 'হলিডে অন্য আইস'—মানে 'স্ক্যান্ডিনেভিয়ান আইস রিভিউ' দেখছি।

বরফ বসে গিয়ে খানিকটা সমতল ও শক্ত হয়েছে বটে তবে এখনও আইস-এক্স পুঁতলে সবটাই ভেতরে চলে যাচ্ছে। তারই ওপরে তাঁবু ফেলা হল।

প্রাণেশ ও নির্মল একটা টু-মেন টেন্ট্ টাঙালো। এখনও সমানে তুষারপাত চলেছে। তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ি।

এমন পরিস্থিতি প্রাণেশের জীবনে নতুন নয়। সে শান্ত মাথায় কাজ করে যাচ্ছে। তাঁবুর 'গ্রাউন্ড-শীট'-য়ের ওপরে তিনটি এয়ার-ম্যাট্রেস বিছিয়েছে। দু'-জনের তাঁবুতে তিনজন থাকব। ভিজে স্লীপিং-ব্যাগগুলোকে আড়াআড়ি ভাবে পাততে হয়েছে। ফলে শুয়ে পা টান করা যাবে না।

আমি এসে ভেতরে বসতেই প্রাণেশ বলে, "তাড়াতাড়ি জুতো মোজা ও দস্তানা খুলে ফেলুন। আমি আপনার হাত-পা ম্যাসেজ করে দিচ্ছি।"

জুতো থেকে টুপি পর্যন্ত সবই ভিজে। সব চেয়ে মারাত্মক হল এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলছে না এবং স্লীপিং-ব্যাগ ভিজে গিয়েছে। ১৮,০০০ ফুট উঁচুতে এভাবে রাত কাটাবো কি করে?

উইন্ড-প্রুফ, পুল-ওভার, ভেস্ট শার্ট প্যান্ট্ গেঞ্জি—সবই ভিজে গিয়েছে। কেবল হাফহাতার সোয়েটার ও ড্রয়ারটি শুকনো রয়েছে। সেই দুটো গায়ে রেখে বাকি সব খুলে ফেলি।

প্রকৃতি আমাদের ওপর অকরুণ। কিন্তু এই মুহূর্তে 'ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন' এবং উত্তরকাশীর 'ডায়াস মেমোরিয়াল ফান্ড'-য়ের কর্মকর্তাদের তার চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। দ্বিগুণ ভাড়া জমা নিয়েও তাঁরা এই জঘন্য এবং অকেজো সাজ-সরঞ্জামগুলি আমাদের দিয়েছেন। বহু অনুরোধের পরেও পালকের স্লীপিং-ব্যাগ এবং অক্ষত এয়ার-ম্যাট্রেস দেন নি। পর্বতারোহণ প্রসারের জন্য যে সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা পর্বতারোহীর প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।

উত্তরকাশী থেকে রওনা হবার সময় প্রাণেশের পরামর্শে আমি আমার কম্বলখানি সঙ্গে এনেছি। রোজ সকালে মালপত্র গুছিয়ে দেবার সময় সেখানে আমার স্লীপি-ব্যাগের ভেতরে ভরে দিই। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, সেখানি এখনও শুকনো রয়েছে।

কম্বলখানি গায়ে জড়িয়ে ভিজে স্লীপিং-ব্যাগে ঢুকে পড়ি। প্রাণেশ আমার হাত-পা ম্যাসেজ করে দিতে থাকে। এ অবস্থায় তুষারক্ষত এড়াবার জন্য এ ধরনের ম্যাসাজ

অপরিহার্য।

ম্যাসাজ শেষ করে প্রাণেশ নিজের রুক্স্যাক্ খোলে। একজোড়া ভুটিয়া মোজা বের করে আমাকে দেয়। এ ঋণ অপরিশোধ্য। এখন এখানে একজোড়া মোজার মূল্য রবীন্দ্র পুরস্কার-এর চেয়ে কম নয়।

মোজা পায়ে দেবার পরেও কিন্তু শীত কমছে না। কেমন করে কমবে? এয়ার-ম্যাট্রেস ফোলে নি, শরু ডাব্‌ল গ্রাউন্ড-শীটের কাজ করছে। কাজেই বরফের ওপরে ভিজে স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে শুয়ে রয়েছি। মাথায় টুপি নেই, হাত দু'খানি খালি, গায়ে একখানি কম্বল, উচ্চতা আঠার হাজার ফুট, বাইরে বরফ পড়ছে—শীত কমবে কেমন করে? আমি ঠক ঠক করে কাঁপছি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রাণেশ আমার দিকে হাত বাড়ায়। বলে, "টান দিন, গরম লাগবে।"

আমি ধূমপান করি না। তবু ওর হাত থেকে সিগারেট নিই। টান দিই।

কাঁপুনি কমে না, উপরন্তু কাশতে থাকি। তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে দিই। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। এক ঢোক জল পেলে হয়তো এ যাত্রা বেঁচে যেতাম।

জল! জল কোথায়? জল নেই। জীবনে একাধিকবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। কিন্তু কখনও তার এত কাছে এসেছি বলে মনে করতে পারছি না। বাবার কথা মনে পড়ছে। তিনি কি আমাকে কাছে ডাকছেন?

"নিন তো, এই 'কফ সিরাপ'টা এক ঢোক খেয়ে নিন। কাশিটা কমে যাবে।"

প্রাণেশের কথা শুনে মাথার ওপর থেকে কম্বল সরাই। সে একেবারে আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। তার হাতে কফ্ সিরাপের শিশি।

আমি হাঁ করি। প্রাণেশ আমার গলায় ওষুধ ঢেলে দেয়। ওষুধ নয়, জল। তরল যে কোন জিনিসই এখন আমার কাছে জল, তার মানে জীবন। খানিকটা রক্ত পেলেও বোধ করি নিঃশেষে খেয়ে নেব।

এক ঢোক কফ্ সিরাপ আমাকে জীবন দান করে। আস্তে আস্তে কাশি কমে আসে, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

প্রাণেশ বোধ হয় বুঝতে পারে আমার মানসিক অবস্থা। সে শান্ত স্বরে সান্ত্বনা দেয়, "একটু কষ্ট করুন শঙ্কুদা। আজকের এই দিনটির কথা ভবিষ্যতের অক্ষয় স্মৃতি হয়ে থাকবে। ভয় পাবেন না, আমরা কেউ মারা যাবো না। আর যদি সত্যি তেমন কিছু ঘটে, জানবেন আমার আগে আমি কাউকে মরতে দেব না।"

"সাব্, চায়।"

দোরজি ও রূপা চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছে। আমি যখন নিজেকে নিয়েই অস্থির, তখন ওরা প্রবল তুষারপাতকে উপেক্ষা করে বরফ গলিয়ে চা বানিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। হিমালয়ের দুর্গম পথের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সখাদের দান আমি সাগ্রহে গ্রহণ করি। গরম চা ঠোঁটে ঠেকিয়ে আমি মৃত্যুর রাজ্য থেকে জীবনের জগতে ফিরে আসি।

চা-বিস্কুট খেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়েছি। তাহলেও ঘুম আসছে না চোখে। সারাদিন শরীরের ওপর দিয়ে প্রচন্ড ধকল গেছে। তার ওপর চা-বিস্কুট ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কিছু পেটে পড়ে নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

তুষারপাতের বিরাম নেই। মাঝে মাঝেই তাঁবু ঝাড়তে হচ্ছে। নইলে বরফচাপা

পড়ে যাবো। তার চেয়েও বড় কথা—ছোট তাঁবু। একটু বেশি বরফ জমলেই একেবারে নাকের কাছে ঝুলে পড়ছে।

দু'জনের তাঁবুতে তিনজন শুয়েছি। নির্মল শুয়েছে দোরের দিকে। দরজার পর্দাটি ছেঁড়া বলে নির্মলের গায়ে বরফ পড়ছে। গায়ে গা লাগিয়ে শুয়েও নির্মলকে আর এদিকে আনা যাচ্ছে না। তবু তো আমরা যা হোক্ শুতে পেরেছি। কিন্তু মেস-টেন্টের সহযাত্রীদের আজ সারারাত বসে থাকতে হবে। দশজনের তাঁবুতে ওরা ষোলজন এবং লালু। তার ওপর মালপত্র।

জীবনের কোন প্রতীক্ষাই অন্তহীন নয়। অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত খিচুড়ি এলো। কামি দোরজী পাসাং ও রূপা তিন ঘণ্টা পরিশ্রমের পরে আধ প্যান জল ও দু'কুকার খিচুড়ি রান্না করতে সমর্থ হয়েছে। দু'চামচ করে গরম খিচুড়ি ও আধ মগ জল ভাগে পাওয়া গেল। এর চেয়ে বড় পাওয়া জীবনে আর কিছু পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে এখনও তুষারপাত চলেছে। তবে শীতটা যেন আর আগের মতো দুঃসহ নয়। এবারে কোনমতে ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই সকল দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাবো। কিন্তু ঘুম আসবে কি ?

আসবে বৈকি। কেন আসবে না ? সারাদিন এত পরিশ্রম করেছি, আর রাতে ঘুম আসবে না ! আমাকে যে ঘুমোতেই হবে।

কিন্তু সে ঘুম যদি আর না ভাঙে ? আজকের এই ঘুম যদি আমার জীবনের শেষ ঘুম হয় ?

আজ আমরা যেখানে তাঁবু ফেলেছি, সে জায়গাটা যে কি—তা এখনও জানি না। জানা সম্ভবও নয়। রাতের অন্ধকারে এই সমস্ত জায়গাটাই যদি ধসে পড়ে—ধসে পড়ে হাজার হাজার ফুট নিচে ?

কেউ কি তাহলে কোনদিন খুঁজে পাবে আমাদের সেই বিকৃত দেহগুলিকে ? নতুন কোন রূপকুণ্ড রহস্য কি সৃষ্ট হবে আমাদের নিয়ে ? * নৃবিজ্ঞানীরা কি আবিষ্কার করতে পারবেন, যে আমরা কয়েকটি ঘরছাড়া মানুষ দেবতাত্মা হিমালয়ের কোলে কেমন করে শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়েছি ?

॥ উনিশ ॥

না। সে আশঙ্কা সত্য হয় নি। ঘুম ভেঙেছে আমার। রাত ফুরিয়েছে, সকাল হয়েছে—সাতই অক্টোবরের সকাল।

আমাদের তাঁবু ধসে পড়ে নি। কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি রয়েছে—রয়েছি আমরা, বেঁচে রয়েছি। এবং আমার জীবনের দুঃখতম রাত্রিটির অবসান হয়েছে।

ছ'টার সময় কামি ও রূপা বেড-টি নিয়ে এলো। কামি নিশ্চয়ই শেষ রাতে বরফ

চাপিয়েছিল। চা-য়ের সঙ্গে রূপা অপ্রত্যাশিত সুসংবাটি পরিশেন করে—তুষারপাত থেমে গিয়েছে, আকাশ পরিস্কার হচ্ছে।

নির্মল পর্দা সরিয়ে আকাশটা দেখে নেয় একবার। সে-ও রূপার রিপোর্ট সমর্থন করে।

চা শেষ করে তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে লেগে যাই। সবই ভিজে, তাহলেও পরতে হবে।

বাইরে আসি। সত্যি বরফ পড়ছে না। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা। ধুমধারকে অবশ্য পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। কত কাছে, অথচ কত দূরে!

কিন্তু দুর্গমের এই দূরত্বকে আজ অতিক্রম করতে হবে। যেমন করেই হোক্ আজ এই তুষার-সমুদ্র পেরিয়ে আমাদের ওপারে পৌঁছতে হবে। ওপারে জল আছে, জ্বালানী আছে, মাটি কিংবা পাথর আছে। এবং বরফ নেই।

সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হল যাত্রা। সবার আগে চলেছে দোরজি ও পাসাং। তারা পথ তৈরি করছে। তাদের ঠিক পেছনে ফতে ও লালু। আমরা চলেছি ওদের অনেক পেছনে, অন্ততঃ শ'খানেক গজ তো হবেই। আমার সামনে বিভাস সুশান্তবাবু ও দাদু, পেছনে প্রাণেশ দিলীপকুমার ও রূপা। সদস্যদের সবার শেষে আসছে অমূল্য। কুলিরা রয়েছে তার পেছনে।

গতকাল যে পথে এগিয়ে গিয়েছিলাম, সেই পথ বেয়েই এগিয়ে চলেছি। তবে কালকের পথরেখার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই আছ। অত পরিশ্রমে তৈরি করা পথটিকে রাতের তুষার সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে।

আজ বরফ আরও বেড়েছে। রাস্তা খুলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই পাসাং ও দোরজির গলা পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে। লালুও প্রায়ই বরফে ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু একটু বাদেই আবার উঠে আসছে ওপরে। অনুগতের মতো দোরজি এবং পাসাংকে অনুসরণ করছে।

আমাদের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু লালুর কষ্ট আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। কেন যে সে আমাদের সঙ্গে এলো? গতকাল সকালে বিভাস একরকম জোর করেই খান চারেক বিস্কুট খাইয়েছে। তারপর থেকে সে আর কিছু মুখে দেয় নি। শুধুই বরফ চেটেছে। আমাদেরই মতো লালুর কণ্ঠেও অন্তহীন তৃষ্ণা। কিন্তু কে ওকে জল দেবে?

তবে আজ যদি আমরা ধুমধার পেরিয় ওপারে যেতে পারি, তাহলে জল পাওয়া যাবে। লালুও বোধহয় সেই আশাতেই এগিয়ে চলেছে। তার সে আশা পূর্ণ হবে কি?

নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু আবার যে তুষারপাত শুরু হল। বহুবার হিমালয়ে এসেছি, অথচ প্রকৃতিকে এমন অকরুণ হতে কখনও দেখি নি। জানি না কি তার মনে আছে? তবে আমরা থামব না, পেছু হাঁটব না—এগিয়ে যাবো।

"দোরজি রোপ্ আপ্।" সহসা প্রাণেশ পেছন থেকে চিৎকার করে ওঠে। বলে, "পাসাং কোমরে দড়ি বেঁধে নাও।"

ওরা পেছন ফেরে। প্রাণেশ আবার একই কথা বলে। ইসারা করে ওদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিতে বলে।

পাসাং ও দোরজি প্রাণেশের পরামর্শ মেনে নেয়। ওরা অভিজ্ঞ শেরপা, ওরা জানে যে দড়ি পর্বতারোহণের জীবনসূত্র।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে দোরজি পেছনে ফেরে। করুণকণ্ঠে বলে, "দুজনে

পারছি না। আরেকজন কাউকে পাঠান।"

কিন্তু কে যাবে শেরপাদের সঙ্গে পথ তৈরি করতে ? সকলেই ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত। দুর্বল শরীরে এই অমানুষিক পরিশ্রমের বোঝা কে কাঁধে তুলে নেবে ?

একটু বাদে প্রাণেশ বলে, "শঙ্কুদা, ওরা দুজনে পথ খুলতে পারছে না। আমি চলে যাচ্ছি ওদের সাহায্য করতে। আপনি ও মণ্ডলদা আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে আসুন। ভয় নেই, রূপা রয়েছে আপনাদের পেছনে।"

রূপা সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে বলে ওঠে, "সাব্, ডরো মত্, তুমহারে লিয়ে ম্যায় জান্ দে দুঙ্গা।"

জান দেওয়া আর জান বাঁচানো এক কথা নয়। তাহলেও তার আশ্বাস আমাকে আশ্বস্ত করে বৈকি। আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার রূপাকে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বরফের কাদা ভাঙতে থকি।

প্রাণেশ শেরপাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সে-ও কোমরে দড়ি বেঁধে নিচ্ছে। এখন ওদের তিনটি জীবন একসূত্রে বাঁধা পড়ল। ওরা আমাদের পথিকৃৎ।

বরফ পড়ছে তবে কালকের মতো মুষলধারায় নয়। অনেকটা দূর অবধি দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সেই কালো পাথরখানি, যে এখন আমাদের জীবনে আলো হয়ে আছে।

না, সে আর এখন কোন দূরের মরীচিকা নয়, কাছের মরুদ্যান। প্রাণেশরা এখন তার খুবই কাছে চলে গিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছে যাবে ওখানে। তারপরে—হ্যাঁ, তরপরে একে একে আমরাও পৌঁছব। আমরা সবাই আজ গাড়োয়াল-হিমালয়ের দুর্গম গিরিবর্ত্ম ধুমধার-কান্দি অতিক্রম করব।

সুদীর্ঘ সারি বেঁধে অগ্রগামী দলের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পথ চলেছি। খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপের ওপরে বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। মুহূর্তের অসাবধানতা জীবনের যদি টেনে দিতে পারে।

আমার সামনে দাদু, পেছনে রূপা। সে সর্বদা সাহায্য করছে আমাকে। অমূল্য ঠিকই বলেছে—ছেলেটা 'বর্ণ মাউন্টেনিয়ার'।

কি সর্বনাশ, দাদু পড়ে গেল যে ! আমার চোখের সামনে ডান দিকের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সে। ডিগবাজি খেয়ে ও আইস-এক্স্ পুঁতে পতন রোধ করবার চেষ্টা করছে সাধ্যমত। পারছে না। ক্রমেই নিচে চলে যাচ্ছে দাদু। নিচে আরও নিচে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার গলা দিয়ে কোন শব্দ পর্যন্ত বের হচ্ছে না। আমি কি বোবা হয়ে গেছি ?

সহসা ঝপ করে একটা শব্দ হয়। আমরা পেছন থেকে কেউ লাফিয়ে পড়েছে দাদুর পাশে। পেছনে তাকিয়ে দেখি রূপা নেই।

সামান্য চেষ্টার পরেই সে ধরে ফেলেছে দাদুকে। দাদুর অধঃপতন রুদ্ধ হয়েছে। তাকে প্রায় কোলে নিয়ে কোমল তুষারাবৃত ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রূপা। কেমন করে, তা সে-ই জানে।

এতক্ষণ বাদে কথা ফোটে আমার মুখে। নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠি, "সাবাশ !"

"থোড়া রুক্ যাও, রূপা।" বিভাসও চেঁচিয়ে উঠেছে। তার রুক্স্যাকে একটা ক্লাইম্বিং রোপ রয়েছে।

বিভাস সুশান্তবাবুর কাছে পেছিয়ে আসে। তিনি বিভাসের রুকস্যাক্ থেকে দড়িটা বের করে দেন। কোমরে দড়ি বেঁধে বিভাস যতটা সম্ভব শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে দড়ির অপর প্রান্ত ছুঁড়ে দেয় রূপার কাছে। দড়ি বেয়ে দাদু ও রূপা উঠে আসে ওপরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি।

রূপার পিঠ চাপড়ে বিভাস বলে, "সাবাশ!"

"কুছ নহি সাব, বরফমে তো এইসা করনা হী পড়তো।" বেপরোয়া পাহাড়ী যুবক পথ চলা শুরু করে। ভাবখানা যেন কিছুই হয় নি।

আরেকজন নির্বিকার—দাদু, শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মল্লিক। সে ডান পা-টা একটু টেনে টেনে চলছে বটে। কিন্তু তার চোখে-মুখে নেই কোন কাতরোক্তি। আগের মতই হাসি মুখে সে চলেছে এগিয়ে। কে বলবে, মাত্র কয়েক মিনিট আগে সে অমন একটা মারাত্মক দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে?

প্রাণেশ পাসাং দোরজি ও ফতের পায়ের গর্তে পা দিয়ে আমরা অতি সাবধানে এগিয়ে চলেছি। লালুর পায়ের ছাপও দেখতে পাচ্ছি। দাদু পড়ে যাবার জন্য ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে। আমরা ওদের আর আলাদা করে চিনতে পারছি না, তবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। শুধু ওদের কেন, দেখতে পাচ্ছি লালুকে। নরম বরফের ওপরে হামাগুড়ি দিয়ে সে ওদের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলেছে।

দেখতে পাচ্ছি ধুমধার-কান্দিকে। প্রাণেশদের সঙ্গে তার দূরত্ব এখন সিকি মাইলের মতো। উচ্চতার পার্থক্য আরও তুচ্ছ—বড় জোর শ'খানেক ফুট। তার মানে প্রাণেশরা এখন ১৮,৩০০ ফুটে পৌঁছে গিয়েছে, ধুমধার ১৮,৪০০ ফুট উঁচু।

আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। দুঃখ কষ্টের অবসান আসন্ন, সাফল্য সুনিশ্চিত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ধুমধারের ওপরে গিয়ে দাঁড়াবো—আমাদের স্বপ্ন সফল হবে।

প্রাণেশরা পৌঁছে গিয়েছে। ওরা এখন সেই কালো পাথরটার সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি পা চালাই। সাফল্যের আনন্দ আমাদের দেহে ও মনে নতুন শক্তির জোয়ার এনে দিয়েছে। আমরা ভুলে গিয়েছি যে ১৯৬০ ও ১৯৫০ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় ভারতীয় এভারেস্ট (২৯,০২৮´) অভিযান শিখরের মাত্র সাত শ' ও তিন শ' ফুট নিচ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

"পড়ে গেল...পড়ে গেল...।"

সুশান্তবাবুর চিৎকারে চমকে উঠি। থমকে দাঁড়াই, সামনে তাকাই। না, দাদু সুশান্তবাবু ও বিভাস তো দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সামনে। তাহলে কে পড়ে গেল? সুশান্তবাবু অমন চিৎকার করে উঠলেন কেন?

না, অকারণে চিৎকার করে ওঠেন নি তিনি। হয়তো ঠিকই দেখেছেন প্রাণেশদের দলের কেউ বোধহয় পড়ে গিয়েছে। নইলে ওরা এখন দু'জন দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

কিন্তু যে পড়ে গিয়েছে, সে গেল কোথায়? তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে কি?

সুশান্তবাবু বললেন, "আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ফার্স্ট ম্যান পড়ে গেল।"

কে প্রথম, কে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। শুধু জানি প্রাণেশ পাসাং ও দোরজি কোমড়ে দড়ি বেঁধে এগিয়ে চলেছিল, তাদের একজন পড়ে গিয়েছে। সে এখন কোথায়, জানি না। সে কে—প্রাণেশ, পাসাং না দোরজি, তাও জানি

না। শুধু দেখতে পাচ্ছি, সে এখন আর নেই ওদের পাশে।

না, না, নিশ্চয়ই আছে—ওখানে আছে। যাবে কোথায় ? একটা মানুষ তো এভাবে উবে যেতে পারে না। এখান থেকে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না, এই যা। অযথা ভয় পাবার কোন মানে হয় না। প্রাণেশ কাল রাতে আমাকে ভয় পেতে নিষেধ করেছে। বলেছে—ভয় পাবেন না, আমরা কেউ মারা যাবো না। আর যদি সত্যি তেমন কিছু ঘটে, জানবেন আমার আগে আমি কাউকে মরতে দেব না।

বুঝতে পারছি না কে ওখানে পড়ে গিয়েছে, তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি তাকে এখুনি উদ্ধার করা প্রয়োজন। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্য কোথায় ?

আমি যে শক্তিহীন। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই এখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আমি রয়েছি দূরে। আমি কেমন করে সাহায্য করব ওদের ?

আমরা শুধু নীরব দর্শক। অচল অটল ও অনড় হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছি। এখান থেকে ওদের অনেকটা ছায়ামূর্তির মতো মনে হচ্ছে।

আমরা নীরব দর্শক অথচ লালু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি, সে ছুটে গিয়েছে ওদের পাশে। কিন্তু সেই অবোধ পশুর কি শক্তি যে ওদের সাহায্য করবে ?

এ কি ! শেষের লোকটিও পড়ে গেল নাকি ?

হ্যাঁ, ঐ তো পড়ে গিয়েছে। নিচে, অনেক নিচে পড়ে গিয়েছে লোকটি। তবে সে প্রথম লোকটির মতো একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় নি। তার দেহটা বরফে তলিয়ে গিয়েছে কিন্তু মাথাটি দেখা যাচ্ছে।

এখন দ্বিতীয় লোকটি একাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে কে ? প্রাণেশ, পাসাং, না দোরজি ?

সে যে-ই হোক, সে এখন তৃতীয় লোকটিকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে।

তুলেছে। দ্বিতীয় লোকটি তৃতীয়কে টেনে তুলেছে ওপরে। তৃতীয় এখন উঠে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয়র পাশে।

মনে হচ্ছে আমরা ছায়াছবি দেখছি—জীবন্ত চলচ্চিত্র।

এবারে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মিলে প্রথম লোকটিকে তুলে আনার চেষ্টা করছে। আমরা শঙ্কিত বক্ষে প্রতীক্ষা করি। জানি না কতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে।

পেরেছে। ওরা বোধহয় প্রথম লোকটিকে উদ্ধার করতে পেরেছে। হ্যাঁ, ঐ তো তার মাথাটি দেখতে পাচ্ছি। আস্তে আস্তে দেহটিও উঠে আসছে ওপরে। দেখতে পাচ্ছি তার গলা হাত বুক পা—সারা দেহ। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে—প্রথমে যে পড়ে গিয়েছিল। যাকে পড়ে যেতে দেখে সুশান্তবাবু চিৎকার করে উঠেছিলেন, তাকে উদ্ধার করেছে তার সহযাত্রীরা। সাবাশ ! জানি না, দ্বিতীয় লোকটি কে ? তবে আগের থেকেই তার উদ্দেশে জানিয়ে রাখি আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

প্রথম লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে এসে পৌঁচেছে তার সহযাত্রীদের কাছে। সে উঠে দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে। ওরা এখন আবার তিনজন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে আমার বুকের ভেতর থেকে।

ইতিমধ্যে ফতে সিংও গিয়ে পৌঁচেছে ওদের পাশে। সে ছিল ওদের খানিকটা পেছনে। ঠিক কথা, লালুকে দেখছি না তো ! সে তো ফতের ঠিক সামনেই ছিল। প্রথম লোকটিকে পড়ে যেতে দেখে সে ছুটে গিয়েছিল ওদের কাছে। সে কোথায় গেল ?

কোথায় আর যাবে ? ওখানেই বরফের ভেতর ঘাপটি মেরে আছে। দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে।

এতক্ষণ নিজেদের কথায় ছিলাম ভুলে। এবারে খেয়াল হতেই চমকে উঠি। এদিকে যে নরম তুষারে আমার বুক অবধি তলিয়ে গেছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে ফ্রস্ট-বাইট অবশ্যম্ভাবী।

বিভাসকে বলি, "চল, এবারে এগনো যাক্।"

"হ্যাঁ, চলুন।"

আমরা চলা শুরু করি।

ওরা হাত নাড়ছে কেন ? আমাদের থামতে বলছে কি ?

ওরাও যে এদিকেই আসছে। নেমে আসছে। আমরা চলা বন্ধ করি।

কিন্তু কেন ? ঐ তো ধুমধার ! কতটুকুই বা পথ ? তুষারপাতের বেগও কমে গিয়েছে। কতক্ষণই বা লাগবে ওখানে পৌঁছতে ? আধ ঘন্টা, বড় জোর এক ঘন্টা ! লক্ষ্যস্থলের এত কাছে পৌঁছে এভাবে থমকে থাকার কোন মানে হয় না।

তবু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অগ্রগামী অভিযাত্রীদের অমান্য করার নিয়ম নেই পর্বতারোহণে।

অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে ওরা। এবারে চেনা যাচ্ছে সবাইকে। প্রথমে ফতে, তারপরে দোরজি প্রাণেশ ও পাসাং। তাহলে তো তখন পাসাং প্রথমে ছিল। সে-ই কি প্রথম পড়ে গিয়েছিল, তারপরে দোরজি ? প্রাণেশ ওদের উদ্ধার করেছে ?

"গো ব্যাক্ গো ব্যাক্...রিট্রীট্...গো...।" প্রাণেশ চিৎকার করছে। হাত নেড়ে আমাদের নেমে যেতে বলছে।

এ কি বিচিত্র নির্দেশ ! জয় যখন করায়ত্ত, তখন পশ্চাদপসরণ ? এত কাছে পৌঁছে আবার পেছিয়ে যাবো ? কেন ? আবহাওয়া তো বেশ ভাল। তুষারপাত থেমে গিয়েছে। এখন চারিদিকে চমৎকার আলো।

বিভাস অমূল্যকে জিজ্ঞেস করে, "প্রাণেশ নিচে নামতে বলছে ?"

"তাই তো।" অমূল্য চিন্তিত। "তাহলে কি approach of the pass is unaccessible? কি আছে ওখানে ? Ice wall, crevasse or it's an avalanche point?"

নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করছে অমূল্য। নইলে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা কেমন করে বলব ধুমধারের দ্বারে কি আছে—কোন তুষার-প্রাচীর, তুষার-গহ্বর অথবা জায়গাটা একটি হিমানী-সম্প্রপাত স্থল ? সুতরাং আমরা নীরবে নেতার নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকি।

একটু বাদে অমূল্য আবার কথা বলে, প্রাণেশ 'ফার্স্ট রোপ্ লীড' করছে। সে যখন নেমে যেতে বলছে তখন আমার পক্ষে অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই চলো আস্তে আস্তে নামা যাক, ওরা আসুক।"

ধুমধারকে আরেকবার ভাল করে দেখে নিয়ে পেছন ফিরি, নেমে চলি। জানি না কেন নামছি, জানি না কোথায় নামছি, জানি না এই নামার সঙ্গে অভিযানের সম্পর্ক কি ?

বেলা আড়াইটের সময় গতকালের শিবিরস্থলীতে ফিরে এলাম ! যে পথটুকু উঠতে পাঁচ ঘন্টা প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছিল, সেই পথটুকু নেমে আসতে মাত্র ঘন্টা দু'য়েক সময় লাগল। কিন্তু এই দু'ঘন্টা নিঃশব্দে পথ-চলার সময় একটা প্রশ্নই বার বার

আমার মনকে বিচলিত করে তুলেছে—কেন আমরা ধুমধারের দুয়ার থেকে এভাবে নেমে এলাম ? কেন, কেন, কেন ?

এবার অন্য প্রশ্ন দেখা দিয়েছে মনে—এখন আমরা কি করব ? কালকের মতো আজ রাতটাও কি এখানে কাটাবো ? তারপরে ? আগামীকাল সকালে কি আজকের ফেলে-আসা পথ বেয়ে আবার ধুমধারের দিকে এগিয়ে যাবো ?

অবশেষে প্রাণেশ পাসাং ও দোরজি এসে পৌঁছয়। আমরা ওদের ঘিরে দাঁড়াই। অমূল্যর প্রশ্নের উত্তরে প্রাণেশ বলে, "এতগুলো 'আন-ট্রেন্‌ড মেম্বারস্' ও 'পোর্টারস্' নিয়ে এই বিপজ্জনক গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করা আত্মহত্যার সামিল হবে।"

"মানে ?" বিভাসের স্বরে কান্নার পরশ।

"একসপিডিসন 'অ্যাব্যান্‌ডান্' করতে হবে।"

"কি বলছ তুমি ?" অমূল্য প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। আমরা উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকিয়ে থাকি প্রাণেশের দিকে।

চশমাটা খুলে চোখ মোছে প্রাণেশ। তারপরে ভারী স্বরে বলে, "অদৃষ্ট নেহাৎ ভাল বলে আজ পাসাং ও দোরজিকে নিয়ে ফিরে এসেছি তোমাদের কাছে।"

"প্রাণেশসাব্ না থাকলে আমি আর দার্জিলিং যেতে পারতাম না।" সকৃতজ্ঞ স্বরে পাসাং বলে ওঠে মাঝখান থেকে।

দোরজি যোগ করে, "প্রাণেশসাব্ আজ আমাদের জান বাঁচিয়েছে লীডারসাব্।"

গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে। দু'জন অভিজ্ঞ শেরপা একজন বাঙালী পর্বতারোহীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ! সে তাদের প্রাণদান করেছে।

আমরা আবার প্রাণেশের দিকে তাকাই, লাজুক প্রাণেশ মাথা নিচু করে।

"সাবাশ !" অমূল্য সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে। সে তার একখানি হাত হাতে তুলে নেয়। তারপরে বলে, "কি হয়েছিল, এবারে খুলে বল তো !"

প্রাণেশ বলতে থাকে, "চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। আশেপাশের কিছুই তেমন নজরে পড়ছে না। ঝিরঝির করে অবিশ্রান্তভাবে কেবল তুষার পড়ে চলেছে। তারই মধ্যে আমরা পথ তৈরি করে এগুতে থাকলাম—পাহাড়ের ঢালু গায়ে কখনও 'কিক্' করে আবার কখনও বা 'স্টেপ্' কেটে কেটে। ফতে সিং বেশ তফাতে থেকে আমাদের অনুসরণ করতে থাকল।

"আইস-এক্সের আঘাতে মাঝে মাঝেই ব্যাং ব্যাং করে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম আমাদের পায়ের নিচে সমস্ত জায়গাটাই ফাঁপা, পলকা। সত্যি কথা বলতে কি, গোটা হিমবাহটাই ফুটিফাটা। গত কয়েক দিনের তুষারপাতে কেবল তাদের মুখগুলো চাপা পড়েছে, গর্তগুলো ভরাট হয় নি। বুকটা কেঁপে উঠল। আমরা জেনেশুনে মৃত্যুফাঁদের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। তুষার-গহ্বরের অতলে লটকে থাকার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তার মতো নিদারুণ যন্ত্রণা আর কিছু আছে বলে জানা নেই আমার।

"তাড়াতাড়ি হরাইজেন্টালি ট্র্যাভার্স করে বাঁ দিকে গিরিশিরায় উঠে গেলুম। পঞ্চাশ ষাট ফুট খাড়াই অংশ উঠে আসতেই আমরা রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলুম। তার ওপরে 'শু-কভারে'র ভেতর দিয়ে তুষারকণা জুতোয় ঢুকে আমাকে তখন খুবই বিব্রত করে তুলেছে। 'ভিজিবিলিটি'ও প্রায় নেই বললেই চলে। তবু আমরা এগিয়ে চলি ধুমধার-কান্দির দিকে।

"দীর্ঘ দু'ঘন্টা প্রাণপাত সংগ্রামের পরে আমরা সেই কালো পাথরের সামনে উপস্থিত হলাম। ততক্ষণে তুষারপাত অনেক কমে এসেছে। বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখতে পেলাম, সামনে একটা বিরাট 'আইসওয়াল'—প্রায় ৭৫/৮০' খাড়াই হবে। গত কয়েক দিনের অবিশ্রান্ত তুষারপাত তার কালিমালিপ্ত দেহখানির রঙ পালটাতে পারে নি। কোথাও কোথাও যে একটু-আধটু তুষার-প্রলেপ লাগে নি তা নয়। তাতে কোন সুবিধে হয় নি বরং তাকে আরও ভয়ঙ্কর ও বীভৎস দেখাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম ফতে সিং যেখানে পৌঁছতে চেয়েছিল, আমরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছি। এই রক্‌ওয়ালের ওপরেই হরশিলে নেমে যাবার পথটা রয়েছে।

"জায়গাটা কিন্তু খুবই খারাপ, ভালভাবে দাঁড়াবার উপায় পর্যন্ত নেই। তার ওপরে 'ফিক্সড রোপ' না লাগাতে পারলে রক্-ওয়ালটার ওপরে ওঠাও সম্ভব নয়।

"ফিক্সড-রোপ লাগাবার জন্য পাসাং পিটন ও রোপ নিয়ে এগিয়ে গেল। ভাঙা। আইস-এক্স্ নিয়েই আমি তাঁকে 'বিলে' করার জন্য প্রস্তুত হলাম। দোরজি পেছন থেকে আমার কোমরের দড়িটা শক্ত করে ধরে থাকে, যাতে আমি বেসামাল হয়ে নিচে পড়ে না যাই। কারণ আমার দাঁড়াবার জায়গাটা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং আমার আইস-এক্সের 'শ্যাফ্ট' ভাঙা।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই পাসাং আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তবে তার হাতুড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে সম্ভবতঃ পাথর পরীক্ষা করছে—পিটন পুঁতবার জন্য রক্-ওয়ালের গায়ে জায়গা খুঁজছে।

"এমন সময় সহসা ঝুপ করে একটা আওয়াজ হল। কিছু বুঝতে পারার আগেই শুনতে পেলাম পাসাং-এর আর্ত চিৎকার, দেখতে পেলাম সে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। এবং কিছু করতে পারার আগেই সে চোখের পলকে একটা ক্রিভ্যাসের ভেতরে ঢুকে গেল। আবার দড়িতে টান পড়ল। আমি কোনমতে ঝাঁকুনিটা হজম করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝতে পারলাম পাসাং যে গহ্বরটায় পড়ে গিয়েছে, সেটা খুবই গভীর এবং সে দড়িতে ঝুলে আছে। বুঝতে পারলাম, আমার ওপরে তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এবং যে কোন মুহূর্তে আমার দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাটাতেও ফাটল দেখা দিতে পারে কিংবা একটু এধার-ওধার হলে আমিও গড়িয়ে পড়ে যেতে পারি।

"লালু এবং ফতে সিং ছিল খানিকটা দূরে। ফতে 'গির গিয়া গির গিয়া' বলে চেঁচাতে শুরু করেছে আর লালু একেবারে আমার পায়ের কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার তখন কথা বলার কিংবা পেছনে তাকাবার অবকাশ নেই। তাই দোরজি ফতেকে লম্ফঝম্ফ করতে বারণ করে।

"আর ঠিক তখুনি পেছন থেকে আমার কোমরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি লাগল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে পেছনে তাকাই। দেখি দোরজি গড়িয়ে পড়েছে।

"প্রথম দুর্ঘটনা থেকে দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা অধিকতর আকস্মিক। আমি এর জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। তার ওপর দু'দিকের প্রবল আকর্ষণ আমাকে তখন একেবারে দিশেহারা করে তুলেছে।" একটু থেমে প্রাণেশ আবার বলতে শুরু করে, "তারপর কি ঘটেছে আমি ঠিক বলতে পারব না। শুধু মনে আছে, আমি প্রাণপণ শক্তি দিয়ে শ্যাফ্ট ভাঙা আইস-এক্সটাকে নরম তুষারের ভেতর আরও খানিকটা ঢুকিয়ে দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলুম। তারপরে প্রবল লড়াই করে টেনে হিঁচড়ে তুলে

এনেছিলুম দোরজিকে। এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাসাং উঠে এসেছে কিছুক্ষণ পরে।" প্রাণেশ চুপ করে।

কেউ কোন কথা বলছে না। অমূল্যর দিকে তাকাই। এ যেন আমাদের সেই সদাহাস্যময় সুরসিক নেতা নয়, অন্য কোন মানুষ। একটা আশ্চর্য রকমের গাম্ভীর্য তার সারা মুখে। চিন্তিত অমূল্য ইশারায় বিভাসকে কাছে ডাকে। কি যেন পরামর্শ করে সহনেতার সঙ্গে।

তারপরে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে থাকে, "বন্ধুগণ, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে ঘোষণা করতে হচ্ছে যে এ অবস্থায় এত বড় দল নিয়ে ধুমধার-কান্দি অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের ফিরে যেতে হবে।

"সত্যি দুঃখের কথা যে ধুমধার পৌঁছেও আমরা ধুমধার অতিক্রম করতে পারলাম না। কিন্তু বন্ধুগণ, পর্বতারোহণে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। কারণ মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া পর্বতারোহীর ধর্ম নয়।" একটু থেমে অমূল্য সবাইকে দেখে নেয় একবার। তারপর আবার বলে, "Comrades, mountaineering does not mean only successful climbs but safe returns also. Soncu'da please remember, some best books on mountaineering are written on unsuccessful expeditions."

আমি মাথা নাড়ি। অমূল্য বলতে থাকে, "বন্ধুগণ, আমরা ধুমধার-কান্দি গিরিখাদ অতিক্রম করতে পারলাম না কিন্তু আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয় নি। আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রথম হরকিদুনের দর্শনার্থী, আমরা প্রথম উচ্চ-তমসা উপত্যকার নৃতাত্ত্বিক প্রাণিতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছি। সব চেয়ে বড় কথা গত কয়েক দিন প্রবল তুষারপাত, দুঃসহ শীত এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে অবহেলা করে আমরা যে দুর্জয় সাহস ও সহনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছি, তার নজির খুব বেশি নেই এ দেশের সর্বতারোহণে।"

ভবিতব্যকে গ্রহণ করার মধ্যে আর যাই থাক, কাপুরুষতা নেই। সুতরাং যত বেদনাদায়কই হোক, আমরা নীরবে নেতার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি।

একটু বাদে অমূল্য আবার বলে, "ফিরে যখন যেতেই হবে, তখন এখানে আরেকটা রাত কাটানোর কোন মানে হয় না। তার চেয়ে একটু কষ্ট করে আমরা যদি আজই দু'নম্বর শিবিরের জায়গায় ফিরে যেতে পারি, তাহলে একদিকে যেমন অনেকটা পথ এগিয়ে যাই, আরেকদিকে তেমনি আজ রাতের কষ্টটাও কমে যায়। কারণ যেখানে এখানকার চাইতে শীত অনেক কম হবে।"

"কিন্তু সে তো বহুদূর, পৌঁছতে যে রাত হয়ে যাবে।" মণ্ডল মৃদু প্রতিবাদ করে।

বিভাস ভরসা দেয়, "উৎরাই পথ, সময় খুব বেশি লাগবে না—বড় জোর ঘন্টা তিনেক। আমরা দিনের আলো থাকতেই পৌঁছে যাবো।"

শুরু হয় প্রত্যাবর্তনের পালা। কলকাতার মানুষদের কাছে হয়তো কাপুরুষোচিত পশ্চাদপসরণ, কিন্তু আমাদের কাছে 'গ্লোরিয়াস রিট্রীট্'।

তবে আমি এখন তাদের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি ধুমধারের কথা। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকে দেখছি আর ভাবছি—ধুমধার কি চিরকালের মতো আমার পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে রয়ে গেল ? আমি কি কোনদিন গিয়ে দাঁড়াতে পারব না তার ওপরে ?

জানি কেউ আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে না। কারণ যে দিতে পারে, সে নীরব রয়েছে। নীরব তো থাকতেই হবে তাকে। নিষ্ঠুর হিমালয় এখন আর কোন্ মুখে কথা

কইবে আমার সঙ্গে!

তেমনি তুষারের কাদা ভেঙে সারি বেঁধে পথ চলেছি। প্রাণেশ আবার আমাদের দলে এসেছে। সে রয়েছে আমার পেছনে। যথারীতি দোরজি ও পাসাং কোমরে দড়ি বেঁধে আগে আগে চলেছে। তাদের পায়ের ছাপের ওপর পা ফেলে আমরা সাবধানে নেমে চলেছি। পর্বতারোহণে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে অবরোহণের পথে। অনিমাদি, অমর, সুজয়া ও কমলা—সবাই ফেরার পথে শহীদ হয়েছে।

হঠাৎ ওর কথা মনে পড়ে আমার। তাড়াতাড়ি পেছনে তাকাই। না, সে নেই তো। সামনে পেছনে কোথাও নেই।

"কাকে খুঁজছেন?" প্রাণেশ প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ রে, লালুকে দেখছি না তো? সে কোথায় গেল?"

প্রাণেশের চোখ দুটি কি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে? নইলে সে সহসা চশমা খুলে চোখ মুছছে কেন?

একটু বাদে বিকৃতি কণ্ঠে সে কোনমতে উত্তর দেয়, 'লালুকে আর কোনদিন খুঁজে পাবেন না শঙ্কুদা। আমি তাকে রেখে এসেছি।"

"রেখে এসেছিস? কোথায়?"

"ধুমধারে।" প্রাণেশ কেঁদে ফেলে। একবার থামে সে। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই বলে, "পাসাং আর দোরজিকে ফিরিয়ে এনেছি, কিন্তু লালুকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।"

কি বলব? চুপ করে থাকি। ভাবতেই পারছি না যে লালু আর কখনও আমার আগে আগে পথ চলবে না। কখনও শুনতে পাবো না সেই পরিচিত ডাক। দেখতে পাবো না তার সেই উচ্ছ্বসিত লেজ নাড়ানো।

আর কোনদিন দূর থেকে দেখতে পেয়ে লালু ছুটে আসবে না আমার কাছে, লাফিয়ে গায়ে উঠবে না, গাল চেটে আদর করবে না। লালু আর কখনও বিরক্ত করবে না আমাদের।

দিন সাতেকের মধ্যেই আমরা জারমোলা যাবো, কিন্তু তখন লালু থাকবে না আমাদের সঙ্গে। জারমোলার লালু আর কোনদিন জারমোলায় ফিরবে না। কি জানি, হয়তো বা সে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের স্বর্গসাথী সেই সারমেয়র উত্তরসাধক। তাই সে চিরকালের মতো রয়ে গেল স্বর্গারোহিণীর পদপ্রান্তে।

প্রাণেশ ইতিমধ্যে খানিকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে। সে ভারী স্বরে বলতে থাকে সেই অপরূপ আত্মদানের কাহিনী, "লালু ছিল ফতে সিং-য়ের সামনে। পাসাংকে পড়ে যেতে দেখেই সে ঝড়ের মতো ছুটে এলো আমার কাছে। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপরেই পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল। একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে থাকল। বরফের ওপর আঁচড় কাটল কয়েকবার। এবং আমি কিছু বুঝতে পারার আগেই, হয়তো বা পাসাংকে সাহায্য করবার জন্যই, কর্তব্যপরায়ণ লালু লাফিয়ে পড়ল সেই গভীর গহ্বরে।"

বোধ করি বাধ্য হয়েই চুপ করেছে প্রাণেশ। তার কণ্ঠে রুদ্ধ হয়ে এসেছে। আমরা কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারি না তাকে। নীরবে পথ চলি।

একটু বাদে প্রাণেশ আবার কথা বলে, যেন জবাবদিহি করে, "আমি তখন পাসাং

ও দোরজিকে নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে লালুর জন্য কিছুই করে উঠতে পারি নি। তাছাড়া কি-ই বা করতে পারতাম ? ওকে উদ্ধার করার উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম কোথায় আমাদের ?"

"লালু নিশ্চয়ই খুব ডাকাডাকি করছিল।" জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ। তবে তা ওপর পর্যন্ত খুব সামান্যই এসে পৌঁচেছে। সে ডাক শুনেছে পাসাং। তুষার-গহ্বরের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই আকুল আর্তনাদ বার বার বিচলিত করে তুলেছে তাকে। কিন্তু ঝুলন্ত পাসাং তাকে কোন সাহায্যই করতে পারে নি। অসহায় লালুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে প্রাণের মায়ায় আমরা স্বার্থপরের মতো পালিয়ে এসেছি।"

আর কিছু বলছে না প্রাণেশ। সে নীরবে পথ চলেছে। সবাই শব্দহীন। লালুর মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনীতে সবার কথা চাপা পড়ে গিয়েছে।

আমি শুধু নীরবে ভেবে চলি লালুর কথা—পাসাং তার সেই অন্তিম আর্তনাদের ভাষা বুঝতে পারে নি। কিন্তু আমি জানি সে তাকে কি বলেছে ? লালু সনির্বন্ধ স্বরে মিনতি করেছে—তোমরা ফিরে যাও ঘরে। দেখছ না ধুমধার এখানে কেমন মরণ-ফাঁদ পেতে রেখেছে !

নিজের জীবনের বিনিময়ে লালু আমাদের জীবনকে নিরাপদ করে গেল।

বিভাসের অনুমান মিথ্যে হয় নি, দিনের আলো থাকতেই দু'নম্বর শিবিরের জায়গায় ফিরে এলাম। আজ ৭ই অক্টোবর। অর্থাৎ গতকাল সকালেই আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে গিয়েছি। মাত্র দুটি দিন ও একটি রাতের ব্যবধান কিন্তু জায়গাটাকে চেনাই যাচ্ছে না। চারিদিকে কোমরসমান কোমল তুষার। তবে ভরসার কথা এখন তুষারপাত হচ্ছে না। জিনিসপত্রও সব তেমনি পড়ে আছে। কেনই বা থাকবে না ? এখানে যে চোর-ডাকাত কিছুই নেই।

শেরপা এবং কুলিরা বরফ পরিষ্কার করতে লেগে যায় ! সদস্যরাও অনেকে হাত লাগায়। কেবল মামা, ভাগনে ও দাদু দূরে সরে রয়েছে।

লালুর আত্মহত্যার কথা শোনার পর থেকেই বিভাস একেবারে মনমরা হয়ে গিয়েছে। লালু যে তাকে বড়ই ভালোবাসত।

মামা ও দাদু কিন্তু অন্য কারণে মনমরা হয়ে পড়েছে। লালুর জন্য তাদের মন খারাপ হয় নি এমন নয়। লালুকে সবাই ভালোবাসত। তার এই আত্মহত্যার—না আত্মহত্যা নয়, আত্মত্যাগ—মহাপ্রয়াণের আকস্মিকতা, সবাইকে বিচলিত করে তুলেছে। স্বর্গারোহিণীর পদপ্রান্তে লালু শান্তির শয্যা পেতেছে। আমাদের স্বর্গারোহণ বিফল হল কিন্তু লালু অনায়াসে অমরলোকে মহাপ্রস্থান করল।

লালুর এই আকস্মিক অন্তর্ধান সবাইকে বিচলিত করে তুললেও মামা এবং দাদু ঠিক লালুর জন্যই হাত গুটিয়ে বসে নেই। তারা মনমরা হয়ে রয়েছে অন্য কারণে—ভাঙের শোকে।

সব চেয়ে দুঃখের কথা, আমরা আবার ভাঙবনের পাশ দিয়ে পুরৌলা ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু নেতার নির্দেশ—কেউ ভাঙ গাছে হাত দিতে পারবে না।

খুবই স্বাভাবিক। আসার সময় অমূল্য সঙ্গে ছিল না বলেই ওরা অমন ভাঙ

কালেক্‌শন করতে পেরেছে। ঝারণ অমূল্য বিশ্বাস করে, হিমালয় দেবালয়। শুচিশুদ্ধ মন নিয়ে তপস্বীর মতো এখানে আসতে হয় অভিযাত্রীকে। মাদক দ্রব্য বর্জন প্রত্যেক পর্বতাভিযাত্রীর আবশ্যিক কর্তব্য।

আরও একজন কোন কাজে হাত লাগায় নি। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বৈকি! এই প্রথম আমি রূপাকে হাত গুটিয়ে দূরে বসে থাকতে দেখছি। তার মতো প্রাণময় উৎসাহী তরুণের তো এমন আচরণ শোভা পায় না।

কি জানি, হয়তো লালুর জন্যই সে এমন মনমরা হয়ে পড়েছে। কিংবা সেই মেয়েটির কথা মনে পড়েছে তার। কিন্তু তাতে এত উতলা হবার কি আছে? আমি তো তাকে বলেছি, আমাদের দশদিন রাখার দরকার না হলেও সে একশ'টাকা পাবে। সুতরাং তার বিরহের অবসান আসন্ন। রূপার যে এখন আরও বেশি হাসিখুশি ও কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠার কথা। তাহলে সে অমন গোমড়ামুখো হয়ে রয়েছে কেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবু টাঙানো হয়ে যায়। রূপাকে ভেতরে ডাকি। বলি "তুই আজ আমাদের তাঁবুতে থাকবি।"

"না, দাদা। আমরা আজ নিচের ঝোপড়ীতে থাকব।"

"সে কি! তাঁবু থাকতে ঝোপড়ায় যাবি কেন? সেখানে যে বরফ জমে রয়েছে।" আমি রীতিমত বিস্মিত।

একটু হেসে রূপা বলে, "আপনাকে তো সেদিন বলেছি দাদা, বরফ আমাদের জনম-মরণের সাথী। বরফে আমাদের কোন অসুবিধে হয় না। তাছাড়া আমরা পাহাড়ী মানুষ, তাঁবুর চেয়ে ঝোপড়ীতে ভাল ঘুম হবে।"

সুতরাং আর প্রতিবাদ করি না। রূপা ও ফতে কম্বল নিয়ে ঝোপড়ায় চলে যায়।

যথারীতি রাতে খিচুড়ি রান্না হল। অথচ অনেক ডাকাডাকির পরেও রূপা এবং ফতে খেতে এল না। শিবির থেকে ওদের ঝোপড়ার দূরত্ব সামান্য, কিন্তু চারিদিকেই নরম তুষার, তার ওপরে সবাই শ্রান্ত—কে এই হাড়-কাঁপানো হাওয়ায় অন্ধকারে বরফ ভেঙে ওদের খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবে?

মনটা খারাপ হয়ে যায়, বেচারীদের আজ না খেয়ে থাকতে হল। এমনটি অবশ্য হওয়া উচিত নয়। তুষারাবৃত উচ্চ-হিমালয়ে গরম খাদ্য এবং পানীয় শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাবার উপকরণ নয়, তুষারক্ষতের হাত থেকে অব্যাহিত পাবার প্রয়োজনেও অপরিহার্য। কারণ হিমালয়ের এই সব তুষারাবৃত অঞ্চলে প্রচন্ড শীত ও প্রবল বাতাস। এখানে দেহের উত্তাপ খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। শরীরের শিরাগুলি সংকুচিত হয়ে মোমের মতো শক্ত আকার ধারণ করে। ফলে শরীরের যে অঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত কিংবা পায়ের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখন রোগী টেরই পায় না। কারণ আক্রান্ত অঙ্গে কোন বোধশক্তি থাকে না।

রক্ত চলাচল বন্ধ হবার ফলে শরীরের সেই অঙ্গটি প্রথমে কুঁচকে লাল ও পরে কালো হয়। অর্থাৎ সেখানে 'আলসার' বা 'গ্যাংরীন' হয়ে যায়। তখন কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

সুতরাং তুষারাবৃত অঞ্চলে অভিযাত্রীদের অবশ্যই গরম খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু রূপা এ-সব নিয়মের ধার ধারে না। সে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়েছে। সে যে পাহাড়ী নওজয়ান—বরফে জন্মেছে, বরফেই শেষ নিঃশ্বাস নেবে। বরফ তার জনম ও মরণের সাথী।

॥ কুড়ি ॥

সকালেই শিবির গোটাবার আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই চাইছে বরফের রাজ্য ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে পৌঁছতে, জ্বালানী আর জলের জগতে যেতে।

আজ ৮ই অক্টোবর--ছ'দিন ধরে আমরা বরফে রয়েছি। সকাল থেকে আজ অবশ্য এখনও তুষারপাত হয় নি, তবে আকাশ মেঘে ঢাকা। যে কোন সময় তুষারপাত শুরু হতে পারে। সুতরাং সবাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে পালাতে চাইছে।

দোরজি ও পাসাং রওনা হল। কুলিরা মাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওদের পেছনে। আমরা বেক্র-ফাস্ট করছি। খাওয়া হলেই রওনা হব।

হঠাৎ মনে পড়ে ওদের কথা। ফতে ও রূপার কথা। ওদের যে আজ দেখি নি সকাল থেকে। ওরা কি এখনও ঘুমোচ্ছে ?

কিন্তু রূপা তো এত বেলা অবধি শুয়ে থাকার ছেলে নয়। সকালে সে কামির সঙ্গে ঘুম থেকে ওঠে, তাকে চা বানাতে সাহায্য করে। আমাদের বেড-টি পরিবেশন করে কুলিদের ঘুম ভাঙায়। তাদের মালপত্র বাঁধতে সাহায্য করে।

আমরা সমবেত স্বরে ওদের ডাকাডাকি করি।

না, কেউ বেরিয়ে আসে না ঝোপড়া থেকে। এখনও গভীর ঘুমে অচেতন আর কি।

দিল বাহাদুরকে বলি, "একবার যাও তো ওখানে। ওদের ডেকে নিয়ে এসো।"

দিল ফিরে আসে কিছুক্ষণ বাদে। বলে "ঝোপড়ীতে কোই নহী হ্যায় সাব্।"

"কোই নহী হ্যায় !"

"জী সাব্। মালুম, ও আদমী চলা গিয়া।"

চলে গিয়েছে ! কোথায় ? কখন ? কেন ?

ওরা যে কাল রাতেও কিছু খায় নি। আজও না খেয়ে চলে গেল ? টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেল না ?

ফতের কথা বলতে পারি না। কিন্তু রূপার যে টাকার বড়ই দরকার। তার অন্তত একশ'টি টাকা চাই। টাকার জন্যই ঘর ছেড়েছে সে। একশ' টাকা না হলে সে গিরিকাকে ঘরে আনতে পারবে না। অথচ গতকাল পর্যন্ত ওর মোটে সত্তরটি টাকা পাওনা হয়েছে। চলে যাবার পরে তো আমরা ওদের আর মজুরি দেব না। একশ' টাকা রোজগার করার আগেই রূপা এভাবে না বলে-কয়ে চলে গেল !

আচ্ছা, ওরা আমাদের কিছু চুরিটুরি করে পালায় নি তো ? কি চুরি করতে পারে ?

এত মালপত্রের মধ্যে এখুনি তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে গতকাল রাতে ওরা যখন ঝোপড়াতে চলে যায়, তখন তো ওদের হাতে কিছু ছিল না। রাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পরে কিংবা আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে যদি কিছু নিয়ে গিয়ে থাকে !

কিন্তু পালাবে কোথায় ? এখান থেকে যে একটাই পথ—ওসলার পথ। ওরা তো জানে আমরা ওসলায় ফিরছি।

ফতের কথা বলতে পারি না, কিন্তু রূপা ? না, রূপাকে চোর বলে ভাবাই যায় না ? তাছাড়া উচ্চ-হিমালয়ের মানুষরা বড় একটা অসৎ হয় না। তারা উপোস করে তবু চুরি করে না।

থাক্ গে, রূপার ভাবনা ছেড়ে এবার নিজেদের ভাবনায় ফিরে আসা যাক্। আজ

যেভাবেই হোক, মূল-শিবিরের জায়গায় পৌঁছতে হবে। অর্থাৎ দু'দিনের পথ একদিনে যেতে হবে। উৎরাই হলেও পথ তুষারাবৃত এবং দুর্গম। ন'টা বাজে, অতএব আর দেরি না করে চলা শুরু করি।

শেরপা ও কুলিদের পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলি। কিছুদূর এগিয়ে বুঝতে পারি আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। ফতে ও রূপা ওসলার দিকেই গিয়েছে। কারণ পাথরের সেই ঝোপড়া থেকে দু'জোড়া পায়ের ছাপ এসে মিশেছে মূলপথে। কিন্তু কেন ওরা এভাবে চোরের মত চলে গেল ? ওরা কি মূল শিবিরে ফেলে আসা মালপত্র নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যই সবার আগে রওনা হয়ে গিয়েছে ?

দু'ঘন্টা বিরামহীন বরফ ভেঙে এক নম্বর শিবিরের জায়গায় এলাম। এখানে বরফ অনেক কম। দেশাই প্রাণেশ ও আমি একসঙ্গে রয়েছি। আমি ও দেশাই সেই তুষারাবৃত ক্ষুদে তালাওটির তীরে এসে বসি। প্রাণেশ বসে না। সে আইস-এক্স দিয়ে হ্রদের ওপরকার শক্ত বরফে ঘা মারতে থাকে।

এ কি স্বপ্ন না বিভ্রম ! এ যে দেখছি জল। ওপরের শক্ত বরফ ভেঙে যেতেই নিচে দেখা দিয়েছে স্ফটিক স্বচ্ছ সলিল—অপ্, অম্বু, অম্ভঃ, উদক, তোয়, নীর, পয়ঃ, বারি, পানি অর্থাৎ টলটলে জল তথা জীবন। আহা, এমন জল কত দিন দেখি না ! সাতদিন ! হ্যাঁ সাতদিন বাদে এমন জল দেখতে পেলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল।

দেশাই তাড়াতাড়ি রুকস্যাক খোলে প্লাস্টিকের গ্লাস বের করে। আমরা জল খাই প্রাণভরে অমৃত পান করি। মনে হচ্ছে যেন একযুগ পরে এমন [illegible] মিটিয়ে জল খেলাম। আমার অন্তহীন তৃষ্ণার অবসান হল।

পথে কয়েকবার তুষারপাত হলেও দুর্গম পথ পেরিয়ে আমরা যখন মূলশিবিরের জায়গায় এসে পৌঁছলাম, তখন আবহাওয়া বেশ ভাল। রোদ না থাকলেও উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক চিক্‌চিক্ করছে।

কিন্তু মালপত্র তো সবই রয়েছে। মানে সেদিন রূপা যেভাবে রেখে গিয়েছিল [illegible] সেইভাবে ত্রিপল ঢাকা দেওয়া আছে। ত্রিপলের ওপর বেশ [illegible] স্পর্শ করেছে বলেও তো মনে হচ্ছে না !

তাহলে ফতে ও রূপা এভাবে চলে এল কেন ? আর এলই যখন, তখন এখানে থামল না কেন ?

সামনের বরফের ওপরে ওদের স্পষ্ট পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। দু'জোড়া পায়ের ছাপ নেমে গিয়েছে নিচে—সেই পথ ধরে আমরা কাল সকালে রওনা হব ওসলার পথে। ওরা আজই চলে গিয়েছে। কিন্তু কেন ?

৯ই অক্টোবর। গতকাল রাতে ঠিক হয়েছে আমরা আজই ওসলা পৌঁছব। অর্থাৎ আজও দু'দিনের পথ একদিনে যেতে হবে। গত দু'দিনও তাই করেছি। কিন্তু আজকের পথ দীর্ঘতর।

তাহলেও যেতে হবে। কেরোসিন ফুরিয়ে গেছে। ওসলায় জ্বালানী পাবো, ঘরে, থাকতে পারব। এই যাযাবার জীবন আর ভাল লাগছে না ! পর্বতারোহী হলেও আমরা মানুষ। মানুষ গৃহপ্রিয় প্রাণী।

দু'বাক্স ওষুধ, দু'টো ফিক্সড রোপ, একটা ত্রিপল, এক বাক্স টিনফুড এবং এক বস্তা করে চাল ডাল আটা ও আলু ফেলে রেখে কোনমতে বাকি জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হওয়া গেল। এখনও পুরৌলা পৌঁছতে অন্তত দিন ছয়েক, তার ওপর উত্তরকাশী গিয়ে পর্বতারোহণ শিক্ষায়তন থেকে সাজ-সরঞ্জামের দাম বাবদ জমা দেওয়া টাকা ফেরত পেতেও বেশ কয়েকদিন লাগবে। পথে রেশন কিনে খেতে হবে জেনেও রেশন ফেলে যেতে হল। উপায় নেই। মাত্র বাইশজন কুলি দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। তাদের মধ্যে দু'জন আবার তুষারান্ধ হয়ে গিয়েছে। ফতে ও রূপা থাকলে চাল ও আলুর দু'টো বস্তা নিয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু তারাও পালিয়েছে।

গতকাল বিকেলের পরে আর তুষারপাত পাই নি। কিন্তু তার আগে যে বরফ পড়েছে, তা সামলাতেই গলদঘর্ম হচ্ছি। একটু এধার-ওধার হলেই হাঁটু অবধি তলিয়ে যাচ্ছে।

দোরজি এবং পাসাং আজও কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়েছে। আমরা তেমনি ওদের পায়ের ছাপের ওপরে পা ফেলে ফেলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নেমে চলেছি।

সকালে কামি তেমনি আধ মগ চা আর খানকয়েক বিস্কুট দিয়েছে। আজও খিদে পেয়েছে, পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে, কিন্তু আজ যেন আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না। সকাল থেকে যে একটা কথা কখনও ভুলে যাই নি—আজ আমরা বরফের এলাকা ছাড়িয়ে মাটিতে পৌঁছব। সেখানে জল আছে, জ্বালানী আছে এবং হয়তো বা রোদ আছে।

তাই বলে আজকের পথ কিছু কম কষ্টকর নয়। যাবার দিন যে ধ্বসগুলো দেখে পেরোতে পেরেছিলাম, আজ সেগুলি তুষারের আবরণে ঢাকা পড়েছে। পাথর পড়ার ভয় যেমন কমেছে, তেমনি আছাড় খাবার সম্ভাবনা বেড়েছে বহুগুণ। সুতরাং সাবধানে চলতে হচ্ছে।

ঘন্টা তিনেক সংগ্রামের পরে শেষ ধ্বসটা পেরিয়ে আমরা সেই মালভূমি সদৃশ টিলাটির ওপরে এসে উপস্থিত হলাম। আর এসেই মাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাড়াতাড়ি প্রণাম করি তাকে—সর্ব-উপদ্রবসহা শ্যামল কোমলা স্নেহময়ী মাটিকে।

এখানে বরফ নেই তা নয়। বরফও রয়েছে বৈকি। বরফ রয়েছে মাটি ও ঘাসের পাশে পাশে, তবে সে বরফ গলছে। এবং বেশ বুঝতে পারছি একটু বাদে এ বরফটুকুও হারিয়ে যাবে।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। বিগত সাত দিন সর্বক্ষণ যে বরফকে অভিসম্পাত দিয়েছি, তার সঙ্গে এ যাত্রায় এই আমার শেষ দেখা। কাল থেকে কপাল খুঁড়লেও আর বরফের কাদা ভাঙ্গতে পারব না। বরফে বসে মাটির জন্য মন কেঁদেছে, আবার মাটিতে এসেই বরফের জন্য অস্থির হয়ে উঠছি। ভাবছি আবার কবে অমন অমল কোমল তুষার-তীর্থে গড়াগড়ি দিতে পারব ? আশ্চর্য মানুষের মন—

'যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই, তাহা চাই না।'

শুধু মাটি নয়, এখানে যে রোদও রয়েছে—নরম-গরম-ঝরা সোনালী রোদ, প্রাণ-জুড়ানো মধুর রোদ। দু-হাত জড়ো করে প্রণাম করি দেব-দিবাকরকে।

তারপরেই অভিমান হয় তার ওপরে। জিজ্ঞেস করি—হে অকরুণ, গত সাত দিন

কোথায় লুকিয়েছিলে তুমি ? এত ডেকেছি, তুমি কি একবারও শুনতে পাও নি আমাদের সেই আকুল আহ্বান ? হে নির্দয়, তুমি যদি একটি দিনের তরে দয়া করতে, একটু সহায় হতে, তাহলে যে আমরা অনায়াসে ধুমধার-কান্দি পেরোতে পারতাম।

পেছনে ফেলে আসা তমসার উৎসটিকেও চমৎকার দেখাচ্ছে এখান থেকে। আবার দেখা হল তমসার সঙ্গে। কে জানে, হয়তো তারই আকর্ষণে আসতে হল ফিরে। আবার তমসার তীরে তীরে শুরু হল আমাদের পথ-পরিক্রমা।

অবশেষে তালাও-য়ের তীরে পৌঁছানো গেল। প্রথমেই প্রাণভরে জল খেয়ে নিই। তারপর জুতো জামা ও টুপি খুলে ভাল করে মাথা ও হাত-পা ধুয়ে গা মুছে নিলাম। ওপর থেকে আসছি, ঠান্ডা লাগবার ভয় নেই। বরং শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। কতদিন বাদে শরীরে জলের ছোঁয়া লাগল।

একটু বাদে প্রাণেশ বলে, "সামনে ঐ বনের ভেতরে দেখুন, ধোঁয়া উঠছে। ওখানেই রান্না হচ্ছে। দেশাইকে নিয়ে আপনি এগিয়ে যান।"

"তুই আসবি না ?" তাকে জিজ্ঞেস করি।

সে উত্তর দেয়, "মন্ডলদা নাকি পায়ে চোট পেয়েছেন, জোরে হাঁটতে পারছেন না। অমূল্য আর বিভাস নিয়ে আসছে তাকে। ডাক্তারের পায়ে ব্যথা, তারও একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার। আপনারা এগোন, আমরা পেছনে আসছি।"

প্রাণেশ ও ডাক্তার বসে থাকে তালাও-য়ের তীরে আমরা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চলি বনের ধারে।

একটি ঝরণার তীরে কয়েকটা কাঠের উনুন জ্বলছে। রান্না হচ্ছে আমাদের ও কুলিদের। কুলিরা আজ ছ'দিন পরে রান্না-করা খাবার খাবে। গত কয়েকদিন চা-বিস্কুট খেয়েই থাকতে হয়েছে ওদের।

কুলিদের আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। শুধু খেতে পাবার আনন্দ নয়, রোদ এবং জল পাবার আনন্দও বটে। কেউ রান্না করছে, কেউ স্নান করছে, কেউ বা জামা-কাপড় ও জিনিসপত্র শুকোতে দিচ্ছে।

রান্না হয়ে গেছে, কামি খেতে দেয়—গরম গরম ডাল ভাত ঘি আলু ভাজা ও আচার। আহা, কত দিন এমন পেটভরা ভাত পাই নি ! কামি আজ অন্নপূর্ণা।

প্রাণেশ ও ডাক্তার এসে পৌঁছয়। প্রাণেশ বলে, "অমূল্যরা পেছনে আসছে। ওরা এলেই আমরা খেয়ে নিয়ে রওনা হব। আপনারা এগিয়ে যান, এখনও অনেকটা পথ।"

সুশান্তবাবু শম্ভু দেশাই ও পান্নার সঙ্গে আমি আবার পথ চলা শুরু করি। পন্ডিত মামা দাদু সুশীল ও রামনাথ এগিয়ে গিয়েছে। নির্মল শেরপাদের সঙ্গে পরে আসছে। কুলিরাও খাওয়া হলে রওনা হবে।

বেলা তিনটে বাজে। আসার দিন ওসলা থেকে তালাও শিবিরে আসতে প্রায় ন'ঘণ্টা লেগেছিল। সেদিন অবিশ্যি ছিল চড়াইপথ, আজ উৎরাই। তাহলেও ঘণ্টা ছয়েক তো লাগবেই। তাড়াতাড়ি হাঁটা দরকার।

কিন্তু হাঁটতে চাইলেই কি হাঁটতে পারা যায় ! আজ যে খাওয়াটা বড়ই বেশি হয়ে গেছে। জোরে হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। তাহলেও যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পথ চলেছি।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে নির্মল আমাদের ধরে ফেলল। ওর সঙ্গে কামি পাসাং ও

বীজেন্দ্র রয়েছে। কথায় কথায় নির্মল জানায়, "অমূল্যদারা চারটে নাগাদ খাবার জায়গায় এসেছেন।"

"তাহলে তো ওদের রওনা হতে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে।"

"তা তো হয়েছেই।"

চিন্তার কথা—এমনিতেই ছ'-সাত ঘণ্টার রাস্তা, তার ওপরে সামনে বনময় পথ ও অন্ধকার রাত। ঠাণ্ডায় টর্চের ব্যাটারি স্যাঁতসেঁতে হয়ে আলো স্তিমিত। সব চেয়ে বিপদের কথা মণ্ডল ও ডাক্তার ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। ওদের যে খুবই কষ্ট হবে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় নির্মল এগিয়ে আসে আমার কাছে। জিজ্ঞেস করে, "শঙ্কুদা, কাল কি ওসলায় রেস্ট্ নেওয়া হচ্ছে?"

"আমার তো তাই ইচ্ছে।" উত্তর দিই, "নিজেদের জন্য না হোক্, অন্তত কুলিদের কথা ভেবে ওসলায় একটা দিন বিশ্রাম করা উচিত হবে। তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে অমূল্য।"

"আমাকে কিন্তু কালই চলে যেতে হবে।"

বিস্মিত হই। একসঙ্গে এসেছি, নির্মল একা চলে যেতে চাইছে কেন? জিজ্ঞেস করি, "কেন বল তো?"

"আমাকে যে চোদ্দ তারিখের আগে কলকাতায় পৌঁছতেই হবে।"

"কেন, সেদিন কি কলকাতায়?"

"বা রে! চোদ্দই অক্টোবর দুর্গাপুজো নয়?"

ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা! আর মনে থাকবেই বা কেমন করে? জীবনের অধিকাংশ পুজোই তো হিমালয়ে কাটল। মা যখন বাঙলায় যান, আমরা তখন কৈলাসে আসি।

তবে এবারে বোধহয় আমাদের পুজো দেখার সৌভাগ্য হবে। উত্তরকাশীর বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার ও কন্ট্রাক্টর ক্ষিতিলাল রায় আসার সময় নেমন্তন্ন করে রেখেছেন। স্থানীয়দের সহায়তায় তিনি এবারে সেখানে সমারোহের সঙ্গে দুর্গাপুজো করছেন। কলকাতা থেকে প্রতিমা আনা হচ্ছে। কাশী থেকে পণ্ডিত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য পৌরোহিত্য করতে আসছেন। উত্তরকাশীর বিবেকানন্দ স্বামী অখণ্ডানন্দজী সবপ্রকারে সাহায্য করছেন তাঁকে। চিত্তদা (মাননীয় বিচারপতি শ্রীচিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়) সহ বহু বিশিষ্ট বাঙালী উপস্থিত থাকবেন সেখানে।

কাজেই নির্মলকে বলি, "পুজো দেখার জন্য তো কলকাতায় যাবার দরকার কি? উত্তরকাশীতেই তো বেশ বড় পুজো হচ্ছে।"

"না, শঙ্কুদা।" নির্মল একটু থামে। তারপরে বলে, "আমি ওকে কথা দিয়ে এসেছি—পুজোর আগে কলকাতায় ফিরব, ওকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবো।।"

না, এর পরে আর আপত্তি করা চলে না। এটি তার বিবাহিত জীবনের প্রথম দুর্গোৎসব। ঘরের পথে পা বাড়িয়েই ঘরছাড়া দামাল মানুষের ঘরণীর কথা মনে পড়েছে।

কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই শম্ভু সহসা বলে ওঠে, "তুই নিশ্চিন্ত থাক্ নির্মল, কাল আমিও তোর সঙ্গী হব।"

অবাক কাণ্ড! শম্ভু সবাইকে ফেলে আগে ঘরে ফিরতে চাইছে কেন? তার তো ঘরণী নেই!

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "তুমি আবার তাড়াতাড়ি কলকাতায় যাচ্ছ কেন ?"

"কলকাতায় নয়, উত্তরকাশী যাবো।" শম্ভু উত্তর দেয়।

"উত্তরকাশী তো আমরাও যাচ্ছি।"

"না, আমার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। আরও আগে পৌঁছলে ভাল হত। ওরা আগামীকালই সেখানে এসে যাবে।"

"কারা ?"

"গোপা ও তার মা-বাবা। আমাকে যে ওদের নিয়ে গোমুখী যেতে হবে।"

এর পরে আর বাধা দেওয়া যায় না। ভবঘুরে শম্ভুনাথ দাসের সব চেয়ে আপনজন গোপা—তার ন'বছরের ভাগনী। খিদিরপুর নিবাসী হিমালয়প্রেমিক প্রবোধচন্দ্র রায়ের একমাত্র কন্যা। গোপা যখন আসছে, তখন শম্ভুকে ছেড়ে দিতেই হবে।

নির্মল কামিদেব সঙ্গে এগিয়ে চলে। আমরা তাদের অনুসরণ করি।

দিনের আলো কমে আসছে। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে তমসার ওপারে। এপারেও গোধূলির ছায়া নেমেছে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পথ চলেছি। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে সমতা রাখতে পারছি না। সে আমাদের আগে আগে চলেছে।

ঠিক ছ'টার সময় সেই সাঁকোর কাছে পৌঁছানো গেল। সন্ধ্যে হয়ে এলো বলে—তাই বিশ্রাম না করে এগিয়ে চলি।

যাবার পথের সেই উৎরাইটা এখন খাড়া চড়াই। তাহলেও সেটা বেশ তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এলাম। উঠে এলাম সেই তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে—সেখানে দাঁড়িয়ে সেদিন প্রথম কৃষ্ণচূড়াকে দর্শন করেছিলাম। আজও তাকে দেখি, প্রাণভরে দেখি। কি জানি, কবে আবার দেখা হবে তার সঙ্গে !

কয়েক মিনিট বিশ্রামের পরে কৃষ্ণচূড়ার কাছ থেকে বিদায় নিই। আবার পথ-চলা শুরু করি।

আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। টর্চ বের করা হল। আমার টর্চের ব্যাটারি একেবারেই নিঃশেষিত। দেশাই ও সুশান্তবাবুর টর্চ দু'টির স্তিমিত আলোকে সম্বল করে এগিয়ে চলি।

বন বিভাগের সেই কুঁড়েঘর দু'টির কাছে আসি। আজকের রাতটা এখানে থেকে গেলে হত। অমূল্যরা অনেক পেছনে। কুলিরাও পেছিয়ে পড়েছে। তাদের কাছে আলো নেই।

কিন্তু আর কিছুক্ষণ কষ্ট করলেই তো আমরা ওসলা বিশ্রামগৃহে পৌঁছে যাব। সেখানে দালানে থাকতে পারব, খাটিয়ায় শুতে পারব। অতএব এগিয়ে চলি।

সে কি ! পথটা যে শেষ হয়ে গেল !

সামনে একটা বড় পাহাড়ী ঝরণা। বাঁ পাশের পাহাড় থেকে প্রবল বেগে জল নেমে যাচ্ছে ডান পাশের তমসায়—বহু নিচে।

কি করব ? বন-বিভাগের সেই ঘরে ফিরে যাবো ? শ্রান্ত দেহ, সারা শরীরে ক্লান্তির অবসাদ। সেই সকাল ন'টায় বরফ ভাঙতে শুরু করেছি। এখন সাতটা বেজে গিয়েছে। মাঝখানে সব মিলিয়ে বড় জোর ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করেছি।

ঝরণার তীরে বসে পড়ি। অন্ধকার রাত। চারিদিকে গভীর জঙ্গল—গোবিন্দ-পশুবিহার। বাঘ-ভালুক সবই আছে। গা ছমছম করছে। কি করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।

কতক্ষণ পরে জানি না। সহসা একটা শিষের শব্দে সচকিত হয়ে উঠি। মানুষ কি? মানুষ হলে তো আমাদের দলেরই কেউ হবে। এখানে এসময়ে আমরা ছাড়া আর কে আসবে? তাড়াতাড়ি সাড়া দিই।

কিন্তু অপর পক্ষের সাড়া নেই। তাহলে কি মানুষ নয়? কোন বন্য জন্তু?

আমরা শঙ্কিত বক্ষে প্রতীক্ষা করি। চারিদিক নিথর ও নিস্তব্ধ। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। সময়ের গতিও বুঝিবা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সে-ও যেন চারিপাশের জমাট বাঁধা অন্ধকারের মতো থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

ঐ তো! অন্ধকারেও দেখতে পাই তাকে। টলতে টলতে এদিকেই আসছে—একটা ছায়ামূর্তি। ও কি মানুষ, না ভালুক?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। আইস-এক্স হাতে নিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হই। দেশাই ও সুশান্তবাবু টর্চ জ্বালান।

না, ভালুক নয়, মানুষ। সে কাছে আসে। চিনতে পারি তাকে—দোরজি, শান্তস্বভাব স্বল্পবাক্ ও স্বাস্থ্যবান শেরপা দোরজি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

সুশান্তবাবু বলেন, "ভগবান ওকে ঠিক সময়টিতে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বিগত কয়েক দিনের দৈব-দুর্বিপাকের পরেও আমরা সেই পরম শক্তিমানের প্রতি বিশ্বাস বিসর্জন দিই নি। তাঁর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেললে যে মানুষ পশুতে পরিণত হয়।

হারিয়ে যাওয়া পথ খুঁজে পায় দোরজি। দেশাইয়ের হাত থেকে টর্চ নিয়ে সে অক্লেশে এগিয়ে চলে। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

সে কখনও ডাইনে যাচ্ছে, আবার কখনও বাঁয়ে। মাঝে মাঝেই বসে পড়ে টর্চের স্তিমিত আলোর সাহায্যে পথ-রেখা খুঁজে বের করছে আর বলছে, "সব সময় বাঁ দিক ঘেঁষে পথ চলুন। আছাড় খেলে বড় জোর ব্যথা পাবেন। কিন্তু ডান দিকে পড়ে গেলে একেবারে সোজা দু'হাজার ফুট নিচে।"

দোরজি চলছে তো চলছেই। কখনও আস্তে, কখনও জোরে। সে থামার নামটি করছে না। আমরাও থামতে পারছি না। আটটা বেজে গিয়েছে। আর যে পারছি না চলতে। পা দু'খানি শরীরের ভার বইতে পারছে না। মাথা ঝিমঝিম করছে।

ওপারে একটা আলোর রেখা—অন্ধকারের বুকে তারার মতো মিটমিট করছে। কুকুরের ডাকও কানে আসছে। তাহলে তো ওসলা এসে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি।

দোরজি হাসে। বলে, "ওটা ওসলা নয়, হরকিদুন যাবার পথে দু'খানি ঘরের যে ছোট গ্রামটি আছে, ও তারই আলো।"

"তাহলে যে ওসলা এখনও বহুদূর?" কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি।

অকম্পিত স্বরে দোরজি উত্তর দেয়, "অন্ততঃ মাইল দেড়েক তো হবেই।"

এখনও দেড় মাইল!

দেড় কেন, দেড়শ মাইল হলেও করার কিছু নেই। অতএব নিঃশব্দে এগিয়ে চলি।

কিন্তু আর যে পারছি না। প্রবল বাতাস বইছে। তুষারশীতল স্যাঁতসেঁতে বাতাস—হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে পথ চলেছি। সর্বদা পায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। অন্ধকারে পথ দেখা যাচ্ছে না, অনুমানে চলতে হচ্ছে। রাত ন'টা বেজে গিয়েছে।

আমরা আবার তমসার তীরে এসে গিয়েছি। অন্ধকারেও সাদা একখানি ওড়নার মতো মনে হচ্ছে তাকে। আমাদের ডাইনে বহু নিচে বিক্ষুব্ধা তমসা আর বাঁয়ে কালো পাহাড়—দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা সেই দৈত্যটাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়েই পথ চলেছি।

কিন্তু আর কতকাল এই প্রাণান্তকর পথ-পরিক্রমার সামিল হতে হবে ? এ পথের কি শেষ নেই ?

আছে। সুখের মতো দুঃখের পথও অন্তহীন হয়। একসময় সহসা দোরজির টর্চের আলোয় সেই পরিচিত সাইনবোর্ডটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—বন-বিশ্রামগৃহ ওসলা।

এই মুহূর্তে রাজকন্যে এবং অর্ধেক রাজত্ব দিতে চাইলেও বোধ করি এর চেয়ে বেশি সুখী হতাম না। এমন আনন্দঘন লহমা আমার জীবনে খুব বেশি আসে নি।

১০ই অক্টোবর। ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়। ভাঙল বলা ভুল, ঘুম ভাঙালো। নইলে এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙবে কেন ? ঘুমিয়েছি তো ভোর সাড়ে চারটায়। কাল সারারাতই একরকম জেগে কাটাতে হয়েছে। দফায় দফায় কুলি ও সহযাত্রীরা এসেছে। তাদের হরলিক্স ও বিস্কুট খাওয়াতে হয়েছে। শেষদলে এসেছে অমূল্যরা—রাত তখন সাড়ে তিনটে।

ওদের কিন্তু ঠিক ঘুম ভেঙেছে—শম্ভু ও নির্মলের। ওরাই ঘুম ভাঙালো আমাদের। ওরা চলে যাচ্ছে। একজন উত্তরকাশী,আরেকজন কলকাতা। একজন ভাগিনীর টানে, আরেকজন ঘরণীর।

বাইরে বেরিয়ে বিদায় জানাই ওদের। তারপরে এসে বসি বিশ্রামগৃহের আঙিনায়। মিঠে রোদে ভরে গিয়েছে জায়গাটি। ভারী ভাল লাগছে।

শুধু রোদের জন্য নয়, ভাল লাগছে এই ভেবে যে আমরা আবার ওসলায় এসেছি। ধুমধার পার হতে পারি নি কিন্তু সকলে সুস্থ শরীরে ফিরে আসতে পেরেছি এই রমণীয় নিবাসে। অথচ সেদিন এখান থেকে তালাও শিবিরে রওনা হবার সময় ভেবেছিলাম—আর কোনদিন আসা হবে না এখানে। সে ভাবনা সত্য হয় নি। আবার লালুকে ছাড়া যে এখানে আসতে হবে তাও ভাবিনি কোনদিন।

কামি চা নিয়ে আসে। চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে তমসাকে দেখি—প্রাণভরে দেখি। কি জানি হয়তো তারই তীরে তীরে পথ চলার জন্য আবার ফিরে আসতে হল এখানে।

সেতীরাম এসে সেলাম করে। ওর নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আছে। একটু বাদেই কাজের কথা বলে সে, "সাব্, কুলিরা মাংস খেতে চাইছে। শ'খানেক টাকা হলেই একটা ভেড়া পাওয়া যায়।"

প্রকৃতির রুদ্র রোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেদিন রূপা দুর্যোধনের কাছে ভেড়া মানত করেছিল ! কোন ফল হয় নি। আর আজ কুলিরা একটা ভেড়া চাইছে। গত কয়েক দিন ওরা না খেয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে। একদিন একটু ভাল খাবার জন্য আবদার করতেই পারে। তাছাড়া ওরা ভেড়া আনলে যে আমরাও ভাগে পাবো। বহুদিন মাংস খেতে পাই নি।

টাকা নিয়ে সেতীরা চলে যায়। ওরা ওপারে যাচ্ছে, ওসলা গ্রামে। গ্রামের আশেপাশে প্রচুর ভেড়া চরছে দেখতে পাচ্ছি। ভেড়া পেতে অসুবিধে হবে না।

দাদু সুশীল ও পণ্ডিত জামা-কাপড় থেকে শুরু করে স্লীপিং-ব্যাগ পর্যন্ত সবই রোদে দিচ্ছে। শেরপারা সাহায্য করছে তাদের। আমরা শুধু দফায় দফায় চা খেয়ে যাচ্ছি—

যার যা কাজ। আর অমূল্য গল্প বলছে—গতরাতের গল্প। অমূল্য বলছে—

পায়ের ব্যথার জন্য ডাক্তার ও মণ্ডল একেবারেই জোরে হাঁটতে পারছিল না। ফলে ওরা যখন সেই অন্তর্বর্তী শিবিরের জায়গায় পৌঁছয়, তখনি সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দু'টি দুর্বল টর্চকে সম্বল করে ওরা ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকে। এইভাবে পথ চলে ওরা যখন সেই বন-বিভাগের কুঁড়েঘরের সামনে আসে, তখন রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে।

দেখি কুলিরা ঐ ঘরে ঢুকে মালপত্র মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছে। অমূল্য সেই নারাজ কুলিদের রাজী করিয়ে এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কারণ স্লীপিং-ব্যাগ ও খাবার না এলে আমাদের কষ্ট হবে। অর্থাৎ আমরা যখন এখানে বসে ওদের কষ্টের কথা ভেবেছি, ওরা তখন ওখানে বসে আমাদের কষ্টের কথা ভেবেছে।

শুকনো ডালপালা জ্বালিয়ে মশাল বানিয়ে কুলিরা যখন রওনা হয়েছে, তখন রাত প্রায় বারোটা। অমূল্যরাও বেরিয়ে পড়েছে পথে। প্রথম প্রাণেশ, তারপরে ডাক্তার বিভাস ও মণ্ডল, সবার শেষে অমূল্য।

সবাই আছাড় খেয়েছে, তবে সংখ্যার দিক থেকে মণ্ডলের স্থানই সবার ওপরে। একটা নালা পেরোবার সময় সে জলে পড়ে গিয়েছিল। একবার আছাড় খেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছে।

অমূল্য বলেছে—মণ্ডল, তুমি আজ এখানেই শুয়ে থাকো, কাল সকালে ধীরে সুস্থে বিশ্রামগৃহে যেও।

—না, না, অমূল্যদা! মণ্ডল আপত্তি করেছ—এখানে ভালুক আছে।

—হয়তো আছে। অমূল্য বলেছে—তবে তারা তোমাকে কিছু বলবে না।

—কেন বলুন তো ?

—তোমাকে মড়া ভেবে, ভালুক নিজের কাজে চলে যাবে।

বুঝতে পারছি, কাল রাতে আমরা ওদের জন্য বৃথাই দুশ্চিন্তা করছি। ওরা মোটেই খারাপ ছিল না। বেশ আনন্দেই পথ চলেছে। গল্প-গুজব ও হাসিঠাট্টার প্রলেপ দিয়ে সেই দুর্গম পথকে সুগম করে নিয়েছে।

ও কে ? ফতে সিং নয় ?

হ্যাঁ, ফতে সিং-ই তো। তার সঙ্গে চৌকিদার ভজন সিং। একা আসতে সাহস পায় নি বোধ হয়, তাই ভজনকে নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই টাকা নিতে এসেছে। আসুক একবার—কর্তব্যহীন ফাঁকিবাজ !

চোরের মতো এসে সামনে দাঁড়ায় ফতে। সে চুপ করে আছে। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, "কি হে, কি খবর ? রূপা কোথায় ?"

সহসা কেঁদে ফেলল ফতে। ভজনও চোখ মুছছে।

ব্যাপার কি, ওরা কাঁদছে কেন ? সেই কথাই জিজ্ঞেস করি ফতে সিংকে। বলি, "কি হয়েছে ? কাঁদছ কেন ? রূপা কোথায় ?"

ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে ফতে সিং বলে ওঠে, "সাব্, রূপা খতম্ হো গিয়া।"

খতম ! কি বলছে লোকটা ? রূপা মারা গেছে ? কবে ? কোথায় ? কেমন করে ?

"নহী সাব্! রূপা জীন্দা হ্যায়, লেকিন উসকো জিন্দগী বরবাদ হো গিয়া।"

কেন ? কেন ওর জিন্দগী বরবাদ হয়ে গেল ?

স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারছে না ফতে। শুধু বলছে, রূপা হাঁটতে পারছে না।

বোধ হয় ফিরে আসার পথে পড়ে-টড়ে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙেছে। ঠিক হয়েছে, যেমন আমাদের না বলে-কয়ে পালিয়ে এসেছিল, ভগবান তেমনি শাস্তি দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

ফতে কিন্তু অন্য কথা বলে—রূপা নাকি পড়ে যায় নি কোথাও। সেদিন রাতে ঝোপড়ায় গিয়েই ফতে দেখতে পায় রূপার পা-দুখানি ভয়ঙ্কর ভাবে ফুলে গিয়েছে।

ফতে ডাক্তারকে ডাকতে চায়, রূপা বাধা দেয়। বলে—দিন ভর খাটুনির পরে ডগ্‌দার সাব্ একটু বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করিস না।

সারাদিন রূপার পা-দুখানি কোল নিয়ে ফতে সেই ঝোপড়ায় বসে রয়েছে। একসময় দুঃসহ শীতের রাত শেষ হয়েছে। ভোরের আলো এসে পড়েছে সেই তুষারাবৃত প্রান্তরে।

একটু বাদে উঠে বসেছে রূপা। ফতেকে অবাক করে বলে উঠেছে—চল, আমরা এবারে বেরিয়ে পড়ি। সাব্‌দের আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হবে। আমরা ততক্ষণে বহুদূর চলে যাবো।

ফতে আপত্তি করেছে। বলেছে—ডগ্‌দার সাব্‌কে না দেখিয়ে তোর এখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু রূপা সে পরামর্শ শোনে নি। সে বলেছে—আমার এমন কিছু হয় নি যে এখুনি ডাগ্‌দার সাব্‌কে দেখাতে হবে। নিচে নেমে গেলে, আমি এমনিতেই ভাল হয়ে যাবো। তাছাড়া ডগ্‌দার সাব্ হয়তো বা বলে বসবেন, আমার পক্ষে হেঁটে যাওয়া উচিত নয়। তখন কি হবে ? এমনিতেই সাব্‌দের কুলি কম, তাঁরা নিজেরা মাল বইছেন। কুলির অভাবে কত মাল ফেলে যেতে হচ্ছে। এ অবস্থায় কে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে ? তার চেয়ে চল, এখুনি বেরিয়ে পড়ি। আজ সন্ধ্যের আগে যদি তালাও চলে যেতে পারি, কাল দুপুরে তাহলে ওসলা পৌঁছতে পারব। ডগ্‌দার সাব্ তো ওসলাতেই যাবেন, দরকার হলে সেখানেই দেখাবো তাঁকে।

না, ভগবানকে তখন বৃথাই ধন্যবাদ দিয়েছি। শাস্তি পাবার মতো কোন পাপ করে নি রূপা। যদি সে সত্যই কোন শাস্তি পায়, তাহলে তা হবে নিষ্ঠুর ভগবানের নির্মম অবিচার।

তাই তাঁর কাছেই করজোড়ে প্রার্থনা জানাই—ঠাকুর তুমি রূপাকে ভাল করে দাও, সে যেন সুখী হয়। তার মতো মহৎ মানুষ যে বড় একটা দেখা যায় না সংসারে।

"আমি তাহলে একবার ঘুরে আসি গাঁও থেকে, দেখে আসি ছেলেটাকে ?"

ডাক্তারের কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। তারও শরীর ভাল নয়, পায়ে ব্যথা নিয়ে কাল একটানা প্রায় উনিশ ঘন্টা চড়াই-উৎরাই করতে হয়েছে। তবু কর্তব্যপরায়ণ চিকিৎসক উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমিও উঠে দাঁড়াই। ভাবি ডাক্তারের সঙ্গে গিয়ে একবার দেখে আসি ছেলেটাকে। টাকাটাও দিয়ে আসি। হ্যাঁ, একশ' টাকাই দেব ওকে। নইলে যে গিরিকাকে বিয়ে করতে পারবে না সে, সুখী হবে না রূপা।

ফতে সিং বাধা দেয়। বলে, "নহী সাব্ ! আপকো যানেকা জরুরত নহী। রূপাকো লে আতা হ্যায়। বহ্ আভি আ যায়েগা।"

ভালই হয়েছে। রূপাকে নিয়ে আসছে। গিরিকাও নিশ্চয়ই আসবে তার সঙ্গে। রূপা সেদিন বলেছিল, তাকে নিয়ে আসবে এখানে। ওদের দু'জনকে আশীর্বাদ করতে হবে আমাদের।

করব বৈকি। আমরা অবশ্যই আশীর্বাদ করব ওদের। জীবন-দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে কামনা করব—প্রভু ! তুমি রূপা ও গিরিকার মিলিত জীবনকে মধুময় করে তোল।

প্রতীক্ষার অবসান আসন্ন। রূপা আসছে। তার সঙ্গে কয়েকজন নারী-পুরুষ। তাহলে গিরিকাও আসছে। কিন্তু রূপাকে ওরা বয়ে আনছে কেন ? সে কি এখনও হাঁটতে পারছে না ?

রূপা আসে। প্রৌঢ় পিতা পিঠে করে নিয়ে এসেছে ছেলেকে। সঙ্গে ক্রন্দনরতা জননী, দাদা, দিদি ও কয়েকজন প্রতিবেশী। না—গিরিকা, রূপার মনের মেয়ে গিরিকা আসে নি রূপার সঙ্গে।

কেন আসে নি ? গিরিকার কি আর আমাদের শুভেচ্ছার প্রয়োজন নেই ? ফতে সিং কি ঠিকই বলেছে—রূপার জিন্দগী বরবাদ হয়ে গিয়েছে ?

ডাক্তার বসে পড়ে রূপার সামনে। বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে তাকে। তারপরে ওষুধ আনতে ঘরে যায়। আমরা কয়েকজন তাকে অনুসরণ করি। ঘরে এসে ঘিরে ধরি ডাক্তারকে।

নতমস্তকে অশ্রুসিক্ত স্বরে ডাক্তার কোনমতে বলে, "দিনের পর দিন বেপরোয়া ভাবে ভিজে জুতো-মোজা পরে বরফে থাকার ফলেই এমন হয়েছে।"

"কি হয়েছে ওর ?"

"তুষারক্ষত। সাংঘাতিক ধরনের ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে রূপার। সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে। অথচ সেদিনও রাতে ভিজে জুতো-মোজা খোলে নি, কোন গরম খাবার খায় নি। পরদিন সকালে যদি ওভাবে না চলে এসে একবার আমাকে দেখাতো, তাহলেও অন্তত এতটা মারাত্মক হতে পারত না।"

"এখন কি করা যায় ?"

"দুটো পা-ই আক্রান্ত হয়েছে। ডান পায়ের আঙুলে 'গ্যাংরীণ' আরম্ভ হয়ে গেছে। কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আছে বলে মনে....."

করুণাময় কৃষ্ণ ! এ তুমি কি করলে ? মহাবলী দুর্যোধন ! কেন তোমার এই অকারণ অবিচার ? কত আশা নিয়ে সে সঙ্গী হয়েছিল আমাদের। তোমরা কি তার সব আশা এইভাবে নিঃশেষ করে দিলে ?

ডাক্তার ওষুধপত্র নিয়ে বিশ্রাম-ভবনের আঙিনায় ফিরে যায়, রূপা যেখানে বসে কাঁদছে। কাঁদছে তার বাবা, দাদা ও দিদি।

আচ্ছা, এই আঙিনাটা তো পরিষ্কার দেখা যায় ওসলা গাঁও থেকে। গিরিকা যে ঐ গাঁয়েরই মেয়ে। সে-ও তো তার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে রূপাকে। সে-ও কি চোখের জল ফেলছে ? গিরিকাও কি কাঁদছে ?

থাক, গিরিকার কথা আর নয়। আমি ভাবি রূপার কথা। সেদিন সে হাসতে হাসতে বলেছিল—আমরা বরফে জন্মাই, বরফে মারা যাই। বরফ আমাদের জনম-মরণের সাথী।

আশ্চর্য, সেই বরফই শেষ পর্যন্ত বেইমানী করল রূপার সঙ্গে। তার যৌবনদীপ্ত জীবনটাকে বরবাদ করে দিল।

ব্যর্থ হলেও আমাদের এ অভিযান তমসা উপত্যকাকে জনপ্রিয় করে তুলবে। অদূর ভবিষ্যতে বহু পর্বতারোহী এবং পদযাত্রী এখানে আসবেন। তাঁরা অনেকেই ওসলা গাঁয়ে

রূপাকে একবারটি দেখে আসবেন। তাকে যথাসাধ্য সাহায্যও করবেন।

কিন্তু জীবন্মৃত রূপাকে দেখে তাঁরা কি ভাববেন ? তার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য তাঁরা কাকে দায়ী করবেন ? আমাদের কিংবা গিরিকাকে ?

অথবা মানুষের ভগবানকে ?

পরিশিষ্ট

আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। 'তমসার তীরে তীরে' প্রকাশিত হবার পর থেকে তমসা উপত্যকা, বিশেষ করে হর-কি-দুন বাঙালী পদযাত্রীদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন প্রতি বছর বেশ কয়েক দল করে পদযাত্রী হরকিদুন বেড়িয়ে আসছেন। আরও আনন্দের কথা তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই রূপার সঙ্গে দেখা করে তাকে সাধ্যমত সাহায্য করেন। ভরসা করি ভবিষ্যতে এই পথে পদাযাত্রীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

ইতিমধ্যে এ পথের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। তাই ভবিষ্যতের পদযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনখানি পত্রের অংশবিশেষ এইসঙ্গে প্রকাশ করছি।

—লেখক

আপনার রচিত হিমালয়-ভ্রমণসমৃদ্ধ বইগুলির বিষয়ে আমি যথেষ্ট উৎসাহী, কারণ নিজেও একটু-আধটু ভ্রমণবিলাসী।.....

আপনার 'তমসার তীরে তীরে' বই পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু ভৌগোলিক তথ্য আহরণের জন্য আমি সম্পূর্ণ একা সেই দুর্গমে যাত্রা করি। এ বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু কৃতিত্বের দাবী হয়ত করতে পারি ভারতীয় ভ্রমণকারীদের জগতে। প্রথম আমিই এককভাবে এই দুর্গমে পদযাত্রা করি। মোরি থেকে শুরু করে পদযাত্রায় হর-কি-দুন পার হয়ে আরও আট মাইল দূরে বোরাসু গিরিপথের কাছাকাছি প্রায় ১৬,৫০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করি ওসলার চৌকিদার ভজন সিংকে সঙ্গে নিয়ে। ফেরার পথে রুইসারা গাড ধরে ধুমধারকান্দির কাছাকাছি অন্য একটি গিরিপথ (১৭,০০০') ধরে যমুযোত্রী আসবার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাতিল করতে হয় ওসলা গ্রামবাসীদের নিষেধে ও কোন গাইড যেতে রাজী না হওয়ার জন্যে। আমার এই পদযাত্রার বিবরণ নৈটয়ার রেস্ট্ হাউস-য়ের লগ বুক-এ লেখা আছে।...

সবশেষে রূপা সিংয়ের কথা কিছু বলব। আপনাদের অভিযানের সাথী রূপার শোচনীয় পরিণতির কথা জেনে ওসলাতে তার সঙ্গে দেখা করার বাসনা আগেই ছিল। সেই অনুযায়ী যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা করি। সে তখন মাঠে কাজ করছিল। দিব্যি সুস্থ-সবল যুবক, বিবাহিত—দুই সন্তানের জনক সে আজ। তবে তুষার-কামড়ের জন্য বাঁ পায়ের আঙুলগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। সে আপনাদের নমস্কার জানিয়েছে।

মান্যবরেষু শঙ্কু মহারাজ,

আমরা তমসা উপত্যকার হর-কি-দুন দেখে কল্পার পথে সিমলা এসে পৌঁচেছি। বাঙালী যাঁরা বেড়াতে ভালবাসেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের দৃষ্টি আপনার দিকে নিবদ্ধ। আপনার লেখায় তাঁরা পথের ডাক শুনতে পান। তমসা উপত্যকার যা কিছু তথ্য, তা আমরা জেনেছি আপনার মাধ্যমে। তাই মনে হল এ বছর তমসা উপত্যকায় বেড়াবার সময় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা আপনাকে জানালে আপনার পাঠক-পাঠিকারা উপকৃত হবেন।

সাতজন মহিলাসহ বিশজন পদযাত্রী নিয়ে আমাদের দল। আমাদের গড় বয়স পঞ্চাশ বছরের ওপরে। সাতষট্টি বছরের শচীন্দ্রনাথ মিত্র আমাদের দলনেতা। কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স এই যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন। আটষট্টি বছরের জ্ঞান মিত্র এবং সাতান্ন বছরের বিভা মিত্র ও জয়ন্তী সেন দলের প্রবীণতম সদস্য এবং সদস্যা। চুয়ান্ন বছরের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীহাররঞ্জন সরকার এই পদযাত্রার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর স্ত্রী মাধবীবৌদিও আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

আমাদের দলটি ২রা অক্টোবর দেরাদুন এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে ৪ঠা অক্টোবর দেরাদুন পৌঁছায়। সে রাত্রি আমরা দেরাদুনে থেকে যাই। পরদিন ৫ই অক্টোবর সকাল ৮টার বাসে আমরা মোরির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। হারবার্টপুর হয়ে বিকাশনগর পৌঁছে সকাল সাড়ে নয়টায় আমরা চা-জলখাবার খেয়েছি। তারপর যমুনার তীর ঘেঁষে এগিয়ে গেছি ডাকপাথরের মধ্য দিয়ে। হীরাপুরে যমুনার পুল পেরিয়ে কলসিকে পিছনে ফেলে লোহারি গ্রাম ছাড়িয়ে মাড়োড় পৌঁচেছি। এখানে একটি হতভাগ্য বাস দেখলাম। সেটি পুরোলা যাবার পথে এইখানেই খাদে পড়ে গিয়েছিল এক মাস আগে। ফলে হতাহত হয়েছিল বেশ কিছু লোক। ডামটায় আমরা মধ্যাহ্নভোজন শেষ করেছি। নওগাঁও পৌঁছতে বিকাল চারটে হয়ে যায়। জাডোড় খাডে বাসের চাকা ফেটে যাওয়াই এই দেরির একমাত্র কারণ। এখানে আমরা চা খেয়েছি। যমুনাকে বিদায় জানিয়ে কমল নদীর ধারাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেছি পুরোলাব দিকে। শেষ বিকালে আমরা পুরোলা পৌঁছে অগ্রবর্তী বিশ্রামগৃহগুলির রিজারভেশন্ ঠিক আছে কিনা ডি. এফ. ও-র আপিস থেকে জেনে নিয়ে মোরির দিকে এগিয়ে যাই। এখনও মাঝে-মাঝে বাস পুরোলার পর আর এগোয় না। তখন বাধ্য হয়ে পুরোলা থেকেই পদযাত্রা শুরু করতে হয়। আমরা জারমোলায় রাত কাটাই নি। মোরি পৌঁছতে প্রায় রাত ন'টা বেজে যায়। এখানেই সে রাতের মতো থেমে যাই। এখানে হোটেল, বিশ্রামগৃহ বা কোন ভাল থাকার জায়গা নাই। চায়ের দোকানের পিছনের ঘরে বা ঐরকম কোন আশ্রয়ে কোনরকমে রাত কাটিয়ে দেওয়া। যদি বরাত ভাল থাকে তাহলে অনেক সময়ে পি. ডবলিউ. ডি-র বা কোন কনট্রাক্টারের ট্রাকে শাঁকড়ি অবধি পৌঁছানো যায়। খচ্চর, কুলি ও অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা আগে নাকি করতে হোত পুরোলা বা মোরি থেকে। আমরা কিন্তু সব সুবিধাই নৈটয়ারে পেয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা উচিত যে এ অঞ্চলে ঘোড়া পাওয়া যায় না—তার পরিবর্তে মানুষ বওয়ার খচ্চর পাওয়া যায়। কোটারি নামে একটি লোকের নৈটয়ার বাজারে খাবারের দোকান আছে। তার অনেকগুলি খচ্চর। সে নিজেই খচ্চরাধিপতি হয়ে আমাদের সঙ্গে হর-কি-দুন পর্যন্ত গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যের কথা

লোকটির স্বভাব তার পালিত পশুগুলির চেয়েও নিকৃষ্টতর। পদে পদে সে আমাদের ভুগিয়েছে।

শাঁকড়ি অবধি পথ বড় ট্রাক চলাচলের জন্য খুবই প্রশস্ত। শাঁকড়িতে আগে রাত্রিবাসের অসুবিধা ছিল। আমরা কিন্তু ওখানে ডাকবাংলো তৈরির কাজ প্রায় শেষ হতে দেখে এসেছি। শাঁকড়ি ও তালুকার মাঝে বেশ চওড়া একটি ঝর্ণার উপর যে পাকা পুলটি ছিল তা গত বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই আমরা ঐ ঝর্ণা পেরিয়েছি পাশাপাশি রাখা দুটি গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে। তালুকা পর্যন্ত রাস্তা ভাল। তালুকা ও গঙ্গাড় গ্রামের মাঝে বেশ চড়াই ভাঙতে হয়। ওসলা (সীমা) বিশ্রামগৃহে রাত কাটিয়ে আমরা এগিয়ে গেছি হর-কি-দুনের দিকে। এ পথে ঝর্ণার কদাচিৎ দেখা মেলে—তাই জলের ব্যবস্থা সীমা থেকেই করা উচিত। হর-কি-দুনের কিছু আগেই পড়ে এ পথের সব থেকে বড চড়াই।

আপনার বইয়ে হর-কি-দুনের যে বর্ণনা পেয়েছি—তা হুবহু মিলে গেছে। আর গোবিন্দ পশুবিহার এবং বিশ্রামগৃহেও কোন পরিবর্তন হয় নি। আমরা মাত্র একটি রাত এখানে কাটিয়েছিলাম। সেইজন্য যমদ্বার হিমবাহের কাছে যেতে পারি নি। শচীনদা, তাঁর বৌদি এবং সস্ত্রীক যুগলবাবু সামান্য একটু এগিয়েছিলেন যমদ্বারের পদপ্রান্তের দিকে। সময় অল্প বলে বেশি দূর এগোতে পারেন নি।

ফেরার পরে আমরা ওসলা গ্রামে দুর্যোধনের মন্দির দেখি এবং রূপাকে খুঁজে বার করি। আপনি শুনলে খুশী হবেন যে রূপা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, শুধু তার বাঁ পায়ের আঙুলগুলি নেই। সে ওসলা ডাকবাংলোয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং আমাদের সামনেই সে একটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে রওনা দিল তালাও-এর পথে। এ সংবাদে আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।

যাই হোক এই চিঠি পড়ে আপনি নিশ্চয়ই আগামী দিনের যাত্রীদের ভরসা দেবেন—তাঁরা যেন নিজেদের বয়সের ভার দেখে কিম্বা মহিলারা নিতান্ত মহিলা বলেই যেন হর-কি-দুনের পথে পা বাড়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পিছিয়ে না থাকেন।

প্রিয় শঙ্কুদা,

শুনে সুখী হবেন আমরা আপনার 'তমসার তীরে তীরে' পড়ে হর-কি-দূন ও যমদ্বার হিমবাহ দেখে ফিরে এসেছি। আমরা চারজন—নন্দদুলাল দাস, দেবু মজুমদার, গোরা গুহঠাকুরতা ও প্রণব হাজরা। আমরা সবাই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া হেড অফিসের কর্মী।

আপনার বইতে আপনি হর-কি-দুন পথের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, সুতরাং

সেকথা বলে অযথা এ চিঠিকে বড় করে তুলব না। কেবল বলব পথের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এখন তমসা উপত্যকায় ভ্রমণ অনেক সহজতর কিন্তু তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য অপরিবর্তিত।

এবারে যমদ্বার হিমবাহের প্রসঙ্গে আসা যাক। হর-কি-দুন থেকে যমদ্বার যাবার জন্য পথ বলতে কিছু নেই। কিন্তু আছে অজস্র ফাটল আর এখানে-ওখানে হাল্কা বরফের স্তর। একটু এদিক-ওদিক হলেই তুষারগহ্বরে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা। গাইড ছাড়া এ পথে যাওয়া কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

আমরা তাই ওসলা গ্রাম থেকেই গাইড নিয়ে গিয়েছিলাম। আর সে গাইড আর কেউ নয়, আপনার রূপা সিং। রূপার বাঁ পায়ের একটাও আঙুল নেই। কিন্তু সে জুতো পায়ে দিয়ে হিমবাহের ওপরেও অক্লেশে চলা-ফেরা করতে পারে। এবং এখন সে ওসলা অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ গাইড। রূপা সম্পর্কে অনেক কথাই আপনাকে লেখার আছে। কিন্তু তার কথায় পরে আসছি।

যমদ্বার হিমবাহের আনুমানিক উচ্চতা চোদ্দ হাজার ফুট। তাপমাত্রা প্রায় হিমাঙ্কের নিচে। হর-কি-দুন বাংলো থেকে খুব সকালে বেরিয়ে পড়লে যমদ্বার দেখে আবার সন্ধ্যের আগেই বাংলোয় ফিরে আসা যায়। তাঁবু থাকলে হিমবাহে রাত কাটানো যেতে পারে।

এবারে রূপা সিংয়ের কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা ওসলা পৌঁছে রূপার সঙ্গে দেখা করলাম। আজও সে সদাহাস্যময় পাহাড়ী যুবক। বিশেষ আগ্রহে সে আমাদের নিয়ে গেল তার ঘরে। কি ভাবে অতিথি সৎকার করবে সে চিন্তায় বেচারী আকুল হল। অথচ তার সংসারে যে কি দারিদ্র্য, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল, সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। দারিদ্র্যের জন্য কোন ক্ষোভ বা দুঃখ দেখতে পেলাম না তার কিংবা তার স্ত্রীর মনে।

আমরা তাকে গাইড হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই শুনে সে খুবই খুশি হল। মজুরির প্রসঙ্গ উঠতে বলল—আপনারা যা পারবেন, তাই দেবেন।

রূপা আমাদের হাত ধরে যমদ্বার নিয়ে গিয়েছে। সে খুবই নির্ভরযোগ্য। ধরাসু গিরিবর্ত্ম এবং তমসা উপত্যকা থেকে যমুনোত্রী যাবার পথও তার নাকি খুব ভাল জানা আছে। যে কোন পদযাত্রীদের সে একজন আদর্শ পথপ্রদর্শক।

হর-কি-দুন থেকে ওসলা ফিরে আসার পথে স্বাভাবিক ভাবেই আপনাদের প্রসঙ্গ উঠল। আপনাদের সঙ্গে গিয়ে তার পায়ের আঙুল গিয়েছে কিন্তু আপনাদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আপনি বইতে তার কথা লিখেছেন বলেই কলকাতার সাহেবরা তাকে দেখতে আসে, সাহায্য করে, সঙ্গে নিয়ে যায়।

তারপরেই সে আবার অনুরোধ করে বসল—আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন? সেই সাহেবদের আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

আপনি শুনে খুশি হবেন শঙ্কুদা, আমরা তাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি। জীবনে যে মোটরগাড়ি দেখে নি, সে এখন সমানে ট্রেন ও ট্রামে চড়ে বেড়াচ্ছে। হাওড়া পুল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, যাদুঘর, বিড়লা তারামণ্ডল, চিড়িয়াখানা আর সিনেমা দেখছে। কলকাতার হিমালয়-প্রেমিকরা এবং আমাদের সহকর্মীরা তাকে প্রচুর জামা-কাপড়, জিনিসপত্র ও টাকা-পয়সা উপহার দিয়েছে। প্রতিদিন সে নেমন্তন্ন খাচ্ছে। সে আমাদের আদর-আপ্যায়নে অভিভূত। তবু তার মন ভরে নি। এখনও যে আপনার সঙ্গে দেখা

হয় নি তার। তাই আগামী রবিবার সকালে বাড়ি থাকবেন। আমরা আপনার রূপাকে নিয়ে আসব আপনার কাছে।

আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। ইতি

যমুনোত্রী—হরকিদুন—গোমুখী—তপোবন যাত্রাপথের পথপঞ্জী

১	দিন	ঋষিকেশ	থেকে	হনুমান চটি	বাসপথে		
২	”	হনুমান চটি	”	জানকীবাঈ চটি	হাঁটাপথে	৭	কিঃ মিঃ
৩	”	জানকীবাঈ চটি	”	যমুনোত্রী	”	৭	”
		যমুনোত্রী	”	জানকী বাঈ চটি	”	৭	”
৪	”	জানকীবাঈ চটি	”	হনুমান চটি	”	৭	”
		হনুমান চটি	”	বারকোট	বাসপথে		
৫	”	বারকোট	”	সাঁকড়ি	”		
৬	”	সাঁকড়ি	”	তালুকা	হাঁটাপথে	১০	”
৭	”	তালুকা	”	ওসলা	”	১৩	”
৮	”	ওসলা	”	হরকিদুন	”	১০	”
৯	”	হরকিদুন	”	যমদ্বার হিমবাহে পদচারণা, মহেন্দ্র সরোবর ও স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গমালা দর্শন।			
১০	”	হরকিদুন	”	সাঁকড়ি	হাঁটাপথে	৩৩	”
১১	”	সাঁকড়ি	”	উত্তরকাশী	বাসপথে		
১২	”	উত্তরকাশী	”	গঙ্গোত্রী	”		
১৩	”	গঙ্গোত্রী দর্শন ও বিশ্রাম					
১৪	”	গঙ্গোত্রী	”	ভুজবাসা	হাঁটাপথে	১৪	”
১৫	”	ভুজবাসা	”	গোমুখী	”	৫	”
		গোমুখী	”	তপোবন*	”	৫	”
১৬	”	তপোবন	”	ভুজবাসা	”	১০	”
১৭	”	ভুজবাসা	”	গঙ্গোত্রী	”	১৪	”
		গঙ্গোত্রী	”	উত্তরকাশী	বাসপথে		
১৮	”	উত্তরকাশী	”	ঋষিকেশ/হরিদ্বার	বাসপথে		

---

* তপোবনে জন চারেক লোকের রাত্রিবাসের উপযোগী একটি গুহা এবং জল আছে। হালকা মালপত্র সঙ্গে নিতে হবে, যাতে একজন কুলি দু'জন যাত্রীর মাল বইতে পারে। বড় দল হলে যমুনোত্রী ও হরকিদুন পথে মাল বইবার জন্য খচ্চর নেওয়া যেতে পারে। তাতে কুলিভাড়া কম লাগবে।

যাত্রাকাল—মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস।

ব্রহ্মলোকে

অনুজ প্রতিম প্রয়াত পর্বতারোহী
অসিত কুমার মৈত্র
এবং
তাঁরই মতো
যাঁরা হিমালয়কে ভালবেসে
চিরকালের তরে হিমালয়ে রয়ে গিয়েছেন
তাঁদের সবার উদ্দেশে—

আদালতের সমন কিম্বা পুলিশের পরোয়ানা থেকে যদিওবা ছাড় পাওয়া যায়, হিমালয়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না। আর তা যায় না বলেই আজ আমি হিমালয়ে।

সত্যি বলতে কি এবারে আমার হিমালয়ে আসার কোন কথাই ছিল না, পর্বতাভিযান তো দূরের কথা। থাকবে কেমন করে ? আমার এক ফরাসী বোন ভারত দর্শনে এসেছিল। তাকে নিয়ে প্রায় মাসখানেক দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করেছি। তারপরে বম্বে গিয়ে তাকে বিমানে তুলে নিয়ে সবে দিনদশেক আগে কলকাতায় ফিরেছি। সুতরাং আমার এবছরের ভ্রমণ হয়ে গিয়েছে। বছরে একবারের বেশি বড়-ভ্রমণ হয়ে ওঠে না।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসেই শুনলাম অনুজপ্রতিম অমূল্য পা ভেঙ্গে বিছানায় শুয়ে আছে। ওকে দেখতে গেলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে অমূল্য হঠাৎ বলে উঠল—শঙ্কুদা, তোমাকে এবারে আমাদের সঙ্গে পর্বতাভিযানে যেতে হবে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছি—তুই পর্বতাভিযানে যাচ্ছিস !

—হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। আগের থেকে সব ঠিক হয়ে আছে।

—কবে রওনা হচ্ছিস ?

—৯ই সেপ্টেম্বর।

—সেকি ! আজ যে পয়লা !

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এই ভাঙা পা নিয়ে আটদিন পরে তুই পর্বতাভিযানে রওনা হতে পারবি ?

—কেন পারব না ? পাল্টা প্রশ্ন করেছে অমূল্য। বলেছে—পরশু প্লাস্টার কেটে দেবে। তারপরেও তো ছ'দিন বিশ্রাম নিতে পারছি।

ওর কথা শুনে হাসি পেয়েছে আমার। তবু বলেছি—আমার পা ভাঙ্গার পরে প্লাস্টার কেটে আমি একমাস বিশ্রাম করেছি। তারপরে প্রায় মাসছয়েক কলকাতার বাইরে যাই নি। পায়ের পরিচর্যা করেছি।

—সে তো জানি। তুমি কিছুদিন কোনচোকির 'নেচার কিওর' হাসপাতালেও ছিলে। কিন্তু তুমি দেখে নিও আমার ওসব কিছুই লাগবে না। তবে এবারে আমি আর মূল-শিবিরের ওপরে যেতে পারব না, আর তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। দুজনে পরামর্শ করে অভিযান পরিচালনা করা যাবে।

আবার হাসি পেয়েছে আমার। ১৯৫০ সাল থেকে অমূল্য পর্বতাভিযান পরিচালনা করে আসছে। কাজেই তার আমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তবু এ প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছি—স্বপন কি বলছে ?

স্বপন মানে পর্বতারোহী ও বিলেত ফেরৎ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ স্বপন রায় চৌধুরী। সে-ই আমার পা অপারেশন করেছিল এবং এখন অমূল্যর চিকিৎসক।

আমার প্রশ্নে অমূল্য সেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য, তারপরেই সহাস্যে বলে ওঠে—স্বপন পর্বতারোহী হলেও এম. এস., এফ. আর. সি. এস. ডাক্তার। সে বলেছে, অভিযানে গেলে আমাকে নিজ দায়িত্বে যেতে হবে। আমি তাই যাবো ঠিক করেছি।

এর পরে আর কথা চলে না। অতএব অন্য প্রশ্ন করেছি—এবারে কোথায় যাচ্ছিস ?

—কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে। কালীঘাটের ইন্‌স্টিটিউট অব্ মাউন্টেনীয়ারিং এক্‌সপ্লোরেশনস এই অভিযানের আয়োজন করছে। এবারে আমরা ২১,০৪৯ ফুট অর্থাৎ ৬,৪১৬ মিটার

উঁচু ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে বসে পিতামহের পুজো করব। তুমি তো এখনও হিমালয়ের এ অঞ্চলে যাও নি!

আমি মাথা নেড়েছি। সে আবার বলেছে—শঙ্কুদা, তুমি একবছরে গোমুখী ও গঙ্গাসাগরে গিয়েছো। এবারে চলো একবছরে কন্যাকুমারী ও কাশ্মীর ঘুরে আসবে।

প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করবার মতো নয়। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে কি? তাছাড়া তিন বছর ধরে আমার আর হিমালয়ে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তিন বছর আগে য়ুরোপ গিয়েছি, পরের বছর পা ভেঙে ঘরে থেকেছি, গত বছর আবার য়ুরোপে যেতে হয়েছে। সুতরাং সুযোগটি হাতছাড়া করা ঠিক নয়।

অতএব হিমালয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে আমি ওদের সঙ্গী হয়েছি। গতকাল দুপুরে আমরা জম্মু পৌঁচেছি। আজ সকালে জম্মুতে কিশ্‌তোয়ারগামী এই বাসে উঠেছি। সকাল সাড়ে ছ'টায় বাস ছেড়েছে।

কিন্তু বাস কিংবা কিশ্‌তোয়ারের কথা পরে হবে, তার আগে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

নেতা অমূল্য সেন আমার পাঠক-পাঠিকাদের পূর্ব পরিচিত। আমার বিভিন্ন বইতে আমি তাব কথা বলেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন অফিসার। এখন বয়স ছেচল্লিশ। বিবাহিত, এক ছেলে ও এক মেয়ের বাবা। স্ত্রী দীপা হিমালয়-পাগল স্বামীর পর্বতারোহণে সর্বদা উৎসাহ দেয়।

দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট থেকে অমূল্য 'বেসিক', 'এ্যাড্‌ভান্স' এবং 'ইন্‌স্ট্রাক্টার' কোর্সের ট্রেনিং নিয়েছে। সে ১৯৫০ সাল থেকে পর্বতাভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে। অর্থাৎ এটি তার নেতৃত্বের রজতজয়ন্তী বর্ষ। সে চন্দ্রপর্বত (৬,৭২৮ মিঃ), কেদারনাথ ডোম (৬,৮৩১ মিঃ), রাধানাথ পর্বত (৬,৬১৭ মিঃ) ও পঞ্চচুলি (৬,৯০৪ মিঃ) শিখরে আরোহণ করেছে। পর্বতাভিযানে এটি তার দশম নেতৃত্ব। দু'বছর আগে এই ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে সুদুর্গম সুদর্শন (৬,৫০৭ মিঃ) পর্বতশিখরে সে সফলকাম অভিযান পরিচালনা করেছে।

আমাদের সহনেতা গৌতম চক্রবর্তীর বয়স আঠাশ বছর। স্টেট ব্যাঙ্ক্ অব্ ইন্ডিয়ায় কাজ করে। সে উত্তরকাশীর নেহেরু ইনস্টিটিউট অব্ মাউন্টেনীয়ারিং থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। ৫,৮১৮ মিঃ উঁচু রুদ্রগয়রা শিখরে আরোহণ করেছে। ১৯৫০ সালের সফলকাম সুদর্শন অভিযানেও সহনেতৃত্ব করেছে।

গৌতমের পরে বলতে হয় শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণ দাশগুপ্ত, আমাদের পর্বতারোহী সদস্য। সেও স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ায় কাজ করে এবং উত্তরকাশী থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। বয়স একত্রিশ। দীর্ঘদেহী ও সুদর্শন কৃষ্ণ সুদর্শন শিখরে আরোহণ করেছে।

তারপরে ছোটখাটো শিবু, শিবু দাস। বয়স ২৯। উৎসাহে ভরপুর। সে ডেকরেটিং ও ক্যাটারিং-এর ব্যবসা করে। পুজোর আগে অভিযানে এসে বহু বহু টাকা হাতছাড়া করল। কিন্তু—এই লোকসানের জন্য তার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। কেনই বা থাকবে? হিমালয়ের নেশা যে ঘোড়দৌড়েব নেশাকেও হার মানায়।

শিবুও উত্তরকাশী থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। সেও রুদ্রগয়রা এবং সুদর্শন শিখরে আরোহণ করেছে।

আমাদের অপর দুই পর্বতারোহী সদস্য হল জগদীশ নস্কর ও তপন ঘোষ। দুজনেই

উত্তরকাশী থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে এবং রুদ্রগয়রা শিখরে আরোহণ করেছে। জগদীশের বয়স তেত্রিশ আর তপনের সাতাশ। জগদীশ পোর্ট ট্রাস্ট-এর কর্মী আর তপন কাজ করে কানাড়া ব্যাঙ্কে। জগদীশ সুদর্শন শিখরে আরোহণ করেছে। আর তপন আমাদের অভিযানের কোষাধ্যক্ষ।

অভিযানের ছ'জন পর্বতারোহী সদস্যের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া গেল। ওরা ছাড়াও আমাদের আরও ছ'জন সদস্য রয়েছে। আমাদের পরিচয় 'নন-ক্লাইম্বিং মেম্বার'। আমরা মূল-শিবিরে বসে ওদের শিখরারোহণে সাহায্য করব।

আমি ছাড়া আমার দলের বাকী পাঁচজন হল—মৃত্যুঞ্জয়, বিনয়, গোরাচাঁদ, শৈলেশ ও অমিতাভ। এরা কেউ ট্রেনিং নেয় নি, কিন্তু সবাই হিমালয়ের দুর্গম পথে ও হিমবাহ অঞ্চলে পদচারণা করেছে। এবং এরা সবাই সফলকাম সুদর্শন অভিযানের সদস্য ছিল।

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ক্লাবের সম্পাদক ও অভিযানের ম্যানেজার। চাকরি ও ব্যবসা করে। তার ডাকনাম জয়। সে সহনেতা গৌতমের বড় ভাই। বয়স একত্রিশ বছর। আগামী বছর বিয়ে করছে।

বিনয় ভট্টাচার্যের ডাক নাম টুলটুল। তার বয়স সাতাশ। অতিশয় উৎসাহী ও কর্মঠ সদস্য। একটা সওদাগরী অফিসে কাজ করে। গোরাচাঁদ পাল ওদের দলে সবার বড় এবং সে-ই একমাত্র বিয়ে করেছে। বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে আছে। গোরাও পোর্টট্রাস্টের কর্মী। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর।

শৈলেশ চক্রবর্তীর বয়স একত্রিশ। সে বিনয়ের সহকর্মী ও অভিযানের একজন উৎসাহী সদস্য। তার হাতের লেখাটা ভারী সুন্দর এবং গানের গলাটি বড়ই মিঠে।

অমিতাভ দেওয়ানজীর ডাকনাম রঞ্জু, আমরা বলি ডাক্তার। সে ডাক্তারের ছেলে। কিন্তু ডাক্তারী পাশ করা তো দূরের কথা, কোনদিন কম্পাউন্ডারীও করে নি। সুতরাং সে হাফ ডাক্তার পর্যন্ত নয়। অথচ শেষ মুহূর্তে যখন নির্বাচিত ডাক্তার বলে বসলেন আসতে পারবেন না, তখন মুষড়ে পড়া অমূল্যকে ভরসা দিয়ে অমিতাভ বলেছে—তুমি এ ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দাও লীডার!

গৌতম ও টুলটুল ওকে সমর্থন করেছে—তুমি রঞ্জুর ওপরে অনায়াসে নির্ভর করতে পারো লীডার! রঞ্জু ওর বাবার কাছ থেকে চিকিৎসা বিদ্যার অনেকখানি আয়ত্ত করে নিয়েছে। আধুনিকতম ওষুধের ব্যবহার থেকে ইঞ্জেকশান দেওয়া পর্যন্ত সবই ওর নখদর্পণে।

গত দুদিনে তার কিছু প্রমাণ আমিও পেয়েছি। আর তাই সবার সঙ্গে আমিও অমিতাভকে ডাক্তার ডাকতে শুরু করেছি।

রঞ্জুর বয়স আঠাশ। চেহারাটি সুন্দর। একটা বড় কোম্পানীতে ভাল চাকরি করে। ছুটি পাবার অসুবিধে থাকায় ছুটি না নিয়েই অভিযানে চলে এসেছে। চাকরির কথা বাড়ি ফিরে ভাবা যাবে।

এই হল অভিযাত্রী সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এছাড়াও আমাদের দলে রয়েছে, দু'জন শেরপা পলদিন ও নিমা আর দু'জন উচ্চ-হিমালয়ের মালবাহক রাম সিং ও পেয়ার সিং। শেরপারা এসেছে দার্জিলিং থেকে আর মালবাহকরা উত্তরকাশী থেকে। কিন্তু তাদের কথা পরে হবে। এবারে আমি একটু নিজের কথা বলে নিই।

এতক্ষণ ধরে আমি যাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম, তাদের মধ্যে

একমাত্র অমূল্য ছাড়া আর কারও সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল না। সত্যি বলতে কি হাওড়াতে রেলে উঠে প্রথম আলাপ হয়েছে। আমরা রেলে উঠেছি ৯ই সেপ্টেম্বর রাত দশটায়। আজ ১২ই সেপ্টেম্বর, এখন সকাল দশটা। মাত্র আড়াই দিন। কিন্তু এরই মধ্যে অপরিচয়ের সব ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কতকালের পরিচয়।

আমরা ৯ই সেপ্টেম্বর রাতে হিমগিরি এক্‌সপ্রেসে হাওড়া থেকে জম্মু রওনা হয়েছি। কিন্তু তখন আমরা মাত্র বারোজন, দশজন সদস্য ও দুজন শেরপা। গৌতম ও শিবু তিনদিন আগে উত্তরকাশী রওনা হয়ে গেছে। ওরা সাজ-সরঞ্জাম আনতে গিয়েছিল।

আমাদের ছোট অভিযান। সামান্য সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই আমরা ব্রহ্মালোকে চলেছি। কিন্তু এটুকু যোগাড় করার জন্য অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসেস, দার্জিলিং ও উত্তরকাশীর পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সাজ-সরঞ্জাম আনতে হয়েছে। তপন ও জগদীশ গিয়েছিল দার্জিলিং আর গৌতম ও শিবু উত্তরকাশী। রাম ও পেয়ারকে নিয়ে ওরা গতকাল শেষরাতে সাহারণপুর স্টেশনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আর তখন থেকেই আমরা ষোলজন।

আগেই বলেছি আজ সকাল সাড়ে ছ'টায় জম্মু থেকে আমাদের বাস ছেড়েছে। উধমপুর পার হয়ে এসেছি। বাস শ্রীনগরের সেই সুপরিচিত পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। এই পথে আমরা বাটোট পর্যন্ত যাবো।

বাটোট আমার পরিচিত জায়গা। শ্রীনগর কিংবা পহেলগাম যাওয়া-আসার পথে বেশ কয়েকবার বাটোটে দুপুরের খাবার খেয়েছি। বাটোটে আমিষ ও নিরামিষ দুরকম খাবারই বেশ ভাল পাওয়া যায়।

সকালে মালপত্র গোছগাছ করে বাসে তোলার হাঙ্গামায় শুধু চা-বিস্কুট খেয়ে রওনা হতে হয়েছে। পথে উধমপুরে গাড়ি থেমেছে মাত্র বিশ মিনিট। তারই মধ্যে জয় আমাদের চানা-পুরী ও চা খাইয়েছে। কিন্তু পাহাড়ীপথের ঝাঁকুনি আর হিমালয়ের স্নিগ্ধ সমীরে সে খাবার বহুক্ষণ হজম হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা বাটোটের পথ চেয়ে রয়েছি।

যথাসময়ে অর্থাৎ দুপুর বারোটায় বাস বাটোট পৌঁছল। সহযাত্রীরা সবাই উল্লসিত। মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করা যাবে।

কিন্তু একি কাণ্ড! দোকান-পাট সব বন্ধ কেন? আজ কি এখানে বাজার বন্ধের দিন? কিন্তু খাবারের দোকান বন্ধ হবে কেন?

বাটোট বেশ ব্যস্ত জায়গা। অথচ আজ পথ প্রায় জনহীন। কেবল কয়েকজন যুবক রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলছে। আমাদের থামতে নিষেধ করছে কি? হ্যাঁ তাই। ওরা আমাদের চলে যেতে বলছে। কিন্তু কেন?

কন্ডাক্টর গম্ভীর স্বরে জানায়—বন্‌ধ।

আঁতকে উঠি। বহুক্ষণ ধরে আশায় ছিলাম, এখানে গরম গরম ভাত ডাল ও সবজি পেটে পড়বে, জঠরাগ্নি নির্বাপিত হবে। অথচ একি হোল?

যা হবার তাই হয়েছে। ভারত যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। আর বাটোট আমার ভারতভূমিরই একটি অংশ। অতএব এখানে বন্‌ধ থাকবে না কেন? রাজনৈতিক ফয়দা তোলার সবচেয়ে সহজ উপায় কাজ বন্ধ করা। আর কয়েক ডজন দাঙ্গাবাজ সক্রিয় 'ক্যাডার' থাকলেই একটা মহানগরীর জীবনযাত্রা কয়েক মিনিটে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। ফলে বন্‌ধ এখন আসমুদ্র-হিমাচলকে অক্টোপাসের মতো নাগপাশে বন্দী করে ফেলেছে।

বাটোট বাজারে বাস থামল না। আমরা এগিয়ে চললাম। বাটোট ছাড়িয়ে শ্রীনগরের পথে খানিকটা এগিয়ে আসতেই দেখা হল চন্দ্রভাগার সঙ্গে। বহুদিন বাদে দেখা। লাদাখের পথে শেষবার কাশ্মীর এসেছি পাঁচ বছর আগে। আর চন্দ্রভাগার জন্মভূমি লাহুলে গিয়েছি বিশ বছর আগে। আজ তাই চন্দ্রভাগাকে আবার কাছে পেয়ে ভারী আনন্দ হচ্ছে।

কিন্তু আজ শ্রীনগরের পথ আমাদের পথ নয়। তাই চন্দ্রভাগার তীর ধরে উত্তরে অর্থাৎ রামবানের দিকে না এগিয়ে বাস ডাইনে বাঁক নিল। নিম্ন-চন্দ্রভাগাব পথ ছেড়ে আমরা উচ্চ-চন্দ্রভাগার তীরপথ ধরে দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে চলি। বলাবাহুল্য এ পথটি শ্রীনগর-পথের মতো মসৃণ ও প্রশস্ত নয়। তাহলেও এটি জাতীয় সড়ক নম্বর 'ওয়ান বি'। এখন পথটি প্রশস্ত করার চেষ্টা চলেছে। ফলে মাঝে মাঝেই মাটি আর পাথরের স্তূপে প্রায় অগম্য হয়ে উঠেছে।

জম্মু থেকে বাটোট ১২০ কিলোমিটার আর বাটোট থেকে কিশ্‌তোয়ার ১০৯ কিলোমিটার। তাই ভেবেছিলাম সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় যখন বাটোট এসেছি, তখন কিশ্‌তোয়ার পৌঁছতে আর ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগবে। কিন্তু এখন পথের হাল দেখে মনে হচ্ছে, তা সম্ভব হবে না।

তবে পথটি ভারী ভাল লাগছে। শ্রীনগর পথের মতো অত সবুজ নয়, কিন্তু বড়ই বৈচিত্র্যময়। এ যেন হঠাৎ এক নতুন হিমালয়ে এসে পৌঁছলাম।

না, ঠিক নতুন বলব না। একে আমি যেন দেখেছি, দেখেছি হিমাচলে—কেলং ও মণিমহেশের পথে পথে। কাশ্মীর কিম্বা কুলুব মতো কোমল ও সবুজ যেমন নয়, তেমনি লাদাখের মতো নয় রুক্ষ ও কঠিন। দুইয়ের মাঝামাঝি এক বিচিত্র-সুন্দর কোমল-কঠিন হিমালয়। তবে লাদাখের সঙ্গে যেন মিল বেশি! চন্দ্রভাগার ওপারে খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ে নানা রঙের পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার বার বার লাদাখের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।

পথ শুধু দুর্গম নয়, সেই সঙ্গে সুন্দর ও ভয়ঙ্কর। ডানদিকে পথের পাশে কোথাও পাহাড়, কোথাও বন, কোথাওবা দু-চারটি বাড়ি-ঘর। আর বাঁদিকে বহু নিচে চঞ্চলা চন্দ্রভাগা। বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী ও সুলেখক ক্রিস বনিংটন এই পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'...driving over the most spectacular route I have ever seen, along the precipitous sides of a deep-out gorge which, in places dropped sheer for over a thousand feet into a racing glacier river.'

বাটোট থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ১৫ কিলোমিটার একটানা পথ চলে একটি ছোট জনপদ ও বাজার পাওয়া গেল। জায়গাটির নাম রামগড়। ড্রাইভার গাড়ি থামায়। সে-ও ক্ষুধার্ত।

নেমে আসি গাড়ি থেকে। তিনটি খাবারের দোকান রয়েছে। কিন্তু কোন্‌টিতে যাবো, তা ঠিক করবে জয়। সে আমাদের ম্যানেজার। অতএব জয় দোকান নির্বাচনের জন্য এগিয়ে যায়। আমরা খিদে চেপে চুপচাপ বাসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। উপায় নেই, নেতার নির্দেশ। পর্বতাভিযানে না খেয়ে থাকার রেওয়াজ আছে কিন্তু শৃঙ্খলাভঙ্গের নিয়ম নেই।

মিনিট দশের বাদে জয় ফিরে আসে, জানায়—তিনটি দোকানের দুটিতে কোন

'Meal' নেই, চা-বিস্কুট পাওয়া যাবে। আর একটিতে আট প্লেটের মতো ডাল-ভাত ও সবজি আছে। সেই খাবারই ষোলজনকে খেতে হবে। জনপ্রতি তিনটাকা করে দিতে হবে।

অগত্যা আধপেটা খেতে হল। তাহলেও জঠরাগ্নির জ্বালা অনেকখানি প্রশমিত হল। খাবার পরেই ড্রাইভার বাস ছেড়ে দিল।

কিশ্‌তোয়ারবাসী জনৈক যুবক আমার পাশের সিটে বসেছেন। জম্মু থেকে গাড়ি ছাড়ার পরে এতক্ষণ তার কোন কথা শুনি নি। এবারে তিনি বলে ওঠেন—বাটোট বন্ধ হওয়ায় একটা লাভ হল।

ভদ্রলোক কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন ? বাটোট বন্ধ হওয়ায় এতক্ষণ খিদেয় কষ্ট পাবার পরে আধপেটা খেয়ে খুশি থাকতে হচ্ছে। তাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি—কি বলুন তো ?

—বাটোটে আমাদের একঘণ্টা থামার কথা ছিল, কিন্তু এখানে খাবার না থাকায় আধঘণ্টার বেশি থামতে হল না। ফলে আধঘণ্টা সময় বেঁচে গেল।

ভদ্রলোকের কথা শুনে লজ্জা পাই। খারাপ লাগে আমার। জয়ের তৎপরতায় আমরা তবু আধপ্লেট ডাল-ভাত পেয়েছি, আর তাঁকে চা-বিস্কুট খেয়েই বাসে উঠতে হয়েছে। বড় দুঃখে তিনি এই রসিকতাটুকু করলেন।

একটু হেসে প্রশ্ন করি--আমরা কখন কিশ্‌তোয়ার পৌঁছব।

—জম্মু থেকে কিশ্‌তোয়ার ২২৯ কিলোমিটার। সাধারণতঃ পাহাড়ী পথে বাসে করে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে ঘণ্টাদশেক সময় লাগে। কিন্তু বাটোট থেকে পথ ভাল নয় বলে আমাদের লাগে তেরো ঘণ্টার মতো। আজ আধঘণ্টা বেঁচে যাওয়ায় আশা করছি সাতটার আগেই পৌঁছে যাবো, অবশ্য যদি বৃষ্টি না নামে।

মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্রভাগা দূরে সরে গিয়েছিল। আমরা একটা পাহাড়ী নদীর সংকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে এসেছি। পথটি যেমন দুর্গম তেমনি বিপজ্জনক। এখন আবার চন্দ্রভাগার তীরে ফিরে এসেছি। তাই বার বার চন্দ্রভাগাকে দেখছি। দেখছি আর ভাবছি ওর কথা। ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা শ্রীনগর যাবার পথে ১৯৬২ সালে। তারপরে ওকে দেখেছি ওর জন্মভূমি লাহুলের তাণ্ডিতে। বড়ালাচা গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তের তুষারক্ষেত্র থেকে সৃষ্ট হয়েছে চন্দ্রা আর ঐ একই গিরিবর্ত্মের উত্তর-পশ্চিম দিকে জন্ম নিয়েছে ভাগা। চন্দ্রা প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী ও পরে উত্তর-পশ্চিমবাহিনী হয়ে লাহুল উপত্যকার পূর্ব ও দক্ষিণদিক পরিক্রমা করে তাণ্ডি পৌঁচেছে। আর ভাগা দক্ষিণ প্রবাহিনী হয়ে লাহুলের পশ্চিমদিক পরিক্রমা করে তাণ্ডি এসেছে। মিলিত হয়েছে চন্দ্রার সঙ্গে। মিলিত ধারা চন্দ্রভাগা নাম নিয়ে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে হিমাচল অতিক্রম করে জম্মুতে এসেছে। তারই তীর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাস।

জম্মু থেকে চন্দ্রভাগা চলে গেছে পাকিস্তানে। একে একে মিলিত হয়েছে বিতস্তা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রুর সঙ্গে। সেই সম্মিলিত সুবিশাল নদীর নাম পঞ্চনদ। অবশেষে পাকিস্তানের মিঠানকোটে পঞ্চনদ সিন্ধুনদে বিলীন হয়েছে।

চন্দ্রভাগা বৈদিক যুগের নদী। ঋগ্বেদে এই নদীকে বলা হয়েছে অসিক্‌নী, মানে কৃষ্ণবর্ণা নদী। এই নদীর জল নাকি সত্যই একটু কালচে। কি জানি আমরা তো এখান থেকে বুঝতে পারছি না।

মহাভারতের সভাপর্বে বলা হয়েছে—'কেউ যদি উপবাসী থেকে সাতদিন চন্দ্রভাগার পুণ্যধারায় অবগাহন করে, তাহলে তার মন পাপমুক্ত হয়, সে মহামুনি হয়ে যায়।'

মহামুনি হতে চাই না, কিন্তু চন্দ্রভাগার দিকে তাকালেই অবগাহন করতে ইচ্ছে করছে। অথচ এখন সে সুযোগ নেই। সুতরাং শুধু লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

বাস চলেছে এগিয়ে। মাঝে মাঝে গ্রাম। গ্রামের মানুষরা বাসে উঠছেন, উঠছে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা। বাসে বসার জায়গা নেই। তারা দাঁড়িয়ে থাকছে। পাহাড়ী পথে চলমান গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপজ্জনক। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বাস খুবই কম। তাই এরা বিপদ মাথায় নিয়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকছে।

আর শুধু বাসের ভেতরের কথাই বা বলছি কেন ? বাসের ছাদেও লোক রয়েছে। বেশ কয়েকজন যাত্রী রামগড় থেকে আমাদের মালপত্রের ওপর চেপে বসেছেন। আঁকাবাঁকা দুর্গম পথ, মাঝে মাঝে পাথর পড়ে প্রায় অগম্য। হেলে দুলে বাস চলেছে, তার ওপরে এত যাত্রী। ড্রাইভার যদি মুহূর্তের তরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তাহলে...।

যাক্ গে, হিমালয়ের পথে বেরিয়ে এসব কথা ভাবতে নেই। জানি গতবছর কলকাতার একটা ট্যুরিস্ট্ বাস শ্রীনগর থেকে ফেরার পথে ভুল করে এ রাস্তায় চলে এসেছিল। আর ফিরে যেতে পারে নি।

ড্রাইভার ভুল বুঝতে পেরে গাড়ি ঘোরাতে চায়। সমতলের চালক, হিমালয়ের পথে গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতা ছিল না। তার ওপরে সংকীর্ণ পথ ও রাতের অন্ধকার, ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে, বাস গড়িয়ে পড়েছে চঞ্চলা চন্দ্রভাগায়। যাত্রীরা প্রায় সকলেই সলিল সমাধি লাভ করেছেন।

আগেই বলেছি, হিমালয়ের পথে বেরিয়ে এসব কথা ভাবতে নেই। আর এসব ভাবনা যে সত্যই অর্থহীন। চিরদিন থাকব বলে আমরা কেউ পৃথিবীতে আসি নি। একদিন সবাইকে এই সুন্দর ভুবন ছেড়ে চলে যেতে হবে। সুতরাং সেই যাওয়া যদি হিমালয়ের পথে হয়, তাহলে তার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে ?

বেলা তিনটের সময় বাস পুল-ডোডা পৌঁছল। এ জায়গাটা জেলাসদর ডোডা ও মহকুমা সদর কিশ্‌তোয়ার পথের জংশন। ডোডা চন্দ্রভাগার অপর তীরে পাহাড়গুলোর পেছনে। যাতায়াতের জন্য একটি পুল রয়েছে চন্দ্রভাগার ওপরে। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

ডোডার যাত্রীরা তাই নেমে পড়লেন এখানে। বাসের ভিড় কমে গেল। আমরাও হাত-পা খেলাবার জন্য বাস থেকে নেমে আসতে পারলাম। জয় একগ্লাস করে চা মঞ্জুর করল। চা খেয়ে আবার উঠে আসি বাসে। বাস এগিয়ে চলে।

ভারত স্বাধীন হবার আগে এসব অঞ্চল জম্মু দেশীয়রাজ্যের উধমপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরে পার্বত্য প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে ১৯৪৮ সালে এই অঞ্চলকে একটি পৃথক জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই থেকেই ডোডা জেলাসদর, আর তার নামেই জেলার নাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন জেলা গঠন করা হয়েছিল, চল্লিশ বছরেও সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। ডোডা আজও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সবচেয়ে অনুন্নত জেলা।

পুল-ডোডা থেকে কিশ্‌তোয়ার ৫৭কিলোমিটার। পথের অবস্থা থেকে অনুমান

করছি আরও ঘণ্টাতিনেক সময় লাগবে।

বিকেল পৌনে পাঁচটার সময় আবার বাস থামল। জায়গাটার নাম থাতরি। কয়েকজন যাত্রী নেমে গেলেন বাস থেকে। এখন আর বাসের ছাদে কোন যাত্রী নেই। ভেতরেও মাত্র আট-দশজন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে। তাহলেও আমরা নামতে পারলাম না। কন্ডাক্টার বাধা দিয়ে বলল—এখানে বাস দাঁড়াবে না। এঁরা নেমে গেলেই বাস ছেড়ে দেব।

অতএব চা খাবার সময় নেই। ম্যানেজার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। ষোল কাপ চা। কম করেও আট টাকা বেঁচে গেল। হঠাৎ গৌতম বলে ওঠে—শঙ্কুদা, ঐ দেখুন, ওপরে কিশ্‌তোয়ার দেখা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাই। দূরে অনেকটা উঁচুতে পাহাড়ের ওপরে বহু বাড়ি-ঘর।

শিবু বলে—ওখানে পৌঁছুলে মনে হবে পাহাড় নয়, মালভূমি।

—অথবা বেশ বড় একটা পাহাড়ের মাথা কেটে কারা যেন সুবিশাল সবুজ সমতলে রূপান্তরিত করেছে। জগদীশ যোগ করে।

শুধু ওরা তিনজন নয়, ওদের সঙ্গে তপন, কৃষ্ণ, গোরা, টুলটুল, শৈলেশ এবং জয় কিশ্‌তোয়ার এসেছে। একবার নয় দুবার, ১৯৫০' ও ১৯৫২' সালে। এসেছে ব্রহ্মা-১ পর্বতের পথসমীক্ষা করতে। ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মা ও ব্রহ্মানী শৃঙ্গের পাদদেশের পৌঁছবার দুটি পথ। একটি কিবার নালা হয়ে সোনামার্গী, আরেকটি নাম্ব্‌ নালা হয়ে সত্তরচিন। ওরা দুবারে দুটি জায়গাই দেখে গিয়েছে।

কিন্তু ব্রহ্মলোকের কথা এখন থাক, কিশ্‌তোয়ারের কথাও পরে হবে। আপাতত আমাদের বাঁদিকের উপত্যকাটিকে দেখা যাক। নদীর তীরে প্রায় সমতলে তৈরি হয়েছে বাঁধানো পথ, সারি সারি গুদাম আর বাড়ি-ঘর। দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো গাড়ি। বুঝতে পারছি এখানে কোন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। কিন্তু কি ?

তপন বলে—দুল হস্তি পরিকল্পনা বা Dul Hasti Project. এই পরিকল্পনা রূপায়িত হবার পরে কিশ্‌তোয়ার অঞ্চলের চেহারা পালটে যাবে।

—কিন্তু পরিকল্পনাটি কি ?

—বিশদভাবে বলতে পারব না। কৃষ্ণ বলে—তবে ৮৫ সালে এখানে এসে যতটুকু শুনেছি, ততটুকু বলতে পারি।

—বেশ তাই বল।

কৃষ্ণ শুরু করে—এটি একটি Hydro Electric Project, তিনবছর আগে National Hydro Electric Power Corporation of India এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। রাস্তা এবং কলোনী তৈবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

—কত খরচ পড়বে ? কৃষ্ণ থামতেই প্রশ্ন করি।

কৃষ্ণ উত্তর দেয়—৬৭০ কোটি টাকার পরিকল্পনা। শুনছি ৩৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এখানে।

—এর নাম দুল হস্তি পরিকল্পনা কেন ? অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

—এ জায়গাটার নাম দুল। এখানে চন্দ্রভাগার ওপরে বাঁধ তৈরি করে ১৩ কিলোমিটার লম্বা একটা Underground Tunnel-এর ভেতর দিয়ে জল নিয়ে যাওয়া হবে হস্তি। সেখানে তৈরি হবে Power-house. তাই এর নাম দল-হস্তি পরিকল্পনা।

শিবু থামতেই জগদীশ বলে—শুনেছি, ভারত সরকার শিগগীরই এক ফরাসী কম্পানীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করছেন। তারা বলেছেন আট বছরের মধ্যে এ পরিকল্পনা পূর্ণ রূপায়িত হবে।

—পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলে এই অবহেলিত অঞ্চল অনেকখানি উন্নত হয়ে উঠবে। গৌতম যোগ করে।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'বেটার লেট দ্যান নেভার'। গৌতমের কথা শুনে সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল। কিশ্‌তোয়ারের অতীত যথেষ্ট গৌরবময় হলেও বর্তমানের কিশ্‌তোয়ার বড়ই অবহেলিত। অথচ স্বাধীনতার পর থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার অত্যন্ত উদারহস্তে সাহায্য করে চলেছেন। সে সাহায্যের সামান্য অংশই ডোডা জেলার ভাজ্যে জুটেছে। ফলে এটি আজও এ রাজ্যের সবচেয়ে পেছিয়ে থাকা জেলা। সেই জেলায় এতবড় একটা প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে এর চেয়ে আনন্দ-সংবাদ আর কি হতে পারে ? অনেক দেরি হয়ে গেছে। তা হোক গে, তবু আমরা সানন্দে স্বাগত জানাবো। আশা করব, ভবিষ্যত ভারতের উন্নয়নে কিশ্‌তোয়ার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নদীতীর থেকে সিঁড়ির মতো আঁকাবাঁকা পথ, ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে। একটার পর একটা 'loop' পার হযে বাস ফুসতে ফুসতে ওপরে উঠছে। নিচের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে, পথ নয় একটা আঁকাবাঁকা কালো ফিতে পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে আছে। আমাদের কয়েক ধাপ ওপরে আরেকটা বাস ওপরে উঠছে। জানি বলেই বলছি 'বাস', নইলে মনে হচ্ছে একটা খেলনা। কি জানি ওখান থেকে আমাদের বাসকেও বোধকরি তা-ই মনে হচ্ছে।

অবশেষে উঠে এলাম সমতলে। শুধু সুন্দর নয়, জায়গাটার অবস্থান সত্যিই বিস্ময়কর। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক সুবিশাল সমতল। তারই ওপর দিয়ে বাঁধানো পথ। পথের দুদিকে বাড়ি-ঘর—শহর কিশ্‌তোয়ার। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি, সাড়ে ছ'টা। সারাদিনের ক্লান্তিকর বাসযাত্রার যতি আসন্ন। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

পথের পাশে দোকান-পাটের মাঝে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাসস্ট্যান্ড। আরও কয়েকখানি বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানেই এসে থামল আমাদের বাস।

এখনও দিনের আলো রযেছে। তবে আকাশে মেঘ। যেকোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। মালপত্র ভিজে যাবে। অনেক মাল।

সবাই হাত লাগিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে হোটেলে চলে আসা গেল। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই বড়রাস্তার ধারে হোটেল, নাম 'মায়া হোটেল'।

' নিচের তলায় একখানি ও দোতলায় তিনখানি ঘর নেওয়া হয়েছে দৈনিক ভাড়া পয়ষট্টি টাকা। প্রতি ঘরে দুখানি করে খাট। আমরা যোলজন। সুতরাং দু'জন করে শুতে হবে।

দোতলার প্যাসেজে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত। তাই চায়ের পরেই খিচুড়ি চড়ল।

পেটভরা খিচুড়ি খেয়ে কোমল শয্যায় শুয়ে পড়া গেল। ব্রহ্মলোকে যাবার পথে আজই আমাদের শেষ আরাম। সুতরাং রাতের ঘুমকে রসিয়ে উপভোগ করতে হবে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজি।

॥ দুই ॥

সকালে ঘুম ভাঙল গাড়ির শব্দে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে বড় রাস্তার ধারে হোটেল। আর কিশ্‌তোয়ারের একমাত্র পরিবহন মোটর গাড়ি। তাই সকাল থেকেই গাড়ির শব্দ শুরু হয়ে গেছে।

'স্লীপিং-ব্যাগ'-এর 'জীপ' খুলে উঠে বসি। কিশ্‌তোয়ারের উচ্চতা মাত্র ৫০০০ফুট। তার ওপরে সবে সেপ্টেম্বর মাস। স্লীপিং-ব্যাগ গায়ে দেবার মতো শীত নয়। কিন্তু গতকাল রাতে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় একটু শীত-শীত করছিল। সুতরাং এযাত্রায় প্রথম স্লীপিং-ব্যাগ গায়ে দেবার সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছি।

ঘড়ি দেখি সাড়ে পাঁচটা বাজে। এটা পশ্চিম হিমালয়। বাইরে নিশ্চয়ই এখনও অন্ধকার রয়েছে। তা থাক গে। আজ অনেক কাজ। সবাইকে জাগানো যাক।

কিন্তু গরম চায়ের মগ মুখের সামনে না ধরলে কেউ স্লীপিং-ব্যাগের জীপ খুলবে না। সবাই শ্রান্ত। তাছাড়া এখানেই আরামে শেষ ঘুম। আজ রাত থেকেই শোবার কষ্ট শুরু হয়ে যাবে।

মুখ-হাত ধুয়ে নিচে নেমে আসি। রাম সিং ও পেয়ার সিং-কে ডেকে তুলি। ওদের চা বানাতে বলি।

চা পেয়ে একে একে উঠে বসল সবাই। উঠতে চাইল না কেবল অমূল্য। সে সারারাত ঘুমুতে পারে নি, পায়ের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছে। পাবারই কথা। পর্বতারোহী ডাক্তার স্বপনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অমূল্য ভাঙা পায়ের প্লাস্টার কেটে এক সপ্তাহের মধ্যে পর্বতাভিযানে চলে এসেছে। স্বপন তাকে একমাস বাড়িতে বিশ্রাম নিতে বলেছিল।

কথাটা শুনেই রঞ্জু বলে ওঠে—সেকি অমূল্যদা, আমাকে ডাকলেন না কেন ? আমি একটা ওষুধ দিয়ে দিতাম। আপনার ব্যথা কমে যেত, ঘুমুতে পারতেন।

—তোমরা শুয়ে পড়েছো, সবাই ক্লান্ত। তাই আর ডাকাডাকি করি নি! অমূল্য জবাবদিহি করে।

'ডেপুটি-লীডার' গৌতম আপত্তি করে—কাজটা ঠিক ক'রো নি 'লীডার'! আগামীকাল থেকে 'ট্রেকিং' শুরু, প্রথম দিনেই কম করে ১৬/১৭ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। পথ ভাল নয়, যেমন চড়াই, তেমনি উৎরাই। তার ওপরে সারাদিন রোদ পাবে, পথের পাশে গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে।

—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না! শিবু বলে—লীডার তো পাতিমহলা থেকে সোন্দার পর্যন্ত ঘোড়ায় যেতে পারে। তাতে দুদিনের হাঁটা বেঁচে যাবে।

সোচ্চার স্বরে শিবুর প্রস্তাব সমর্থন করে অপর চার পর্বতারোহী গৌতম, জগদীশ, কৃষ্ণ ও তপন। ওদের সবারই পরিচিত পথ, ওরা সমীক্ষায় এসেছিল। শুধু ওরা নয়, ম্যানেজার জয় ও মেডিক্যাল অফিসার রঞ্জু সমর্থন করে শিবুকে। শৈলেশ, বিনয় এবং গোরাও মাথা নাড়ে।

কিন্তু যার সম্পর্কে এত আলোচনা, সেই নেতা সহাস্যে বলে ওঠে—অভিযানের নেতা ঘোড়ায় চেপে ব্রহ্মলোকে গেলে যে ব্রহ্মাজী বিগড়ে যাবেন।

—অর্থাৎ আপনি ঘোড়ায় চড়বেন না ? এই তো ? শৈলেশ সোজাসুজি প্রশ্ন করে।

অমূল্য উত্তর দেয়—না, মানে অভিযানের নেতা ঘোড়ায় চড়ে মূলশিবিরে গিয়েছে,

একথা প্রচারিত হলে শুধু আমার নয়, তোমাদেরও পর্বতারোহণ ছেড়ে দিতে হবে।

—১৯৪৪ সালের প্রি-এভারেস্ট অর্থাৎ নন্দাদেবী অভিযানের নেতা কিন্তু হেলিকপ্টারে করে মূল-শিবিরে গিয়েছিলেন। আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না।

অমূল্য আবার একটু হাসে। হেসে আবহাওয়া হাল্কা করার চেষ্টা করে। তারপরে বলে—তা গিয়েছিলেন। কিন্তু ওসব হল গিয়ে সরকারী পর্বতাভিযান। মূল-শিবির কেন ওঁরা হেলিকপ্টারে করে শিখরেও চলে যেতে পারেন, আমরা পারি না। কারণ ওঁরা গৌরী সেনের টাকায় হিমালয়ে আসেন আর আমরা এসেছি ভিক্ষে করে। ওঁদের মতো আচরণ করলে পরের বার আর কেউ আমাদের ভিক্ষে দেবে না।

অর্থাৎ ভাঙা পা নিয়েও অমূল্য হেঁটেই যাবে। অতএব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তার চাইতে কাজে লেগে যাওয়া যাক। আজ আমাদের অনেক কাজ। বাড়তি মাল গুছিয়ে এখানে রেখে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ 'রি-প্যাকিং' করা দরকার। কাঁচা বাজার ও কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে নেওয়া দরকার, দেখা করতে হবে তহসিলদার অর্থাৎ এস. ডি. ও. এবং পোস্ট মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে।

কিশ্‌তোয়ার থেকে বাসপথ প্রসারিত হচ্ছে মারু-চেনাব উপত্যকায়। এখন পাতিমহলা পর্যন্ত বাস যাতায়াত করছে। কিশ্‌তোয়ার থেকে পাতিমহলা ২৯ কিলোমিটার। কাল খবর নিয়ে জেনেছি। দৈনিক দুবার করে বাস যাতায়াত করে। প্রথম বাস সকাল ন'টায় আর দ্বিতীয়টি দুপুর আড়াইটেয়। ঠিক হয়েছে গৌতম ও শিবু সকালের বাসে পাতিমহলা চলে যাবে। ওরা সেখানে গিয়ে আমাদের আশ্রয় এবং মাল পরিবহনের ব্যবস্থা করে রাখবে। আমরা আড়াইটের বাস ধরব। তার আগে ভাগ ভাগ করে সব কাজ সেরে ফেলতে হবে।

সকালের খাবার খেয়ে গৌতম ও শিবুকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসি। ওরা কলকাতা থেকেও আমাদের সঙ্গে আসে নি। সার-সরঞ্জাম আনতে উত্তরকাশী চলে গিয়েছিল। পরশু শেষরাতে সাহারাণপুর স্টেশনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আজ আবার ওদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। তবে এটা নিতান্তই সাময়িক। সন্ধ্যার আগেই আবার দেখা হবে।

বাস এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করা গেল। দুপুরের বাস বেলা দুটোর সময় আমাদের হোটেলের সামনে আসবে। আমরা মালপত্র তুলে নেব এবং মালের জন্য কোন বাড়তি ভাড়া দিতে হবে না। জম্মুতেও আমরা এ সুবিধা পেয়েছি। এঁদের সহযোগিতা সত্যই মনে রাখার মতো।

গৌতম ও শিবুকে নটার বাসে পাতিমহলা রওনা করে দিয়ে হোটেল ফিরে এলাম। বাজার পার্টি বাজারে চলে গেল। প্যাকিং ও রান্না পার্টি তাদের কাজ শুরু করে দিল। শৈলেশ ও তপনকে নিয়ে আমি ও অমূল্য বেরিয়ে এলাম পথে। এটি কিশ্‌তোয়ারের প্রধান পথ। পথের দুদিকে দোকানের সারি, মুদি মনোহারী, বাসনপত্র, জামা-কাপড় ও জুতো প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসের দোকান। রয়েছে সেলুন রেস্তরাঁ ও খাবারে দোকান, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স অফিস। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি আর চলতে চলতে ভাবতে থাকি কিশ্‌তোয়ারের কথা।

জনপদ দিনে দিনে বড় হয়, উন্নত হয়, কিন্তু কিশ্‌তোয়ারের বেলায় হয়েছে ঠিক তার উল্টো। কিশ্‌তোয়ার যখন স্বাধীন রাজ্য, তখন এর চেয়ে অনেক বড় ছিল। এমন কি মোগল কিম্বা ডোগরা আমলেও কিশ্‌তোয়ার ওয়াজারাত অর্থাৎ জেলা হিসেবে গণ্য

হয়েছে। ডোগরা আমলেও রামবান এবং গুল-গুলাবগড় কিশ্‌তোয়ার ওয়াজারাতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৪৩ সালে ডোগরা সেনাপতি জরোয়ার সিং কিশ্‌তোয়ারের উজীর ওয়াজারাত বা জেলা শাসক হয়ে আসেন আর এখানে শেষ জেলাশাসক হলেন পণ্ডিত ডোগরা প্রসাদ ধর। ১৯০৩ সালে তাঁর কার্যকাল শেষ হয়। তারপরেই বৃটিশ অধিকার। ১৯২৪ সালে কিশ্‌তোয়ার জেলার মর্যাদা হারায় এবং তখন থেকেই এটি একটি তহসিল বা মহকুমা সদর।

বৃটিশ আমলে, কিশ্‌তোয়ার-ডোডা অঞ্চল উধমপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে এ অঞ্চলের পাহাড়ী প্রকৃতি ও অধিবাসীদের অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে ১৯৪৮ সালে পৃথক ডোডা জেলার পত্তন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আজও এটি এ রাজ্যের সবচেয়ে পেছিয়ে থাকা জেলা।

৩৩° ১০´ ও ৩৩° ২৫´ অক্ষরেখা এবং ৭৫° ২৫´ ও ৭৬° ১০´ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই তহশিল। এটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রায় পূর্ব-মধ্যাঞ্চল, লাদাখ চাম্বা ও অনন্তনাগ জেলার মাঝখানে অবস্থিত এই তহসিল। আয়তন ২৮২৩ বর্গমাইল কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার, ১৫৬টি গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায় হয়। মহকুমার বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই বন ও পাহাড়। চাষের জমি খুবই কম। তাহলেও অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিনির্ভর। তবে এই তহসিলে একটি নীলকান্ত মণির খনি (Saphire mine) আছে।

উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবনের জন্য রাজ্য সরকার বছর তিনেক আগে এই অঞ্চলের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। তাঁরা কিশ্‌তোয়ার তহসিলকে পৃথক জেলার মর্যাদা দেবার সুপারিশ করেছেন। প্রস্তাবটি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। এটি কার্যকর হলে আশা করি কিশ্‌তোয়ার কিছু উন্নত হবে।

অনুন্নত হলেও কিশ্‌তোয়ার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমাহীন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। বনসম্পদ ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ণ এবং পর্যটন শিল্পের প্রসার সাধন করলে কিশ্‌তোয়ারবাসীদের জীবনে সমৃদ্ধি আসবেই। কিন্তু সেই সুসময় কবে হবে?

আগেই বলেছি এখনও এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবি। গম, ভুট্টা, যব, রাজমা বা পাহাড়ী ডাল ও সামান্য কিছু জাফরান এই তহসিলের প্রধান কৃষি সম্পদ। বলা-বাহুল্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিশয় অনগ্রসর এই তহসিল। ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যখন এই তহসিলের জনসংখ্যা ছিল ৯৭,৮৪৩ জন, তখন শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১,৪৩৫ জন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র সাড়ে আট ভাগ। বিগত পনেরো বছরে বোধকরি শিক্ষিতের হার কিছু বেড়েছে। কারণ ইদানিং কিশ্‌তোয়ার শহরে একটি ডিগ্রি কলেজ ও পাঁচটি দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া এখন এখানে সাতটি উচ্চবিদ্যালয় এবং অনেকগুলি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমান কিশ্‌তোয়ার শহরের জনসংখ্যা প্রায় দশ হাজার।

কিন্তু কিশ্‌তোয়ার শহরের কথা এখন থাক। আমরা তহসিলদার অফিসের সামনে পৌঁছে গিয়েছি।

বড় রাস্তার পাশে একফালি মাঠ তারপরে লম্বা টিনের বাড়ি, সামনে খোলা বারান্দা। এটাই তহসিলদারের অফিস—কাছারী ও কালেক্টরেট।

আমরা মাঠ পেরিয়ে বারান্দায় উঠে আসি। জনৈক কর্মচারী জানালেন—

তহসিলদারসাব ঘণ্টাখানেক বাদে আসবেন।

—তাহলে চলুন, পোস্টাপিসের কাজটা সেরে আসা যাক। তপন বলে।

সে ঠিকই বলেছে। এখানে বসে থেকে কি হবে? আমরা ওর সঙ্গে এগিয়ে চলি। বড়রাস্তা থেকে উৎরাই গলিপথ পেরিয়ে মিনিট তিনেক হেঁটে পোস্ট অফিসে পৌঁছন গেল।

পরিচয় দিতেই সানন্দে স্বাগত জানান পোস্টমাস্টারজী। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। নাম শান্তিপ্রসাদ শর্মা। আমাদের বসতে বলে চা-য়ের ফরমাস করেন। সহকর্মীদের ডেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কথায় কথায় শর্মাজী বললেন—আপনারা যখন কিবার নালার পথে ব্রহ্মজীর কাছে যাচ্ছেন, তখন মারু-চেনাব উপত্যকায় আপনাদের শেষ বড় গ্রাম সোন্দার। সোন্দারে কোন ডাকঘর নেই। ডাকঘর আছে আরও ২কিলোমিটার এগিয়ে সুয়েদ গ্রামে। কিন্তু আপনারা তো সে পর্যন্ত যাচ্ছেন না। আপনারা মূল-শিবির থেকে লোক পাঠিয়ে সেখানে চিঠি ডাকে দিতে পারেন, কিন্তু আপনাদের ঠিকানা হবে আমার প্রযত্নে। আমি আপনাদের সব চিঠি এখানেই ধরে রাখব। ফেরার পথে আপনারা সেগুলো নিয়ে যাবেন।

অর্থাৎ অভিযান যতদিন চলবে, ততদিন আমরা কেউ বাড়ির খবর পাবো না। কিন্তু এ ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই। পোস্ট মাস্টারজী বলছেন, ওপরে চিঠি পাঠালে গোলমাল হতে পারে। হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে এখানে ফিরে এসে চিঠি হাতে পাওয়া অনেক ভাল। অতএব অমূল্য সেইভাবে লিখে দেয় পোস্টমাস্টারজীকে।

ডাকটিকেট কিনে বিদায় নিই শর্মাজীর কাছ থেকে। অবশ্য শর্মাজীদের বলাই উচিত হবে। কারণ কেবল পোস্টমাস্টারজী নন, তাঁর সহকারী, টিকেট বিক্রেতা ও টেলিগ্রাফিস্ট তিনজনেই শর্মা। এরা সবাই স্থানীয় লোক। কিশ্‌তোয়ারে শতকরা ৪৫ জন হিন্দু। অফিস-কাছারী, স্কুল-কলেজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুদের প্রাধান্যই বেশি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, হিন্দু মুসলমান এখানে বড়ই সৌহার্দের সঙ্গে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করছেন।

পোস্ট অফিস থেকে ফিরে এলাম তহসিলদার অফিসে। অফিস নয় আদালতে—কাছারীতে। তহসিলদার-সাহেব কাছারীতে বসে গিয়েছেন। মামলা চলছে। ভেতরে ঢুকব কি?

হাকিম সাহেব কি দেখতে পেয়েছেন আমাদের? তিনি পেশাকারকে কি যেন বলছেন। পেশকার নেমে এলেন এজলাস থেকে। এগিয়ে এলেন দোরগড়ায়। জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন?

বুঝতে পারছি না আমাদের কালো চেহারা ও পোশাক ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিনা? আকর্ষণ করার মতই বটে। সবার মুখে খোচা-খোচা দাঁড়ি আর গায়ে হলুদ গেঞ্জি,

অমূল্য মাথা নেড়ে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

পেশকারজী আবার জিজ্ঞেস করেন—আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা।

—আইয়ে, অন্দর আইয়ে!

আমরা তাঁর সঙ্গে ভেতরে আসি। তিনি হাকিমসাহেবকে বোধকরি আমাদের পরিচয় দেন। তারপরেই ইসারায় আমাদের এজলাসে উঠে আসতে বলেন।

হাকিমসাহেব আমাদের দেখিয়ে বিবদমান আইনজীবীদের কি যেন বলছেন? তিনি শুনানীর সাময়িক বিরতি ঘোষণা করলেন কি? বোধকরি তাই। কারণ সাক্ষী নেমে গেলেন কাঠগড়া থেকে। উকিলরাও কাগজপত্র গোছাচ্ছেন।

আমরা উঠে আসি এজলাসে। ইতিমধ্যে বাড়তি চেয়ার এসে গেছে। তহসিলদার সাহেব আমাদের সবার সঙ্গে করমর্দন করে বসতে বলেন।

ভদ্রলোককে ভাল লাগে আমাদের। শুধু ব্যবহার নয়, চেহারাটি ভারী সুন্দর। সুপুরুষ যুবা, বয়সে নবীন। বোধকরি সদ্য সিভিল সার্ভিস পাশ করেছেন। নাম খুরশিদ আহমেদ দেব।

এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার এ অঞ্চলে। আগে কিশ্‌তোয়ার হিন্দু রাজ্য ছিল। অধিবাসীরা সবাই ছিলেন হিন্দু। শ'আড়াই বছর আগে সৈয়দ শাহ-ফরিদ্-উদ্-দিন সাহেব নামে জনৈক স্বনামধন্য ফকির বাগদাদ থেকে এখানে আসেন। তাঁর অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে কিছু মানুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই শুরু। এখন কিশ্‌তোয়ার তহসিলের শতকরা পঞ্চান্নজন মুসলমান। কিন্তু তাদের অনেকেই এখনো পিতৃপুরুষের বংশটি নামের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছেন। তাই আমাদের তহসিলদার সাহেবের নাম খুরশিদ আহমেদ দেব।

দেবসাহেব আমাদের অভিযানের কথা শুনে ভারী খুশি হলেন। তিনি সোন্দার গ্রামের পাটোয়ারী (পুলিশের প্রতিনিধি) ও ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারকে চিঠি লিখে দিলেন। লিখলেন উর্দুতে কিন্তু ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমাদের তাঁর চিঠির বক্তব্য বুঝিয়ে দিলেন।

এই একটা বিচিত্র ব্যাপার। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে এখন স্থানীয় ভাষা সরকারী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজী ছাড়া আন্তঃরাজ্য ভাববিনিময় সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে ইংরেজীকে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে বজায় রাখলে কি দোষ হত? তাছাড়া আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে যে ইংরেজী অপরিহার্য, এটা অস্বীকার করার মতো নির্বোধ আমরা নিশ্চয়ই নই। জাতীয় সংহতি আমাদের এখন প্রধান সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধানে ইংরেজী আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে। অর্থহীন হিন্দীপ্রীতি যে জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে ফেলছে, এটা এখনও উপলব্ধি না করতে পারলে যে দেশের বড়ই ক্ষতি হয়ে যাবে।

কিন্তু থাক গে এসব কথা। তার চাইতে দেবসাহেবের কথা শোনা যাক। তিনি বলছেন—সোন্দারে কোন পুলিশচৌকি নেই। পুলিশচৌকি আছে আরও খানিকটা এগিয়ে সিরশি গ্রামে। আমি ওয়্যারলেস করে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের অভিযানের কথা। তারা প্রয়োজনে সাহায্য করবে।

চা খেয়ে বিদায় নিলাম দেবসাহেবের কাছ থেকে। বিদায় বেলায় তিনি অভিযানের সাফল্য কামনা করলেন। নেতাকে বললেন—ফেরার পথে সবাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসে চা খেতে হবে।

আমরা সানন্দে সম্মত হই। বেরিয়ে আসি পথে। কিশ্‌তোয়ারের পথ। তারই কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলি। কথা নয় ইতিহাস। কিন্তু কিশ্‌তোয়ারের নির্ভেজাল ইতিহাস আমি কোথায় পাবো? অতীতের ভারত যে ইতিহাসের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাশীল ছিল না। তাই ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো কিশ্‌তোয়ারে ও কোন অতীত ইতিহাস নেই।

ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের মতো জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখেও ইংরেজরাই প্রথম ইতিহাসের অনুসন্ধান করেন। ১৮৫৮ ও ১৮৯০ সালে তাঁরা গেজেটীয়ার প্রকাশ করেন। সেই গেজেটীয়ার থেকে জেনেছি—

হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্যের মতো কিশ্‌তোয়ারেও মধ্যযুগে রাজপুত রাজারা রাজত্ব করেছেন। এবং তাঁরা স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম যাঁর নাম জানা যায়, তিনি রাজা ভগবান সিং। অন্তত শ' তিনেক বছর আগে কিশ্‌তোয়ারে ভগবান রাজত্ব করতেন। বিস্মৃতির মাঝে তাঁর নামটি স্মরণীয় হয়ে আছে কারণ তিনি শক্তিতে হীনবল হয়েও মোগলসম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সেই অসম যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। দিল্লীশ্বর কিন্তু তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। তবে সেই সন্ধির ফলে দরবার থেকে মনোনীত দুজন উজীরের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি রাজকর্ম পরিচালনা করবেন। জিউ পাল ও কাহন পাল নামে দুজন দিল্লীবাসী ক্ষত্রিয় উজীর নির্বাচিত হয়ে এলেন। তাঁদের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে কিশ্‌তোয়ারে দিল্লীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবং আজও তাঁরা কিশ্‌তোয়ারে রয়ে গিয়েছেন।

ভগবান সিংয়ের পরে রাজা মান সিং ও রাজা জয় সিং কিশ্‌তোয়ারে রাজত্ব করেছেন। তখন পর্যন্ত কিশ্‌তোয়ার একটি হিন্দুরাজ্য।

তারপরে রাজা গিরাত সিং কিশ্‌তোয়ারের সিংহাসনে বসলেন! তাঁরই রাজত্বকালে সৈয়দ শাহ ফরিদ্‌-উদ্‌-দিন সাহেব বাগদাদ থেকে এখানে আসেন। রাজা তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে রাজা গিরাত দিল্লীর সম্রাটের [সম্ভবতঃ মহম্মদ শাহ ১৭১৯-৪৬ খ্রীঃ] প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। সম্রাট খুশি হয়ে তাঁর নাম রাখলেন রাজা সৈয়াদত ইয়ার খান।

রাজধর্ম গ্রহণ করলে ব্যবহারিক জীবনে সুবিধে হয়। সুতরাং কিশ্‌তোয়ারবাসীদের মধ্যে ধর্মত্যাগের প্রবণতা দেখা দিল। এবং কিছুকালের মধ্যেই কিশ্‌তোয়ারের প্রায় অর্ধেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু আজও কিশ্‌তোয়ারী মুসলমানদের সঙ্গে কাশ্মীরী মুসলমানদের আচার ব্যবহারে প্রচুর পার্থক্য রয়ে গেছে। এঁদের পূর্বপুরুষগণ ধর্মত্যাগ করলেও হিন্দু সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করেন নি। ফলে এ অঞ্চলে কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ নেই। হিন্দু-মুসলমান শান্তিতে বসবাস করছেন।

ধর্ম-ত্যাগ করে এঁরা অনেকেই পিতৃপুরুষের বংশটি পরিত্যাগ করেন নি, একথা আগেই বলেছি। আর এই বিচিত্র নিয়মটি প্রচলন করে গেছেন সেকালের রাজারা। গিরাত সিং-য়ের পরে রাজা হলেন আমলকি সিং। তাঁর পরে মিহর সিং।

মিহরের পরে কিশ্‌তোয়ারের সিংহাসনে বসেন রাজা সুজান সিং। তাঁর পরে এনায়েতুল্লা সিং। এবং অবশেষে রাজা মহম্মদ তেজ সিং। তিনি কিশ্‌তোয়ারের শেষ স্বাধীন রাজা। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত উজীরদের বংশধরগণ এতকাল রাজাদের পরামর্শদাতার কাজ করে আসছিলেন। তেজ সিং এই বংশানুক্রমিক নীতির পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি লাকপত নামে জনৈক স্থানীয় জমিদারকে উজীর নিযুক্ত করলেন। কিন্তু

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর যোগ্যতা ও আনুগত্যে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদচ্যুত করলেন।

অপমানিত লাকপত জম্মুতে পালিয়ে গেলেন। দেখা করলেন শিখ সেনাপতি গুলাব সিংয়ের সঙ্গে! তিনি তাঁকে কিশ্‌তোয়ার আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। কত সহজে কিশ্‌তোয়ার দখল করা যায়, তার উপায় বলে দিলেন।

সাম্রাজ্যলোভী গুলাব সিং বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী লাকপতের পরামর্শ মেনে নিলেন। সেনাবাহিনী নিয়ে ডোডা পৌঁছলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। রাজা তেজ সিং ভয় পেলেন। পাছে শিখবাহিনী তাঁর সাধের কিশ্‌তোয়ার ধ্বংস করে ফেলে! তাই তিনি তাড়াতাড়ি ডোডা এসে গুলাবের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। গুলাব তাঁকে বন্দী করে লাহোর পাঠিয়ে দিলেন। এটি সম্ভবতঃ ১৮৩০ সালের ঘটনা।

রাজা তেজ সিংয়ের দুই ছেলে—জামাল ও জরোয়ার! ডোগরা অধিকারের পরে তাঁদের কি পরিণতি হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। ইতিহাস শুধু বলে—বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেও তেজসিং তাঁর সাধের কিশ্‌তোয়ারকে রক্ষা করতে পারেন নি। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গেজেটীয়ারে কিশ্‌তোয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'The population consisting of Mohamedans and Hindus are proverbially poor, the place having suffered excessively from the oppression of the Sikhs since the expulsion of the rightful Rajahs.....and whose power extended northwards as far as Ladakh.'*

॥ তিন ॥

হোটেলে ফিরে এসে দেখি, সদস্যরা সকলেই নিজেদের কাজ শেষ করে ফেলেছে। জয় ও জগদীশ রান্নার পাট চুকিয়েছে, কৃষ্ণ গোরা রঞ্জু ও টুলটুল কেনাকাটা ও প্যাকিং শেষ করেছে। হোটেল ম্যানেজারের ঘরে সদস্যদের বাড়তি জিনিস রেখে দেওয়া হয়েছে।

অতএব নিশ্চিন্তে খেতে বসা গেল। ভাত, ডাল, তরকারী ও বেগুনী। খাওয়াটা সত্যই খুব ভাল হল। কিন্তু ভরপেট খেয়ে বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল না। বাস এসে পড়ল। সুতরাং খেয়ে নিয়েই মালপত্র ঘাড়ে তুলতে হল।

বাস ছাড়ল যথা সময়ে, বেলা আড়াইটেয়। আমরা বিদায় নিচ্ছি শহর কিশ্‌তোয়ারের কাছ থেকে। মাত্র ঘণ্টা বিশেক বাস করেছি এই শহরে। কিন্তু এরই মধ্যে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে জায়গাটার ওপরে।

কেনই বা পড়বে না? গতকাল সন্ধ্যায় প্রথম পদার্পণ করলেও আমি যে এই সুপ্রাচীন শহরের কথা শুনে আসছি বহু বছর ধরে। শুনেছি, একদা ভদ্রাওয়ার অঞ্চল কাবুলের আমীর তিমুর শাহর অধীন ছিল। কিন্তু স্থানীয় রাজ্যপাল আবদুল্লা নিজেকে

স্বাধীন নরপতি রূপে ঘোষণা করে ভদ্রাওয়ার কিশ্‌তোয়ারের রাজাকে দিয়ে দেন। ফলে কিশ্‌তোয়ার রাজ্যের সীমা লাদাখ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এখনও ভদ্রাওয়ার ডোডা জেলার একটি মহকুমা।

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা কিশ্‌তোয়ারের মানুষদের খুবই প্রশংসা করছেন। বলছেন—

'The People of Kishtwar are a fine-made race in general, especially the Hindu portion, and are morally much superior to the Kashmiris, being more straightforward and cheerful.'

শুনেছি কিশ্‌তোয়ারের ভাষার সঙ্গেও কাশ্মীরী ভাষার পার্থক্য বিস্তর। বরং এখানকার ভাষার সঙ্গে নাকি হিমাচলী ভাষার মিল অনেক বেশি।

কিশ্‌তোয়ারের কথা শুনেছি কাকাবাবুর (শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র) কাছে। তিনি তাঁর 'সেই রাজা সেই রাণী' ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিশ্‌তোয়ারের এক রাজকন্যার কথা লিখেছেন। কাহিনীটি মনে পড়ছে আমার।

সম্রাট প্রথম বাহাদুর শা মারা গেলেন (১৭১২ খ্রীঃ)। কঠোর সংগ্রাম ও খুন-খারাপির পরে সম্রাটের প্রথম পুত্র মুইজ-উদ্দীন জাহান্দার শা নাম নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসলেন। কিন্তু তাঁর নবাবী মাত্র বছরখানেক স্থায়ী হল। তাঁর ভাইপো ফররুকশিয়র পরের বছরই (১৭১৩খ্রীঃ) তাঁকে হত্যা করে মসনদ দখল করলেন। তিনি ছ' বছর রাজত্ব করেছেন। ১৭১৯ সালে তাঁর ওমরাহ সৈয়দ হুসেন তাঁকে হত্যা করেন।

কাকাবাবুর কাহিনীর নায়ক এই ফররুকশিয়র আর নায়িকা কিশ্‌তোয়ারের রাজকন্যা। অপরূপা সুন্দরী তিনি। কাকাবাবুর ভাষায়—'তুষার-মণ্ডিত হিমগিরির মতো তাঁর গাত্র-বর্ণ। পার্বত্য-কুসুমের পেলবতা তাঁর ত্বকে, হিমালয়ের অনন্ত রহস্য তাঁর দৃষ্টিতে।'

হিমালয় পার হয়ে তাঁর রূপের খ্যাতি গিয়ে পৌঁছল লাহোরে। সুবাদার আবদুস সামাদ খাঁ লুব্ধ হলেন। শিকারের ছলে তিনি কিশ্‌তোয়ারে এলেন।

না, রাজকন্যাকে দেখতে পান নি তিনি। আড়াল থেকে শুধু দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর হাত দুখানি। আর তাতেই সুবাদার অস্থির হয়ে উঠলেন। মোহাচ্ছন্ন সুবাদার ছুটে এলেন রাজার [সম্ভবতঃ রাজা জয় সিং] কাছে। রাজকন্যার সেই দেবদুর্লভ হাত দুখানি ধরবার অধিকার প্রার্থনা করে লাহোরে ফিরে গেলেন।

রাজা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করতে ইতস্তত করছেন জানতে পেরে ভয় দেখালেন। বললেন তিনি কিশ্‌তোয়ারকে 'গুড়িয়ে চেনাবের জলে ধুয়ে সমভূমি করে দেবেন। এখানে আপেলের চাষ করাবেন।'

তবু রাজা সম্মত হলেন না। কিশ্‌তোয়ার ছোট হলেও একটি স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীন নরপতি হয়ে তিনি কেমন করে তাঁর মেয়েকে একজন সুবাদারের হাতে সম্প্রদান করেন?

ভাগ্যদেবতা বোধকরি তাঁর অবস্থা উপলব্ধি করে থাকবেন। তাই রাজা খবর পেলেন সম্রাট ফররুকশিয়র শিকার করতে তাঁর রাজ্যের সীমান্তে ছাউনী ফেলেছেন। রাজা স্থির করলেন—'শৃগালের ভক্ষ্য হওয়ার চেয়ে সিংহের ভক্ষ্য হওয়াই ভাল। ...সূর্য হাতের কাছে থাকতে খদ্যোতের কাছে কোন্‌ কমলিনী আত্মসমর্পণ করে?

পাছে সংবাদটা ছড়ায় এবং সুবেদার বাধা দেন—এই ভয়ে কাউকেই তিনি জানান

নি, এমনকি কন্যার মাকেও নয়। এক সন্ধ্যারাত্রিতে চুপিচুপি মেয়েকে আর জন-পাঁচেক মাত্র সশস্ত্র বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়েছিলেন।'

তিনদিন তিন রাত ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা পৌঁচেছিলেন তরুণ রূপবান ও উদার বাদশা ফররুকশিয়রের শিবিরে। সেখানে 'মধ্যরাত্রির প্রমোদ বিলাস' সবেমাত্র তখন শেষ হচ্ছে।

অনুমতি পেয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে রাজা সম্রাটের সামনে এলেন। মেয়ের মুখের ওপর থেকে ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে শুধু বললেন, "আমার বংশের ও আমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুসুম আপনাকে নিবেদন করতে এনেছি জাহাঁপনা, দয়া করে গ্রহণ করুন।"

নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্য বাদশা তখনই—সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করেছিলেন। কোন অনুষ্ঠানের বিলম্ব তাঁর সহ্য হয় নি।

'আদর করে বাদশা তাঁর পার্বতী প্রিয়ার নাম রেখেছিলেন নূরমহল। তারপরে বাদশা যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তাঁর সেই অলোক সাধারণ রূপের ঘোর বাদ্‌শার দৃষ্টি থেকে মুছে যায় নি। তাঁর অসংখ্য দাসী, একাধিক মহিষী এবং আরও নানা প্রমোদ সহচরীর মধ্যে নূরমহলই ছিলেন প্রধান এবং তাঁর প্রিয়তমা।'

তাহলেও কিশ্‌তোয়ারের নূরমহল আগ্রার নূরজাঁহা হতে পারেন নি। সে সুযোগও তাঁর ছিল না। কারণ ফররুকশিয়র জাহাঙ্গীর নন। তাছাড়া ফররুকশিয়রের মৃত্যুর পর নূরমহলের কি দশা হয়েছিল, তাও জানার দরকার নেই আমার। আমি শুধু জানি, কিশ্‌তোয়ারের কন্যা কিছুকালের জন্য আগ্রার হারেমে প্রধানা হতে পেরেছিলেন। এবং সে গৌরব কিশ্‌তোয়ারের কাছে চিরস্মরণীয়।...

—শঙ্কুদা, দেখুন কতবড় ময়দান!

জয়ের কথায় আমি অতীতের কিশ্‌তোয়ার থেকে বর্তমানের কিশ্‌তোয়ারে ফিরে আসি। তাকিয়ে দেখি, সে ঠিকই বলেছে। পথের বাঁদিকে সুবিশাল সবুজ মাঠ। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে এতবড় সমতল সত্যই বিস্ময়কর। অবশ্য সারা কিশ্‌তোয়ার শহরটাই এক প্রাকৃতিক বিস্ময়। চারিদিকে পাহাড়ের মাঝে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৩ কিলোমিটার প্রশস্ত সমতলে এই শহর। পাশ দিয়ে বয়ে চলছে চন্দ্রভাগা।

কিন্তু শহব কিশ্‌তোয়ার নয়, আমি ময়দানটিকে দেখি। শুধু বড় নয়, সুন্দরও বটে। ময়দানের এপাশে বাসপথ, ওপাশে সারি সারি বাড়ি-ঘর। তারপরেই পাহাড়, খাড়া উঠে গেছে ওপরে। পাহাড় নয়, যেন প্রকৃতির প্রাচীর। কিন্তু সে প্রাচীর রক্ষা করতে পারে নি কিশ্‌তোয়ারকে।

ভারতের পর্যটন মানচিত্রে কিশ্‌তোয়ারের নাম নেই। যাঁরা একাধিকবার কাশ্মীর ভ্রমণে এসেছেন, তাঁরাও অনেকে কিশ্‌তোয়ারের নাম জানেন না। অথচ প্রকৃত হিমালয়-প্রেমীদের কাছে কিশ্‌তোয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় হতে পারে। প্রচারের অভাবে কিশ্‌তোয়ার অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। কিশ্‌তোয়ারের অবস্থান হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে। দূরত্ব কিন্তু বেশি নয়, জম্মু থেকে ২২৯ কিলোমিটার আর বাটোট থেকে মাত্র ১০৯ কিলোমিটার।

ভাবছি কিশ্‌তোয়ারের কথা কিন্তু দেখছি পথের পাশে পাহাড়গুলিকে। পাহাড় নয়, গাছে ছাওয়া সুনিবিড় বন। নিচের দিকে ঝোপঝাড় আর ওপরে পাইনবন। বন ছাড়িয়ে পাথর, নানা রঙের পাথর। শীতকালে নিশ্চয়ই তুষারে শুধুই সাদা হয়ে যায়।

বন সম্পদে এত সমৃদ্ধ হয়েও কিশ্‌তোয়ার বড়ই দরিদ্র। কিশ্‌তোয়ার আজও এরাজ্যের সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চল। তাই কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীরা ঠাট্টা করে, বলেন—'কিশ্‌তোয়ারের মানুষ দিনে ক্ষুধার্ত রাতে শীর্তাত।' তাঁদের মতে একজন মোটা মানুষও এখানে এসে কিছুকাল বাস করলে নাকি ফকিরের লাঠির মতো রোগা হয়ে যায়।

আমার অবশ্য সে ভয় নেই। বয়সের ভারে শরীরে যে মেদ জমেছে তার কিছু কমবে, এই আশা করে এবারে আমি হিমালয়ে এসেছি। তবে সে আশা কতখানি সফল হবে, এ সম্পর্কে এখুনি আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ আমার সহযাত্রীরা সঙ্গে প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছে এবং তার মধ্যে মাছ, মাংস ও ডিমের পরিমাণ রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

পথের বাঁধানো অংশ বোধকরি শেষ হয়ে গেল। পাথর মেশানো নরম মাটির পথ। ধুলো উড়ছে। পথের পাশে ঘর-বাড়ি ও ক্ষেত ও খেলার মাঠ। দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝেই গাড়ি থামছে। ধুলো ঢুকছে আর লোক উঠছে। কিছুক্ষণ আগেও তারা গাড়িতে উঠছিল। এখন আর সে উপায় নেই। তাই কন্ডাক্টর তাদের ছাদে উঠবার পরামর্শ দিচ্ছে এবং তারা সে পরামর্শ মেনে নিচ্ছে।

ছাদের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই আমাদের মালপত্র, বিশেষ করে রুক্‌স্যাক্‌গুলো সব দাঁড় করানো। তার ওপরে বসলে যে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু কি করা যাবে? জয় একবার কথাটা বলেছিল কন্ডাক্টরকে। সে মৃদু হেসে সবিনয়ে উত্তর দিয়েছে—"ছিঁড়বে কেন সাব, ছিঁড়বে না। ওরা তো ত্রিপলের ওপরে বসেছে।

এ আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়া ছাড়া আমাদের যে আর কিছু করার নেই। বাস আছে অথচ ভিড় নেই, এটি তো এ দেশে হবার উপায় নেই। এই একটি ব্যাপারে এক আশ্চর্য জাতীয় সংহতি এ দেশে। বাসের ভিড় দেখে কলকাতা কিম্বা কিশ্‌তোয়ার বুঝতে পারার উপায় নেই। অথচ এমনটি হওয়া উচিত নয়। কারণ পাহাড়ী পথে দাঁড়িয়ে যাত্রী নেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ, বিপজ্জনকও বটে।

কিশ্‌তোয়ার থেকে পাতিমহলা ২৯ কিলোমিটার। কিন্তু এই পথটুকু যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে, বুঝতে পারছি না। কারণ বাস যতক্ষণ চলছে, তার চেয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে।

তাহলেও একসময় আমরা শহরের সমতল অংশ ছাড়িয়ে এলাম। বাস নিচে নামতে শুরু করল। গতকাল যেমন আঁকাবাঁকা পথে একটানা ওপরে উঠে এসেছি, আজ তেমনি পথে নিচে নেমে চলেছি। শুধু আমরা নই, আমাদের সঙ্গে নদীও নিচে নামছে। আর তাই সে মাঝে মাঝে অপরূপ জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে।

সহসা সহনেতা আমাকে জানায়—সবচেয়ে সুন্দর প্রপাতটি শহরের বিপরীত দিকে। সময় পেলে ফেরার পথে দেখিয়ে আনব।

—সেটা বুঝি এগুলোর চেয়ে বড়? জিজ্ঞেস করি।

কৃষ্ণ উত্তর দেয়—হ্যাঁ। কয়েক শ' ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ছে। ভারী সুন্দর। সত্যি দেখবার মতো।

তা হোক গে, কিন্তু সে দেখা তো ফেরার পথে। ফেরার কথা এখন নয়, পেছনের কথাও আর নয়। এবারে সামনের দিকে তাকানো যাক। পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা

পথ। আমরা কেবলি নিচে নেমে যাচ্ছি। নিচে আরও নিচে। পাইনবন ছাড়িয়ে নদীর বেলাভূমির দিকে। এখন বেলা সওয়া তিনটে।

পথের পাশে কাঁটাগাছ আর ঝোপঝাড়। মাটি আর পাথরের পথ। সঙ্কীর্ণ পথ। একখানি গাড়ি যেতে পারে। উল্টোদিক থেকে হঠাৎ কোন গাড়ি উঠে এলে সমূহ বিপদ। তবে শুনেছি সে বিপদ ঘটে না। কারণ এপথে আসা-যাওয়ার সময় বাঁধা। এপথে সবসময়—'ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক।'

এখন পথের পাশে পাহাড়গুলো দেখে আমার ত্রিপুরার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এগুলিকে অবশ্য মাটির পাহাড় বলা উচিত হবে না, তবে মাটির ভাগ খুবই বেশি। বৃষ্টি পড়লে নিশ্চয়ই পথ দুর্গম হয়ে ওঠে। তখন বাস চলে কি ?

হয়তো চলে। তবে চলা উচিত নয়। পথের পাশে রক্ষা-প্রাচীর বা 'গার্ড' নেই। পাশেই বয়ে চলেছে উত্তাল ও উদ্বেলিতা চন্দ্রভাগা। পিচ্ছিল পথে একটু এদিক-ওদিক হলেই অতল সমাধি।

এখন এসব ভাবনা কেন ? এখন তো বৃষ্টি পড়ছে না ! পড়ছে না, কিন্তু যে কোন সময় পড়া শুরু হতে পারে। আজ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ? গতকাল রাতে কিশ্‌তোয়ারে বৃষ্টি হয়েছে। হিমালয়ে বৃষ্টির চেয়ে বড় শত্রু নেই। এখন ব্রহ্মাজী ভরসা।

ঘণ্টাখানেক হল আমরা কিশ্‌তোয়ার থেকে রওনা হয়েছি। কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছি জানি না, কিন্তু নেমে এসেছি অনেক নিচে, একেবারে নদীর বেলাভূমিতে। প্রায় সমতলে, দুটি নদীর সঙ্গমে। আর বলা বাহল্য দুটি নদীর একটি চন্দ্রভাগা। অপর নদীটি মারু-চেনাব। চেনাব মানে চন্দ্রভাগা। কিন্তু মারু-চেনাব চন্দ্রভাগা নয়, কিশ্‌তোয়ার হিমালয়ের অন্য এক নদী। এটি লাদাখের দ্রাস অঞ্চলে সৃষ্ট হয়ে কিশ্‌তোয়ার তহসিলের মারোয়া উপত্যকা বেয়ে এখানে এসে চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চন্দ্রভাগার শাখানদী বলে সুপ্রাচীন কাল থেকে এরও স্থানীয় নাম চন্দ্রভাগা।

গতকাল বাটোট ছাড়াবার পরে দেখা হয়েছিল চন্দ্রভাগার সঙ্গে। সেই থেকে সে ছিল আমার সঙ্গে। তারই তীরপথে কিশ্‌তোয়ার পৌঁচেছি। আজও তার সঙ্গে এতক্ষণ পথ চলে এই বাণ্ডারকোট এসেছি। হ্যাঁ। সহযাত্রীরা বলছেন—এ জায়গাটার নাম বাণ্ডারকোট। বলছেন—এখানে বিদায় নিতে হবে চন্দ্রভাগার কাছ থেকে। এখান থেকে মারু-চেনাব সঙ্গী হবে আমাদের।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। আগেই বলেছি, চন্দ্রভাগার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৪২ সালে, প্রথমবার শ্রীনগর যাবার পথে। কিন্তু সেবারে সে পরিচয় থেকে কোন প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। তারপরে চন্দ্রভাগার সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে তার জন্মস্থান তাণ্ডিতে, খোকসার থেকে কেলং যাবার পথে। সেবারে চন্দ্রভাগাকে বড় আপন করে কাছে পেয়েছি। বিশবছর আগের সেই মধুর স্মৃতি আজও আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

সে যাত্রায় যারা আমার সঙ্গী ছিল, তারা কেউ সঙ্গে নেই আজ। আর তাদের মধ্যে একজন অকালে চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। অথবা চিরকালের জন্য রয়ে গেছে এই দেবতাত্মা হিমালয়ে। তার নাম শ্রীমতী সুজয়া গুহ। ১৯৭০ সালের সফলকাম ললনা (২০,১৩০´) অভিযানের সুযোগ্যা নেত্রী। চন্দ্রাভাগার উপনদী ভাগার তীরে তার দেহ পঞ্চভূতে মিশে আছে। গতকালও সুজয়ার কথা মনে পড়েছে। তাই

চন্দ্রভাগার কাছে আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করেছি।

লাহুল হিমালয়ের সেই প্রাণধারা চন্দ্রভাগার কাছ থেকে এবারে নিতে হবে বিদায়। এখান থেকে মারু-চেনাবের তীরে তীরে পথ চলে আমরা পৌঁছব পাতিমহলা।

কিন্তু পাতিমহলার কথা এখন থাক। এখন বান্ডারকোটের কথা হোক, সঙ্গমটিকে দেখা যাক। চন্দ্রভাগা এসেছে পুব থেকে আর মারু-চেনাব উত্তর থেকে, মিলিত ধারা প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিমে। আমরা পশ্চিম থেকে এসেছি এবারে উত্তরে যাবো। দুটি নদীই ওপর থেকে প্রচুর পাথর এনেছে বয়ে। দুই বিপরীত স্রোতের মুখে পড়ে তারা সঙ্গমে সুবিশাল এক প্রস্তর-বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে সঙ্গম। সঙ্গমতীরে থরে থরে কাঠ সাজানো রয়েছে। দুটি নদীই উচ্চ-হিমালয় থেকে কাঠ পরিবহন করে এনেছে। বন-বিভাগের শ্রমিকরা সেই কাঠ জল থেকে তুলে তীরে জড়ো করেছেন। এখান থেকে গাড়ি করে এইসব কাঠ নিচে নিয়ে যাওয়া হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ বণিকরা কাঠ পরিবহনের জন্য যে পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন, আজও আমরা তা অনুসরণ করে চলেছি। অথচ এই পদ্ধতিতে শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ কাঠ পাওয়া যায় না।

যাক্ গে এসব কথা বলা আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা। তার চাইতে পথের দিকে নজর দেওয়া যাক।

পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম সঙ্গমে। কয়েক মিনিট ধরে সঙ্গমতীরে প্রায় সমতল পথ পেরিয়ে উঠে এলাম একটা পুলের ওপরে। পুল পেরিয়ে পৌঁছলাম চন্দ্রভাগার অপর তীরে। খানিকটা প্রায় সমতল পথ চলে মারু-চেনাবের তীরে এলাম। আবার শুরু হল পাহাড়ে ওঠা।

পথের ডানদিকে ন্যাড়া পাহাড, কোথাও খাড়া কোথাও বা আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছে। আর পথের বাঁদিকে মারু-চেনাব। অনেক নিচে বয়ে চলেছে কিন্তু তার উচ্ছ্বসিত প্রবাহকে দেখতে পাচ্ছি না। নদীর ওপারে পাহাড়, সীমাহীন পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার বাহার।

এখন বিকেল চারটে। দুলতে দুলতে বাস চলেছে। দুলছে পথ অসমান বলে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, সংকীর্ণ পথ। দোলানীটা একটু যদি বেশি হয় আর তার ফলে বাসটা যদি কাত হয়ে পড়ে, তাহলে বিক্ষুব্ধা চেনাবের বুকে আশ্রয় নিতে হবে।

বাসের ভেতরের অবস্থা আরও খারাপ। ভিড় প্রায় কলকাতার অফিস টাইমের মতো। সর্বত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা তিনসারি। বাসের দোলানী বেশি হলেই তাঁরা টাল সামলাতে না পেরে গায়ের ওপর পড়ে যাচ্ছেন। এবং আমাদের নির্বিকার ভাবে বসে থাকতে হচ্ছে।

না, নির্বিকার থাকা গেল না। একটি যুবতী কয়েকমাসের শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধাক্কা খাচ্ছে। কোলের বাচ্চাটিকে সামলে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অতএব জয় উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটি যেন স্বর্গ হাতে পেল। একবার বলতেই সে ধপ করে বসে পড়ল জয়ের জায়গায়।

কিন্তু জয়ের পক্ষেও এই দোদুল্যমান বাসে এত ভিড় ঠেলে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব

হচ্ছে না। তাই তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে পাশে বসাই। তিনজনের সিটে চারজনের জায়গা হল কোনমতে।

এতক্ষণ আঁকাবাঁকা চড়াই পথে ওপরে উঠছিলাম, এবারে আবার শুরু হল সিঁড়ি ভাঙ্গা। এক ধাপ ছাড়িয়ে আরেক ধাপ, তারপরে আবার এক ধাক। কিছুক্ষণ আগে যেমন ধাপে ধাপে নেমে এসেছি এখন আবার তেমনি ওপরে উঠছি। তখন পাশে ছিল চন্দ্রভাগা, এখন মারু-চেনাব—দুটি নাম হলেও আসলে একই ধারা।

অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। আরও উঠছি। উঠেই চলেছি। তাই তো চলব। আমরা যে নিচে নেমে গিয়েছিলাম।

হিমালয়ের পথ জীবনপথের মতো নয়। এপথে নিচে নামলে আবার ওপরে ওঠা যায়। এপথে পতন ও উত্থান একে অপরের পরিপূরক। তাই কিশ্‌তোয়ার থেকে যতটা নেমে আমরা সঙ্গমে পৌঁচেছিলাম, এখন আবার ততটাই ওপরে উঠতে হবে। কারণ পাতিমহলার উচ্চতাও ৫০০০ফুট।

পথের কথা আগেই বলেছি। সুন্দর সন্দেহ নেই, তবে সেই সঙ্গে ভয়ঙ্করও বটে। একটু এধার-ওধার হলেই বিক্ষুব্ধা নদীর বুকে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু কথাটি বোধকরি চালকের খেয়াল নেই। বাসে খুবই ভিড় হয়েছে। সুতরাং বনেটের ওপরে তিনজন লোক বসেছেন। তাঁদেরই একজনের সঙ্গে সমানে গল্প চালিয়েছে চালক। কখনও বা স্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে।

জয় আমাকে আশ্বস্ত করে—আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন, এদের অভ্যেস আছে।

—তা আমিও জানি। কিন্তু ভাই দুর্ঘটনা সর্বদাই দুর্ঘটনা। ওর হাতে যখন এতগুলো মানুষের প্রাণ, তখন ওর আরেকটু সাবধান হওয়া উচিত।

এবারে জয় মাথা নাড়ে। আমি আবার বলি—আমি ভয় পেয়ে কথাটা বলি নি জয়! ভয় পাবার কি আছে? একদিন তো সবাইকে যেতে হবে। আর সেই যাওয়া যদি হিমালয়ের পথে হয়, তার চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ও সুন্দর পথ পাড়ি দেবার সময় আমার কেবলি মনে হচ্ছে জীবন মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি সত্য, বেশি সুন্দর আর বেশি মহান। তাই জীবন আত্মহত্যা করবার জন্য নয়।

তিনজনের সিটে চারজন বসেছিলাম, এখন পাঁচজন হয়েছি। জনৈক প্রৌঢ় সিটের হাতলে বসেছেন। তিনি মাঝে-মাঝেই আমার ঘাড় ধরে ধাক্কা সামলাচ্ছেন। কি করব? ঘাড়ধাক্কা খেয়েও বসে থাকতে হচ্ছে।

বিকেল সওয়া চারটে। সহযাত্রীরা জানালেন—ওপরে ওঠার পালা শেষ হল। এবারে মোটামুটি সমতল। পালমার এসে গেল।

দুবছর আগেও পালমার পর্যন্তই বাসপথ ছিল গতবছর পাতিমহলা পর্যন্ত পথ প্রসারিত হয়েছে। পথ এগিয়ে চলেছে কয়েক বছরের মধ্যে এখেলা পর্যন্ত বাস চলাচল করবে। করলেই ভাল। হিমালয়ে মোটরপথ আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার পথিকৃত।

পালমার একটি ছোট উপত্যকা। বলা বাহুল্য কিশ্‌তোয়ারের মতো সমতল নয়। পথের ওপরে ও নিচে কয়েকটি বাড়িঘর এবং কিছু চাষের জমি নিয়ে পালমার। ক্ষেতে আলু, পালং, মূলা ও কফি ফলে আছে। ফলে আছে রামদানা ও ভুট্টা।

পথের পাশে পাহাড় ভেঙে খানিকটা জায়গা সমতল করা হয়েছে। সেখানে এসেই থামল আমাদের বাস।

অনেক যাত্রী নেমে যাচ্ছেন। জয় সে মেয়েটিকে সিট ছেড়ে দিয়েছিল, সে-ও বাচ্চা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি ওকে গিয়ে সিটটা দখল করতে বলি। বলা যায় না, অন্য কেউ হয়তো বসে পড়বে! অবশ্য তাতে খুব বেশি একটা ক্ষতি হবে না কারণ এখান থেকে পাতিমহলা মাত্র ৩ কিলোমিটার। তাহলেও জয় গিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় বসে পড়ে।

বসে বলে—আমরা আবার কিশ্‌তোয়ারের সমান উঁচুতে উঠে এসেছি। এখানকার উচ্চতাও ৫০০০ফুট। আর তাই তাকিয়ে দেখুন, কিশ্‌তোয়ার কেমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাই। সত্যই তাই। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কিশ্‌তোয়ারকে। আমরা দেখি। বার বার দেখি।

দেখতে দেখতে বাস ছেড়ে দেয়। এখন বিকেল সাড়ে চারটে। গৌতম বলে—পালমার বড় জায়গা নয় কিন্তু মাধ্যমিক স্কুল আর পোস্টাপিস আছে। পাতিমহলা এখন বাসপথের প্রান্তসীমা হলেও সেখানে কোন ডাকঘর নেই।

না, থাক। ডাকঘরের দরকার নেই আমার। সভা জগৎ, শুধু সভ্য জগৎ কেন, মনুষ্যলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলেছি ব্রহ্মলোকে। এখন ডাকঘর দিয়ে কি করব? তার চেয়ে ব্রহ্মলোকের প্রবেশ তোরণটিকে দেখা যাক।

হ্যাঁ, এই পথই ব্রহ্মলোকের পথ। সবে তৈরি হয়েছে। গত বছর থেকে বাস চলাচল করছে। এখনও স্থিতি লাভ করে নি। কয়েকটা শীত ও বর্ষা সইবার পরে হিমালয়ের পথ মোটামুটি স্থায়ী হয়।

তাছাড়া পথের এ অংশটা যেমন সংকীর্ণ, তেমনি অসমতল। ফলে বাসের দোলানী আরও বেড়েছে। এবং পথ মাঝে মাঝেই মেয়েদের চুলের কাঁটার মতো বাঁকা—ওপরে উঠেছে কিম্বা নিচে নেমে গেছে। ফলে ড্রাইভার বাঁকের মুখে এসে গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছে। তারপরে খানিকটা পেছনে গাড়ি নিয়ে আবার সামনে এগিয়ে বাঁক ফিরছে। পথের পাশে কোথাও রক্ষা প্রাচীর নেই।

কেবল বাঁক ফিরবার জন্যই বাস থামছে না। যাত্রী নামবার জন্যও থামছে এবং বার বার থামছে! ড্রাইভার বেচারী কি করবে? সবাই নিজের বাড়ির সামনে নামতে চাইছে।

অবশেষে বিকেল সওয়া পাঁচটার সময় আমরা পাতিমহলা পৌঁছলাম। তার মানে তিন কিলোমিটার পথ আসতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগল।

লাগুক গে। এখানে তো অফিস করতে আসি নি যে সময়ে পৌঁছতে হবে। আর তাই নেতা নির্দেশ দেয়—অন্য যাত্রীরা নেমে যান, তারপরে আমরা নামব।

এটা পশ্চিম হিমালয়, আজ তেরোই সেপ্টেম্বর, সুতরাং সন্ধ্যে হতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু রোদ নেই। মেঘলা আকাশ। হিমালয়ে মেঘ দেখলে মন ময়ূরের মতো নেচে ওঠে না, অজানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারপরেই মনে পড়ে এখন সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। গাড়োয়াল-কুমায়ুনে দেখেছি, পর্বতাভিযানে আসার শ্রেষ্ঠ সময় এখন। এখানেও মেঘ কেটে রোদ উঠবে। প্রকৃতির করুণা ছাড়া যেমন পর্বতাভিযান সফল হতে পারে না, তেমনি পর্বতারোহীকে হতে হয় আশাবাদী। মেঘলা আকাশ আমাদের তাই নিরাশ করতে পারে না।

কিন্তু পর্বতাভিযানের প্রসঙ্গ থাক। অন্যান্য যাত্রীরা প্রায় সকলেই বাস থেকে নেমে পড়েছেন। আমরাও উঠে দাঁড়াই।

বাস থেকে নামতেই গৌতম ও শিবু স্বাগত জানায়। ওরা আমাদের আশ্রয় ও মাল পরিবহনের ব্যবস্থা করতে সকালের বাসে এখানে চলে এসেছে। শিবু বলে—সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কাল সকালেই পদযাত্রা শুরু করছি।

ওরা বাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামাতে লেগে যায়। আমি আর অমূল্য পথের পাশে এসে দাঁড়াই। পাহাড় ভেঙে পথের খানিকটা অংশ চওড়া করা হয়েছে। সেখানেই বাস এসে থেমেছে। তাই বলে জায়গাটা সোজাসুজি বাস ঘোরাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সামনে পেছনে করে কোনমতে বাসখানিকে ঘোরাতে পারা যাবে।

বাসস্ট্যান্ডে কয়েকটি দোকান। সবই পাথর আর কাঠের ঘর। মাটির মেঝে। একটি মুদি, একটি দর্জি ও গুটি তিনেক চায়ের দোকান। চায়ের দোকানে নাকি ফরমাস দিলে ডাল ভাত ও সবজি পাওয়া যায়।

পথের বাঁদিকে নদী, ডানদিকটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গিয়ে বনময় পাহাড়ে মিশেছে। সেখানে কয়েকখানি ঘর ও একফালি ক্ষেত। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়েও অনেকটা জুড়ে ক্ষেত। সামনে খানিকটা দূরে পথের পাশে আরও কয়েকটি বাড়ি দেখতে পাচ্ছি।

শেরপা ও মালবাহকদের সহায়তায় সদস্যরা ডানদিকের দোকানের দাওয়ায় মালপত্র রাখছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আর ভাবি, গৌতম ও শিবু নিশ্চয়ই এরই কোন ঘরে আমাদের রাতের আশ্রয় ঠিক করেছে। কারণ এখানে এর চেয়ে ভাল ঘর দেখছি না। তবু তো আজ ঘরে বাস করতে পারব। কাল থেকে কিভাবে রাত কাটবে কেবল হিমালয় জানেন। আমি শুধু জানি আজ আমার বাসযাত্রার যতি পড়ল। আগামীকাল থেকে চরণযুগলকে সম্বল করে দুর্গম থেকে দুস্তর পথে যেতে হবে এগিয়ে।

॥ চার ॥

—বাবুজি! চায়।

ঘুম ভেঙ্গে যায়। কোমল কিশোরীর কণ্ঠস্বর। মনে পড়ে সব কথা, শ্যামার কথা।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। ষোড়শী শ্যামার হাত থেকে মগটা হাতে নিই। এতো চা নয়, জীবনসুধা। ঠোঁটে ঠেকিয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করি। আর ভাবতে থাকি গতকাল বিকেলের কথা, পাতিমহলার কথা, শ্যামার কথা।

বাস থেকে মালপত্র নামাবার পরে পথের পাশের ঘরখানি দেখিয়ে শিবু বলেছে—এই ঘরে থাকব আমরা।

—এই চায়ের দোকানে।

—হ্যাঁ। তবে এটা শুধু চায়ের দোকান নয়, দোকানীর বাড়িও বটে। এখানে এর চেয়ে ভাল আশ্রয় নেই।

থাকলেও সুখের কিছু ছিল না। পর্বতাভিযানে এসে ঘরে থাকতে পারছি, এটাই বড় কথা। ঘর কি রকম, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ নেই। সুতরাং তিন ধাপ

মাটির সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছি দোকানের দাওয়ায়। দাওয়ার একদিকে ছাউনীর নিচে চায়ের দোকান, আরেকদিকে ছোট একখানি ঘর। দোকানের পেছনে একফালি বারান্দা। এই নিয়ে দোকানীর দোকান ও বাড়ি। নাম রুস্তম বাট। বয়স ছ'য়ের ঘরে। দীর্ঘদেহী। যৌবনে যে স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন এখনও বেশ বোঝা যায়।

রুস্তমজী জাতিতে গুর্জর। আগে ভেড়া চরাতেন। বছর দশেক আগে স্ত্রী বিয়োগের পরে স্থায়ী হয়েছেন এখানে। সামান্য কিছু জমি আর এই দোকান দিয়ে সংসার প্রতিপালন করছেন।

এখন অবশ্য সংসার খুবই ছোট। ছয় মেয়ের মধ্যে পাঁচজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তারা সবাই সুখে স্বামীর ঘর করছে। এখন ছোট মেয়ে শ্যামাকে নিয়ে তাঁর সংসার।

রুস্তম বাট নামটি শুনে আরেকজনেব কথা মনে পড়েছে আমার। তাঁর নাম আক্রাম বাট মল্লিক। তিনি হারিয়ে যাওয়া অমবনাথ গুহাকে খুঁজে বার করেছেন। তিনিও ছিলেন যাযাবর গুর্জর। হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে ভেড়া চরাতেন। একদিন একটা ভেড়া গেল হারিযে। ভেড়া খুঁজতে খুঁজতে আক্রাম বাট গিয়ে উপস্থিত হলেন একটি গুহায়। দর্শন করলেন স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ। *

তাই তাঁর বংশধরগণ আজও যাত্রীদের অর্ঘ্যের অংশ পেয়ে যাচ্ছেন। পুণ্যার্থীরা অমরনাথজীকে যে অর্থ বস্ত্র ও ফল-মিষ্টি নিবেদন করেন, তা তিনভাগ করা হয়। একভাগ পান ছড়ির মহান্ত মহারাজ, একভাগ মার্তণ্ডের পাণ্ডারা (অমরনাথের পূজারীরা) আরেক ভাগ আক্রাম বাটের বংশধরগণ। এবং তাঁরা এখন পহেলগামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী পরিবার।

আরেকজন বাট এখন আমাদেব আশ্রয়দাতা। তাঁরই কিশোরী কন্যা এই শীতল সকালে চা এনে ঘুম ভাঙ্গিযেছে আমার। না, কেবল আমার নয়, সেই সঙ্গে সবার। আমি আর অমূল্য চৌকিতে শুয়েছি, বাটসাহেবের বাড়ির একমাত্র চৌকি। শিবু, তপন ও গৌতম শুয়েছে মেঝেতে, বাকি সবাই সামনের দাওয়া ও পাশের বারান্দায়।

না, শ্যামা ও তার বাবা কাল ঘরে ঘুমোয় নি। রাত সাড়ে দশটায় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে। তারপরে বাপ-বেটি নিজেদের কম্বল বের করে আমাদের বিছানা করে দিয়েছে এবং আমাদের অপ্রস্তুত করে নিজেরা পাশের বাড়িতে শুতে চলে গেছে। আজ সকালে শ্যামা এসে চা বানিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়েছে আমাদের।

অথচ কতই বা বয়স মেয়েটার ? বছর ষোলো হবে হয়তো। দেখতেও কিন্তু ভারী সুন্দর। টানা-টানা চোখ, উঁচু নাক, মাথায় একরাশ কালোচুল, বেশ লম্বা আর স্বাস্থ্যটাও ভাল।

কেবল গায়ের রঙটা কাশ্মীরীদের মতো অত ফর্সা নয়। আর তাই বোধকরি শ্যামাকে এত সুন্দর দেখায়।

যাক্ গে শ্যামার কথা। অমূল্যকে বলি—কাল রাতে তো ভাল ঘুম হয়েছে ?

—হ্যাঁ। রঞ্জু যে ওষুধটা দিয়েছিল, খুবই ভাল।

—তাহলে লীডার, আমাদের মেডিক্যাল অফিসার মেডিসিনের ক্লাশ না করেও ভাল

ডাক্তার ? সঙ্গে সঙ্গে সহনেতা সুযোগ নেয়। কারণ তারই আশ্বাসে নেতা ডাক্তার না নিয়ে অভিযানে এসেছে।

এত সহজে হার মানবার মানুষ নয় আমাদের নেতা। সে বলে—রঞ্জুর প্রকৃত পরীক্ষা এখনও আরম্ভই হয় নি। কাজেই সে কেমন ডাক্তার, তা আমি যথাসময়ে বলব। আপাতত শ্যামার প্রশংসা করা যাক। কারণ সে চা করে আমাদের ঘুম না ভাঙালে রওনা দিতে দেরি হয়ে যেত।

আমরা সমস্বরে সমর্থন করি তাকে। সত্যই শ্যামা আমাদের অশেষ উপকার সাধন করেছে। এখুনি ঘোড়াওয়ালা এসে যাবে। পদযাত্রার প্রথমদিনেই আজ আমাদের দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে। তাছাড়া হিমালয়ের আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই। উচ্চ-হিমালয়ে সাধারণতঃ দুপুরের পরে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়।

সত্যি বলতে কি এমন আতিথেয়তা এবারে প্রত্যাশা করি নি। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল হয়েও মোটেই অতিথিবৎসল নয়। সুযোগ পেলেই তারা পর্যটকদের শোষণ করে। কিশ্‌তোয়ারে এসেই অবশ্য এর ব্যতিক্রম চোখে পড়েছিল। এখানে পৌঁছে ধারণাটি পালটে গেল। নইলে এই পাতিমহলায় শ্যামার মতো মেয়ে আর বাটসাহেবের মতো বাপ থাকবে কেন ?

ছোট গ্রাম পাতিমহলা। পঁচানব্বুইখানি ঘরে শ'সাতেক মানুষের বাস। চার শ' নাকি ভোটার আছে এ গ্রামে। আছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্কুল। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। শ্যামাও পড়েছে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত। তারপরে ছোড়দির বিয়ের পর থেকে বাবাকে চাষাবাদ আর দোকানদারীতে সাহায্য করছে। না করেই বা কি করবে ? সামান্য আয়, বাবা লোক রাখবেন কেমন করে ?

গতকাল বিকেলে শ্যামা আমাদের ক্ষেতের সবজি খাইয়েছে। ধান যব ভুট্টা রামদানা রাজমা (পাহাড়ী ডাল) আলু, টমেটো ও সবজির চাষ হয এ গ্রামে। তবে যা হয়, তা নাকি এদের খেতেই লেগে যায়। বাইরে চালান করতে পারে না।

কথাটা কাল বলেছে শ্যামা। আমাদের সবজি এনে দেবার পরে তপন তাকে দাম দিতে চেয়েছিল। শ্যামা বলেছে—ইয়ে কলকাত্তা নহী হ্যাঁয়।

অর্থাৎ এটা কলকাতা নয়, এখানে সবজি বিক্রি হয় না। আসল কথাটি বোধকরি অন্য—এরা দরিদ্র হলেও শহর কিম্বা সমতলের মানুষদের মতো পয়সার কাঙাল নয়।

ওরা জায়গা দিয়েছেন, তাই কাল রাতে আমরা বাপ-বেটিকে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। কিন্তু বাটসাহেব সবিনয়ে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন—আমরা দুপুরেই রাতের রান্না সেরে রেখেছি। আপনাদের সঙ্গে খেলে আমাদের খাবার নষ্ট হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আমরা কাল কোনভাবেই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে পারি নি। ভেবেছি আজ যাবার সময় চায়ের দামের সঙ্গে কিছু টাকা বেশি দিয়ে যাবো। নিতে আপত্তি না করলে হয়।

আবার পাতিমহলার ভাবনাটা পেয়ে বসে আমাকে। পাতিমহলা এখন বাসপথের প্রান্তসীমা। মারু-চেনাব উপত্যকার মানুষদের কিশ্‌তোয়ার কিম্বা জম্মু যাতায়াতের পথে এখানে থামতে হয়। তাই বলে পাতিমহলার তেমন কোন উন্নতি হয় নি। বাটসাহেব

বলেছেন—চার শ' ভোটার আছে আমাদের গ্রামে। তারই লোভে ভোটের আগে নেতারা আসেন। আমাদের নানা প্রতিশ্রুতি দেন। ভোট মিটে গেলে কেউ কথা রাখেন না। তবু নাকি এবছর রাস্তা আর জলের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু কোথায়, কাজ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আরও অনেক কথা বলেছেন বাটসাহেব। কিন্তু থাক্ সে সব কথা। শ্যামা কিম্বা পাতিমহলার কথা ভেবে আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। প্রাতঃকৃত্য সেরে ফিরে আসি বাটসাহেবের দোকানে। পাতিমহলা মাত্র পাঁচ হাজার ফুট উঁচু হলেও জল বেশ ঠাণ্ডা। সেই জলেই মুখ-হাত ধুতে হল। এখন একটু শীত-শীত করছে।

কিন্তু দোকানে ফিবে এসেই আবার গরম চা পাওয়া গেল। শুধু চা নয়, শ্যামা ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট রেডি করে ফেলেছে। গরম-গরম পরোটা ও চা দিয়ে প্রাতঃরাশ ভালই হল।

ঘোড়াওয়ালা এসে গেল। শেরপা ও মালবাহকদের নিয়ে শিবু জগদীশ টুলটুল ও গোরা মাল বোঝাই শুরু করে দিল।

অমূল্য বলে—টুলটুল ও গোরা আমাদের সঙ্গে চলো। গৌতম ও কৃষ্ণ এখানে থাকুক। আমি নন-ক্লাইম্বিং মেম্বারদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। তোমরা ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে রওনা হবে।

নেতার নির্দেশে রুক্স্যাক্ পিঠে তুলি, আইস এ্যাক্স্ হাতে নিই। কিন্তু চলতে গিয়ে থামতে হয়, বাটসাহেব আমাদের জন্য জোরে জোরে আল্লাহ্ তাল্লার দোয়া প্রার্থনা করছেন আর শ্যামা ? সে সজল চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। শ্যামা কাঁদছে। কিন্তু কেন ? আমরা তো ওর কেউ নয়। একদিন আগেও সে চিনত না আমাদের। তবু আমাদের বিপদসঙ্কুল পদযাত্রার প্রাক্কালে সে চোখের জল ফেলেছে। শ্যামা যে গুর্জর কিশোরী হলেও ভারতের নারী, যার কোন যুগ নেই, ধর্ম নেই, সমাজ নেই। তাই তিরিশ বছর আগের ঋষিকেশের অঞ্জলির সঙ্গে তিরিশ বছর পরের পাতিমহলার শ্যামা মিলে মিশে এক হয়ে গেল।*

সেদিন যেমন অঞ্জলির অনুরোধের উত্তরে নীরব ছিলাম, আজও তেমনি নীরবে এগিয়ে চলি সামনে। সেদিনের অঞ্জলির মতো আজকের শ্যামাও পড়ে থাকে পেছনে। আমি এগিয়ে চলি ব্রহ্মলোকের পথে।

নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ সকাল ঠিক সাড়ে-সাতটাতেই রওনা দেওয়া গেল। সবার আগে চলেছে অমূল্য, চলেছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তার পেছনে জয়, রঞ্জু, শৈলেশ, গোরা, টুলটুল ও আমি। গৌতম, কৃষ্ণ, তপন, শিবু ও জগদীশ ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই করে শেরপা ও মালবাহকদের নিয়ে রওনা হবে। ছ'টা ঘোড়া নিতে হয়েছে। শুনেছি সোন্দার গ্রাম পর্যন্ত ঘোড়া যেতে পারবে। তারপরে মালবাহক নিতে হবে। ঘোড়াওয়ালা মহম্মদ ইক্বাল বলেছে, সোন্দারে মালবাহক পেতে কোন অসুবিধে হবে না।

শুধু ঘোড়া নয়, দুটি মানুষও আমরা নিয়েছি পাতিমহলা থেকে। দুজনে মাসতুতো

গেছে, কোথাও বা একেবারে খাড়া নেমে গিয়েছে। চেনাবের বিরামহীন প্রণবধ্বনি শুনতে শুনতে আমরা এতক্ষণ ধীরে ধীরে ব্রহ্মলোকের পথে এগিয়ে চলছিলাম। কিন্তু আগেই বলেছি, এখন ডানদিকেই বেশি নজর দিতে হচ্ছে।

পাইনবনের ধারে পথের পাশে ঘাস আর ঝোপঝাড়। ফুটে আছে নানা রঙের অসংখ্য অজানা ফুল। তারা মাথা দুলিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ফুলবনের মাঝে মিশে আছে কিছু ভাঙ গাছ। শুনেছি স্থানীয়রা এইসব গাছের সবুজ পাতা দিয়ে মুড়ে বিড়ি কিংবা সিগারেট খায়। দারুণ নাকি মৌজ আসে। কিন্তু আমি সে রসে বঞ্চিত। অতএব বন দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি।

আবার চেনাবের দিকে তাকাই। চলা বন্ধ হয়ে যায়। সচল নদী নয়, মনে হচ্ছে, অচল একখানি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা। অসংখ্য মানিক জ্বলে আছে তার বুক জুড়ে। আমি দেখি আর দেখি। কিন্তু আমি যে পর্বতাভিযানে এসেছি। আমার তো থামবার অধিকার নেই। অতএব আবার এগিয়ে চলতে হয়। একটু বাদে বাঁকের আড়ালে রূপোলী রেখা যায় হারিয়ে।

সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ একটি ছোটগ্রাম পাওয়া গেল। আবদুল রসিদ দুভাই পথের ধারে মাল রেখে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। আমাদের দেখে লজ্জা পায়, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। বলে -এ গাঁয়ের নাম খেরাইল। খানদশেক ঘর আর পঞ্চাশজনের মতো মানুষ নিয়ে গ্রাম।

না শুধু রসিদরা নয়। গোবা, জয়, শৈলেশ আর রঞ্জুও এগিয়ে এসে বসে আছে এখানে। বসে আছে একটা চায়ের দোকানের সামনে। আমাকে দেখে রঞ্জু ছুটে আসে কাছে। পিঠ থেকে রুক্‌স্যাক্‌ খুলে নিয়ে বলে—একটু বিশ্রাম করে একগ্লাশ চা খেয়ে নিন।

–Well done Soncuda. well done.

আমার প্রশংসা করতে করতে অমূল্য এসে হাজির হয়।

হেসে বলি—আমার তারিফ না করে নিজের প্রশংসা কর। সত্যি তুই অবাক করলি ভাই! ভাঙা পা নিয়ে কি করে এই দুর্গমপথ পার হয়ে এলি?

অমূল্য এসে আমার পাশে বসে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। একটু বাদে করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে—সত্যই শঙ্কুদা, সত্যি বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি করব বলো, হাঁটতে যখন শুরু করেছি, শেষ তো করতেই হবে।

—এখনও ঘোড়াওয়ালাকে বললে হয়তো একটা ঘোড়া যোগাড় করে দিতে পারবে।

—কিন্তু তোমাদের তো বলেছি শঙ্কুদা, ঘোড়ায় চেপে আমি পর্বতাভিযানে যেতে পারব না। পায়ে হেঁটে না যেতে পারলে, বাড়ি ফিরে যাবো।

এর পরে আর কোন কথা চলে না। অতএব অন্য প্রসঙ্গ তুলতে হয়। তাডাতাড়ি জিজ্ঞেস করি—আমরা পাতিমহলা থেকে কতদূর এলাম?

—চার কিলোমিটার। দোকানী উত্তর দেন।

—সেকি! এতক্ষণে মাত্র ৪ কিলোমিটার! আমি বিস্মিত। মৃদু হেসে দোকানী বলেন—জী সাব!

—দু'ঘণ্টায় মাত্র ৪ কিলোমিটার হেঁটেছি। অমূল্য বলে—এত আস্তে তো চলা যাবে না। এখনও ১২/১৩ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু পেরে উঠব কি ?

—পারতেই হবে। অমূল্য যেন গর্জে ওঠে। বলে—ছক মতো না চলতে পারলে, অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অতএব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়ে আবার এগিয়ে চলি।

পথ একই রকম—আঁকাবাঁকা আর চড়াই-উৎরাই। রোদ এসে গেছে। রোদে পুড়ে চড়াই ভাঙছি। লাভ হচ্ছে না কিছু। চড়াইয়ের পরেই আবার উৎরাই।

খেরাইল থেকে রওনা হয়ে ঘণ্টাখানেক হেঁটেছি। এখন বেলা এগারোটা। একঘণ্টায় কতটা এসেছি বুঝতে পারছি না। জানি না আজকের গন্তব্যস্থল আর কতদূরে ? তবে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পা-দুটো ক্রমেই অবাধ্য হয়ে উঠেছে! কেবল ক্লান্তি নয়, সেই সঙ্গে ক্ষুধা। বার বার কেবল শিবুর কথা মনে পড়ছে। সে নাকি এখেলায় আমাদের 'হট্-লাঞ্চ' খাওয়াবে। এখেলা বোধকরি আর বেশিদূর নয়।

পথ দুর্গম, পথ কষ্টকর। কিন্তু সামনে কিংবা পেছনে তাকালে পথটি ভারী সুন্দর দেখায়! গাছে ছাওয়া উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পথ। পথ নয়, যেন একখানি রঙীন ছবি।

শুধু পথের কথাই বা বলি কেন ? নদীর কথাও না হয় বাদই দিলাম। নদীর পারের দৃশ্যও তাকিয়ে থাকবার-মতো। পাহাড়গুলি প্রায় নদীর সমান্তরাল হয়ে সোজা উঠে গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশেছে। তার গায়ে সবুজের বিস্তার সামান্য কিন্তু রঙের বাহার অসামান্য। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। সারা পাহাড়টা মসৃণ পাথর দিয়ে গড়া। কিন্তু সে পাথর কালো নয়, লাল হলুদ আর সাদা সহ নানা রঙের পাথর।

ওপারের সবুজ সামান্য কিন্তু এপারে সবুজ সীমাহীন। ওপারে খাড়া পাহাড় কিন্তু এপারে পাহাড়টা আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে। তারই বুক জুড়ে সবুজ। ঝোপ-ঝাড় ঘাস ফুল তো রয়েছেই তার সঙ্গে পাইনের সারি। আর সেই তারকাঁটার বেড়া।

কিন্তু বেড়া দিয়ে রাখলেই কি বন-সংরক্ষণ হয়ে গেল ? সকাল থেকে হাঁটছি অথচ এখন পর্যন্ত বনবিভাগের কোন কর্মরত শ্রমিকের সঙ্গে দেখা হল না। তাছাড়া যেখানে পথের এই হাল, সেখানে কেমন করেই বা বনের রক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব ? মনে পড়ছে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স ও পশ্চিম-জার্মানীর কথা। আল্‌পস, এ্যালসাস ও ব্ল্যাক-ফরেস্ট অঞ্চলে কি সুন্দর ও মসৃণ পথ। সেই পথ দিয়ে দিনরাত গাড়ি চলেছে। পর্যটক আর বনসম্পদ যাওয়া-আসা করছে। অথচ এই সীমাহীন বনাঞ্চলের কাছে সে বনসম্পদ কিছুই নয় হিমালয়ের বনসম্পদ আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধির একটা উৎস হতে পারে।

হতে পারে কিন্তু হয় নি। এবং বোধকরি হবেও না। কারণ কর্তব্য আর সততা শব্দদুটি যে বিদায় নিতে বসেছে ভারতীয় অভিধান থেকে।

চড়া রোদ উঠেছে। গরম লাগছে, পিপাসা পেয়েছে, খিদেয় পেটব্যথা করছে। বড়ই ক্লান্ত লাগছে। পা-দুটো আর চলতে চাইছে না। একটু জিরিয়ে নিতে পারলে হ'ত।

একটা ছোট পাইনগাছ পথের ওপর ছায়া বিছিয়েছে। কাউকে কিছু না বলে পিঠ থেকে রুক্‌স্যাক্ নামাই। গাছের ছায়ায় বসে পড়ি।

কেউ আপত্তি করে না। ওরাও বসে পড়ে। এখন শুধু জয় ও শৈলেশ আমার সঙ্গে রয়েছে। অমূল্য সহ সবাই এগিয়ে গেছে। ওরা বোধকরি এতক্ষণে খেতে বসে গেছে।

না। আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে

হট্-লাঞ্চ্ করে নেওয়াই ভালো। তাছাড়া এখনও সামনে সুদীর্ঘ পথ পড়ে রয়েছে। বেশিক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ নেই। অতএব রুক্‌স্যাক্ পিঠে তুলে আবার চলা শুরু করি। ওরাও সঙ্গী হয়!

সকালের দিকে পথচারীর সাক্ষাৎ পাই নি। এখন মাঝে মাঝেই দু-চারজন নারী-পুরুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ওরা ক্ষেতে যাচ্ছে, কেউ ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরছে। মাথায় তাদের ভুট্টা রামদানা কিংবা ঘাসের বোঝা। শীত এসে যাচ্ছে। শীতের খাদ্য ও জ্বালানী সঞ্চয় করে রাখতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কিশ্‌তোয়ার পৌঁছবার পরেই লক্ষ্য করেছি, আজও দেখছি, এ অঞ্চলের পোষাক বড়ই বৈচিত্র্যময়। এঁরা এখনও নিজেদের হাতে তৈরি পোষাক পরেন। ছেলেরা সাধারণতঃ পায়জামা ও কুর্তা। কেউবা জ্যাকেট ব্যবহার করেন। মাথায় টুপি আর পায়ে ঘাসের জুতো। মেয়েরা অনেকেই ছেলেদের মতো হাতে তৈরি পশমের সালোয়ার পরেছেন। আবার কেউবা পুট্টু মানে একটুকরো দিশী কম্বল গলায় বেধে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছেন। অনেকে আবার তারই ওপরে কুর্তা পরে নিয়েছেন। তবে সবারই পায়ে ঘাসের জুতো।

শহরবাসীদের কথা বলতে পারি না কিন্তু গাঁয়ের এই মানুষগুলি ভারী ভাল। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ওঁরা আলাপ করেন। ব্রহ্মলোকের কথা শুনে ওঁরা হাতেজোর করে ব্রহ্মাজীকে প্রণাম জানিয়ে বলেন—ব্রহ্মাজীর পুজো দিতে যাচ্ছেন শুনে সুখী হলাম। আপনারা ভাগ্যবান। আমরা তো এত কাছে থেকেও কোনদিন ব্রহ্মাজীর কাছে যেতে পারি নি। তবে তিনি বড়ই জাগ্রত। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের ভাল করবেন।

গতকাল কিশ্‌তোয়ারে বসেই গৌতম সবাইকে বলে দিয়েছে, আমরা যেন স্থানীয়দের কাছে পর্বতারোহণের কথা না বলি। কারণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ অঞ্চলের মানুষ পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মা শিখরকে ভয় এবং ভক্তি করে আসছেন।

—শঙ্কুদা! ঐ দেখুন এখেলা দেখা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। সত্যি তাই। খানিকটা দূরে একটা উপত্যকা ও কিছু বাড়ি-ঘর। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। ওখানে পৌঁছে বিশ্রাম করতে পারব, জল পাবো, হট-লাঞ্চ্ জুটবে। চলার বেগ বেড়ে যায়। চলতে চলতে উপত্যকাটিকে দেখি।

নদীটি সরে গেছে দূরে। নদীর তীর থেকে আস্তে আস্তে উঠে ক্ষেতগুলি পথে এসে মিশেছে। পথের ডানদিকেও ক্ষেত আর ঘর-বাড়ি। বাড়ি বেশি নয়। কিন্তু ঘরগুলো বেশ শক্ত ও সুন্দর। একটা তিনতলা ঘরও দেখতে পাচ্ছি।

গাঁয়ের মানুষ ক্ষেতে কাজ করছেন। তাঁরা হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। আমরা হাসিমুখে হাত নেড়ে এগিয়ে চলি।

মাটি আর পাথরের প্রায় সমতল পথ। পথের বাঁদিকে বনবিশ্রাম গৃহ, নদীর ধারে। নদীর ওপারে সারি সারি সীমাহীন পাহাড়ের ঢেউ। প্রথমে সবুজ, তারপরে কালো আর ধূসর পাহাড়।

না, সাদা পাহাড় দেখা যাচ্ছে না এখনো। তবে দেখব, আজ না দেখতে পেলেও কাল আশাকরি আমি তুষারমৌলি হিমালয়ের হাতছানি দেখতে পাবো।

দুপুরবেলা অর্থাৎ বারোটার সময় এখেলা বনবিশ্রাম গৃহে পৌঁছলাম। পথের পাশে নদীর ধারে সুন্দর একটি একতলা বাড়ি। টিনের চাল, পাথরের দেওয়াল। সামনে ছোট

একফালি জায়গা, তারপরে খোলা বারান্দা। পাশে একখানি ছোট ঘর, সেখানে জলের কল। পাশের পাহাড় থেকে ঝরণার জল পলিথিনের পাইপ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। গেটের সামনে একখানি সাইনবোর্ড। তাতে লেখা-একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এখানে শিকার নিষিদ্ধ। এই অঞ্চলে নানা জাতের পাখি বানর ও হরিণ আছে। আছে কালো ভালুক, সাপ ও বাঘ।

ভাবি—কারো সঙ্গেই তো দেখা হ'ল না এখনো।

বারান্দাতেই বসেছিল ওরা—কৃষ্ণ জগদীশ তপন গৌতম রঞ্জু ও গোরা।

অমূল্য টুলটুল ও শিবুকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ? ওরা কোথায় গেল ?

কাছে আসতেই কৃষ্ণ আমার রুক্স্যাক্ খুলে নেয়। বলে—বসুন জল খান। সে মগ বের করে।

শৈলেশ বলে—শুধু জল নয়, খানিকটা গ্লুকোজ মিশিয়ে দে।

জল খুবই ঠাণ্ডা। অল্প অল্প করে গলায় ঢালতে হ'ল। কিন্তু তাই খেয়েই যেন দেহে প্রাণ ফিরে এলো।

তপন বলে—এ জায়গাটার নাম এখেলা। সেদিন কিশ্‌তোয়ারে তহসিলদারসাব বলেছেন, কয়েক বছরের মধ্যেই এই পর্যন্ত বাস আসবে। এখানকার উচ্চতা ৫৫০০ ফুট।

তখন আর যাত্রীদের এই দুর্গম ৮ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে না। হ্যাঁ, সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে এই সাড়ে চারঘণ্টায় আমরা মাত্র ৮ কিলোমিটাব পথ পার হয়েছি। আজ আরও ৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। আবহাওয়া ভাল থাকলে তেমন একটা অসুবিধে হবে না। কিন্তু তার আগে কিছু খাওয়া দরকার। শিবু বলেছে হট্-লাঞ্চ্ খাওয়াবে। কোথায় সে ?

গৌতম বলে—লীডারকে নিয়ে টুলটুল ও শিবু ওপরে চলে গেছে। একটু ওপরেই দোকান। সেখানেই খাবার পাওয়া যাবে।

বিশ্রামগৃহ থেকে মিনিট পাঁচেক চড়াই ভেঙ্গে একফালি প্রশস্ততর পথে পৌঁছনো গেল। সেখানেই পাহাড়ের পাশে পরপর তিনখানি চা ও খাবারের দোকান। অর্থাৎ রেস্তোরাঁ-কাম-হোটেল। পাইস-হোটেলও বলা যেতে পারে। তারই একটা দোকানের সামনে অমূল্য ও টুলটুল বসে রয়েছে। শিবু কোথায় ? সে নিশ্চয়ই হোটেলের ভেতরে হট্-লাঞ্চ্-এর তদারকি করছে। আচ্ছা, কি পাওয়া যাবে এখানে ? গরম গরম ডাল-ভাত ও সবজি তো বটেই। চাই কি 'ওমলেট' অথবা আলুভাজাও পাওয়া যেতে পারে। না পেলেও ক্ষতি নেই। পুলকিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলি।

কিন্তু অমূল্য ও টুলটুল চা খাচ্ছে কেন ? বোধকরি শ্রান্তি দূর করতে। হিমালয়ে চা পানের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। 'এনি টাইম্ ইজ্ টি টাইম্'।

আমরা কাছে আসতেই অমূল্য বলে—টুলটুল, শঙ্কুদাদের চা দিতে বলো !

নেতার পাশে বসে বলি—এখুনি তো হট্-লাঞ্চ্ পাওয়া যাবে। আবার চা কেন ?

—লাঞ্চ্ পাওয়া যাবে না শঙ্কুদা ! নেতার কণ্ঠস্বরে হতাশা।

কেউ যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিল। তলিয়ে যাবার প্রাক্কালে আপনা থেকেই ক্ষীণস্বরে প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো মুখ থেকে—পাওয়া যাবে না ?

—না। অমূল্য উত্তর দেয়। বলে—আগে অর্ডার না দিলে এরা কেউ এতগুলো

লোকের খাবার দিতে পারে না। আমরা চাইলে এখন অবশ্য রান্না করে দিতে পারে, কিন্তু অন্তত দু-ঘণ্টা বসতে হবে। আমাদের পক্ষে খাবারের জন্য এখন এখানে দু-ঘণ্টা বসে থাকা সম্ভব নয়।

সত্যিই তাই। সবে অর্ধেক পথ এসেছি। এখানে দু-ঘণ্টা দেরি করলে গন্তব্যস্থল সেওয়াবাতি পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। তাছাড়া আকাশের অবস্থাও ভাল নয়, যেকোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

চায়ের অর্ডার দিয়ে টুলটুল ফিরে আসে।

জিজ্ঞেস করি—শিবু কোথায় ?

—দু কিলোমিটার দূরে আরেকটা হোটেল আছে। শিবু এগিয়ে গেছে খাবারের ব্যবস্থা করতে।

—ঘোড়াওয়ালারাও মালপত্র নিয়ে এগিয়ে গেছে। নইলে চিনি দিয়ে চিড়ে ও ছাতু খাওয়া যেতে পারত। গৌতম আপসোস করে।

—তোমরা দু-দুবার সমীক্ষায় এসেও খবরাখবর নিয়ে যাও নি। নেতার স্বরে তিরস্কার।

জগদীশ জবাবদিহি করে—তুমি বিশ্বাস করো লীডার, দুবারই যাতায়াতের পথে আমরা এখানে গরম খাবার পেয়েছি।

—পেয়েছো তার কারণ তোমরা ছিলে পাঁচ-ছ' জন আর আজ আমরা আঠারোজন।

ওরা মাথা নাড়ে। অর্থাৎ নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেয়।

চা আসে। শুধু চা। সেই 'হট্-টী' দিয়েই 'হট্-লাঞ্চ্' সমাধা করে রওনা দিতে হয়। এখন বেলা সাড়ে বারোটা।

এখেলার পরে খানিকটা জায়গা বেশ ছায়াশীতল। তাছাড়া আকাশের মেঘ যেন ক্রমেই ভারী হচ্ছে। কখন বৃষ্টি নামবে কে জানে ? তাড়াতাড়ি পা চালাই।

এখন বেলা দেড়টা। এখানে পথের বাঁদিকে নদীর ধারে একফালি জায়গা রয়েছে। সেখানে এক ভেড়াওয়ালা পরিবার অস্থায়ী ছাউনী ফেলছে। বড় একটা পাথরের আড়ালে আগুন জ্বলছে। কয়েকটা পোটলা-পুটলি এখানে-ওখানে পড়ে আছে। দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কি সব কাজকর্ম করছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই তারা ছুটে উঠে আসে পথে। ছোট্ট দুটি হাত বাড়িয়ে কোমল কণ্ঠে বলে—সাব মিঠা দে !

মিঠা মানে লজেন্স। ওরা জানে আমরা পাহাড়ে বেড়াতে এসেছি। আমাদের কাছে লজেন্স আছে। কিন্তু আমার পকেটের লজেন্স ফুরিয়ে গেছে। অসহায় ভাবে রঞ্জুর দিকে তাকাই। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে—আমার পকেটে যে মাত্র একটা রয়েছে। রুকস্যাকে আছে। কিন্তু আবার রুকস্যাক্ নামাবো !

—দেখি, আমার পকেটে আছে কিনা। জয় পকেটে হাত ঢোকায়। একটু বাদে বলে ওঠে—আছে। একটা নয়, দুটোই রয়েছে দেখছি।

জয় ছেলে-মেয়ের হাতে লজেন্স দুটি দিতেই তারা উল্লাসে ফেটে পড়ে। হাত নেড়ে মায়ের উদ্দেশে কি যেন বলতে থাকে।

মা সাড়া দেয়। কাজ ফেলে সে-ও দেখছি এদিকে আসছে। তারও কি 'মিঠা' চাই নাকি ? আমরা দাঁড়িয়ে থাকি।

সে আসে। দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। ছেলে-মেয়ের মা। দুঃসহ শীত সয়ে আর কঠোর

পরিশ্রম করে জীবনধারণ করতে হয়। গৃহহীনা নিরাশ্রয়। তবু যেমন সুশ্রী, তেমনি স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু পোষাকটি বড়ই জীর্ণ। তাই সোজাসুজি তার দিকে তাকাতে লজ্জা লাগছে। দুঃখও হচ্ছে।

সে কিন্তু মোটেই লজ্জাবতী নয়। ওর কোন দুঃখ আছে বলেও মনে হয় না। হাসি-খুশি মেয়েটি সেলাম জানায় আমাদের। তারপরে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলে—আপনাদের নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে। আমার কাছে খানিকটা মাঠা (ঘোল) আছে কিন্তু শক্কর (চিনি) নেই। খেতে পারলে দিতে পারি।

মাঠা মানে মাখন তুলে নেওয়া দুধ। ঠাণ্ডা জায়গা বলে নষ্ট হয় না। খেতেও নাকি খুবই ভাল। আমরা তৃষ্ণার্তও বটে। কিন্তু এই দরিদ্র পরিবারের খাবারে ভাগ বসানো ঠিক নয়। তাই বলি—সামনে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আমরা আর কিছু খাব না।

সে-ও জোর করে না, হয়ত বা সাহস পায় না। কেবল জিজ্ঞেস করে—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

উত্তর শুনে আবার বলে—আমরাও ব্রহ্মাজীর কাছেই গিয়েছিলাম। শীত আসছে বলে নেমে যাচ্ছি। আপনারাও দেরি করবেন না। ব্রহ্মাজীর পুজো হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি নেমে আসবেন।

কি বলব ? বিচিত্র এই দেশ। এ দেশের যাযাবর মানুষদের বুকেও কত মমতা।

সে আবার বলে—সামনে আমার বড ছেলে ও তার বাবার সঙ্গে দেখা হবে। ওরা ভেড়া চড়াতে গিয়েছে।

মেয়েটি ও তার ছেলে-মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে কিন্তু ওদের কথাই ভাবতে থাকি। এ অঞ্চলে এই ছিন্নমূল কষ্টসহিষ্ণু মানুষগুলোকে বলা হয় গুর্জর, আর হিমাচলে গদ্দি। এঁরাই অমরনাথ ও মণিমহেশ আবিষ্কার করেছেন।*

বৈচিত্র্যময় ভারতের এক বিচিত্র জাতি এই গুর্জর। এঁদের ইতিহাস ও সমাজ নিয়ে গবেষণার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন, এঁদের পূর্বপুরুষগণ মধ্য-এশিয়ার বিজয়ী দলগুলির অন্যতম। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা বহুদলে বিভক্ত হয়ে ভারতে আগমন করেন। তাঁদের কতগুলি দল ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছেন। কর্মক্ষমতা কষ্টসহিষ্ণুতা সাহস ও বীরত্বের বিনিময়ে তাঁরা এবং তাদের উত্তরপুরুষগণ ভারতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আপন শক্তিতে উত্তর ও মধ্য ভারতের অধিকাংশ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মিশ্রিত এই জাতিই পরবর্তীকালের রাজপুত রূপে পরিচিত। * *

ইংরেজ ঐতিহাসিকের ধারণা, যেসব জাতির সংমিশ্রণে রাজপুতজাতির অভ্যুত্থান, তাঁদের মধ্যে গুর্জরগণই নাকি সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন।

কিন্তু গুর্জরদের সব শাখাই ভারতের আর্যদের সঙ্গে মিশে যান নি। কয়েকটি শাখা

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। আর তাই তাঁরা আজও যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে চলেছেন। তাঁরাই আজকের গুর্জর।

সমতলে স্থায়ী না হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে এঁরা হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এঁরা এখন কতকগুলি ছোট-ছোট দলে বিভক্ত। পশুপালনই এঁদের প্রধান জীবিকা। এঁরা আজও চাষাবাদ করতে শেখেন নি এবং এঁদের মধ্যে এখনও লেখা-পড়ার প্রচলন হয় নি। এঁরা ভেড়া-ছাগল গরু-ঘোড়া ও কুকুর নিয়ে হিমালয়ের দুর্গম উপত্যকা আর গ্রাবরেখায় ঘুরে বেড়ান। গ্রীষ্মকালে গুর্জররা পশুচারণের জন্য হিমালয়ের স্থায়ী তুষাররেখা অর্থাৎ তৃণভূমির প্রান্তসীমা পর্যন্ত চলে যান, আবার শীতের তুষারপাত শুরু হবার আগেই নিচে নেমে আসেন।

এঁদের জীবিকা বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর। অথচ এঁরা বড়ই দরিদ্র। বিজ্ঞানের কোন অবদানের এঁরা অংশীদার নয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও এঁরা মধ্যযুগে রয়ে গিয়েছেন। এটি যেকোন দেশের পক্ষে চরম অগৌরবের।

—একি পথ কোথায় ?

শৈলেশের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। সত্যই সামনে আর পথ নেই। ধস নেমে পথ নিশ্চিহ্ন। এখন কোনদিকে যেতে হবে ? শৈলেশ জয় ও রঞ্জু রয়েছে আমার সঙ্গে। আমরা কেউ পর্বতারোহী নই। টুলটুলকে নিয়ে ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে অমূল্য এগিয়ে গেছে। তবে গৌতমরা পেছনে রয়েছে। ওদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কি ?

শৈলেশ বলে—পথ বুঝতে না পারলে অপেক্ষা করতে হবে বৈকি ! কিন্তু তার আগে জায়গাটা একবার দেখে নেওয়া দরকার।

আমরা মাথা নেড়ে সমর্থন করি ওকে। শৈলেশের মতো রঞ্জু এবং জয়ও পিঠ থেকে রুক্‌স্যাক্‌ খুলে রাখে। জয় বলে—আপনি একটু এখানে বসুন শঙ্কুদা ! আমরা দেখছি পথের হদিশ পাওয়া যায় কিনা ?

আমি তার পরামর্শ মেনে নিই। বলি—সাবধানে পা ফেলে এগিও, একেবারে ধারে যেও না।

পথের হদিশ পেতে দেরি হয় না। শুধু তাই নয়, ওরা জানায়—লীডার টুলটুল ও ঘোড়াওয়ালা নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সাবধানে নামতে বলছে।

এই না হলে অমূল্য। ভাঙা পা নিয়েও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে আসি ধসের ওপরে। অমূল্য দেখতে পায় আমাকে। চিৎকার করে বলে—শঙ্কুদা, তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। আগে ওদের নামতে দাও। তারপরে ঘোড়াওয়ালা যাচ্ছে। সে তোমাকে নিচে নিয়ে আসছে।

নেতার নির্দেশ। অতএব তাই করতে হয় আমাকে। ঘোড়াওয়ালার হাত ধরে নেমে আসি পথে। একটু হাসে অমূল্য। স্বস্তির হাসি বলে—জায়গাটা দেখেই মনে হল, তোমার অসুবিধে হবে। তাই ঘোড়াওয়ালাকে নিয়ে বসে রইলাম।

—কতক্ষণ বসে আছিস ?

—তা প্রায় আধঘণ্টা হবে।

কি বলব ? নিজের পায়ের এই অবস্থা। পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ আমাদের জন্য এখানে আধঘণ্টা বসে আছে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলি।

যারা সামনে কিংবা পেছনে রয়েছে, তাদের কথা বলতে পারছি না, কিন্তু আমাদের চারজনেরই খুব খিদে পেয়েছে। আশ্চর্য পথ, একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই।

না, আছে। সামনে একটা বেশ বড় বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওখানে হয়তো কোন দোকান থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি পা চালাই, ক্ষেতের পাশ দিয়ে পথ। ক্ষেতে প্রচুর ভুট্টা, কুমড়ো ও শাক ফলে আছে।

ক্ষেত পার হয়ে বাড়িটার সামনে আসি। না, শুধুই বাড়ি, কোন দোকান নেই।

বড্ড ক্লান্ত লাগছে। দেহের দোষ কি ? অভুক্ত থেকে কি এমন দুর্গম পথ পারি দেওয়া যায় ? খাবার না পাই, একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

কাউকে কিছু না বলে পথের ওপরেই বসে পড়ি। আমার দেখা-দেখি ওরাও বসে।

বাড়িটায় দোকান নেই কিন্তু মানুষ আছে। তারাই দাঁড়িয়ে আছে দোতলার বারান্দায়—দুটি কিশোর-কিশোরী ও একটি যুবতী। এবং আমাদের বসতে দেখেই কিশোর ও কিশোরী নেমে আসে পথে, আমাদের কাছে।

কাছে এসে কিশোরী জিজ্ঞেস করে—তোমরা কোথা থেকে আসছ, কোথায় চলেছো ?

রঞ্জু উত্তর দেয়। শুনে কিশোর জিজ্ঞেস করে—ব্রহ্মাজীর কাছে চলেছো কেন, তাঁর পুজো দেবে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের কাছে মিঠা আছে ?

—আছে। এই যে নেও। বলতে বলতে রঞ্জু রুক্‌স্যাক্‌ থেকে লজেন্স বের করে ছেলে-মেয়ে দুটিকে দেয়।

লজেন্স মুখে পুড়ে মেয়েটি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে—তোমাদের কাছে কি আর মিঠা আছে ?

—কেন বলো তো ? শৈলেশ জিজ্ঞেস করে !

না, সে মোটেই লজ্জা পায় না। বরং সহজ স্বরে বলে—থাকলে, দিদির জন্য একটা নিয়ে যেতাম। বলতে বলতে সে দোতলার দিকে দেখায়। তাকিয়ে দেখি যুবতীটি এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রঞ্জু আরেকটা লজেন্স বের করে তার হাতে দিতেই কিশোর-কিশোরী ছুটে পালাতে চায়। আমি বাধা দিই। বলি—এ ক্ষেতগুলো কি তোমাদের ?

—হ্যাঁ। আমাদের বাবার।

—তিনি বাড়ি আছেন ?

—না। কাল কিশ্‌তোয়ার গিয়েছেন। কিন্তু কেন ব'লো তো ?

—থাকলে, তাঁর কাছ থেকে কয়েকটা ভুট্টা কিনতাম। আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে।

—খিদে পেয়েছে !

—হ্যাঁ। সকালে ঠিকমতো খাওয়া হয় নি।

—তা, আগে বলবে তো ! কিশোরী রীতিমত ধমক লাগায়। বলে—তোমরা একটু বসো। আমরা দিদিকে জিজ্ঞেস করো আসি।

—হ্যাঁ যাও, ব'লো আমরা দাম দেব।

কিশোর বলে—আমাদের তো মা নেই। তাই দিদি বললেই তোমাদের ভুট্টা দিয়ে দেব।

বুকটা কেঁপে ওঠে। এই প্রাণচঞ্চল কিশোর-কিশোরী মাতৃহীনা! ভগবানের কি বিচার বুঝতে পারি না!

ওরা ছুটে যায় বাড়িতে। আমরা বসে থাকি। মনে হচ্ছে যেন 'ইন্টারভিউ' দিতে এসেছি। ম্যানেজারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে আছি।

ভাই-বোন দোতলায় পৌঁছে গিয়েছে। দিদিও দাঁড়িয়েছিল ওখানে। কতই বা বয়স। ওদের থেকে কিছু বড়। তাকে লজেন্সটা দিয়েছে। ভালই করেছে। লজেন্স খেতে খেতে সে ওদের কথা শুনছে। তার সিদ্ধান্তের ওপর আমাদের ভুট্টা পাওয়া না-পাওয়া নির্ভর করছে।

ওরা তিনজনেই নেমে আসছে নিচে। তাহলে কি দিদি আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেছে?

বোধকরি তাই। নইলে সে কেন বোনকে নিয়ে ভুট্টাক্ষেতে ঢুকছে! ভাই ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে আসে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—তোমরা একটু বসো। দিদি বলেছে, তোমাদের ভুট্টা দেবে।

মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। তারপরেই আবার ওদের কথা মনে পড়ে। ভগবানকে বলি—ঠাকুর, তোমার যদি এতই করুণা, তাহলে এদের প্রতি তুমি এমন অকরুণ হলে কেমন করে? এই ফুলের মতো নিষ্পাপ ও সুন্দর ছেলে-মেয়েদের মাকে তুমি অকালে অপহরণ করলে কেন?

একটি নয়, দুটি করে ভুট্টা পাওয়া গেল। এখনও ঠিকমতো পাকে নি, কাঁচা রয়েছে। তাহলেও খেতে ভারী মিঠে।

শৈলেশ বাংলায় বলে—কত দেওয়া উচিত?

আমি বলি—ওদের দিদিকে জিজ্ঞেস করো।

—না। জয় আপত্তি করে। সে বলে—আমি পাঁচটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

সে তাই করে। পকেট থেকে একখানি পাঁচটাকার নোট বের করে সে কিশোরীর হাতে দিয়ে দেয়। কিশোরী দিদির দিকে তাকায়।

—ওয়াপস দে দে! এই প্রথম সে কথা বলল।

আমরা তার দিকে তাকাই। সে অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলে—বাবুজি, আমরা গাঁয়ের গরীব মানুষ। আমাদের কিই বা আছে? আপনারা পরদেশী পথিক, আপনাদের ভুখ লেগেছে, তাই ক'টা ভুট্টা খেতে দিয়েছি। তার জন্য রূপেয়া দিচ্ছেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। কারণ এই আতিথেয়তা, এই প্রীতি, এতো টাকা দিয়ে কেনা যায় না। অতএব চুপ করে থাকি। জয় কেবল নীরবে হাত পেতে নোটখানি ফেরত নেয়।

দিদি খুশি হয়। আমাদেরও মান বাঁচে, ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিতে চাই। পারি না। দিদি আবার বলে—আমাদের ক্ষেতে অনেক কুমড়ো ফলেছে, আপনারা নিয়ে যাবেন নাকি গোটা দুয়েক? রান্না করে সবাই মিলে সবজি খাবেন।

—পেলে তো ভালই হয়। শৈলেশ বলে।

—তাহলে একটু দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি। বলেই বোনকে নিয়ে সে ক্ষেতে ঢুকে যায়।

ভাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু বাদে ছোটো দুটি মিষ্টি কুমড়ো নিয়ে ওরা ফিরে আসে। জয় কুমড়োদুটি তার রুক্‌স্যাকে ভরে নেয়।

তারপরে ওদের ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি।

দিদি বলে—ফেরার পথে সবাইকে নিয়ে আসবেন! বাবা থাকবেন, চা খেয়ে যাবেন।

আমরা ভুট্টা খেতে খেতে মাথা নাড়ি। এগিয়ে চলি। চলতে চলতে ভাবি—এমন সহজ সরল ও মধুর আতিথেয়তা কি সমতলে পাওয়া যায়? বোধকরি না। কিন্তু কেন? এদের জীবনেও তো সমস্যা কিছু কম নয়। তবু এরা এমন সরল আর উদার রয়েছে কেমন করে? একি হিমালয়ের প্রভাব? হবে হয়তো।

ভুট্টাগুলি ভারী মিষ্টি। ঠিক যেন এই ছেলে-মেয়েদেরই মতো। মনে মনে বার বার ওদের আশীর্বাদ করি। জীবনদেবতাকে বলি- ওদের জীবনও এই ভুট্টার মতই মিষ্টি হোক্। ওরা যেন এমনি মন নিয়েই জীবন কাটাতে পারে।

এখন বেলা তিনটে। যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হোল। বৃষ্টি নামল। কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। জয় শৈলেশ ও রঞ্জুর 'হুড' দেওয়া 'উইণ্ডচীটার' গায়ে রয়েছে। ওরা মাথা ঢেকে নেয়। আমি রুক্‌স্যাক্ থেকে 'ওয়াটার প্রুফ' নামিয়ে নিই।

ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়ে পথ চলা অসুবিধে। তবু চলতে হয়। উপায় কি?

বৃষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ হল না। আকাশ যতই মেঘলা হোক্, কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থেমে গেল। ভালই হল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। জোর কদমে এগিয়ে চলি।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় স্বর্গ হাতে পাই। দেখতে পাই সবাইকে। পথের পাশে একখানি বড় পাথরের নিচে দাঁড়িয়ে ওরা মগে করে কি যেন খাচ্ছে। শিবু পরিবেশন করছে। ঘোড়াগুলিও পথের পাশে গাছপালা চিবুচ্ছে। মালপত্র সব নামানো হয়েছে। তাহলে কি দোকানে খাবার না পেয়ে শিবু রান্না করে ফেলেছে?

কাছে আসতেই জগদীশ বলে—মগ বের করুন।

—খিচুরি রেঁধেছিস নাকি?

—না। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। রবিবাব বলে আজ পথের দোকানটাও বন্ধ। তাই তো এতটা ছুটে এসে একটু আগে ঘোড়াওয়ালাদের ধরতে পেরেছি। রান্না করার সময় কোথায়? শিবু বলে।

গোরা বলে—জল ও চিনি দিয়ে চিঁড়ে ও ছাতু মাখা হয়েছে, খানিকটা খেয়ে নিন।

হায় হরি! কোথায় হট্-লাঞ্চ্ আর কোথায় ঠাণ্ডাজলে চিঁড়ে ও ছাতুমাখা!

কিন্তু পেটের তাগিদে তাই গলাধঃকরণ করতে হল। তারপরে আবার শুরু করি পথচলা।

নেতা ও সহনেতা ছাড়া পর্বতারোহী সদস্যরা সবাই এগিয়ে গিয়েছে। গোরা ওদের সঙ্গে গেছে। ওরা রাতের আশ্রয় ঠিক করে রাখবে।

অমূল্য পেছনে আসছে। টুলটুল ওর সঙ্গে আছে। গৌতম রয়েছে আমাদের সঙ্গে।

চলতে চলতে দুজন গুর্জরের সঙ্গে দেখা হয়। দুজনেরই বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে চাপ দাঁড়ি ও মাথায় পাগড়ি। হিন্দী বলতে পারে। চিনি ও কেরসিন আনতে এখেলায় গিয়েছিল। কথায় কথায় বলে—আমরা পাঁচ ভাই। সবাই সাদি করেছি। একসঙ্গে থাকি। ছেলে-মেয়ে মিলে আমরা একচল্লিশ জন। আমাদের প্রায় হাজার খানেক ভেড়া-ছাগল,

আঠারটা গরু-বাছুর, পাঁচটা ঘোড়া ও চারটে কুকুর আছে।

—ঘোড়া দিয়ে কি করেন? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

বড়ভাই উত্তর দেয়— আমাদের মালপত্র অনেক। যেমন তাঁবু, জামাকাপড়, খাবার-দাবার। ঘোড়া সেসব বয়ে নিয়ে যায়। তাছাড়া বাচ্চা বুড়ো ও অসুস্থদের আমরা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেই।

কথায় কথায় আরও অনেক কথা বলে ওরা—আমরা মে মাসে জম্মু থেকে পাহাড়ে রওনা হই। আপনারা যেখানে যাচ্ছেন, আমরাও সেই সোনামার্গী অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল কাটাই। এখন নিচে নেমে যাচ্ছি। দুধ-ঘোল, ঘি-মাখন, ও পশম বিক্রি করেই আমরা বেঁচে আছি।

হাঁটতে হাঁটতে ওদের শিবিরে এসে পৌঁছই। পথের পাশে একটি নাতিপ্রশস্ত সমতল প্রান্তরে তাঁবু ফেলেছে ওরা। আমাদের দেখে সবাই কাজ ফেলে ছুটে আসে। ছোটরা মিঠা চায়, বড়রা ওষুধ। অতএব রঞ্জু বিপদে পড়ে। মিঠা অর্থাৎ লজেন্সের ব্যাপারে আমরা ওর শরিক হই। রুক্‌স্যাক্‌ কুড়িয়ে যা পাওয়া যায়, তাই পরিবেশন করি। কিন্তু ওষুধের ব্যাপারে আমরা ওকে কোন সাহায্যই করতে পারি না।

কোন সাহায্যের প্রয়োজনও হয় না রঞ্জুর। সে রোগী দেখতে শুরু করে দেয়। নানা রোগের রোগী। কারও চোখের অসুখ, কারও বুকের অসুখ, কারও বা গলার। কারও শ্বাসকষ্ট, কারও দাঁত ব্যথা, কারও বা ঘা হয়েছে। একটি যুবতী একটা হাড়সর্বস্ব শিশুকে কোলে নিয়ে রঞ্জুর সামনে এসে দাঁড়ায়। সে তাকে পরীক্ষা করতে লেগে যায়। জনৈকা বৃদ্ধা বলেন—ডগ্‌দারসাব, বাচ্চাটাকে একটু ভাল দাওয়াই দিয়ে দিন।

পরীক্ষা শেষে রঞ্জু বলে—এর ওষুধ আমার কাছে নেই। এর 'জন্ডিস' (কামলা) হয়েছে। তাড়াতাড়ি একে কিশ্‌তোয়ার নিয়ে যান। হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। দেরি হলে বাঁচাতে পারবেন না।

ওরা রঞ্জুর কথা শোনে, কিন্তু বলে না কিছুই। মুমূর্ষু মেয়েটির জন্য কারও তেমন আকুলতা চোখে পড়ে না আমার।

একটু বাদে আমরা বিদায় নিই গুর্জর পরিবারের কাছ থেকে। সেই রোগা মেয়েটা ছাড়া আর সবাইকে ওষুধ দিয়েছে রঞ্জু। তাই তার কথাই আমার মনে পড়ে বার বার।

ভাবি মেয়েটাকে কি কেউ কিশ্‌তোয়ার নিয়ে যাবে না?

বোধকরি না। কারণ গুর্জররা আজও পরিবার পরিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। এদের সন্তানসংখ্যা বড়ই বেশি। অতএব দু-একটা মরে গেলে কি এসে যায়?

বিকেল সাড়ে ছ'টার সময় আমরা সেওয়াবাতি এলাম। আশ্চর্য! উচ্চতা এখেলার সমান—৫৫০০ ফুট। তার মানে সারাবিকেল চড়াই ভাঙা বৃথা হল।

সেওয়াবতি ছোট গ্রাম। পথের পাশে দুটি চা ও খাবারের দোকান, আর নিচে পাহাড়ের ঢালে কয়েকটি ঘর নিয়ে গ্রাম। শুনেছি দোকানে দু-চারজন যাত্রীর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা যাতায়াতের পথে সাধারণত সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে দোকানেই রাত কাটায়। আমরা সংখ্যায় অনেক, সে সুযোগ নেই। আমাদের আজ তাঁবু ফেলতে হবে।

দোকানের সামনে আসতেই শিবু বেরিয়ে আসে। এখন আর ওর লজ্জার কিছু নেই। কারণ 'হট্‌-লাঞ্চ' না পেলেও হট্‌-ডিনার আমরা পাব।

শিবু আমার পিঠ থেকে রুক্‌স্যাক্‌ খুলে নিয়ে বলে—দোকানে বারান্দায় উঠে আসুন। চা বিস্কুট খেয়ে ঘরে চলে যান।

—ঘর! আজও কি আমরা ঘরে থাকতে পারব?

—হ্যাঁ। জগদীশ উত্তর দেয়। বলে—কালকের চেয়ে ভাল ঘরে।

—কোথায়?

—স্কুলে। গৌতম ইসারা করে ঘরখানি দেখায়।

সত্যই তাই। পথ থেকে সামান্য নিচে, বেশ বড একখানি ঘর। টিনের চাল ও কাঠের মেঝে, একপাশে প্রশস্ত খোলা বারান্দা।

খুশি হবার মতো ব্যাপারই বটে। জিজ্ঞেস করি—কত ভাড়া লাগবে?

—কিছু না। কেবল এই দোকান থেকে চা-বিস্কুট খেতে হবে আর কাল সকাল ন'টার আগে ঘর ছেড়ে দিতে হবে, স্কুল বসবে। শিবু উত্তর দেয়।

এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? অতএব খুশি হয়ে মাষ্টারসাবের চায়ের দোকানে উঠে আসি।

মাষ্টারসাবকে চা বানাতে বলে বাইরে তাকাই। এখনও সন্ধ্যে হতে কিছু দেরি আছে। ভালই হল দিনের আলোতেই দিনের পথচলা শেষ হোল। প্রথম দিনের পদযাত্রায় এগারো ঘণ্টা ধরে দুগর্ম পথ পাড়ি দিলাম। হোক্‌গে, এখন তো বিশ্রাম। শুধু তাই নয় আজও ঘরে রাত্রিবাস করতে পারব।

সুখের ভাবনা শেষ হবার আগেই মাষ্টারসাব গরম চায়ের গ্লাশটা এগিয়ে ধরেন। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করি।

॥ পাচ ॥

আজ আরেকটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেত। আজ মাত্র ৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। পথও নাকি কালকের চেয়ে ভাল। অমূল্য বলেছে, আটটায় রওনা হবে।

তবু ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখি—ছটা বাজতে দশ। স্লীপিং-ব্যাগের জীপ খুলে উঠে বসি। সকালে ঘুম ভেঙে গেলে আমি আর শুয়ে থাকতে পারি না।

দু'খানি ঘর আর তার লাগোয়া বেশ চওড়া বারান্দা নিয়ে সেওয়াবাতি গ্রামের এই প্রাইমারী স্কুল। মাষ্টারসাব সামনের ঘর ও বারান্দাটি আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণতঃ বড় দল হলে তিনি নাকি তাঁদের এখানে আশ্রয় দান করে থাকেন। দু-চারজনের দল হলে দোকানেই থাকতে পারেন।

ঘরখানি আকারে মাঝারী। কাঠের মেঝে। এককোণে একটা ফায়ারপ্লেস। আমাদের অবশ্য আগুন জ্বালাবার দরকার হয় নি। কারণ হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে অবস্থিত হলেও সেওয়াবাতির উচ্চতা মাত্র ৫৫০০ ফুট এবং এখনো শীত পড়ে নি।

ঘরে কোনমতে বারোখানি স্লীপিং-ব্যাগ পাতা গিয়েছে। তাই একঘরে সদস্যরা সবাই শুতে পেরেছি। শীত কম। স্লীপিং-ব্যাগ তোষক ও লেপ দুয়েরই কাজ করেছে। ম্যাট্রেস পাতার দরকার হয় নি।

বারান্দাটি বেশ বড়। তিনদিক খোলা। তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। একপাশে

মালপত্র রেখে আরেকপাশে রান্না-খাওয়া হয়েছে। খাবার পরে সেখানেই শেরপা ও মালবাহকরা শুয়ে পড়েছে।

স্কুল-বাড়িটির অবস্থানও ভারী সুন্দর। ওপরে পথ, নিচে নদী। পথ মানে সোন্দারের পথ আর নদী মানে চেনাব। দিনের আলো নিবে আসতেই পথ ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু চেনাব রয়েছে জেগে। সে যে অনন্তকালের ক্লান্তিহীন গায়ক। তার কলগান শুনতে শুনতে কালরাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। আজ সকালে সেই সামগান শুনেই ঘুম ভেঙেছে আমার।

কিন্তু থাকগে, এসব ভাবনা আর নয়। ঘুম যখন ভেঙে গেল, তখন রসিদ ব্রাদার্সকে ডেকে তুলে চায়ের ব্যবস্থা করা যাক। গরম চায়ের মগ মুখের সামনে এগিয়ে না ধরলে বাবুরা স্লীপিং-ব্যাগের মায়া ছাড়বেন না। গতকাল সকালেও শ্যামা চা এনে সবার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে।

দু-বার ডাক দিতেই দু-ভাই উঠে বসে। বলি—মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দাও। সাবলোগদের চা পিলাও।

ওরা মাথা নেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। আমিও বরং প্রাতঃকৃত্য সেরে আসি। রসিদ ব্রাদার্স স্টোভ জ্বালাতে জানে। শুধু তাই নয়, কাল সন্ধ্যায় বড়-রসিদ পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়েছে। তাদের বাড়িতেও নাকি 'গ্যাসবাত্তি' আছে। এরা পেট্রোম্যাক্স-কে গ্যাসবাতি বলে।

হিমালয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করার একটা অলিখিত নিয়ম আছে। এখানে তো জমাদার নেই। সুতরাং জনপদটি যাতে অপরিষ্কার না হয়ে যায়, নদীর জল যাতে দূষিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।

প্রথমে তাই পাথর ডিঙ্গিয়ে নেমে আসি নদীর তীরে। তারপরে আবার পাথরের পর পাথর পার হয়ে নিচের দিকে নেমে চলি। চলতে চলতে নদীকে দেখি। চলা বন্ধ হয়ে যায়, চোখ ফেরাতে পারি না।

সংসারে সচলের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক সুমধুর নয়। সাধারণতঃ যারা অচল অচঞ্চল ও স্থির, তারাই অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। হিমালয় অচল, তাজমহল অচঞ্চল, ফুলদল স্থির। কিন্তু নদী এই নিয়মের ব্যতিক্রম। চেনাবও সচল, শুধু সচল নয় অতিশয় বেগবতী, সে দুর্বার। তবু সে সুন্দর, অনিন্দ্যসুন্দর। আমি এই সীমাহীন সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছি।

তাও তো সবে সকাল। এখনও সোনালী রোদ এসে আছাড় খেয়ে পড়ে নি চেনাবের বুকে, ওপারের রঙ্গীন পাথরে আর এপারের রঙ্গীন ক্ষেতে। তখন যে সে আরও রমণীয় হয়ে উঠবে।

আস্তানায় ফিরে এসে দেখি রসিদ ব্রাদার্স চা বানিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, আমার জন্য আধমগ লিকার রেখে দিয়ে তারপরে চায়ে দুধ মিশিয়েছে। গতকাল ওরা লক্ষ্য করেছে, আমি চায়ে দুধ খাই না।

নেতার নির্দেশ ছিল সকাল আটটায় 'মার্চ' করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়ে আটটা বেজে গেল। নেতার সঙ্গে উঠে এলাম পথে। শেরপা ও মালবাহকরা এগিয়ে গেল। আমরা বিদায় নিলাম মাষ্টারসাব ও উপস্থিত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। আশ্চর্যের ব্যাপার মাষ্টারসাব চা-বিস্কুটের দাম নিলেন না। বললেন—ফেরার সময় চা খেয়ে একসঙ্গে দিয়ে যাবেন।

কি বিস্ময়কর বিশ্বাস! তাই এরা এত সুখী। সংসারে সুখ-শান্তি সচ্ছলতার ওপর নির্ভরশীল নয়।

শিবু তপন জগদীশ ও গৌতম রওনা হতে পারল না। ওরা ঘোড়ার পিঠে মালপত্র তুলে দিয়ে তারপরে রওনা হবে। মালপত্রের তদারকি পদযাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবং এ কাজটি সর্বদা নিজেদের করতে হয়। তাও তো এবারে আমরা মালপত্র খুবই কম এনেছি। আগামীকাল থেকে এই হাঙ্গামা আরও বাড়বে। সোন্দারের পরে আর ঘোড়া যাবার পথ নেই। তাই ঘোড়ার পরিবর্তে মালবাহক নিতে হবে। ছ'টি ঘোড়ার বদলে অন্তত পনেরজন মানুষ। তাদের সবাইকে সমান ওজনের মাল দিতে হবে। কাজটি সহজ নয়। তাছাড়া ঘোড়ার 'শির দরদ' হয় না, 'বুক ধড়ফড়' করে না, এবং সে মানুষের চেয়ে বেশি কথা শোনে।

যাক্ গে আগামীকালের কথা, এবারে আজকের কথা হোক। সামনের পথটিকে দেখা যাক্। দোকানদুটি পথের পাশে গ্রামের সীমারেখা। আর গ্রাম ছাড়িয়েই ছায়াপথ। এখন অবশ্য ছায়া না হলেও চলত। কারণ সবে রোদ উঠেছে।

পথের এই গাছে ছাওয়া অংশটি কিন্তু ভারী ভাল লাগছে। ডানদিকের পাহাড়ে ও পথের পাশে বড় বড় গাছ। গাছগুলি যেন পথের ওপর চন্দ্রাতপ বিছিয়ে দিয়েছে, প্রাকৃতিক চন্দ্রাতপ। পথের এই অংশটুকু মোটামুটি সমতল ও সোজা। আমরা প্রায় নদীর বেলাভূমিতে নেমে এসেছি। নদীর তীরে তীরে পথ চলেছি, আর দেখছি। দেখছি ঐ পাহাড় এই নদী আর বনপথ। মনে হচ্ছে এ বুঝি বা মাটির পৃথিবী নয়, স্বপ্নমধুর স্বর্গভূমি।

কৃষ্ণ বলে—আজ তো মাত্র ৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। তাড়াহুড়া করার কোন দরকার নেই। আসুন না একটু বসা যাক এখানে।

—কিন্তু লীডার যে টুলটুলকে নিয়ে এগিয়ে গেল! জয় আপত্তি করে।

শৈলেশ বলে—যাক্ না, লীডারের পায়ে ব্যথা। আমরা ওকে ধরে ফেলব। তাছাড়া লীডারের সঙ্গে টুলটুল রয়েছে। জায়গাটি সত্যি ভারী সুন্দর। আসুন, একটু বসা যাক।

গোরা আর রঞ্জুও সমর্থন করে তাকে। অতএব একটা গাছের গোড়ায় বসে পড়ি। ওরাও বসে।

বসে বসে দেখি আর দেখি। প্রাণময় প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। ভাবি তাঁদের কথা, যাঁরা আমাদের এই আনন্দের অংশীদার হয়েছে।

তাঁদের কথা ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে চলি। সেকালে সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে যেসব বৃটিশ অফিসার এসব অঞ্চলে আসা-যাওয়া করেছেন তাঁদের কথা থাক। কেবল পর্বতারোহণের জন্য যাঁরা এইপথে এসেছেন, তাঁদের কথাই মনে করা যাক। যতদূর জানি এ অঞ্চলে প্রথম পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়ে ১৯৪৭ সালে। ঐ বছর লুডউইগ ক্রেনেক (Ludwig Crenek) ও ফ্রিট্জ কোব (Fritz Kolb) নামে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছাত্র কিশ্তোয়ার হিমালয়ের দুর্গম পথে আর দুস্তর হিমবাহে প্রথম পদপরিক্রমা করলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন পাঁচ থেকে সাড়ে ছ'হাজার মিটার উঁচু অনেকগুলি অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গ রয়েছে হিমালয়ের এই অবহেলিত অংশে। বুঝতে পারলেন, তখনও সার্ভে অব ইণ্ডিয়া এ অঞ্চলের সঠিক মানচিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হন নি।

অভিযাত্রীরা ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মা পর্বতগোষ্ঠীর হিমাঙ্গনে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পেরে ওঠেন নি। তবে তাঁরা দূর থেকে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কোব এই গিরিশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম রাখলেন সিক্‌ল মুন (Sickle Moon)। ২১,৬৮৬ ফুট উঁচু সেই শৃঙ্গটি আজ ঐ নামে পরিচিত।

তাঁদের পরে কোন অনিবার্য কারণে বহুবছর এপথে আর কোন পর্বতাভিযাত্রী পদচারণা করেন নি। এ অঞ্চলে পরবর্তী পর্বতাভিযান পরিচালিত হয় ১৯'৪৫ সালে। ডঃ চার্লস ক্লার্ক (Charles Clarke) সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ক্লার্ক কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের প্রেমে পড়ে যান। তাই ১৯৪১ ও ১৯৪৪ সালেও তিনি এই অঞ্চলে দুটি পর্বতাভিযান পরিচালনা করেন। তিনিই ব্রহ্মলোকের প্রকৃত আবিষ্কারক। তিনি ব্রহ্মা শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি কিন্তু ব্রহ্মা পর্বতের প্রতিবেশী কয়েকটি অনামী শিখরে আরোহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ক্লার্ক কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের প্রথম সমীক্ষক। তাঁর ফটো দেখে ও বিবরণ পাঠ করে পরবর্তীকালের পর্বতারোহীরা এ অঞ্চলে আসতে শুরু করেছেন।

ডঃ ক্লার্ক অঞ্চলের অনেকগুলি অনামী শিখরের নামকরণ করেছেন। তার মধ্যে আইগার (Eiger) ও ক্যাথিড্রেল (Cathedral) শৃঙ্গদুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দুটির উচ্চতা যথাক্রমে ১৯,৬৮৫ ও ১৮,২০৯ ফুট।

আবার তাঁর ব্রহ্মা পর্বতাভিযানের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। ডঃ ক্লার্ক ও তাঁর সহযাত্রীরা তিনবার ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের চেষ্টা করেছেন। কারণ ব্রহ্মা-১ এ অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্বতশিখর। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের তিনটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তাহলেও সে ব্যর্থতা গৌরবময়। কারণ তৃতীয়বার তাঁরা দুরারোহ ব্রহ্মা-১ শিখরের মাত্র কয়েক শ' ফুটের মধ্যে পৌঁচেছিলেন। কিন্তু শিখরশিরায় অত্যধিক তুষার সঞ্চয়ের জন্য তাঁদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ডঃ ক্লার্ক কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়কে পর্বতারোহণের আদর্শক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ব্রহ্মা অভিযানের রোমাঞ্চকর বিবরণে আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪৭ সালেই একদল জাপানী পর্বতারোহী ব্রহ্মা পর্বতাভিযানে আসেন। তাঁরা উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা ধরে শিখরারোহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিযানকালে এক দুর্ঘটনায় দুজন অভিযাত্রীর অকাল মৃত্যুর জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের পর্বতাভিযান পরিত্যক্ত হয়।

বিয়োগ কিংবা ব্যর্থতা কোনদিন হিমালয়-অভিযাত্রীদের অবসন্ন করে তুলতে পারে নি। আর্ভিন ও ম্যালোরীর মহান স্মৃতি তেনজিং ও হিলারীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অনিমাদি, অমর, গৌরাঙ্গ, সুজয়া ও অসিত প্রতিনিয়ত আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।*

তাই দুবছর বাদে ১৯৪১ সালে বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী ক্রিস বনিংটন এলেন এখানে। সহযাত্রী নিক্‌ এস্টকোর্ট (Nick Estcourt) -এর সঙ্গে ২৪শে অগাস্ট তিনি ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেন। তিনিও কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়কে পর্বতারোহণের উপযোগী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়—'The area had the singular

attraction of having a host of attractive rock and snow peaks of between 18,000 and 21,500 ft, not one of which had been climbed.'**

বনিংটনের বিবরণে উৎসাহিত হয়েই আমাদের সদস্যরা এ অঞ্চলে এসেছে এবং এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কথা এখন থাক, পূর্বসূরীদের স্মৃতিচারণ করা যাক।

ক্রিস বনিংটনের পরে এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য অভিযান আয়োজিত হয় ১৯৪৫ সালে। এবং এটি সম্ভবতঃ কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযান। ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর এই অভিযানের আয়োজন করেছেন। ছাব্বিশজন সদস্যের সেই অভিযাত্রীদের নেতৃত্ব করেছেন লেঃ কর্ণেল ডি. এন. টংখা।

অভিযানের সদস্য শেরিং নরবু ও নিমা দোরজি ৫ই অক্টোবর কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ২১,৬৮৬ ফুট উঁচু সিক্‌ল মুন শিখরে ভারতের জাতীয়পতাকা প্রোথিত করেন।

পরের বছর আবার কয়েকজন বৃটিশ পর্বতারোহী এ অঞ্চলে আসেন। ডঃ ক্লার্ক ও ক্রিস বনিংটনের বিবরণ পাঠ করে তাঁরাও এই সিদ্ধান্তে উপণীত হন যে, 'The area has been recognised as very suitable for small parties, and every year sees numerous light expeditions (including many Japanese) in the area.'

কেল্‌ভিন টোর‍্যান্‌স (Calvin Torrans), ক্লেয়ার শেরিড্যান (Clare Sheridan) ও সে বিলেন (Se Billane) নামে তিনজন অভিযাত্রী জুলাই-অগাস্ট মাসে 'আইগার' (১৯,৬৮৫´) এবং 'ক্যাথিড্রেল' (১৮,২০৯´) শিখরের পথসমীক্ষা সম্পূর্ণ করে যান।

দুর্ভাগ্যের কথা অভিযানের আয়োজন করার সময় এপ্রিল মাসে (১৯৪৭) এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিলেন মারা গেলেন। সুযোগ্য সহযাত্রীরা কিন্তু বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে মুষড়ে পড়লেন না। বরং তাঁরা তাঁর স্মৃতিকে অমর করে তুলতে দ্বিগুণ উৎসাহে অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন।

যাই হোক সাতাত্তর সালের জুন মাসে অভিযাত্রীরা ভারতে এলেন। কেল্‌ভিন টোর‍্যান্‌স এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। দলের অন্যান্য অভিযাত্রীরা হলেন এমেট্‌ গোল্ডিং (Emmett Goulding), এন্টনী লেঠ্যাম (Anthony Latham), জস্‌ লিন্যাম (Joss Lynam) এবং শেরিড্যান। ভারত সরকার অভিযাত্রীদের খুবই সাহায্য করেছেন। ক্যাপ্টেন আই. পি. সিং নামে প্রতিরক্ষা দপ্তরের জনৈক পর্বতারোহীকে তাঁরা সংযোগাধিকারিক (Liason Officer) রূপে তাঁদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁরা ৫ই জুন দিল্লী থেকে রওনা হয়ে ২২শে জুন ক্যাথিড্রেল শিখরে আরোহণ করেন।

পর্বতারোহণের প্রেক্ষাপটে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয় সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্যটি মনে রাখার মতো। তাঁরা বলেছেন—"The scale of the mountains is not large, by Himalayan standards, but they are technically difficult. The rock is mostly a compact gneiss, not well endowed with holds. The Valleys are mostly narrow and deeply cut. The glaciers.....are quite large, and descend to about

4000m. In their lower stretches they offer the usual Himalayan purgatory of moraine mounds."

ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে আরও একদল বিদেশী অভিযাত্রী ও অঞ্চলে এসেছেন। তাঁরা আসেন সেপ্টেম্বর মাসে। কার্লাইল মাউন্টেনীয়ারিং ক্লাব এই অভিযানের আয়োজন করেছেন। স্টুয়ার্ট হেপ্‌হার্ণ (Stuart Hephurn) -এর নেতৃত্বে ছ'জনের এই অভিযাত্রীদল ৭ই অক্টোবর কিয়ার নালার উত্তরে ২০,৯৭০ ফুট উঁচু একটি অনামী শিখরে আরোহণ করেন।

—নমস্তে সাব!

আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। একজন পাহাড়ী মানুষ আমাদের নমস্কার করছে। তার সঙ্গে দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। বড়টি ও ছোটটি মেয়ে। বড়টির বয়স বারো ও ছোটটির বছর চারেক। ছেলে দুটি মাঝখানে।

আমি এদের চিনতে পারি না, চিনতে পারে না ওরাও—জগদীশ কৃষ্ণ ও তপন। আজ ওরা আর এগিয়ে যায় নি। কি করবে এগিয়ে? আজ যে মাত্র ৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। গত দু' ঘন্টায় তার অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি।

পর্বতারোহীরা চিনতে না পারলেও, পাহাড়ী ছেলে-মেয়েরা ভুল করে নি। বড় মেয়েটি কৃষ্ণকে দেখিয়ে নিজেদের ভাষায় কি যেন বলে তার বাবাকে। বাবা হাতজোড় করে এগিয়ে যায় কৃষ্ণের সামনে। তারপরে সবিনয়ে হিন্দীতে বলে—সাব্, এটাই দারসী গ্রাম। আমার নাম মোক্তার আহমেদ। আমি মারোয়া তহসিল অফিসে পিওনের কাজ করি।

—মারোয়া...

—জী। এখান থেকে ৪২ কিলোমিটার। সেখান থেকে অনন্তনাগ ও লাদাখের পথ আছে।

একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে—সাব্, গতবছর আপনারা আমার বাড়ি গিয়েছিলেন, ফটো তুলেছিলেন। ঐ যে সামনে আমার বাড়ি।

সে হাত দিয়ে নালার ওপারে পথের বাঁদিকে বাড়িটা দেখায়।

এবারে মনে পড়ে ওদের। কৃষ্ণ বলে—হ্যাঁ, গতবছর। আমরা আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম।

শুধু তার নয়, জগদীশ আর তপনেরও মনে পড়েছে এই পাহাড়ী পরিবারটির কথা।

তপন বলে—আমরা সেদিন খুবই ক্লান্ত। একটু জিরিয়ে নেবার জন্য আপনার ঘরের সামনে বসে পড়েছিলাম। আপনার ছেলে ও ছোট মেয়েটি আমাদের দেখতে পেয়ে আপনার স্ত্রীকে মানে আমাদের বহিনজীকে ডেকে নিয়ে আসে।...

—বহিনজী একরকম জোর করেই আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। তপনের কথা কেড়ে নিয়ে জগদীশ বলতে শুরু করে দেয়—পরিচয় হল আপনার সঙ্গে, পরিচয় হল আপনার ভাঁইদের সঙ্গে। আপনি গাছ থেকে আবু (আপেল) পেড়ে নিয়ে এলেন। বহিনজী আমাদের চা বানিয়ে দিলেন।

জগদীশ থামতেই কৃষ্ণ আবার বলে—ভালই হল তখনও আপনি ছুটিতে ছিলেন, এখনও বাড়িতে রয়েছেন। তা বহিনজী ভাল আছেন নিশ্চয়ই?

সহসা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে বড় মেয়েটি। ছেলে আর ছোট মেয়েটাও কাঁদতে

শুরু করে দেয়। মোস্তারের চোখ দুটিও সজল হয়ে উঠেছে। সে চোখ মোছে।

আমরা অপ্রস্তুত, আমরা বিভ্রান্ত। ওরা কাঁদছে কেন? কি হয়েছে বহিনজীর?

কিন্তু কেউ সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারি না নীরবে। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি।

একটু বাদে আবার চোখ মোছে মোস্তার। তারপরে কান্না মেশানো স্বরে কোনমতে বলে—সাব, আপনাদের বহিনজী আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে? কোথায়? এতটুকু মেয়েকে ফেলে, স্বামীর সংসার ছেড়ে কোথায় গেছেন বহিনজী? তবে শুনছি পাহাড়ী সমাজে নাকি এমন হামেশাই হয়।

কিন্তু সেকথাও জিজ্ঞেস করতে পারি না কেউ। কোন কথাই বলতে পারি না আমরা। ছেলে-মেয়েদের কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এই পাহাড়ী পথে। আমরা চুপ করে থাকি। হিমালয়ের পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে সেই অসহায় আর্তনাদ আমার আত্মাকে শুধু অস্থির করে তুলছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মোস্তার আবার বলে—আটমাস হ'ল সে আমাদের ছেড়ে গেছে। আমি তখন মারোয়াতে ডিউটি করছিলাম। তার অসুখের খবর পেয়ে ছুটে এলাম। ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হয়েছিল। কি করব সাব! এখানে তো ডাক্তার নেই! তখন ডিসেম্বর মাস, বরফ পড়ে পথ বন্ধ। তাই তাকে কিশ্‌তোয়ার নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। সাব, চোখের সামনে সে বিনা চিকিসিায় মরে গেল।...

আর কিছু বলতে পারে না মোস্তার। তার কণ্ঠস্বর রূদ্ধ হয়ে গেল।

আমরাই বা কি বলব? আমাদের স্নেহময়ী বহিনজী বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন। কিন্তু এমন শত শত ঘটনা এদেশে প্রতিদিন ঘটছে, তবু যে এর সান্ত্বনার ভাষা আজও শেখা হয়ে ওঠে নি আমাদের। অতএব চুপ করে থাকি।

একটু বাদে আমরা ওদের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছই। এক বছর আগে তপনরা এই বাড়িতে বসে বহিনজীর বানিয়ে দেওয়া চা খেয়ে গেছে।

হাতজোড় করে মোস্তার বলে—সাব্ আজ সে নেই। কে আর আপনাদের আদর-যত্ন করবে? তবু যদি দয়া করে একটিবার পায়ের ধুলো দেন, তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

আমি তাকে দেখি নি, তবু সে যে আমারও বোন, হিমালয়ের বোন। আর তাই আমি চেতনাহত। ওদের সঙ্গে নীরবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি বহিনজীর ঘরে।

ভাইদের যৌথ সংসার। ইতিমধ্যে মোস্তারের ভাইরা আমাদের বসার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এমনকি কতগুলো আপেল পর্যন্ত এনে রেখেছে।

মোস্তার বড় মেয়েকে বলে—চাচীদের চায় বানাতে বল!

আমরা তাকে বাধা দিতে পারি না। কয়েক মিনিট বাদে চা আসে। আমরা চায়ের গেলাস হাতে তুলে নিই।

মোস্তার বলে—আমাকে পড়ে থাকতে হয় সেই মারোয়াতে। ছেলে-মেয়েরা এখানেই আছে চাচা-চাচীদের কাছে।

ছোট মেয়েটা বাবার গা ঘেসে দাঁড়িয়েছিল। কি যেন সে বলে বাবাকে। বাবা মাথা নাড়ে। আমি তাকিয়ে থাকি অবুঝ মেয়েটার মুখের দিকে। মাতৃহীনা, অসহায়, তবু মুখখানি ভার মিষ্টি। বড্ড মায়া হচ্ছে মেয়েটাকে দেখে।

মোস্তার কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে—আমাদের তসবির এনেছেন সাব?

তসবির মানে ফটো। কার ফটো।

কৃষ্ণ যেন চমকে ওঠে। শুধু কৃষ্ণ নয়, তার সঙ্গে জগদীশ আর তপন। ওদের দিকে তাকাই। ওরা মাথা নিচু করে।

একটু বাদে কৃষ্ণ কোনমতে ঢোক গিয়ে জবাব দেয়—না, সত্যি বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

—আপনারা তো বলে গিয়েছিলেন, তসবির পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা পর্যন্ত নিয়েছিলেন। বড় মেয়েটি কথা বলে এতক্ষণে। তার কথায় স্পষ্ট অভিযোগ।

তপনরা মাথা নিচু করে নীরব থাকে। তাছাড়া কিই বা করবে? আন্তরিক আতিথেয়তার মুগ্ধ হয়ে পর্বতারোহীরা এই পাহাড়ী পরিবারের ফটো তুলেছিল, বলেছিল কলকাতায় ফিরে সেই স্মারক পাঠিয়ে দেবে। যথারীতি তারা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে নি।

—ওর মধ্যে আমাদের মায়ের তসবির আছে সাব! বড় মেয়েটি আবার বলে।

কৃষ্ণ মাথা নাড়ে।

মোক্তার বলে—সাব, আমরা অনেকদিন আপনাদের চিঠির পথ চেয়েছিলাম। আমার স্ত্রীও বলত তসবিরের কথা। তারপরে সে হঠাৎ চলে গেল। তার তো কোন তসবির নেই। আমিও আপনাদের ঠিকানা জানি না যে চিঠি লিখব। আজ দূর থেকে দেখতে পেয়ে আমার এই ছোট মেয়েটিও চিনতে পেরেছে আপনাকে। তখন তার কি আনন্দ, আপনি ওর মায়ের তসবির নিয়ে এসেছেন।

জগদীশ জবাবদিহি করে—সত্যি বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আর ভুল হবে না, এবারে কলকাতায় ফিরে গিয়েই বহিনজীর ছবি পাঠিয়ে দেব।

কৃষ্ণ আবার ওদের ঠিকানা নেয়, রঞ্জু কিছু ওষুধ দেয়। ওষুধগুলো হাতে নিয়ে বড় মেয়েটা আবার কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—এই দাওয়াই তখন পেলে, মা আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারত না।

নতমস্তকে বেরিয়ে আসি পথে। ওরা দাঁড়িয়ে থাকে দাওয়ায়। আমরা এগিয়ে চলি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কি ভাবছে জানি না। কিন্তু জানি ওরা এবারেও কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করেছে। ওরা যে হিমালয়ের সরল মানুষ।

আর আমরা? আমরা কি আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করব?

কিংবা এবারেও হিমালয় থেকে ঘরে ফিরে এই ফুলের মতো সুন্দর মাতৃহারা সন্তানদের আকুল আকাঙ্খার কথা বিস্মৃত হয়ে যাবো?

গ্রাম ছাড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ চড়াই ভাঙতে হল। তারপরে আবার একফালি সমতল পাওয়া গেল। পথের প্রকৃতি কালকের মতই। কেবল তার চেয়ে কিছু কম কষ্টকর। ডানদিকে তেমনি বনময় পাহাড়। বাঁদিকে অনেকটা নিচে চেনাব। ওপারে তেমনি মসৃণ পাথরের রঙ্গীন প্রাচীর, নদীর বুক থেকে খাড়া ওপরে উঠে গিয়েছে।

পথের পাশে পাশে নানা রঙের ফুলের বাহার। তারা হাওয়ায় দুলছে। ভারী ভাল লাগছে।

আজও মাঝে মাঝে গুর্জরদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এঁরাও ভেড়া-ছাগল গরু-ঘোড়া নিয়ে সপরিবারে নেমে যাচ্ছেন নিচে। যাবেন জম্মু পর্যন্ত। প্রায় সোয়া তিন শ' কিলোমিটার পদযাত্রা শেষ করতে মাস দুয়েক লেগে যাবে। অর্থাৎ এঁরা নভেম্বরের মাঝামাঝি জম্মু পৌঁছবেন। তারপরে আবার মে মাসে শুরু হবে এঁদের হিমালয় যাত্রা।

আগেই বলেছি এঁরা চোদ্দ/পনেরো হাজার ফুট উঁচু হিমবাহ অঞ্চলে গিয়ে পশুপালন করেন। তিন-চার মাস সপরিবারে বাস করেন সেখানে। কেউ তাঁবু ফেলেন, কেউ গুহায়, কেউবা পাথরের আড়ালে আস্তানা করেন। আবার কেউ কেউ হিমবাহ কিংবা বুগিয়ালে (উচ্চ হিমালয়ের তৃণভূমি) পাথরের ঘর বানিয়ে নেন। পরের বছর ফিরে এসে আবার একই জায়গায় বাস করেন।

এঁরা ভারতের নাগরিক। কিন্তু সরকার এঁদের কোন সাহায্যই করেন না। তবে এঁরা যাতে জায়গা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি না করেন, তাই এঁদের বসবাসের অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য সেখানে কোন 'চেকিং' কিংবা জরিমানার ব্যবস্থা নেই। থাকবে কেমন করে ? কোন্ অফিসার সেখানে যাবেন চেক্ করতে ? তবে এঁরা সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী বসবাস করেন। ফলে হিমালয়ে রক্তপাত হয় না।

আজ আর আমরা ওয়াটার বটলে জল ভরি নি। কারণ সমীক্ষায় আসা সদস্যরা সবাই বলেছে, আজ পথে জলের অভাব হবে না। সত্যি হয় নি। মাঝে মাঝেই ঝরণা কিংবা নালার জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে পারছি।

পথের পাশে ঝোপঝাড়ে যেমন রঙীন ফুল বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে সবুজ ভাঙ গাছ। আমরা বলছি, 'ভাঙ' কিন্তু ইংরেজ অভিযাত্রীরা লিখেছেন 'Marijuana'। নাম যাই হোক, মাঝে মাঝে আমরা দু-একটি পাতা ছিঁড়ে হাতে কচলে নাকের কাছে নিচ্ছি। শুনেছি ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয় কিন্তু ভাঙের গন্ধে তো ভাঙের নেশা হচ্ছে না!

আজও মাঝে মাঝে পথচারীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কেউ গাঁয়ের নারী-পুরুষ, কেউবা কিশ্‌তোয়ার যাচ্ছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকের প্রবল কৌতূহল আমাদের সম্পর্কে। আমরা কোথা থেকে এসেছি কোথায় চলেছি, কেন যাচ্ছি ? আরও অনেক প্রশ্ন। পর্বতারোহণের কথাটা উহ্য রেখে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি। বলা বাহুল্য কথাবার্তা সব হিন্দীতেই হচ্ছে। কিন্তু কেউ আমরা নির্ভুল হিন্দী বলছি না। কারণ আমাদের মতো এদেরও মাতৃভাষা হিন্দী নয়। এ অঞ্চলের ভাষার নাম কিশ্‌তোয়ারী। জম্মুর ডোগরা ভাষার সঙ্গে এ ভাষার কোন মিল নেই। এরাও উর্দু অক্ষরে লেখা-পড়া করে।

লেখাপড়ার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল কথাটা। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যসরকার স্থানীয় ভাষাকে সরকারী ভাষা করে 'অংরেজী হটাও' পাগলামীকে বাস্তবায়িত করে তুলেছেন। ফলে একদিকে যেমন জাতীয় সংহতির নাভিশ্বাস উঠেছে, তেমনি আন্তঃরাজ্য পর্যটনশিল্প বিপন্ন বোধ করছে। গতকাল এখেলায় এসে তাই বড় আনন্দ হয়েছিল। সেখানে বন-বিশ্রামগৃহের সামনে ইংরেজী সাইনবোর্ড। তাতে লেখা এ অঞ্চলটি সংরক্ষিত বনভূমি। এবং এই বনে নাকি বিভিন্ন জাতের হিংস্র শ্বাপদ রয়েছে। বনবিভাগ যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের মন্দভাগ্য, এখন পর্যন্ত তাদের কাউকে দর্শন করতে পারি নি।

না পারায় দুঃখের কিছু নেই। কারণ আমরা শিকার করতে আসি নি। তবু একবার বাঘমামা কিংবা ভালুকদাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কলকাতায় ফিরে রসিয়ে গল্প করা যেত।

বাঘ ভালুকের বদলে দেখেছি হরিণ ও বানর। শুনেছি এ অঞ্চলে প্রচুর বিষাক্ত সাপ রয়েছে। তাই পাতিমহলায় বাটসাহেব সাবধান করে বলেছেন—সোন্দার পর্যন্ত সন্ধ্যার

পরে আলো ছাড়া কেউ চলাচল করবেন না। প্রতিবছর কোন না কোন গ্রামে সাপের কামড়ে মানুষ মারা যায়।

কথাটা যে সত্যি তার প্রমাণও পেয়েছি। সেদিন বিকেলেই জঙ্গলে গিয়ে জগদীশ একটা গোখরো জাতীয় সাপ দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু আমরা আর কেউ এখন পর্যন্ত সাপের সাক্ষাৎ পাই নি। তবে মাঝে মাঝেই গিরগিটী জাতীয় ছোট-বড় সরীসৃপ দেখতে পাচ্ছি। গায়ে তাদের নানা রঙের বিচিত্র সমাবেশ। আর দেখছি বহু বর্ণের প্রজাপতি ও ছোট-বড় পাখি। পাখিদের যেমন গায়ের রং, তেমনি দেহের গড়ন। সত্যি চেয়ে থাকবার মতো। আমরা দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

পথের বাঁদিকে বাড়ি। বেশ বড় দোতলা বাড়ি। এটা কি কোন গ্রাম ? কিন্তু ওরা যে দারসীতে বলল পরের গ্রামটাই সোন্দার! তাহলে কি সোন্দার এসে গেল ?

তপন বলে—এদের ঠিকানাও সোন্দার। তবে এটা ঠিক সোন্দার উপত্যকা নয়। মূল সোন্দার গাঁয়ে পৌঁছতে আরও আধঘণ্টা হাঁটতে হবে।

ঘড়ি দেখি, বারোটা বাজতে পাঁচ। সাড়ে আটটায় রওনা হয়েছি। আজ পথে সামান্যই বিশ্রাম করেছি। তাহলেও আট কিলোমিটার পথ যেতে আমার চার ঘণ্টা লাগবেই।

বাড়িটার ঠিক আগে পথের পাশে প্রকাণ্ড একটা গুহা। বাড়ির লোকেরা সেটিকে ঢেঁকিঘরে রূপান্তরিত করেছে। প্রাকৃতিক অবদানের এমন কৃত্রিম ব্যবহার খুব কমই দেখেছি। তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি—দুজন মহিলা ঢেঁকিতে ধান ভানছে। শুনছি সোন্দার উপত্যকায় প্রচুর পাহাড়ী ধান হয়।

আমাদের দেখতে পেয়েই ওরা কাজ থামিয়ে দেয়। বয়স্কাটি জিজ্ঞেস করে—আপনারা কোথা থেকে আসছেন ভাইসাব, কোথায় যাচ্ছেন ?

রঞ্জু উত্তর দেয়।

শুনে খুশি হয় ওরা। ব্রহ্মাজীর কাছে আমাদের নির্বিঘ্ন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা জানায়।

ওদের ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি। ওরা ধান ভানতে থাকে, আমরা চড়াই ভাঙতে শুরু করি। বড় বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে-মেয়ে হাত নাড়ছে। আমরাও হাত নাড়ি।

সামনে উৎরাই। চমকে উঠি। উৎরাই মানে আবার চড়াই। কিন্তু করার কি ? এগিয়ে চলি।

একটু বাদেই কারণ বুঝতে পারি।

ডানদিকের পাহাড় থেকে একটা নদী নেমে এসে চেনাবে মিশেছে। নদীটা ছোট কিন্তু খুবই খরস্রোতা, পাহাড়ী নদী যেমন হয়।

নদী পার হতে হবে, তাই পথ নেমে এসেছে তীরে। এখানে দেখছি একটা ছোটঘরে পানিচাক্কি রয়েছে। দুটি মেয়ে মকাই ও রামদানা পিষছে। পানিচাক্কি মানে প্রাকৃতিক জলশক্তির সাহায্যে চালিত চাকি। সাধারণতঃ এসব কলে মালিক উপস্থিত থাকে না। থাকার দরকারও হয় না। যারা পিষতে আসে, তারা ঘরের কোণে রেখে দেওয়া একটি পাত্রে মালিকের মজুরি বাবদ খানিকটা ছাতু কিংবা আটা রেখে দিয়ে যায়। কেউ তাকে ফাঁকি দেয় না।

সাঁকোর সামনে এসে বুঝতে পারি, ওপারে যাবার কাজটি কোনমতেই সহজ নয়। কারণ পাশাপাশি দুটি পাইনগাছের টুকরো ফেলে সাঁকো তৈরি করা হয়েছিল। তার একটা টুকরো কেমন করে যেন ওপার থেকে নদীতে খসে পড়েছে। অর্থাৎ একটা গাছের ওপর দিয়ে ওপারে যেতে হবে এবং সে গাছটি মোটেই মোটা নয়। পাশে ধরবারও কোন ব্যবস্থা নেই। নিচে বিরাট বিরাট পাথরের ওপর দিয়ে দুর্বার বেগে জল বয়ে চলেছে। সাঁকো থেকে পড়ে গেলে আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাহলেও যেতে হবে ওপারে। ওপারে না পৌঁছুলে সোন্দার পৌঁছন যাবে না। আর যেতে যখন হবে, তখন সবার আগে আমার যাওয়াই ভাল। কিছু একটা হয়ে গেলে সহযাত্রীরা সাক্ষী হতে পারবে।

অতএব এগিয়ে চলি। ওরা সবাই পেছন থেকে সাবধান করছে। তার কিছু কানে আসছে আর কিছু নদীর গর্জনে হারিয়ে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু হারিয়ে গেলাম না। ব্যালান্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। একটা সরু পাইনগাছের ওপর দিয়ে বিক্ষুব্ধ নদীর অপর পারে পৌঁছলাম। ওরা ওপারে দাঁড়িয়ে সোচ্চার স্বরে আমাকে অভিনন্দিত করে। তারপরে একে একে সবাই সাঁকো পার হয়ে আসে।

সাঁকো থেকেই শুরু হয় চড়াই। তবে গতকালের মতো এবড়োখেবড়ো ঘামঝরানো খাড়া চড়াই নয়, মোটামুটি মসৃণ পথ। আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছে।

চড়াই শেষ করে ডানদিকে বাঁক ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে উন্মোচিত হল সীমাহীন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার।

কৃষ্ণ বলে—সোন্দার-সুয়েদ ভ্যালী, চেনাবের সবচেয়ে সুন্দর ও বড় উপত্যকা। এতবড় উপত্যকা হিমালয়ের অন্তরলোকে আপনি খুব কমই দেখেছেন।

ওর উক্তির সত্যতা বিচারের সময় এখন নয়। তাই আমি কোন কথা না বলে কেবল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি সেই সীমাহীন সৌন্দর্যলোকের দিকে।

না, আমি একা নই। আমার সঙ্গে রঞ্জুও বাক্যহারা। আমাদের আগে যারা এসেছে তাদেরও একই অবস্থা হয়েছে, আমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও একই অবস্থা হবে।

কিন্তু নিজেদের কথা থাক, এখন শুধু নীরবে সামনের সীমাহীন সৌন্দর্যকে উপভোগ করা যাক। আমি চেনাবের দিকে তাকাই। সে এখানে প্রায় সমতল প্রান্তরের বুক বেয়ে প্রবাহিত একটি আঁকাবাঁকা রূপোলী ধারা। তার দু-তীরের বেলাভূমিও সাদা। তারপরে সবুজ সোনালী ও লাল ক্ষেত। বাঁদিকের ক্ষেত ধাপে ধাপে ওপরে উঠে বনময় পাহাড়ে মিশেছে। আর ডানদিকে অর্থাৎ আমরা যে তীরে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে রঙীন ক্ষেতগুলি প্রায় সমতল প্রান্তর। সেই প্রান্তরের বুক চিরে আরও দুটি রূপোলী ধারা এসে চেনাবে মিশেছে। প্রথম পাহাড়ী নদীটির নাম কিবার নালা, দ্বিতীয়টি নাম্ছু নালা।

কিবারের বাঁতীরে সোন্দার গ্রাম আর দুই নদীর মাঝখানে উপত্যকায় সুয়েদগ্রাম। সুয়েদ ছাড়িয়ে নাম্ছু নালার ওপারে আরও খানিকটা হেঁটে গেলে আরেকটি নদীর সঙ্গে দেখা হবে। নাম তার কিয়ার নালা। সেও এসে চেনাবে মিশেছে। কিন্তু তাকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

না যাক, যা দেখা যাচ্ছে, তাই যে আমার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে। সুয়েদ ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে পাহাড়। না পাহাড় নয়, পাহাড়ের ঢেউ। সামনেরটি

সবুজ, পরেরটি কালো, তারপরেরটি ধূসর। আর শেষেরটি সাদা—তুষারাবৃত হিমালয়। তারই আকর্ষণে আজ আমার এখানে আসা।

কিন্তু তার কথা পরে হবে, এখন আজকের গন্তব্যস্থল সোন্দারকে দেখা যাক। সোন্দার শব্দটি বুঝি বা সুন্দরের রূপান্তর। এমন ছবির মতো সুন্দর গ্রাম খুব কমই দেখেছি। সুবিস্তৃত সমতলের বুক জুড়ে ক্ষেত আর সামান্য কয়েকটি বাড়ি-ঘর। বেশির ভাগ বাড়ি-ঘর পাহাড়ের গায়ে। সেখানেও ক্ষেত আছে। ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে ঘরগুলিকে ছবির মতো মনে হচ্ছে।

তাঁদের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, যাঁরা সেই সুদূর অতীতে এই দুর্গম পথ পেরিয়ে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আচ্ছা, তাঁরা কেন এসেছিলেন ? শুধুই কি ক্ষুধার তাড়নায়, না অন্য কোন আর্কষণ ছিল ? কিসের আকর্ষণ ? সুন্দরের না ঈশ্বরের ? যে কারণেই এসে থাকুন, তাঁরা নিশ্চয়ই সুন্দরের মাঝে পরমসুন্দরকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই প্রকৃতির শত আঘাতেও এই দেবভূমি পরিত্যাগ করেন নি। আর তা করেন নি বলেই একালে এই পথ তৈরি হয়েছে, যেপথে আমরা আজ পৌঁছতে পেরেছি এখানে, এই অপরূপ দেবলোকে।

শুধু সোন্দার নয়, এখান থেকে সুয়েদ গ্রামটিকেও দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি কিবারের পুল। ঐ পুল পেরিয়ে সুয়েদ যেতে হয়। সোন্দার থেকে সুয়েদ মাত্র ২ কিলোমিটার।

সুয়েদ ও অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গ্রাম। সেখানে পোস্টাপিস আছে। আছে একটি উষ্ণকুণ্ড ' একবার স্নান করতে পারলে পথের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যেত।

তাহলেও এখন আমরা সুয়েদ যাবার সুযোগ পাচ্ছি না। কিবার নালার পথ ধরে আমাদের ব্রহ্মালোকে পৌঁছতে হবে। সে পথ সোন্দার থেকে।

সুয়েদ হয়ে নাস্থু নালার তীরপথ ধরেও ব্রহ্মালোকে যাওয়া যায়। সেটি ব্রহ্মালোকের সুন্দরতম অংশ সত্তরচিন। তবু আমরা সেপথে যেতে পারব না। কারণ কয়েকদিন আগে এক জাপানী অভিযাত্রী দল এ অঞ্চলে এসেছেন। তারাও ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করবেন। ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশান তাঁদের সত্তরচিন দিয়ে আরোহণের অনুমতি দিয়েছেন। আমরা ওপথে যেতে পারব না।

না পারলেও বোধ করি অভিযানের কোন লোকসান হবে না। কারণ ক্রিস্ বনিংটন ১৯৪৩ সালে কিবারের পথেই ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেছেন।

কিন্তু এসব কথা ভাবার জন্য আমাদের চলা বন্ধ হয় নি। হিমালয়ের অন্তরলোকের অসীম ও অপরূপ রূপ আমাদের গতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমরা অপলক নয়নে তাকিয়ে আছি চেনাব উপত্যকা আর কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের দিকে, তাকিয়ে আছি নীলাকাশ আর তার বুকে ভাসমান সাদা মেঘদলের দিকে। মনে হচ্ছে এই অভিযানের জন্য আমরা যে যতটুকু কষ্ট করেছি, এক পলকে হিমালয় তা সুদে আসলে শোধ করে দিল। আমাদের সকল শ্রম মুহূর্তে সার্থক হয়ে উঠল।

মনে হচ্ছে একখানি অনন্ত ও জীবন্ত রঙীনছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সে ছবি স্থির নয় কিন্তু তাকে স্পর্শ করা যায়। সে ছবি নির্বাক নয়, কেবলি কথা বলছে ব্রহ্মলোকের কানে কানে। সেই সচল ও সবাক ছবি আমাদের অচল ও অবাক করে দিয়েছে। আমরা যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলেছি।

সম্বিত ফিরে পাই কৃষ্ণের কথায়। সে বলে—চলুন শঙ্কুদা, সামনের ঐ বাঁকটা ফিরলেই বিশ্রামগৃহ দেখতে পাবেন।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলি ওদের সঙ্গে। চলতে চলতে ভাবতে থাকি নিজের সৌভাগ্যের কথা। জীবনদেবতার অনেক কৃপায় এমন সীমাহীন সৌন্দর্যলোকে পদার্পণ করা যায়। ধন্য আমি, ধন্য আমার জীবন। তাই হে অসীম, হে অনন্ত, হে সুন্দর ! তোমাকে প্রণাম, শত-সহস্র প্রণাম।

অনিন্দ্যসুন্দর সোন্দার গ্রামের পথে এগিয়ে চলি। পথের পাশে প্রায় সমতল ক্ষেত। কোথাও ভুট্টা, কোথাও রামদানা, কোথাও বা পাহাড়ী ধান।

সমতলের শেষে পাহাড়—সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের গায়েও ক্ষেত আছে, তবে বাড়ি-ঘরই বেশি। সমতলেও বাড়ি রয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। তারই দুটি বাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার। দুটিই দেয়াল ঘেরা টিনের বেশ বড় চৌচালা। কাছের বাড়িটির চালে লাল রং দেওয়া। অবস্থানটিও ভারী সুন্দর-ক্ষেতের মাঝে একটা ছোট টিলার ওপরে।

দূরের বাড়িটি দেখিয়ে শৈলেশ বলে—ওটা প্রাইমারী স্কুল।

—আর একটা ? আমি কাছের বাড়িটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি।

কৃষ্ণ উত্তর দেয়—ফরেস্ট রেস্ট হাউস। ওখানেই আমরা থাকব।

চমৎকার ? সুন্দর সোন্দারের সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটিতে বাস করতে পারব।

পথ থেকে নেমে আসি ক্ষেতে।

আলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলি। খানিকটা এগিয়ে একটা বড় আখরোট গাছ। শৈলেশ বলে—আশি সালে আমরা সন্তুরচিনের পথে এখানে বসে লাঞ্চ্ সেরে নিয়েছিলাম।

—তাহলে তো আজও একবার এখানে বসা উচিত হবে।

সবাই সমর্থন করে আমার প্রস্তাব। আমরা রুক্‌স্যাক্ খুলে রেখে গাছের গোড়ায় বসে পড়ি। ঘড়ি দেখি, দুপুর সাড়ে বারোটা। ৮ কিলোমিটার পথ আসতে চার ঘণ্টা লেগেছে। আজ অবশ্য আমরা দেখতে দেখতে পথ চলেছি। এখনও তাই করছি। বসে বসে সোন্দারকে দেখছি। এ দেখার যে শেষ নেই।

হঠাৎ নজর পড়ে আমার। সবিস্ময়ে বলে উঠি—এটা কি কবরখানা নাকি !

—ঠিক কবরখানা নয়, গাঁয়ের কয়েকজন গরীব মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে এখানে।

তাঁদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষা বোধ করছি। এমন শান্ত সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশে যাঁদের শেষশয্যা রচিত হয়েছে, তাঁরা দরিদ্র হয়েও পরম সৌভাগ্যবান।

গৌতমের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। গৌতম বলে—কিশ্‌তোয়ার তহসিলের অন্যান্য গ্রামের মতই সোন্দার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গ্রাম। এখানে অবস্থাপন্নদের সাধারণতঃ বাড়িতেই সৎকার করা হয় কিংবা কবর দেওয়া হয়। যেসব হিন্দুর বাড়িতে জায়গা নেই, তাঁদের দাহ করা হয় চেনাবের তীরে, আর যেসব মুসলমানের বাড়িতে জায়গা নেই, তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছে এখানে। এসব ব্যাপার নিয়ে এখানে কোন অশান্তি হয় না, কারণ এ তহসিলে যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই, তেমনি নেই অস্পৃশ্যতার সংকীর্ণতা।

শিবু আর গোরা বিশ্রামভবনের সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই ওরা নামতে শুরু করেছে নিচে। ওরা আমাদের কাছে আসছে। বোধহয় ভেবেছে আমরা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি এখানে।

ওরা আসে। শিবু বলে—চলুন শঙ্কুদা, চা হয়ে গেছে রান্না চড়েছে। আজ সত্যই হট্-লাঞ্চ্ খাওয়াবো।

বেচারী, গতকালের কথা আজও ভুলতে পারে নি। সে আমার রুক্‌স্যাক্ পিঠে নিয়ে আবার তাগিদ দেয়—চলুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অতএব উঠে দাঁড়াই, শুধু আমি নই, আমরা সবাই। এখন একমগ গরম চা পেলে সত্যই বড় ভাল হয়।

—লীডার কত পেছনে? গোরা জিজ্ঞেস করে।

জয় উত্তর দেয়—ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে আমরা আস্তে আস্তে পথ চলেছি। মনে হচ্ছে একটু বাদেই এসে যাবে।

—লীডারের সঙ্গে টুলটুল রয়েছে। রঞ্জু যোগ করে।

—তাহলেও আমি একটু এগিয়ে দেখি, তোমরা বিশ্রামভবনে চলে যাও। নিজের রুক্‌স্যাক্ ও আইস এ্যাক্‌স গোরাকে দিয়ে গৌতম বলে। সে সহনেতা। সুতরাং নেতার প্রতি তার একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে।

আমরা ওকে বাধা দিই না। কিন্তু জয় গৌতমের বড় ভাই। সুতরাং তারও একটা কর্তব্য রয়েছে। তাই সে নিজের আইস এ্যাক্‌স-টা বাড়িয়ে ধরে বলে—পাহাড়ী পথ খালি হাতে যাস নে।

আইস এ্যাক্‌স নিয়ে গৌতম চলে যায়, আমরাও এগিয়ে চলি।

এটি সংক্ষিপ্ত পথ। পতিত জমি আর ক্ষেতের ওপর দিয়ে। মিনিট পাঁচেক হেঁটে বিশ্রামভবনের আঙ্গিনায় উঠে আসি।

অপূর্ব অবস্থান। চারিপাশে ক্ষেত, মাঝখানে বেশ খানিকটা উঁচু সমতলে এই বিশ্রামভবন। ওপারের পাহাড় থেকে এপারের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকার সবটাই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

বিশ্রামভবনের সামনে একফালি সমতল অঙ্গন। তারপরে দু-ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে ছোট একটুকরো বারান্দা। বারান্দা পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি দুখানি ঘর এবং রান্নাঘর। প্রথম ঘরখানি ছোট, দ্বিতীয়টি বেশ বড়। তারই সঙ্গে রান্নাঘর ও বেসিন। আমরা এঘরেই থাকব। প্রথম ঘরখানিতে শেরপা ও মালবাহকরা থাকবে।

রান্নাঘর ও বেসিনে জলের পাইপ আছে কিন্তু জল নেই। জলের কল বাড়ির পেছনে। পলিথিনের পাইপ দিয়ে ওপরের কোন ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছে।

এটি বনবিভাগের বিশ্রাম ভবন। কিন্তু এখানে কোন আসবাবপত্র নেই। আর নেই শৌচাগার। তার মানে মাঠে যেতে হবে।

ঘোড়াওয়ালা মাল নিয়ে আগেই পৌঁছে গিয়েছে। আপাতত তার কাজ শেষ হয়ে গেল। এখান থেকে, কুলি নিতে হবে। কারণ এর পরে পথ সংকীর্ণতর। সেপথে ঘোড়া চলবে না।

দুদিনের এই পথে মাল পরিবহনের জন্য ঘোড়াপ্রতি আমাদের একশ' টাকা করে দিতে হবে। বর্তমান বাজারে বেশ সস্তা। কারণ একটা ঘোড়া আড়াইজন মানুষের মাল বয়।

ঘরে এসে দেখি গ্রাউণ্ড-শীট পাতা হয়ে গেছে। জুতো খুলে ভেতরে এসে বসি। বড়-রসিদ চা নিয়ে আসে। গত কয়েকদিন প্রধানতঃ গোরা ও জগদীশ রান্না করেছে। কিন্তু আজ শিবু রান্নাঘরের দায়িত্ব নিয়েছে। খাওয়া বোধকরি মন্দ হবে না। কারণ আগেই বলেছি, শিবু ক্যাটারিং-য়ের ব্যবসা করে।

চা-বিস্কুট শেষ হবার আগেই নেতা ও টুলটুলকে নিয়ে গৌতম ঘরে ঢোকে। আমরা সোচ্চার স্বরে তাদের স্বাগত জানাই। নেতা জুতো খুলে ভেতরে এসে বসে পড়ে। তার মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে না। নিঃশব্দে শিবুর হাত থেকে চায়ের মগ নিয়ে একটা চুমুক দেয়।

সহসা রঞ্জু বলে—লীডার তোমার পা-টা দেখছি বড্ড ফুলে গেছে।

—হ্যাঁ। মৃদু স্বরে অমূল্য বলে—তাই জুতো খুলে আরাম লাগছে।

রঞ্জু তাড়াতাড়ি নেতার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মোজাটা খুলে ফেলো তো, পা-টা একটু দেখি।

অমূল্য দ্বিধা করছে দেখে রঞ্জুও ওর মোজার দিকে হাত বাড়ায়। বাধ্য হয়ে অমূল্য মোজা খোলে। সত্যি ওর পা খুবই ফুলে গেছে। রঞ্জু আঙুল দিয়ে একটু টিপতেই অমূল্য তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে—শুধু ফুলে যায় নি, সেই সঙ্গে ব্যথাও বেড়েছে।

—তবু তুমি আমাদের কথা শুনলে না, একটা ঘোড়া নিলে না। সহনেতা অভিযোগ করে।

নেতা চুপ করে থাকে। ভুল করলে কথা না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। নেতার পা পরীক্ষা করে রঞ্জু শিবুকে বলে—রান্না হয়ে গেলে এক সসপ্যান জল গরম করে দিস, লীডার পা সেঁকবে।

তারপরে রঞ্জু তার রুক্‌স্যাক্ খুলে একটা ট্যাবলেট বের করে নেতার হাতে দিয়ে বলে—এটা খেয়ে একটা ম্যাট্রেসের ওপর পা টান করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো, দেখবে অনেক ভাল লাগছে।

নেতা ডাক্তারের পরামর্শ মেনে নেয়।

কিন্তু সে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারে না। একটু বাদেই তপন দুজন মানুষকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। একজন সুবেশ ও সুশ্রী আধুনিক যুবক, আরেকজন প্রৌঢ় পাহাড়ী।

যুবককে দেখিয়ে তপন বলে—লীডার, ইনিই মহেশ ঠাকুর।

অমূল্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে ডানহাত প্রসারিত করে। যুবক তার সঙ্গে করমর্দন করেন। অমূল্য বলে—বসুন।

নেতার পাশে বসে মহেশবাবু তার সঙ্গীকে বসতে বলেন। লোকটি জোড়হাত করে আমাদের সবাইকে নমস্কার করে। মহেশবাবু তাকে দেখিয়ে বলেন—এর নাম গোলাম রসুল পাদিয়ার, আপনাদের মালবাহকদের মেট।

আমরা সবাই ওদের দুজনের সঙ্গে করমর্দন করি। অমূল্য মহেশবাবুকে বলেন—আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারী খুশি হলাম, গতবছর আপনি আমার মেম্বারদের খুবই সাহায্য করেছিলেন।

সহনেতা সহাস্যে বলে—এবারেও করছেন। আমরা ওকে মালবাহক সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। উনি একেবারে মেটসাবকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—এ তো আমার কর্তব্য। মহেশবাবু বলেন—আপনারা আমার অবহেলিত দেশে এসেছেন, আপনাদের তো সাহায্য করতেই হবে। তাছাড়া চিঠিতে লিখেছেন. আপনারা কাল সকালেই দোবাতি রওনা হবেন, তাই রসুলসাবকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—ভালই করেছেন। নেতা বলে—একটু চা খেয়ে নিন, তারপরে কথাবার্তা হবে। আরেকটা কথা, আপনারা কিন্তু আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ্ করবেন।

ওরা সম্মত হন। অমূল্য মহেশবাবুকে বলে—আপনাকে একটা অনুরোধ করব।

—বেশ বলুন

—আপনি তো এখান থেকে বাড়ি ফিরবেন ?

মহেশবাবু মাথা নাড়েন। বলেন—কি দরকার বলুন ?

—আমাদের কয়েকখানি চিঠি আপনাকে সুয়েদ ডাকঘরের ডাকবাক্সে ফেলে দিতে হবে।

—বেশ তো, এ আর কি এমন কাজ ? আমাকে দিয়ে দেবেন, আমি বাড়ি ফেরাব পথে মাষ্টারজীর হাতে দিয়ে যাবো।

নেতা আমার দিকে তাকায়। বলে—হাওড়াতে গাড়ি ছাড়ার পর থেকে এখানে পৌঁছন পর্যন্ত একটা সংবাদ লিখে ফেলো। দিল্লীর ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান, কলকাতার পি. টি. আই-এর দীপক বসাক ও আজকাল-এর অসীম মিত্রকে পাঠিও। একবার থামে অমূল্য। তারপরে আবার বলে—সংবাদের একটা কপি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে দিও। তিনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন।

শৈলেশকে নিয়ে বসে পড়ি। ওর হাতের লেখাটি সুন্দর।

সংবাদ লিখতে সময় বেশি লাগে না। অমূল্যকে একবার দেখিয়ে নিয়ে শৈলেশকে কপি করতে বলি।

নেতা ও সহনেতা মেটের সঙ্গে দর-দস্তুর করছে। মেট বলছে—জনপ্রতি দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা করে দিতে হবে। এখান থেকে মালসহ মূল-শিবিরে পৌঁছতে দু-দিন লাগবে, আর সেখান থেকে খালি হাতে এখানে ফিরে আসতে লাগবে একদিন।

—তার মানে প্রতি মালবাহককে আমাদের একশ'পাঁচ টাকা করে দিতে হবে। গৌতম বলে।

মেট মাথা নেড়ে বলে—জী।

আগেই বলেছি, মানুষটি মধ্যবয়স্ক। ভদ্র এবং বিনয়ীও বটে। সর্বদা হাসিমুখে এবং আস্তে কথা বলে। দেখে মনে হচ্ছে খুবই ধীরস্থির।

রেট শুনে ট্রেজারার তপন যেন একটু চঞ্চল হয়ে পড়ে। সে বলে ফেলে—কিন্তু এত টাকা...

—না, না, সাব্ আমি বেশি টাকা চাই নি। এখানে পথে কিংবা বনে কাজ করলেও দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা পাওয়া যায়। আর সে কাজ অনেক আরামের।

—আমি একটা কথা বলব ? নেতা জিজ্ঞেস করে।

মেট উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই, বলুন।

—তিনদিনের জন্য তোমরা এক শ' টাকা করে পাবে।

মেট কি যেন একটু ভাবে, তারপরে বলে—বেশ ঠিক আছে, তাই দেবেন। কিন্তু আপনারা যদি কোন মালবাহককে মূল-শিবিরে রেখে দেন। তাহলে তাকে দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা ও খাবার দিতে হবে।

গৌতম সম্মত হয়। আমি ওর কানে কানে বলি—একটা চুক্তিপত্র করে নিবি নাকি ?

—কি দরকার ?

—আমাদের সিনিয়লচু অভিযানে বড়ই ঝামেলা হয়েছিল।*

—আমি পড়েছি সেকথা, কিন্তু সেখানে তো আপনি একটা চুক্তিপত্র সই করে নিয়েছিলেন। গৌতম বলে।

আমি মাথা নাড়ি।

সে যোগ করে—তাহলে চুক্তিপত্র সই করে লাভ কি ? ঝামেলা বাঁধাবার হলে তো চুক্তিপত্র থাকলেও বাঁধাতে পারে।

অতএব কোন লিখিত চুক্তি হল না। সবটাই মৌখিক রয়ে গেল। ঠিক হল সকালে চা ছাড়া আমরা ওদের আর কোন খাবার দেবো না। ওরা বিছানা নিয়ে যাবে। কেবল মূল-শিবিরে যাদের রাখা হবে, তাদের জামা-কাপড় জুতো ম্যাট্রেস স্লীপিং-ব্যাগ ও খাবার দিতে হবে

কথাবার্তা শেষ হতেই শিবু সুসংবাদ দেয়—রান্না হয়ে গেছে, হট্-লাঞ্চ্ রেডি। সবাই রুক্স্যাক্ থেকে থালা ও মগ বের করে বড়-রসিদকে দিয়ে দিন।

একটু বাদেই লাঞ্চ্ আসে, সত্যই 'হট্'—ডাল ভাত, আলু-কুমড়ার তরকারী ও ডিমের কারী। বলাবাহুল্য গতকালের কুমড়োদুটো আজ রান্না করা হয়েছে। আর ডিম আমরা নিয়ে এসেছি। কাঁচা নয়, রান্না করা ডিম, কৌটোজাত করে। এখানে শুধু গরম করা হয়েছে। তাই উপাদেয়, পরম উপাদেয়।

মেট এবং মহেশবাবু আমাদের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তাঁরাও দুখানি থালা হাতে তুলে নিলেন। আমরা খেতে শুরু করি।

হঠাৎ নেতা চিৎকার করে উঠল—ম্যানেজার, ম্যানেজার কোথায় গেল ?

—কেন লীডার, এই তো আমি এখানে বসেছি। ঘরের এককোণ থেকে জয় উত্তর দেয়।

লীডার গলার স্বর কিছুমাত্র না নামিয়ে অভিযোগ করে—তুমি আজকাল একেবারেই 'ডিউটি' করছ না।

—কোন্ ডিউটি লীডার ?

—মেম্বারদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখা কি টীম-ম্যানেজারের ডিউটি নয় ?

—নিশ্চয়ই ! কিন্তু আমি তো সে 'ডিউটি ডিউলী ডিস্চার্জ' করছি লীডার !

—নো, নো নেভার। তুমি তো জানো আমরা সঙ্গে যথেষ্ট আচার নিয়ে এসেছি।

জয় মাথা নাড়ে।

অমূল্য আবার চেঁচিয়ে ওঠে—তাহলে আমাদের আচার দেওয়া হয় নি কেন ?

একটু হেসে জয় উত্তর দেয়—আচার বের করে দিয়েছি। রাম সিং এখুনি নিয়ে আসছে।

একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে—শুধু আচার নয়, সেই সঙ্গে পেয়ার সিং আরও একটা জিনিস নিয়ে আসবে।

* লেখকের 'সুন্দরের অভিসারে' দ্রষ্টব্য।

এবারে নেতার স্বর বদলে যায়। সে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—কি ?

—রসগোল্লা।

—নেতা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—থ্রিচীয়ার্স ফর আওয়ার ডিউটিফুল ম্যানেজার।

—হিপ্ হিপ্ হুররে...

হৈ হৈ করে খাওয়ার পাট চুকল। খাবার পরই গৌতম মেটকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। শিবু কৃষ্ণ জগদীশ তপন গোরা ও জয় ওদের সঙ্গী হয়। ওরা মালপত্র 'রিপ্যাক্' করবে। ঘোড়া যে বোঝাগুলো বয়ে এনেছে, সেগুলো এখন মানুষের উপযোগী করে তুলতে হবে। ছটা বোঝাকে পনেরো ভাগে ভাগ করতে হবে। আর মেট সেগুলো অনুমোদন করার পরেই আমরা আগামীকালের যাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

ঘরে বসে একাজ করা সম্ভব নয় বলে ওরা বোঝাগুলো বাইরে নামাতে শুরু করে দিল। দিনের আলো থাকতে থাকতে কাজ সেরে ফেলতে হবে। এখানে বৈদ্যুতিক আলো নেই।

মেট ঘরে আসে। নেতাকে বলে—সাব্, বাইরে কয়েকজন রোগী এসে বসে আছে, ডাক্তারসাব যদি একটু মেহেরবানী করেন।

অতএব ওষুধপত্র নিয়ে রঞ্জু বাইরে চলে গেল, টুলটুল ওর সঙ্গী হল। অমল্য আমি আর শৈলেশ মহেশবাবুর সঙ্গে গল্প করতে থাকি। কথায় কথায় মহেশবাবু বলেন—আমরা ক্ষত্রিয়। কিন্তু আমাদের আদিপুরুষ কেন রাজস্থান থেকে এখানে চলে এসেছিলেন, আমার জানা নেই। কোন্ পথে এসেছেন, তাও জানি না। তবে আমাদের বংশের কেউ ধর্মত্যাগ করে নি। এই উপত্যকার প্রত্যেক গ্রামেই হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। তবে আমাদের গ্রামে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি।

—কত ? শৈলেশ প্রশ্ন করে।

—তা শ' ছয়েক তো হবেই। আমাদের গ্রামে হিন্দু ছাড়া কেবল কয়েকটি মুসলমান বাড়ি আছে। তাঁরা অধিকাংশই 'শা'।

—আপনি কি করেন ? আমি জিজ্ঞেস করি।

মহেশবাবু বলেন—এখন ব্যবসা করি। এর আগে বাইরে ছিলাম।

—কোথায় ?

—আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে, ওমান দেশে। আমি রয়েল ওমান পুলিশে চাকরি করতাম। ওখানে চাকরি করার সময় সরকারী সফরে ইতালী, ইউ. কে. এবং ইউ. এস. এ. ভ্রমণ করেছি। আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম, বছর পাঁচেক আগে 'ভল্যান্টারী রিটায়ারমেন্ট' নিয়ে দেশে ফিরে এসেছি।

অমূল্য আমার কানে কানে বাংলায় বল—শঙ্কুদা, তুমি এই সোন্দার গ্রামে এসেও একজন বিলেত-ফেরৎ পেয়ে গেলে।

আমি মাথা নাড়ি। মহেশবাবু একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। পাছে ভদ্রলোক ভুল বোঝেন, তাই অমূল্য তাড়াতাড়ি আমাকে দেখিয়ে হিন্দীতে বলে—আমাদের এই দাদাও দুবার য়ুরোপ গিয়েছেন।

—তাই নাকি! মহেশবাবু আমার দিকে তাকান। বলেন—কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছেন ?

—সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইউ. কে., বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, সুইডেন, পূর্ব

ও পশ্চিম জার্মানী, ইতালী ও গ্রীস।

—তার মানে পশ্চিম-য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ দেখেছেন ?

আমি মাথা নাড়ি। কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাই। হিমালয়ের এই অন্তরলোকে বসে য়ুরোপের কথা ভাল লাগছে না আমার। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি—শুনেছি সুয়েদ গ্রামে ভাল স্কুল আছে ?

—হ্যাঁ। হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল। আমার বড় মেয়ে সেই স্কুলে পড়ে।

—তাই নাকি ! বয়স কত ?

—ছ' বছর। ক্লাশ ওয়ানে পড়ে।

—আপনার কটি ছেলে-মেয়ে ?

—দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। ছেলে ছোট, মাত্র এক বছর।...

আরও কিছু কথা বলেন মহেশবাবু। বলেন—সেখানে ভালই ছিলাম, টাকা পয়সা প্রচুর পেতাম, সম্মানও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পারিবারিক কারণে দেশে চলে আসতে হল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে বলে প্যাকিং শেষ হবার আগেই মহেশবাবু ও মেট বিদায় নিল। যাবার সময় মেট বলল—মালবাহকদের নিয়ে আমি সকাল আটটা নাগাদ এসে যাবো, আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন।

—আটটা ! নেতা আপত্তি করে। বলে—তোমরা আটটায় এলে যে রওনা দিতে অনেক দেরি হয়ে যাবে মেট !

—না জনাব, দেরি হবে না ! ন'টায় রওনা হলে আপনারা বিকেল পাঁচটার মধ্যে আরামসে দোবাতি পৌঁছে যাবেন। কতটুকুই বা পথ, ১৫/১৬ কিলোমিটার হবে, তার ওপরে কোন খাস চড়াই নেই।

—খাস-চড়াই নয় ! অমূল্য বলে—বলছ কি মেটসাব ? সোন্দারের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট আর দোবাতির সাড়ে দশ হাজার। দশ মাইলে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে। এর মধ্যে না জানি কতবার নদীর কাছে নেমে যেতে হবে।

—তাহলেও জনাব কোন খাস চড়াই নয়, মামুলি চড়াই। আপনারা আরামসে আট ঘণ্টায় চলে যাবেন।

খাস-চড়াই ও মামুলি-চড়াই কি বস্তু এবং দু-য়ের পার্থক্যই বা কি, জানা নেই, আমাদের। তবু নেতা আর কিছু বলে না। কিন্তু মেট আবার বলে—জনাব, কুলি-লোগ তিনদিনের জন্য যাচ্ছে, তারা খানা খাবে, পথের খানা সঙ্গে নেবে। ওরা আটটার আগে আসতে পারবে না।

একথা শুনে আর কোন তাগিদ দেওয়া চলে না। তাই নেতা বলে—বেশ, তাই এসো। আমরাও ব্রেক-ফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে থাকব।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে প্যাকিং শেষ হল। আমরা মালপত্র গুছিয়ে ঘরে নিয়ে এলাম। জগদীশ আর গোরাও দোকান করে ফিরে এলো। তারপরেই বৃষ্টি নামল।

অমূল্য বলে উঠল—দেখলে তো প্রকৃতি আমাদের কি রকম সহায়। তোমরা বাইরে কাজ করছিলে বলে এতক্ষণ বৃষ্টি নামছিল না।

আমরা ওর মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু মুখে কিছুই বলি না। নেতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—আর এই বৃষ্টির মানে কি জানো ?

—আমি জানি লীডার। গোরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

—কি বলো দেখি ?

—চা বানাতে হবে।

—না, না, শুধু চা নয়, সেই সঙ্গে চানাচুর।

—থ্রি চীয়ার্স ফর আওয়ার গ্রেট গ্র্যাণ্ড লীডার !

—হিপ্ হিপ্ হুররে......

অতএব পেট্রোম্যাক্স জ্বালানো হল। স্টোভ ধরানো হল। বর্ষামুখর সন্ধ্যায় চানাচুর সহযোগে চা-পান পর্ব বেশ রসিয়ে উপভোগ করা গেল। যাবার পথে আজই আমাদের ঘরে শেষ রাত্রিবাস। আগামীকাল থেকে তাঁবু-জীবন শুরু হয়ে যাবে।

চায়ের পরে রান্না চড়ল। ম্যানেজার মিষ্টান্ন মঞ্জুর করেছে। মিষ্টান্ন মানে রেডক্রশ থেকে পাওয়া গুড়োদুধের পায়েস। তার সঙ্গে থাকবে রুটি রাজমার ডাল ও শাকের তরকারী। রুটি বানাবার জন্য রসিদ ব্রাদার্স জ্বালানীকাঠ নিয়ে এসেছে।

আগেই বলেছি পাশে রান্নাঘর। দরজা খোলাই রয়েছে। সবই দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, গোরা ও জগদীশ রান্না করতে করতে আমাদের গল্প শুনতে পাচ্ছে।

গল্প, হ্যাঁ আমরা গল্প করছি। বাড়ির গল্প নয়, নিজেদের গল্প নয়, হিমালয়ের গল্প। কথায় কথায় শৈলেশ বলছে, ব্রহ্মলোকে ওদের প্রথম পদযাত্রার কথা। সেই পদপরিক্রমার পরিণত পদক্ষেপেই এবারের এই পর্বতাভিযান।

শৈলেশ বলে চলেছে—আমরা প্রথম ব্রহ্মা হিমবাহে এসেছি ১৯৪০ সালে। সেবারেও এসেছিলাম সেপ্টেম্বরে। ১৪ই কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ১৭ই কিশ্তোয়ার পৌঁচেছিলাম। তখন পালমার পর্যন্ত বাস আসত। ১৯শে সকালে পালমার থেকে শুরু হল পদযাত্রা। সেদিন কিন্তু এখোলয় আমরা সত্যই হট্-লাঞ্চ্ পেয়েছিলাম। রাত্রিবাস করেছিলাম পিঞ্জরারী গ্রামে।

—পিঞ্জরারী ?

আমার প্রশ্নে থামতে হয় শৈলেশকে।

শিবু বলে—যে গ্রামের দোকনটা বন্ধ থাকার জন্য আমি আপনাদের কাল হট্-লাঞ্চ্ খাওয়াতে পারলাম না।

—তার মানে সেওয়াবাতির আগে ? আমি প্রশ্ন করি।

শৈলেশ মাথা নাড়ে। সে বলতে থাকে—দ্বিতীয়দিন সকালে সেখান থেকেই আমাদের পদযাত্রা শুরু হয়। সেওয়াবাতি এসে আমরা ব্রেকফাস্ট করি, দুপুরে পৌঁছই এখানে এই সোন্দার গ্রামে। এখানে আমরা লাঞ্চ্ খেলাম কিন্তু যাত্রাবিরতি করলাম না। সোন্দার থেকে সুয়েদের দূরত্ব সামান্য। পথটি দেখতেও ভারীসুন্দর ঢেউ খেলানো। কিন্তু বড়ই চড়াই-উৎরাই। মাঝখানে কিবারনদী। নদী পার হবার পরেই ছবির মতো সুন্দর সুয়েদ গ্রামটি দূর থেকে দেখতে পেলাম। শুধু গ্রাম নয়, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নাছু নালাকেও মনে হল যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি রূপোলী রেখা।

গ্রামে প্রবেশ করতেই গ্রামবাসীরা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। বেশ উন্নত ও সম্পদশালী গ্রাম। সবারই খাওয়া-পরার সংস্থান রয়েছে।

তহসিল কাছারীতে আশ্রয় পেলাম। নায়েবমশাই মানুষটি বড়ই ভাল। তাঁকে আমরা ডিনারে নেমন্তন্ন করলাম। তারপরে দল বেঁধে ছুটলাম উষ্ণকুণ্ডে। তিনদিন পরে অনেকক্ষণ ধরে ভারী আরামে স্নান করা গেল। ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে শরীরটা ঝরঝরে

হল। আশ্রয়ে ফিরে এসে দেখি গাঁয়ের কয়েকজন মানুষ ও মোড়ল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন। গল্প শেষে খাওয়া-দাওয়া সারতে সেদিন বেশ রাত হয়ে গেল।

পরদিন ২১শে সেপ্টেম্বার। সকালেই শুরু হল পথচলা। গাঁয়ের মানুষদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নাছু নালা পার হয়ে এলাম। শুরু হল বনপথ—ঘনজঙ্গল। দিনের বেলাতেই যেন রাতের আঁধার নেমে এসেছে পথে। স্যাঁতস্যাঁতে পথ, নরম মাটি জুতো বসে যায়।

কিছুক্ষণ চলার পবে হোঞ্জার নামে একটি গ্রাম পাওয়া গেল। সেখান থেকে তুযারাবৃত শৃঙ্গমালা দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে ব্রেক-ফাস্ট সেরে নিলাম। তারপরে নতুন উদ্যমে আবার এগিয়ে চললাম।

দুপুর নাগাদ ঘুঙ্গট নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম। জায়গাট দেখে ভারী পছন্দ হল। আমরা সেখানে বসে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। তারপরে ঘাসের ওপরে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। হঠাৎ দেখি ক্ষুদে ক্ষুদে অসংখ্য জোঁক চারিদিক থেকে সারা শরীর ছেঁকে ধরেছে। কোন রকমে তাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে চললাম।

পাথরের ওপরে পা ফেলে ফেলে খুব সাবধানে সেদিন কয়েকটি পাহাড়ী নদী পার হতে হল। তারপরে সন্ধ্যার কিছু আগে পৌঁছলাম একফালি সমতলে, নাম 'হাওয়াল'। জায়গাটার তাঁবু ফেলা যাবে দেখে সেখানেই যাত্রা বিরতি করলাম।

তাঁবু টাঙ্গিয়ে চা খেয়ে কিছু কাঠ যোগাড় করা গেল। আগুন জ্বালানো হল, কিন্তু বাইরের আগুনে তাবুর ভেতরের ঠাণ্ডা সামান্যই কমল। তাই তাড়াতাড়ি রান্না সেরে খেয়ে নেওয়া গেল। তারপরে সবাই সঙ্গে আনা সব গরম পোশাক গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি। শীত তেমন কমল না, তবে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল গৌতমের ডাকে। ধরমর করে উঠে বসলাম। তাঁবুর বাইরে প্রচুর আলো, ভেতরেও আলো এসে গেছে। বাইরে এসে বুঝতে পারলাম ভুল হয়েছে। দিন নয় রাত, সূর্য নয় চন্দ্র। চাঁদের আলোয় আকাশ ও মাটি ভেসে যাচ্ছে।

মাটিতে স্বপ্নের ছোঁয়া আর আকাশে সারি সারি রূপোলী পাহাড়। চাঁদের আলায় বরফের চূড়াগুলি রূপোর মালা। ভাগ্যিস গৌতম রাতকে দিন বলে ভুল করেছিল, তাই ব্রহ্মালোকের এই অপরূপ রূপোলী রূপ দেখতে পেলাম।

পরদিন ২২ শে সেপ্টেম্বার। সকালেই বেরিয়ে পড়া গেল। দুর্গম পথ, কখনো ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, কখনও বা বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে। কখনও নিচে নামছি, কখনো বা ওপরে উঠছি। তাহলেও থামতে পারি নি, কারণ ক্রমেই বরফের পাহাড়গুলি আমাদের কাছে এগিয়ে আসছিল।

বেলা দুটো নাগাদ একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে আমরা নাছু নালা পার হলাম, পৌঁছলাম কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের অনাবিল অন্তরলোক সত্তরচিনে। প্রায় চারিদিক তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার পরিবেষ্টিত আশ্চর্য-সুন্দর সবুজ উপত্যকা এই সত্তরচিন। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলাম।

আমাদের ডাইনে ব্রহ্মা হিমবাহ, পাথর আর মাটিতে ঢাকা গ্রাবরেখা। এখানে ওখানে ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে, ফুল ফুটে আছে। গ্রাবরেখার শেষে হিমবাহের তুষারাবৃত অংশ। ব্রহ্মা-১ পর্বতের গা বেয়ে নেমে এসেছে। ব্রহ্মার পাশে ব্রহ্মাণী।

আমাদের বাঁদিকে আরেকসারি বরফ। প্রথমেই আইগার। তার গায়ে ও মাথায়

সামান্যই বরফ। মনে হচ্ছে বেচারী ব্রহ্মার সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে।

আইগারের পরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রহ্মা-২, ক্রুকেড-ফিঙ্গার ও ফ্ল্যাট-টপ।

এই বরফের রাজ্যে, এই মৃত্যুশীতল প্রান্তরে, এক বিস্ময়কর সবুজ সুন্দর প্রাণের প্রতীক সত্তরচিন। প্রায় সিকি মাইল চওড়া ও মাইল খানেক লম্বা সবুজ ও সমতল ময়দান। একপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নাম্বু নালা আরেকপাশে পাহাড়ের সারি। তাদের গা বেয়ে নেমে এসেছে অনেকগুলি ঝরণা। তারা সত্তরচিনকে সিক্ত করে নাম্বু গিয়ে মিশেছে। নাম্বু এসেছে ব্রহ্মা হিমবাহ থেকে।

ভেড়াওয়ালাদের রেখে যাওয়া দুটি কুঁড়ে রয়েছে এখানে। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি কুঁড়ে দুটির একটিতে ফরাসী অভিযাত্রীরা রান্নাঘর বানিয়েছেন, আরেকটি আমরা দখল করলাম। তারপরে তাঁবু টাঙ্গালাম।

কয়েকদিন আগে এই ফরাসী অভিযাত্রীদল সত্তরচিনে মূল-শিবির স্থাপন করেছেন।

তাঁরা আমাদের স্বাগত জানালেন। তাঁরা ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের চেষ্টা করছেন। আমরাও একই কারণে সমীক্ষায় এসেছি শুনে তাঁরা খুশি হলেন। (পরে এঁরা ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেছেন।)

আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে রাতটা কেটে গেল। পরদিন সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লাম কাজে। তিনঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড চড়াই আর অসংখ্য বড় বড় পাথর বেরিয়ে উপস্থিত হলাম ব্রহ্মা হিমবাহে। প্রায় পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ এই হিমবাহটি বিশ্বের বৃহত্তম হিমবাহগুলির অন্যতম। আমরা তারই ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। কাজটি কোনমতেই সহজ নয়। কারণ কোথাও বালি কোথাও মাটি, কোথাও পাথর কোথাও বরফ আবার কোথাও লুকিয়ে থাকা ফাটল। সেখানে জীবনের ঝুকি। তবে সর্বদাই শরীরে শিহরণ আর হৃদয়ে অপার আনন্দ লাভ করছিলাম। হিমালয়ের এমন ভয়ঙ্কর-সুন্দর রূপ আমি যে এর আগে আর কোথাও দেখি নি।

অবশেষে উপস্থিত হলাম ব্রহ্মালোকে—ব্রহ্মা-১ পর্বতশৃঙ্গের প্রায় পাদদেশে। সেখান থেকে দেখতে পেলাম ব্রহ্মাণীকে—আরেকটি পর্বতশিখর। একটা সুবিশাল গিরিশিরা ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণীকে যুক্ত করেছে। তার গায়ে কম করেও গুটিপাঁচেক প্রকাণ্ড 'আইসফল' বা তুষারপ্রপাত। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তবু আমরা তারই মধ্যে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চলি।

বিকেল নাগাদ একফালি নিরাপদ সমতল পাওয়া গেল। সেখানেই এক নম্বর শিবির স্থাপন করা গেল। তাঁবু টাঙ্গানো হয়ে যাবার পরেও কিন্তু আমরা ভেতরে ঢুকলাম না। হিমেল হাওয়ার দাপাদাপিকে উপেক্ষা করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণীকে দেখতে থাকলাম। দেখলাম ব্রহ্মা শিখরে হিমানী সম্প্রপাত (Avalanche) আর চারিদিকের বিচিত্র বিশাল ও বিস্ময়কর রূপ। দেখতে দেখতে একসময় ব্রহ্মলোকে আঁধার নেমে এলো। আমরা তাঁবুর ভেতরে চলে এলাম।

পরদিন অর্থাৎ ২৪শে সেপ্টেম্বর সকালেই শিবির গুটিয়ে আবার হিমবাহপথে এগিয়ে চললাম। দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম বালি ও পাথর বিছানো একটা চালু

জায়গায়। দেখতে পেলাম ১৯৭৯ সালের সফলকাম জাপানী ব্রহ্মা-১ অভিযানের কিছু জিনিসপত্র। আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে দেখে আমরা সেখানেই দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলাম।

তারপরে প্রবল ও ঝড় ও তুষারপাতের জন্য দুটি দিন সেই শিবিরে বন্দী হয়ে থাকতে হল। ২৭শে সেপ্টেম্বর আবহাওয়ার একটু উন্নতি হলে আমরা শিবির গুটিয়ে এগিয়ে চলি। বেশ কিছুক্ষণ কষ্টকর পদযাত্রার পরে পৌঁছলাম 'আইগার' শিখরের পাদদেশে। সেখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চললাম এগিয়ে। উপস্থিত হলাম ব্রহ্মা-২ (৬০০২ মিঃ) পর্বতের পাশে।

পিতামহকে প্রণাম করে আবার চলি এগিয়ে। পৌঁছই 'প্লেটু' ও ক্রুকেড ফিঙ্গার (৫৬৩০ মিঃ) শৃঙ্গদ্বয়ের কাছে। উচ্চতা কম হলেও প্লেটু পর্বতশিখরটি বড় ভাল লাগে আমাদের। এখানেও জাপানী অভিযাত্রীদের কিছু পরিত্যক্ত জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে।

আমরা আবার এগিয়ে চলি। এবং অবশেষে পৌঁছই ব্রহ্মলোকের উচ্চতম পর্বতশিখর 'সিক্‌ল মুন' শৃঙ্গের কাছে। গঠনবৈচিত্র্যে এই অঞ্চলটি অভিনব। দু-দিকের প্রতিটি পর্বতের গা বেয়ে হিমবাহ নেমে এসেছে। তারা এসে মিলিত হয়েছে এখানে। আর এখান থেকে বাঁদিকে তাকলে অর্ধবৃত্তকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে 'আইগার', 'প্লেটু', 'ক্রুকেড-ফিঙ্গার', 'সিক্‌ল-মুন' 'ফ্ল্যাট-টপ্‌' ও ব্রহ্মা-২। আর ডানদিকে ব্রহ্মা-১ ও ব্রহ্মাণী। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আর কোথাও একসঙ্গে এতগুলি তুষারাবৃত শিখর দেখা যায় বলে শুনি নি। আমরা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। দেখি আর দেখি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আমরাও ফিরে আসি তাঁবুতে।

পরদিন ২৮শে সেপ্টেম্বার শুরু হয় ফেরার পালা। কিন্তু সেকথা বলবার মতো সময় নেই এখন। রাত এগারোটা বাজে, আসুন এবারে আলো নিবিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক।

শৈলেশ চুপ করে। আমি স্লীপিং ব্যাগের জীপ টেনে দিই।

॥ সাত ॥

মেট তার কথা রেখেছে। কিন্তু আমরা কথা রাখতে পারলাম না। মেট মালবাহকদের নিয়ে ঠিক সকাল আটটায় হাজির হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও তৈরি হতে পারি নি।

মেট পনেরোজন মালবাহক নিয়ে এসেছে। কেউ তরুণ, কেউ যুবক, কেউবা প্রৌঢ়। তবে সবাই স্বাস্থ্যবান। একজন হিন্দু, বাকি সবাই মুসলমান। পোশাক ও চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। নাম শুনে জানা গেল, প্রৌঢ় লোকটি হিন্দু, নাম নাথুরাম ঠাকুর। অর্থাৎ মহেশবাবুর মতো নাথুরামও রাজপুত।

গৌতম শিবু ও তপন মালবাহকদের নাম লিখে নিয়ে তাদের বোঝা বুঝিয়ে দিল। ওরা পিঠে মাল তুলে রওনা হয়ে গেল। আমাদের রওনা হতে ন'টা বেজে গেল।

খুবই দেরি হযে গেল। কারণ শুনেছি আজকের পথ যেমন দীর্ঘ, তেমনি দুর্গম। দশ মাইলে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে এবং পথে প্রচুর উৎরাই পড়বে। তাছাড়া কিশ্‌তোয়ার পৌঁছবার পর থেকেই দেখছি, বিকেলের দিকে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু দেরি যখন হয়েই গেছে, তখন আর আপসোস করে কি হবে ? তার চাইতে চলতে চলতে আরেকবার সোন্দারকে দেখে নেওয়া যাক।

বিশ্রামভবন থেকে নেমে এলাম নিচে। বাঁদিকে একটা বাড়ি, তারপরেই ভুট্টা ক্ষেত। ক্ষেতে চাষীরা কাজ করছিল। তারা কাজ ফেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। রঞ্জু বলে ওঠে—জয়, ব্রহ্মাজীকি জয় !

ওরা জয়ধ্বনিতে সাড়া দেয়। আমরা হাত নেড়ে এগিয়ে চলি।

ভুট্টাক্ষেত পেরিয়ে ধানক্ষেত। এখানেও দেখছি ধানক্ষেতে আল রয়েছে। তারই ওপর দিয়ে চলেছি। হিমালয় অভিযানে এসে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে পথচলা বিচিত্র ব্যাপার তবে তমসা উপত্যকা অভিযানে গিয়ে এ সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপরে চোদ্দ বছর পরে আবার এমন সুযোগ পাওয়া গেল। (লেখকের 'তমসার তীরে তীরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।)

ধানক্ষেতের পরে একফালি সবুজ ও সমতল ময়দান। তার একপাশে পাথর বাঁধানো বেদি। বেদির মাঝখানে পতাকাদণ্ড। বোধকরি বিশেষ বিশেষ দিনে গাঁয়ের মানুষ এখানে সমবেত হন। তখন পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ময়দানের সামনেই স্কুল—প্রাইমারী স্কুল। সোন্দারে কোন হাইস্কুল নেই। হাইস্কুল রয়েছে সুয়েদ গ্রামে।

গতকাল আমরা পথ থেকে এই স্কুল বাড়িটি দেখেছি। কিন্তু সেটা পেছনের দিক। এখন সামনে এসেছি। তবে ছাত্র-ছাত্রী দেখতে পাচ্ছি না। মেট জানায়—বেলা এগারোটায় স্কুল বসবে। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে এখানে। ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়তে পারে। তারপরে সুয়েদ হাইস্কুলে যায়।

চেনাবের তীর থেকে যে সুবিস্তীর্ণ সমতল আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে পাহাড়ে মিশেছে, তারই বুকে বিশ্রামভবন ক্ষেত ও স্কুল। স্কুলের পরে আরও খানিকটা ধানক্ষেত, তারপরে পাহাড়। আমরা তার পাদদেশে পৌঁছলাম।

পাহাড়টা মোটেই খাড়া নয়, আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে। আর তাই তার গায়ে বাড়িঘর আর ক্ষেত-খামার।

সামান্য চড়াই পথ বেয়ে আমরা সারি বেঁধে ওপরে উঠতে আরম্ভ করি। খানিকটা উঠে মন্দির। তারপরে এক গুচ্ছ ঘর। পথটা এখান থেকে ডানদিকে চলে গেছে। মেট বলে-এটাই বাজারের পথ।

গতকালই আমাদের বাজার করা হয়ে গেছে। তাই বাজারে পথে না গিয়ে বাড়ি-ঘরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলি। পারি না।

গাঁয়ের মানুষ এসে ঘিরে ধরেন আমাদের। বাপ কাকা ও দাদাদের সঙ্গে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরাও আছে। মহিলারা ঘরের ভেতর থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছেন। ঘরগুলি সবই দোতলা, কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি। নিচের তলায় গরু-ভেড়া আর ওপরতলায় মানুষ থাকে।

ছোটরা মিঠা চায়, বড়রা দাওয়াই। রঞ্জু বুক্‌স্যাক্‌ নামায়। জনগণের প্রয়োজনে গতকাল দুটো জিনিসই তার বুক্‌স্যাকে ভরে দেওয়া হয়েছে।

কাজটা কিন্তু মেটসাবের পছন্দ হয় না। সে রঞ্জুকে বলে—ভুল করে ফেললেন

সাব্ ! এক্ষুনি দলে দলে লোক ছুটে আসবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, আরও দেরি হয়ে যাবে।

—কিন্তু ডাক্তারসাব যখন বুক্স্যাক্ নামিয়ে ফেলেছে, তখন এদের মিঠা ও দাওয়াই দিতেই হবে মেট ! নেতা বলে—তুমি বরং দেখো, যাতে আর বেশি মানুষ ভিড় না করে।

মেট সেই চেষ্টাই করতে থাকে। বার বার বলে—এখন সময় নেই, ফেরার পথে সবাই দাওয়াই পাবে।

অসহায় ও রুগ্ন মানুষগুলি কিন্তু তবু অনুরোধ করতে থাকে। রঞ্জু বলে—মেট, তুমি লীডারসাবকে নিয়ে এগিয়ে যাও। আমরা এদের দাওয়াই দিয়েই তোমাদের অনুসরণ করছি। বেশি দেরি হবে না।

শুধু নেতা নয়, সেই সঙ্গে আমরাও নেতার সঙ্গী হই। কেবল শিবু আর সহনেতা ডাক্তারের সঙ্গে থেকে যায়।

যাবার সময় নেতা বলে—বেলা একটা নাগাদ কোন জলের জায়গায় আমরা লাঞ্চের জন্য থামব।

সহনেতা সহাস্যে বলে—তার অনেক আগে আমরা তোমাদের ধরে ফেলব লীডার !

আমরা কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চলি। গ্রামবাসীরাই পথ দেখিয়ে দেন।

পথ বলে কিছু নেই অবশ্য এখানে। একটা নালার ওপর দিয়ে ওপরে উঠছি। নালায় শুধু জল নামছে না, সেই সঙ্গে নোংরা। অর্থাৎ এটি গ্রামের নর্দমাও বটে। কি করব, পথটা যে বাজার হয়ে অনেক ঘুরে ওপরের পথে মিশেছে। আর এটা প্রায় সোজাসুজি ওপরে উঠেছে।

তাছাড়া সে পথ এর চেয়ে পরিষ্কার, তাইবা কে বলতে পারে ? এ পথে যেমন নর্দমার নোংরা, সে পথে তেমনি থাকবে অশ্ববিষ্ঠা। হিমালয়ের গ্রামে যেমন নোংরা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, তেমনি নেই পথ পরিষ্কারের বন্দোবস্ত। ফলে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেও এঁরা নিত্য নানা রোগের শিকার। স্বাস্থ্য খাতে সরকার শত শত কোটি টাকা খরচ করছেন কিন্তু হিমালয়ের ভাগ্যে তার ছিটেফোঁটাও জুটছে না।

কিন্তু কার কাছে কৈফিয়ৎ চাইব ? সেদিন বাটসাহেব তো বললেন নেতাদের কথা। যে দেশে মানুষের চেয়ে ভোটের দাম বেশি, সে দেশের এমন হাল তো হবেই। অতএব নিঃশব্দে নর্দমাপথে এগিয়ে চলি।

গ্রামের ঘরগুলি কয়েকটি স্তরে অবস্থিত। পাহাড়টির গঠনের জন্যই এমন হয়েছে। একটি স্তর ছাড়িয়ে আমরা আরেকটি স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছি। তবে এখানে ঘরের সংখ্যা আগের চেয়ে কম। গ্রামবাসীরা কেউ পথে কেউ বা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নমস্কার করেন, ব্রহ্মাজীর কাছে আমাদের কুশল কামনা করেন।

তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি। জনৈক যুবক বাধা দেন ! একজন বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলেন—এঁর নাম অমরচাঁদ। ইনি বনিংটনসাবের সঙ্গে ব্রহ্মাজীতে গিয়েছিলেন। তাঁদের পাচকের কাজ করেছেন।

—তাহলে তো ইনি শিখরের পথ জানেন। জয় বলে।

নেতা মাথা নাড়ে, সেই কথাই জিজ্ঞেস করে বৃদ্ধকে।

বৃদ্ধ মাথা নাড়েন। বলেন—না। আমি শিখরের পথ জানব কেমন করে ? আমি যে মূল-শিবিরে ছিলাম। তাছাড়া বনিংটনসাব তো শিখরে আরোহণ করেন নি !

—সে কি! আমরা সবিস্ময়ে বলে উঠি।

বৃদ্ধ আবার মাথা নেড়ে বলেন—না। ওঁরা শিখরে চড়েন নি।

—কিন্তু আমরা তো রিপোর্টে পড়েছি ওঁরা আরোহণ করেছেন।

—গলতী রিপোর্ট, ঝুটা রিপোর্ট...। বৃদ্ধ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। উত্তেজিত স্বরেই বলেন—শুধু বনিংটনসাব নন, কেউ ব্রহ্মাজীতে চড়েন নি, কেউ চড়তে পারবেন না। ব্রহ্মাজীর শিখরে কি মানুষ উঠতে পারে?

প্রতিবাদ না করাই ভাল। তাই নেতা শান্তস্বরে বলে—তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?

—না। বৃদ্ধ বলেন—গিয়ে কি হবে? আমি যে পথ জানি না। তাছাড়া আমার বয়স হয়েছে। এখন আমার পক্ষে অত উঁচুতে গিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

—তাহলে আমরা আসি। নেতা হাতজোড় করেন।

বৃদ্ধ এবং তাঁর প্রতিবেশীরাও নমস্কার করেন। আমরা ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি। মনে মনে ভাবি—বিশ্বাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়। এঁরা বিশ্বাস করেন ব্রহ্মা দেবশিখর। সে মনুষ্য-পদলাঞ্ছিত হতে পারে না। অতএব ক্রিস্ বনিংটন শিখরে আরোহণ করেন নি।

কয়েক মিনিট চড়াই ভেঙে মূল-পথে উঠে আসি। এই পথের পাশে গ্রামের তৃতীয় স্তর। তবে বাড়ি কম, ক্ষেতই বেশি। পাহাড়ের গা দিয়ে প্রায় সমান্তরাল সংকীর্ণ পথ। নিচে আর ওপরে পাহাড়ের ঢালে ক্ষেত। তারই মাঝে একটি বাংলো এবং কয়েকখানি বাড়ি। বেশ ভাল ভাল দোতলা বাড়ি।

বাড়ির লোকেরা হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, আমরাও চলতে চলতে হাত নাড়ছি।

এখান থেকে সমস্ত সোন্দার উপত্যকা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। এমন কি গতকালের চেয়েও সুন্দর। কারণ আজ ওপর থেকে দেখছি। নিচের ক্ষেতগুলিকে রঙ্গীন গালিচা বলে মনে হচ্ছে। তবু যেন গতকালের মতো ভালো লাগছে না।

লাগবে কেমন করে? গতকাল যে সুন্দর সোন্দারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। প্রথম ভালোবাসার স্মৃতি মনের মুকুরে অক্ষয় হয়ে থাকে।

তাহলেও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। দেখি এপারের গ্রাম আর ওপারের পাহাড়, দুয়ের মাঝে চেনাব আর দূরের সুয়েদ। দেখি কিবার আর নাম্বু নালাকে। আজও মনে হচ্ছে, একখানি প্রাণময় রঙ্গীন ছবি, যে ছবি কথা বলে চলেছে অনন্তলোকের কানে কানে।

কেবল দেখতে পাচ্ছি না কিয়ার নালাকে। না পাই, যা দেখতে পাচ্ছি,তা-ই যে আমাকে পুলকে আপ্লুত করে তুলছে। আমার হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নেতা তাগিদ দেয়। সে ঠিকই বলেছে, এখানে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ দেখার সময় নেই আমাদের হাতে। আজ দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পারি দিতে হবে। এমনিতেই রওনা হতে দেরি হয়ে গেছে। অতএব এগিয়ে চলি।

পারি না। পাশের বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে জনৈকা মহিলা মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—মহারাজ, কোথায় চলেছেন?

'মহারাজ' শব্দটা শুনে সঙ্গীরা চমকে ওঠে। শৈলেশ জিজ্ঞেস করে—ভদ্রমহিলা আপনার নাম জানলেন কেমন করে?

হেসে বলি—উনি জেনে বলেন নি। বোধকরি গাড়োয়ালীদের মতো এঁরাও অপরিচিতকে 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করে থাকেন। এবং সেই সম্ভাষণ থেকেই আমি মহারাজ। নইলে আমার যেমন রাজ্য নেই, তেমনি শিষ্যও নেই।

আমাদের উত্তর না পেয়ে ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করেন—আপনারা কোথায় চলেছেন মহারাজ!

—ব্রহ্মাজী। জয় উত্তর দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকান তিনি ও তাঁর ছেলে-মেয়েরা। তারপরে বলেন—কিন্তু এত দেরি করে এলেন কেন? শীত এসে গেল যে! বখরিওয়ালারা পর্যন্ত নিচে নামতে শুরু করে দিয়েছে!

সেই এক কথা, এক ভাবনা আর এক দুশ্চিন্তা।

এথচ এঁরা আমাদের শুধু অপরিচিতা নন, আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানা নেই এঁদের।

তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরের কাছে এগিয়ে আসি। তাঁকে আশ্বস্ত করে তুলতে জবাবদিহি করি—খাস শীত আসতে এখনও মাসখানেক দেরি আছে। তারই মধ্যে আমরা ব্রহ্মাজীর পুজো দিয়ে, বরফ পড়া শুরু হবার আগেই, ফিরে আসব আপনাদের কাছে।

—তাই আসবেন বাবা! ব্রহ্মাজী আপনাদের মঙ্গল করবেন। তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে পিতামহের উদ্দেশে প্রণাম জানান। ছেলে-মেয়েরাও তাই করে।

আমরা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে চলি আর ভাবি—সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ। যে দেশের পথে-প্রান্তরে এমন অনাবিল ভালোবাসা, সেই দেশে কেন এত হিংসা, এত অশান্তি?

রাস্তাটা ডাইনে বাঁক ফিরেছে। কৃষ্ণ বলে—এখান থেকে সোন্দার-সুয়েদ উপত্যকাকে শেষবারের মতো দেখে নিন।

—তাছাড়া...। গৌতম যোগ করে—এখান থেকেই নিচে উপত্যকা আর নদীকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

হয়তো তাই। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার মনে হচ্ছে, একই রকম। আগেও সুন্দর, এখনও সুন্দর—সোন্দার সর্বদা সুন্দর।

অবশেষে সুন্দর সোন্দারের কাছে নিতে হল বিদায়। এ বিদায় সাময়িক, আমরা আবার আসব ফিরে, আসবো পিতামহ ব্রহ্মার বরমাল্য নিয়ে।

আমরা ডাইনে বাঁক নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সোন্দার অদৃশ্য হল। সামনে সংকীর্ণ এবড়োখেবড়ো পথ। ডানদিকে বনময় পাহাড় আর বাঁদিকে কিবার নালা। আমাদের এই ওঠা-নামা আর ঘোরাঘুরির ফাঁকে কখন কিবার যে পাশটিতে এসে হাজির হয়েছে, তা টের পাই নি।

না পাই গে। এখন থেকে কিবার থাকবে আমার পাশে পাশে। রইবে, আমার পথপ্রদর্শক হয়ে। তারই তীরে তীরে পথ চলে পৌঁছব ব্রহ্মলোকে।

বাটোট থেকে চন্দ্রভাগার তীরপথে এসেছি বাণ্ডারকোট, সেখান থেকে চেনাবের পাশে পাশে সোন্দার। এবারে কিবারের তীরে তীরে শুরু হল পথচলা। এই উচ্ছ্বসিত

জলধারার উৎসমুখের অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের ব্রহ্মা পর্বতাভিযানের মূল-শিবির।

কিশ্‌তোয়ার-হিমালয় অবহেলিত হলেও ব্রহ্মাপর্বত পর্বতারোহীদের পরমপ্রিয় পর্বতশিখর। ১৯৪৩ সালে ক্রিস্‌ বনিংটনের সফলকাম অভিযানের পরেও বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে পর্বতারোহী ব্রহ্মা পর্বতাভিযানে এসেছেন। ১৯৪৮ সালে আরেকদল বৃটিশ অভিযাত্রী আসনে। চারজনের এই অভিযাত্রীদলের নেতৃত্ব করেন এ্যান্টনী হুইটেন। অপর সদস্যরা হলেন—ডানকান নিকল্‌সন্‌, জন স্কট এবং পল বেল্‌চার। তাঁরা গিয়েছিলেন সত্তরচিনের পথে।

অভিযাত্রীরা ২৮শে জুলাই মূল-শিবির ও ৩১শে জুলাই ব্রহ্মা হিমবাহে অগ্রবর্তী মূল-শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে তাঁরা দক্ষিণ গিরিশিরার সংকীর্ণ টোল (South Col) ধরে ১৯০০০ফুট (৫৭৯১ মিঃ) পর্যন্ত আরোহণ করেন। সেখান থেকে পাথুরে পর্বতগাত্র বেয়ে ২০,০০০ফুটে (৬০৯৬ মিঃ) পৌঁছন।

তাঁরা দুটি দড়িতে বিভক্ত হয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। নেতা এবং পল প্রথম দড়িতে, জন এবং ডানকান দ্বিতীয় দড়িতে অগ্রসর হন। নেতা এবং পল তুষারক্ষেত্রের ওপর দিয়ে শিখরের দিকে এগিয়ে চলেন।

অবশেষে তাঁরা শিখরে উপস্থিত হন। সেদিনটি ছিল ১৫ই আগস্ট।

কিছুক্ষণ শিখরে অবস্থান করার পরে নেতা ও পল অবরোহণ শুরু করেন। নেমে আসার পথে তাঁদের সঙ্গে জন ও ডানকানের দেখা হয়। নেতা সুসংবাদ দিয়ে তাঁদেরও শিখরে আরোহণ করতে বলেন। উৎসাহিত হয়ে তাঁরা চলার বেগ বাড়িয়ে দেন।

কিছুদূর নেমে আসার পরে নেতা দেখতে পেলেন জন এবং ডানকান শিখরে পৌঁছে গেছেন। পুলকিত অন্তরে তিনি পল্‌কে নিয়ে শিবিরে ফিরে আসেন। গরম পানীয় তৈরি করে নিজেরা খান, সহযাত্রীদের জন্য রেখে দেন। ওঁদের পথ চেয়ে তাঁবুতে এসে বসে থাকেন।

ওঁরা আসেন না। দিনের আলো মিলিয়ে যায়, নেমে আসে রাত। রাতের পরে ভোর হয়। কেটে যায় দিন। তারপরে আরও একদিন। কিন্তু তাঁদের প্রতীক্ষার অবসান হয় না, প্রিয় সহযাত্রীরা ফিরে আসেন না।

প্রকৃতি আর শান্ত থাকতে পারেন না। আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। শুরু হয় তুষারপাত। তারই মধ্যে ২০শে আগস্ট নেতা ও পল 'সাউথ কল্‌' পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু নিখোঁজ সতীর্থদের কোন চিহ্ন দেখতে পান না।

সেখানেই অন্বেষণ শেষ হয় না। রাজ্যসরকারও পরে পুলিশ দপ্তরের কয়েকজন পর্বতারোহীকে অনুসন্ধানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাঁরা অভিশপ্ত পর্বতারোহীদের খুঁজে পান নি। তাঁদের অনুমান জন ও ডানকান শিখর থেকে নেমে আসার পথে পড়ে গিয়েছেন, ব্রহ্মালোকের যাত্রীরা পিতামহ ব্রহ্মার পদতলে স্থায়ী আসন নিয়েছেন।

—শঙ্কুদা, সামনে তাকিয়ে দেখুন, কি অপরূপ দৃশ্য!

জয়ের কথায় ব্রহ্মাজীর কথা থামাতে হয়। আমি ওদের কাছে ১৯৪৮ সালের বৃটিশ ব্রহ্মা অভিযানের কথা বলছিলাম। এবারে সামনে তাকাতে হয়।

জয় ঠিকই বলেছে। কিবার সত্যই অপরূপ। আমরা ইতিমধ্যে তার অনেকটা কাছে

নেমে এসেছি। দু-দিকে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে কিবার নাচতে নাচতে নিচে নামছে। নদী নয় যেন কতগুলো স্ফটিকের সিঁড়ি, তাই বেয়ে ব্রহ্মবারি নেমে আসছে মর্ত্যলোকে। মুক্তাধারার ওপরে একটি কাঠের পুল। সেই পুল পেরিয়ে পথ। সত্যই অপরূপ।

কয়েক মিনিট হেঁটে পুলের ওপরে উঠে আসি। এখান থেকে কিবারকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তবে সেই সঙ্গে ভয়ঙ্করও মনে হচ্ছে। দুর্বার বেগে ফেনিল জলরাশি পুলের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে। পুলের ওপরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করা গেল। জগদীশ তপন ও রঞ্জু প্রাণভরে ছবি নিল। আর তারপরেই গৌতম ও শিবু রঞ্জুকে নিয়ে আমাদের ধরে ফেলল। আবার সবাই একসঙ্গে সারি বেঁধে এগিয়ে চলি।

আস্তে আস্তে চলতে হয়। কারণ সংকীর্ণ এবড়োখেবড়ো চড়াই পথ। এতক্ষণ নদী আমাদের বাঁয়ে ছিল, এখন ডাইনে। এতক্ষণ বনের ভেতর দিয়ে এসেছি, এখন পথের পাশে খাড়া পাহাড়। গাছপালা খুবই কম। তবে আজও মেঘলা আকাশ, রোদের তেমন তেজ নেই। চলতে আরাম লাগছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তা না করে পারছি না। বৃষ্টি নামলে বিপদে পড়ব।

কিন্তু বৃষ্টি নয়, ব্রহ্মা পর্বতাভিযানের প্রসঙ্গই আবার ফিরে আসে। শৈলেশ বলে—১৯৪৯ সালেও তো একদল জাপানী অভিযাত্রী ব্রহ্মা পবর্তাভিযানে এসেছেন?

—হ্যাঁ। আমি উত্তর দিই। বলি—তাঁরা সিক্‌ল মুন ও ব্রহ্মা পর্বতে আরোহণ করেছেন।

—তাহলে তাঁদের কথা বলুন। গোরা অনুরোধ করে।

আমি শুরু করি—আটাত্তর সালের দুর্ঘটনাও কিন্তু ব্রহ্মা পর্বতের প্রতি পর্বতারোহীদের আকর্ষণ কিছুমাত্র কমাতে পারে নি। তাই পরের বছর আবার জাপানীরা ব্রহ্মলোকে আসেন।

কিশ্‌তোয়ার হিমালয়ের প্রতি জাপানীদের আকর্ষণ বহুদিনের। ১৯৪১, ১৯'৪৩ ও ১৯৭৫ সালে তাঁরা ব্রহ্মলোকে তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু সব কয়টি অভিযান বিফল হয়। তার ওপরে পঁচাত্তর সালের অভিযানে সহনেতা সাতোরু তাকাচি এবং শেরপা আঙ ছাতার শহীদ হন। আর তাই বোধকরি উনআশি সালে জাপানের এ্যাল্‌পাইন ক্লাব আবার অভিযানের আয়োজন করেন।

কিশ্‌তোয়ার হিমালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শৃঙ্গ সিক্‌ল মুন (৬,৬০৯ মিঃ/২১,৬৮৬ ফুট) এবং ব্রহ্মা-১ (৬,৪১৬ মিঃ/২১,০৪৯ ফুট) আরোহণের উদ্দেশে দশজনের অভিযাত্রীদল এদেশে আসেন। কাটসুহিকো ডেণ্ডা (Katsuhiko Denda) নামে জনৈক প্রখ্যাত পর্বতারোহী অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তাঁরাও সত্তরচিনের পথে গিয়েছেন। ওঁরা এমন জায়গায় মূল-শিবির স্থাপন করেছিলেন, যেখান থেকে দুটি শৃঙ্গে অভিযান চালানো যায়।

অভিযাত্রীরা ১লা সেপ্টেম্বর ৩,৫০০ মিটার (১১,৪৮৩ ফুট) উঁচু সত্তরচিনে মূল-শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রবর্তী মূল-শিবির ও এক নম্বর শিবির স্থাপিত হয় ব্রহ্মা হিমবাহে যথাক্রমে ৪,০০০ মিটার (১৩,১২৩ ফুট) ও ৪,২০০ মিটার (১৩,৭৮০ ফুট) উচ্চতায়। সেখান থেকে তাঁরা অনায়াসে ৪৫০০ মিটার (১৪,৭৬৪ ফুট) পর্যন্ত আরোহণ করেন। কিন্তু তারপরেই একটা তুষার সম্প্রপাতের জন্য তাঁদের অগ্রগতি বুদ্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তাঁরা বাঁদিকে সরে এসে ২৪০ মিটার (৭৮৭ ফুট) 'ফিক্‌সড রোপ' করে

একটা তুষারঢাল অতিক্রম করেন। উপস্থিত হন একখণ্ড তুষারক্ষেত্রে। সেখানে ৪,৮০০ মিটার (১৫,৭৮০ ফুট) উচ্চতায় তাঁরা দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে একটা বরফ পড়ে থাকা পাথুরে গিরিশিরার ওপরে আরও ১০০০ মিটার (৩২৮১ফুট) ফিক্সড রোপ করে অভিযাত্রীরা ৫,২০০ মিটার (১৭,০৬০ ফুট) উঁচুতে তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

ইতিমধ্যে মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার পরে পনেরো দিন কেটে গিয়েছে। অর্থাৎ তিন নম্বর শিবির স্থাপিত হয় ১৫ই সেপ্টেম্বর। তারপরে অভিযাত্রীরা দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা ধরে অগ্রসর হয়ে সেই গিরিশিরার ওপরেই ৫,৬০০ মিটার (১৮,৩৭৩ ফুট) উঁচুতে চার নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে তাঁরা ব্রহ্মা-১ ও ব্রহ্মা-২ শিখর দুটিকে দেখতে পাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য সিক্‌ল মুন শিখর দেখা যাচ্ছিল না। কারণ ৬৪১৫ মিটার (২১,০৪৭ ফুট) উঁচু একটি অনামী শিখর তাকে আড়াল করে রেখেছিল। বাধ্য হয়ে তাঁদের ছ'দিন ধরে আরও ১২০০ মিটার (৩৯৩৭ ফুট) ফিক্সড রোপ লাগিয়ে সেই অনামী শৃঙ্গটিকে অতিক্রম করতে হল।

আর তারপরেই তাঁরা উপস্থিত হলেন একটি প্রকাণ্ড প্রশস্ত তুষার অধিত্যকায়। তারই ওপরে সিক্‌ল মুন শিখরটি যেন সাদা থালায় আইসক্রিম-পিরামিডের মতো বসে রয়েছে। অভিযাত্রীরা সেই অধিত্যকার ওপরে ৬২০০ মিটার (২০,৩৪১ ফুট) পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করলেন। জায়গাটা এত প্রশস্ত ও সমতল যে সেখানে অনায়াসে হেলিকপ্টার অবতরণ করতে পারে। এবং সেখান থেকে শিখর মাত্র ১৩৪৫ ফুট উঁচু।

তাহলেও ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশ্য পরদিন সাতজন অভিযাত্রী শিখরে আরোহণ করেন। বাকি তিনজন শিখরে আরোহণ করেন তার পরদিন অর্থাৎ ১লা অক্টোবর। ৫ই অক্টোবর তাঁরা সবাই নিরাপদে মূল-শিবিরে ফিরে আসেন। অর্থাৎ শুধু সিক্‌ল মুন শিখরে আরোহণ করতেই জাপানী অভিযাত্রীদের পাঁচ সপ্তাহ লেগেছে।

—আর সেজন্য তাঁদের ২৪৪০ মিটার অর্থাৎ ৮০০৫ ফুট ফিক্সড রোপ করতে হয়েছে। কৃষ্ণ মন্তব্য করে।

—আমরা মাত্র হাজারখানেক ফুট রোপ নিয়ে এসেছি। শিবুর কণ্ঠে হতাশা।

গৌতম তাকে ভরসা দেয়—কিন্তু ওঁরা তো সিক্‌ল মুন ক্লাইম্ব করেছেন। আমাদের ব্রহ্মা-১ শিখরে অত ফিক্সড রোপ লাগবে না। তাছাড়া ক্রিস্ বনিংটন ফিক্সড রোপ না করেই ব্রহ্মা শিখরে আরোহণ করেছেন এবং আমরা তাঁরই পথে যাচ্ছি।

—না লাগলেই ভাল। শৈলেশ বলে—কিন্তু থাকগে সেকথা। শঙ্কুদা এবারে আপনি জাপানীদের ব্রহ্মা-১ অভিযানের কথা বলুন।

গোরা প্রতিবাদ করে—শঙ্কুদাকে একটু জিরিয়ে নিতে দে! দেখছিস না পথ কিরকম চড়াই।

কথাটা ঠিকই বলেছে গোরা। আজকের পথ পরশুর চেয়ে খারাপ। তবে আজ পা দু-খানি সেদিনের চেয়ে পটু হয়ে উঠেছে, আর দমও কিছু বেড়েছে বোধকরি। তাই আজ অত কষ্ট হচ্ছে না। তাছাড়া আজ আমরা গল্প করতে করতে পথ চলেছি। চলতে চলতে আমি ওদের ১৯৭৯ সালের জাপানী অভিযানের কথা বলছিলাম।

একটু হেসে গোরাকে বলি—হিমালয়ের পথে হিমালয়ের গল্প করতে শ্রান্তি বাড়ে না, বরং কমে যায়।

—তাহলে বলুন জাপানীদের ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের কাহিনী। রঞ্জু আমাকে বলে। সে-ও শৈলেশের দলে। আর জয় টুলটুল এবং নেতা মাথা নেড়ে সমর্থন জানায় তাকে।

তবু শুরু করতে পারি না। তার আগেই কৃষ্ণ বলে ওঠে—মনে হচ্ছে কিবার গাঁও এসে গেল। সামনের ঐ বাঁকটা পার হলেই বাড়ি-ঘর দেখা যাবে।

জগদীশ তপন ও সহনেতা সমর্থন করে তাকে। আমরা তাড়াতাড়ি পা চালাই।

ওদের অনুমান বোধকরি মিথ্যে নয়। কারণ ইতিমধ্যে উপত্যকাটি প্রশস্ত হয়েছে। বাঁদিকের পাহাড়গুলি অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। ডানদিকে পথের পাশে নদীর ধারে ছোট ছোট ক্ষেত, রামদানা আর ভুট্টার ক্ষেত। পথের ধারে বড় বড় গাছ। তাদের ডালে ডালে অন্যান্য গাছের ডাল-পালাকে মালার মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শীত আসছে, তাই জ্বালানী সঞ্চয় করে রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ মনুষ্য বসতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

চড়াই পথের শেষে বাঁক ফিরতেই গ্রাম দেখতে পেলাম। কিবার নালার তীরে কিবার গাঁও—এ পথের শেষ গ্রাম। উচ্চতা ৭০০০ ফুট অর্থাৎ ২১৩৪ মিটাব। সোন্দার থেকে দূরত্ব ৮ কিলোমিটারের মতো। আট কিলোমিটারে দেড় হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছি। তিনঘণ্টার মতো সময় লেগেছে। পরশুদিনের তুলনায় খুবই তাড়াতাড়ি এসেছি। তবে গতকাল সোন্দারে একটি ছেলে বলেছে, ওদের নাকি আসার সময় দুঘন্টা ও যাবার সময় এক ঘন্টা সময় লাগে।

তা হোক্ গে। ওরা হিমালয়ের সন্তান। ওদের কথা আলাদা। কিন্তু আমরাও একটানা হেঁটে দুপুর নাগাদ এখানে পৌঁছে গেলাম, এ কিছু কম কৃতিত্বের নয়। তাই নেতা বলে—এখানে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

—করতেই হবে। শিবু যোগ করে—ঐ দেখুন, গাঁয়ের মানুষ আমাদের স্বাগত জানাতে আসছেন।

তাকিয়ে দেখি সত্যই তাই। কয়েকজন মানুষ সারি বেঁধে নেমে এলেন পথে। সামনের প্রৌঢ় মানুষটি হাতজোড় করে নমস্কার জানায়। তাঁর দেখাদেখি সবাই হাতজোড় করেন। আমরাও প্রতিনমস্কার করি।

প্রৌঢ় বলেন—আমার নাম নারায়ণদাস। পাশের এই বাড়িটাই আমার। গতকালই আমরা শুনেছি আপনাদের কথা। চলুন, আমার বাড়িতে বসে একটু বিশ্রাম করে নেবেন।

এমন আন্তরিক আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না। তাই নেতা ওঁদের আতিথ্য গ্রহণ করে। ক্ষেতের ঢাল বেয়ে আমরা পথ থেকে উঠে আসি নারায়ণদাসের ঘরে। ঘরে বলা ঠিক হল না, আমরা দাওয়ায় বসি। ওঁরা আগেই কম্বল বিছিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, একটা ঝুড়িতে আপেল পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন।

তারই একটা আপেল তুলে খেতে খেতে গ্রামটিকে দেখি। সম্পূর্ণ সমতল নয়। পাহাড়ের ঢালে গ্রাম। তবে খুবই আস্তে আস্তে নিচে নেমেছে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে কিবারের তীর পর্যন্ত প্রসারিত। নদীর ওপারে কিছু পাইন গাছে ছাওয়া খাড়া পাহাড়। নদীটাও গ্রাম থেকে খুব নিচে নয়। ফলে নদীর বিরামহীন গর্জনে গ্রামখানি সর্বদা মুখরিত।

গ্রামবাসীরা জানান তেইসটি পরিবার বাস করেন এই গ্রামে, সব মিলিয়ে শ' দেড়েক

মানুষ। সবাই রাজপুত। গ্রামের মাত্র দুজন যুবক সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে বাইরে থাকেন। বাকি সবারই জীবিকা চাষাবাদ। কিবার নালার তীরে একমাত্র গ্রাম কিবার গাঁও। ফলে এই নদীর তীরে যেখানেই চাষের জমি আছে, তা এঁরাই চাষ করেন।

শুনতে ভাল লাগছিল ওঁদের কথা। কিন্তু কথা থামাতে হল। একটা বেশ বড় এ্যালুমিনিয়ামের ঘটি নিয়ে জনৈক কিশোর আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটা আবার দিশী মদ-টদ নিয়ে এলো না তো!

তাকে দেখিয়ে নারায়ণদাস বলেন—পূরণচাঁদ। আমাদের গাঁয়ের ছেলে সুয়েদ হাইস্কুলে পড়ে।

—কোন ক্লাশ? নেতা জিজ্ঞেস করে।

সপ্রতিভ পূরণচাঁদ উত্তর দেয়—ক্লাশ নাইন।

—আমাদের গাঁয়ে কেউ আর এত উঁচু ক্লাশ পর্যন্ত পড়েনি জনৈক গ্রামবাসী যোগ করেন।

পূরণচাঁদ মাথা নিচু করে। অহঙ্কারে কি লজ্জায়, বুঝতে পারছি না।

—সাবাস। নেতা তার পিঠ চাপড়ে দেয়।

পূরণচাঁদ ঘটিটা নেতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—আমাদের গাইয়ের দুধ। মা গরম করে পাঠিয়ে দিলেন। আপনাদের তেষ্টা পেয়েছে।

নেতা দুহাতে ঘটিটি গ্রহণ করে। বলে—এ যে এখনও গরম রয়েছে দেখছি! তারপরে একটু থেমে গৌতমকে বলে—বুক্‌স্যাক্ থেকে মগ বের করে ভাগ করে খেয়ে নাও। নিজেরা না খেয়ে ছেলেটা আমাদের জন্য দুধ নিয়ে এসেছে।

সহনেতা দুধের ঘটিটি হাতে নিয়ে নেতার নির্দেশ পালন করতে উদ্যোগী হয়।

তপন নেতাকে জিজ্ঞেস করে—ওকে তো কিছু দেওয়া উচিত?

—নিশ্চয়ই! দশটা টাকা দিয়ে দাও।

—কিন্তু টাকা বের করে পূরণচাঁদের দিকে এগিয়ে ধরতেই বিপত্তি বাঁধে। শান্ত মুখচোরা ছেলেটা অশান্ত হয়ে ওঠে। চড়া গলায় বলে—ভাইসাব আমরা গুর্জর নই, আমরা দুধ বেচি না। আমি আপনাদের কাছে দুধ বেচতে আসি নি। আপনারা আমাদের মেহমান বলে আমার মা খাবার জন্য আপনাদের দুধ পাঠিয়েছেন।

সমবেত গ্রামবাসীরা সকলেই মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করেন। মনে হচ্ছে আমাদের আচরণে তাঁরাও মনে আঘাত পেয়েছেন।

সেই ক্ষত নিরাময় করতে চায় নেতা। সে শান্তস্বরে পূরণচাঁদকে বলে—তুমি ভুল ভেবেছো ভাই! আমরা তোমাকে দুধের দাম দিচ্ছি না। টাকা দিয়ে কি তোমাদের এই ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া যায়, না তা দেওয়া উচিত?

—তাহলে! পূরণচাঁদ প্রশ্ন করে। এখনও তার কণ্ঠস্বরে উষ্মা।

নেতা সবিনয়ে উত্তর দেয়—তুমি তো জানো, আমরা পাহাড়ে এসে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের লজেন্স অর্থাৎ মিঠা দিয়ে থাকি।

পূরণচাঁদ মাথা নেড়ে জানায় ব্যাপারটা তার জানা আছে।

এই ফাঁকে অমূল্য গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়াটি একবার দেখে নেয়। তাঁরাও কেউ কেউ মাথা নাড়ছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে নেতা আবার বলতে শুরু করে—কিন্তু এবারে আমাদের মিঠা কম পড়ে গেছে। তাই তোমাকে এই দশটা টাকা দিচ্ছি।

—কিন্তু আমি টাকা দিয়ে কি করব ? পূরণচাঁদ পুনরায় প্রশ্ন করে। এবারে তার গলার স্বর শান্ত হয়েছে।

—এখন রেখে দেবে। সুয়েদ যাবার সময় টাকাটা সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারপরে যখন বাড়ি ফিরে আসবে, তখন তোমার গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য দশটাকার মিঠা কিনে আনবে।

পূরণচাঁদের অভিমান দূর হয়। সে হাত বাড়িতে টাকাটা নেয়। তপন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

দুধ খেয়ে সত্যি শরীরে বল ফিরে এলো। ইতিমধ্যে রঞ্জু কিন্তু ডাক্তারী শুরু করে দিয়েছে। খুবই স্বাভাবিক, এখানে রোগ আছে ডাক্তার নেই।

রঞ্জু তার কাজ করুক, আমরা ততক্ষণ গ্রামের কথা শুনে নিই। ওঁরা বলছেন--আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ নেই। আঠারো-বিশ বছর বয়সে সাধারণতঃ মেয়েদের বিয়ে হয়। অভিভাবকরাই বিয়ে ঠিক করেন তবে ভালোবাসার বিয়েও হয়। কনে কেনার নিয়ম নেই আমাদের সমাজে। বরং মেয়ের বাবাকেই পণ দিতে হয়। ছেলেরা একাধিক বিবাহ করতে পারে কিন্তু বিধবা কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তাদের দ্বিতীয়বার বিয়ে হওয়া প্রায় অসম্ভব !

অর্থাৎ হিমালয়ের এই অন্তরলোকেও পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। আর এখানে বসেও তার প্রমাণ পাচ্ছি। এঁদের পর্দানসীন সমাজব্যবস্থা নয়। তবু পূরণচাঁদের মা নিজে দুধ নিয়ে আসেন নি, ছেলের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুধু তিনি নন, কোন বউ কিংবা বড় মেয়ে এখানে আসেন নি, তাঁরা দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়। সামাজিক সমস্যার পবিবর্তে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রসঙ্গ ওঠে। জনৈক প্রৌঢ় মন্তব্য করেন--শুনতে পাই কাশ্মীরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেড়াতে আসেন। তাঁরা কোটি টাকা খরচ করে যান। সরকারও কাশ্মীরের উন্নতির জন্য কি না করছেন ! আর আমাদের অবস্থা তো নিজের চোখে দেখে গেলেন। অথচ আমাদের দেশ কাশ্মীরের চেয়ে কোনমতেই কম সুন্দর নয় ! তাহলে কেন আমাদের দেশে মানুষ বেড়াতে আসে না ?

কে তার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে ? চুপ করে থাকি। কিন্তু মানুষটি যদি উত্তর দাবী করেন, তাহলে বিপদে পড়ব।

না, রক্ষা পেয়ে যাই। প্রৌঢ় আর কিছু বলতে পারার আগেই আরেকজন যুবক এসে আমাদের নমস্কার করে। তার হাতে একটা বোঝাই থলি।

নেতার সামনে থলিটি রেখে লোকটি বলে—সাব, আমার নাম মঙ্গতরাম। ঐ দূরে আমার ঘর। আপনারা আমাদের মেহমান। আমি আপনাদের খাবার জন্য সামান্য কিছু ক্ষেতের সবজি নিয়ে এসেছি।

মঙ্গতরাম থলিটা খুলে তার উপহার বের করে—আলু কুমড়ো আর শাক।

নেতা তাকে ধন্যবাদ দেয়। তারপরে জয়কে বলে—ম্যানেজার, ভাগা-ভাগি করে জিনিসগুলো কয়েকজনের রুক্‌স্যাকে ভরে নাও। আজও রাতে তরকারী খাওয়া যাবে। পাহাড়ে এসে সবুজ সবজি খেতে পারলে, শরীর ভাল থাকে।

আমি ভাবি অন্যকথা। ভাবি—এতো শুধু সবুজ সবজি নয়, সেই সঙ্গে হিমালয়ের সহজ সরল ও উদার মনের মানুষগুলির মধুর উপহার। হিমালয়ের মানুষ হিমালয়ের

মতই মহৎ ও সুন্দর। আমি তাই হিমালয়ে এসে এই প্রাণময় মানুষগুলির প্রাণের পরশে আপন প্রাণকে প্রাণবন্ত করে তুলি। তারপরে এঁদের সুমধুর স্মৃতি দিয়ে হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে ঘরে ফিরে যাই। শান্ত চিত্তে আবার হিমালয়-ভ্রমণের প্রতীক্ষায় থাকি।

জানি আমার এ প্রতীক্ষা অনন্ত নয়, অনন্ত নয় মানুষের জীবন। অন্তহীন কেবল মানুষের ভালোবাসা। আমি সেই ভালোবাসার উষ্ণ স্পর্শে নিয়ত অভিষিক্ত। এ আমার পরম গৌরব। এ গৌরব যেন আমাকে আমৃত্যু গৌরবান্বিত করে রাখে।

॥ আট ॥

মূল-শিবিরে পাঁচদিন বিশ্রামের পরে ১০ই অক্টোবর (১৯৪৯) জাপানী অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করলেন। ব্রহ্মা হিমবাহের ওপরে ৩৮০০ মিটারে (১২,৪৬৭´) অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপিত হল। সেখান থেকে তাঁরা ব্রহ্মা-১ পর্বতের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা দুটিকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলেন। ক্রিস্ বনিংটন দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা দিয়ে শিখরে আরোহণ করেছেন। তাঁদেরও মনে হ'ল সেটাই সহজ হবে। তাঁরা তাই বনিংটনের পথেই শিখরে আরোহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।...

—কিন্তু শঙ্কুদা, ক্রিস্ বনিংটন তো সত্তরচিন দিয়ে ব্রহ্মা হিমবাহে যান নি?

রঞ্জুর প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে। কিছুক্ষণ আগে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কিবার গাঁও থেকে রওনা হয়েছি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জাপানীদের ব্রহ্মা পর্বতাভিযানের কথা আরম্ভ করতে হয়েছে।

কিন্তু রঞ্জুর প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না আমাকে। আমি কিছু বলতে পারার আগেই কৃষ্ণ বলে—কিবার নালা ও নাম্ব নালা দুটি নদীই এসেছে ব্রহ্মা হিমবাহ থেকে। বনিংটন কিবার নালা ধরে সোনামার্গী হয়ে ব্রহ্মা হিমবাহে পৌঁছেছিলেন আর জাপানী অভিযাত্রীরা নাম্ব নালা ধরে সত্তরচিন হয়ে ব্রহ্মা হিমবাহে অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপন করেছিলেন।...

আর বেশি কিছু বলতে হয় না কৃষ্ণকে। রঞ্জু তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। তাই সে কৃষ্ণকে থামিয়ে দিয়ে আমাকে বলে—আই এ্যাম্ সরি শঙ্কুদা! আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম। আপনি বলুন, তারপরে কি হ'ল?

আবার বলতে শুরু করি—জাপানী অভিযাত্রীদের সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আরও একটি কারণ ছিল।

—কি? জয় জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—সিক্‌ল মুন আরোহণ করতে গিয়ে তাঁদের অধিকাংশ ফিক্‌সড রোপ ফুরিয়ে গিয়েছিল। কারণ নামার সময় তাঁরা সব দড়ি খুলে আনতে পারেন নি। তা ছাড়া সিক্‌ল মুন অভিযানে তাঁদের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাঁরা বনিংটনের পথেই আরোহণ করতে চান। তাঁদের মনে হয় সেই পথে সাজ-সরঞ্জাম কম লাগবে।

একবার একটু থেমে আমি আবার বলতে থাকি—জাপানী অভিযাত্রীরা ব্রহ্মা হিমবাহের দক্ষিণদিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ৪২০০ মিটার (১৩,৭৮০´) উঁচুতে এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপরে হিমবাহের বাঁদিক দিয়ে তাঁরা একসারি তুষার-গহ্বর

অতিক্রম করে একটি তুষারাবৃত মালভূমিতে উপস্থিত হন। এখানেই ৪৯০০ মিটারে (১৬,০৭৬´) অভিযানের দু-নম্বর শিবির স্থাপিত হল।

অভিযাত্রীরা দেখতে পেলেন সেখান থেকে সোজাসুজি দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরায় আরোহণ করা খুবই কষ্টকর। তাই তারা কতগুলো চূড়ার মতো সরু শিখরযুক্ত একফালি তুষারক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে (through a group of Pinnacles) অগ্রসর হয়ে একটা স্পার-এর (Spur) ওপর উঠে এলেন। সেটি তাঁদের দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরায় পৌঁছে দিল। সেখানেই তাঁরা ৫৮০০ মিটার (১৯,০২৯´) উঁচু একটা তুষারশৃঙ্গের ওপর তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন।

২২শে অক্টোবর একই গিরিশিরার ওপরে ৬১০০ মিটারে (২০,০১৩´) অভিযানের চার নম্বর শিবির স্থাপিত হল। সেখান থেকে ব্রহ্মা-১ শিখরের উচ্চতা মাত্র ৩১৬ মিটার অর্থাৎ ১০৩৬ ফুট।

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে অক্টোবর দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আটজন অভিযাত্রী ব্রহ্মা-১ শিখরে জাপানের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করলেন। চার বছর আগে নিহত শহীদদের আত্মা তৃপ্ত হ'ল।

আমার কথা শেষ হয়। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত কেটে যায়। তারপরে সহনেতা বলে—তাহলে জাপানী অভিযাত্রীদের ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করতে কতদিন সময় লেগেছে?

একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিই—মূল-শিবির থেকে রওনা হয়ে শিখরে আরোহণ করতে ঠিক চোদ্দ দিন লেগেছে। সেখান থেকে মূল-শিবিরে ফিরে আসতে আরও দু-তিন দিন লেগে থাকবে।

—তার মানে ষোলো-সতেরো দিন। টুলটুল বলে—আমাদেরও তো তাই লাগবে? সে নেতার দিকে তাকায়।

—না। নেতা বলে—আমি মূল-শিবিরে দু-সপ্তাহ থাকব। তোমরা বারোদিন সময় পাচ্ছ।

—তার মানে দশ দিনের মধ্যে আমাদের শিখরে আরোহণ করতে হবে, এই তো? সহনেতা নেতার দিকে তাকায়।

—Exactly. নেতা উত্তর দেয়।

—O.K.Leader. সহনেতা সম্মতি জানায়।

—Thank you.

নেতা ও সহনেতার এই বাক্য বিনিময় অকারণে নয়। নেতা এবারে ভাঙা পা নিয়ে অভিযানে এসেছে। সে মূল-শিবিরের ওপরে যেতে পারবে না। তাই পর্বতারোহণ পরিচালনা করবে সহনেতা। সে নেতার আদেশ পালন করার প্রতিশ্রুতি দিল।

শিবু কিন্তু অন্যকথা বলে। সে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা শঙ্কুদা, কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের পর্বতারোহণ প্রসঙ্গে জাপানী অভিযাত্রীরা কোন মন্তব্য করেছেন?

একটু ভেবে নিয়ে বলি—হ্যাঁ। তাঁদের মতে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে পর্বতারোহীদের আদর্শ-আরোহণ, ওঁদের ভাষায় 'best alpine objectives' হচ্ছে, ব্রহ্মা-১ শৃঙ্গের উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা, ব্রহ্মা-২ শৃঙ্গের উত্তরগাত্র এবং ব্রহ্মা-২ পর্বত থেকে ফ্ল্যাট টপ শৃঙ্গের ওপর দিয়ে ব্রহ্মা-১ পর্বতকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম বা Traverse করা।

আলোচনা শেষ হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। কেউ আর কোন কথা বলছে না। সবাই

নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। কিই বা বলবে ? নেতা বলেছিল, বেলা একটা নাগাদ কোথাও থেমে লাঞ্চ করা হবে। একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু থামার নামটি নেই। সদস্যরা যখন কেউ কথাটা বলেছে না, তখন আমাকেই বলতে হয়।

নেতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—না, না, ভুলে যাবো কেন ? একি ভুলে যাবার মতো কথা ? তবে তোমরা কিবার গাঁয়ে আপেল আর দুধ খেলে কিনা, তাই 'লাঞ্চ্ টাইম্' একঘণ্টা পেছিয়ে দিয়েছি।

—এক পো দুধ আর দুটি আপেল খাবার জন্য লাঞ্চ্ টাইম একঘণ্টা পেছিয়ে গেল ? তপন কথাটা না বলে পারে না।

কিন্তু নেতা কিছু বলতে পারার আগেই গোরা তাকে মনে করিয়ে দেয়—তাহলেও কিন্তু সময় হয়ে গেছে লীডার ! দুটো বাজে।

—জানি। আর তাই তো জায়গাটাও ঠিক করে ফেলেছি। নেতা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়।

—কোথায় ? বেচারা তপন আবার কথা বলে। ওর খুবই খিদে পেয়ে গেছে। পাবারই কথা।

—ঐ যে, ওপরের ঐ গুহাটায়। দেখছ না, রসিদ ব্রাদার্স বসে আছে।

এই না হলে নেতা। জায়গাটা সত্যই অপূর্ব। এতদূর থেকে একবার দেখে নিয়েই মনে মনে নির্বাচিত করে ফেলেছে। কিন্তু রসিদ ব্রাদার্স ওখানে বসে আছে কেন ? বোধকরি বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদের কাছে আজ সবার খাবার দিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই ওরা এগিয়ে যেতে পারছে না।

আগেই বলেছি, জায়গাটি অপূর্ব। চড়াই পথটা ওখানে পৌঁছে খানিকটা সমতল হয়ে বাঁদিকে বেঁকে গিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে নদীর ধারে সুন্দর একটি গুহা। পাহাড়ী পথে আহার ও বিশ্রামের আদর্শ স্থান। ইচ্ছে করলে গুহাটিতে চার-পাঁচজন অনায়াসে রাত্রিবাস করতে পারে।

ক্লান্ত চরণদুখানির কল্যাণে কোনমতে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর দেহখানি নিয়ে পৌঁছন গেল। সেই গুহার সামনে একখানি পাথরের ওপরে ধপ্ করে বসে পড়ি।

আমরা আসতেই রসিদ ব্রাদার্স উঠে দাঁড়ায়। খাবার বের করতে লেগে যায়। খাবার মানে চিঁড়ে-ছাতু ও চিনি। তারপরেই ছোট রসিদ একটা সসপ্যান বের করে জল আনতে নিচে চলে যায় আর বড়-রসিদ আমাদের রুকস্যাক্ খুলে খুলে মগ বের করতে থাকে।

ছেলেদুটো সত্যই খুব কাজের। কখনও কোন কাজে ক্লান্তি নেই। আর মুখে সবর্দা লেগে আছে হাসি। তাছাড়া শুধু আমাদের নয়, ওরা শেরপা আর 'হ্যাপ্-দের ফরমাস পর্যন্ত খেটে চলেছে।

তুষারশীতল জল দিয়ে চিঁড়ে ও ছাতু মাখা হয়েছে। তবু তা খেয়েই প্রাণে যেন বল ফিরে এলো। কিন্তু খাবার পরে বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল না। মেট তাগিদ লাগায়—চলিয়ে সাব।

নেতা নির্দেশ দেয়—গৌতম, তুমি শিবু জগদীশ ও কৃষ্ণকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও। শেরপা ও হ্যাপ্‌দের দেখা পেলে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যেও। আর ঠিক কথা...। একবার থামে অমূল্য। তারপরে আবার বলে—যে দুজন কুলি মেস-টেন্ট্ বইছে, তারাও যেন তোমাদের সঙ্গে থাকে। দোবাতি পৌঁছেই তাঁবু টাঙ্গিয়ে ফেলবে।

ওরা জোর কদমে এগিয়ে যায়। আমরাও হাঁটা শুরু করি। নেতা আবার বলে—আমার পায়ে বড্ড ব্যথা হচ্ছে, আমি মেট সাবের সঙ্গে আস্তে আস্তে আসছি, তোমরা এগিয়ে যাও।

সেই আঁকাবাঁকা পথ। আজ চড়াই বেশি, উৎরাই কম। তবে কোথাও সোজা নয়। সোজা পথের কথা ভুলতে বসেছি।

সংকীর্ণ পথ। পাশাপাশি দুটি মানুষ চলতে পারে। কোথাও কোথাও তাও নয়। একেবারে পায়ে-চলা পাকদণ্ডি।

পথের বাঁদিকে বনময় পাহাড়, ডানদিকে কিবার—কোথাও কাছে, কোথাও অনেক নিচে। কিবারের কলরব শুনতে শুনতে আমরা নীরবে পথ চলেছি।

এখন আর পথেব পাশে কেবল বনময় পাহাড় নয়, বনের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। বড় বড় গাছের বন। দিনের আলোতেও অন্ধকার। স্যাঁতস্যাঁতে পথ। কেমন একটা অচেনা গন্ধ। বোধকরি ভিজে মাটি আর পচা পাতার।

মুখে যাই থাকুক, এখন পর্যন্ত অমূল্য কিন্তু মেটকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে সমানে পথ চলেছে। কেমন করে, তা সে-ই বলতে পারে। আমরা সুস্থ পা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আর সে ভাঙা পা নিয়ে এই প্রাণান্তকর পথ পেরিয়ে চলেছে।

তাই মেট মনে হচ্ছে, নেতাকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। সে কেবল আমাদের উৎসাহ দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই বলছে—সাব্, আউর কুছ করনা নেই, স্রেফ খালি কদম উঠাইয়ে।

—তা তো বুঝতে পারছি ভাই! কিন্তু কদম ওঠাতেই যে প্রাণপাখি খাঁচা ছাড়া হতে চাইছে।

—আউর থোরাসা সাব্! খালি একঠো চড়াই। উসকি বাদ একদম সিধা রাস্তা।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবু শুনতে ভাল লাগে। মানুষটি সর্বদা আমাদের সাহস দিচ্ছে, উৎসাহিত করছে। অথচ এসব ওর কাজ নয়। ওর কাজ মালপত্র আর মালবাহক সামলানো। আগেই বলেছি এ অঞ্চলের মানুষ ভাল। কিন্তু মেট যেন একটু বেশি ভাল। আমাদেরও অদৃষ্ট ভাল। এমন মানুষকে সর্দার রূপে পেয়েছি। এখন শেষটুকু ভাল হলেই সব ভাল হয়।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। এটাও বনময় পাহাড়। পাইনগাছই বেশি। তবে ভূজগাছও শুরু হয়ে গেছে। তার মানে আমরা অন্তত ন'হাজার ফুটে এসেছি। ন' হাজার ফুটের নিচে ভূজগাছ বড় একটা জন্মায় না।

পাহাড়ের ওপরে বনপথ হলেও সমতল পথ নয়। পাথর বোঝাই চড়াই-উৎরাই। তবে আগের চেয়ে ওঠা-নামা কিছু কম করতে হচ্ছে। আর তাই বোধকরি মেট তখন বলেছে—একদম সিধা রাস্তা।

আজও ওয়াটার বটলে জল নিয়ে সোন্দার থেকে রওনা হই নি। তবু পথে জলের অভাব হয় নি। মাঝে মাঝেই ঝরণা পাচ্ছি। তেষ্টা পেলেই জল খেয়ে নিচ্ছি।

বনময় পাহাড়টার ওপর থেকে একটা প্রস্তরময় প্রান্তরে উঠে এলাম। বিরাট বিরাট পাথর ডিঙিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। এপারে যতদূর দৃষ্টি চলে, কোথাও তাঁবু ফেলবার মতো জায়গা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওপারে পাহাডের পাদদেশে চমৎকার একফালি সমতল ময়দান। নদীর ওপরে একটা সাঁকো রয়েছে। এখানে গ্রাম নেই। বোধকরি

বনবিভাগের কর্মীদের যাওয়া-আসার জন্যই এই সাঁকো। অনায়াসে ওপারে গিয়ে তাঁবু ফেলা যায়।

কিন্তু কোথায় তাঁবু ? মালবাহকরা এগিয়ে গেছে। অতএব ঐ রমণীয় সমতলে রাত্রিবাসের সুযোগ পাওয়া গেল না। আমরা এগিয়ে চলি।

চলা অবশ্য কোনমতেই সহজ নয়। পাথর ডিঙ্গিয়ে চলা। কখনও লাফিয়ে, কখনও পাশ কাটিয়ে আবার কখনও বা নিচে নেমে দুই পাথরের ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়া। এই উচ্চতায় এ বয়সে এমন করে চলতে গিয়ে কেবলি দম ফুরিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে জিরিয়ে নিতে হচ্ছে।

কিন্তু আর কতক্ষণ ? সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। পা দুখানি যে আর দেহের ভার বইতে পারছে না। ক্লান্ত দেহ বিশ্রাম চাইছে।

চাইলেই যদি পাওয়া যেত তাহলে তো এ সংসারে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব থাকত না। সুতরাং আশ্রয় ও আহারের কথা যাক, তার চাইতে আস্তে আস্তে আমার এই দেহখানি বয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

এখানে বড় গাছ নেই তবে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে মাথা উঁচু করে আছে নানা জাতের ছোট-ছোট গাছ আর নানা রঙের ফুল। কীট পতঙ্গও রয়েছে। উড়ছে প্রজাপতি।

এই পাথুরে উপত্যকায় বড় গাছ না থাকলেও বন ফুরিয়ে যায় নি। সামনে বনভূমি দেখতে পাচ্ছি। ভারী সুন্দর দেখাচ্চে। মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের পাদদেশে আর কিবারের তীরে সবুজ দ্বীপ।

হঠাৎ দেখতে পেলাম ওদের, আমাদের মালবাহকদের। পাথুরে প্রান্তর পেরিয়ে একফালি সমতল পেয়ে ওরা মাল নামিয়ে বসে পড়েছে। জায়গাটা সমতল হলেও শিবির স্থাপনের উপযোগী নয়। জল অনেক নিচে আর চারিদিক খোলা, প্রবল হাওয়া বইছে।

ওরা কেন বসে পড়েছে জানি না। তবু বসার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, একটু বসে নেওয়া যাক। আমরাও বসে পড়ি।

একটু বাদে টুলটুল বলে—এরা কি আর যাবে না, নাকি ?

—তাই তো মনে হচ্ছে। শৈলেশ উত্তর দেয়।

—কিন্তু আমরা তো আজ দোবাতি যাবো ! সেখানে যেতে আরও ঘণ্টাখানেক লাগবে। তপন বলে ওঠে। সে গতবছর সমীক্ষায় এসেছিল।

জয় সেই কথাই বলে মালবাহকদের।

তারা ক্লান্তকণ্ঠে বলে—সাব্ আউর নহী সক্তে।

কথাটা মিথ্যে নয়। পিঠে বোঝা নিয়ে এই দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া সত্যই কষ্টকর। তাছাড়া ওরাও তো মানুষ।

তবু অমানুষ হতে হয় আমাদের। রঞ্জু বলে—কিন্তু ওরা যে তাঁবু নিয়ে এগিয়ে গেছে ! এখানে থাকব কোথায় ? তাছাড়া খাবার ও শোবার জিনিসপত্র সব এখানে পড়ে থাকলে ওরাই বা রাত কাটাবে কেমন করে ?

—আমরা যে আর পারছি না সাব ! মালবাহকরা সমস্বরে বলে ওঠে। বলে—বহুত মেহনত কিয়া, আউর নহী সক্তে।

বলে—ছ'টা বাজে। একটু বাদেই সন্ধ্যা হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে পথ চলব কেমন করে ?

অমূল্য পেছনে, গৌতম সামনে চলে গেছে। আমাকেই কথা বলতে হয়। ওদের কাছে এসে বলি—আমাদের সবার সঙ্গে টর্চ রয়েছে, তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া সন্ধ্যা হবার আগেই আমরা দোবাতি পৌঁছে যাবো। তোমরা তো জানো, সেখানে শীত কম। তোমাদের থাকবার গুহা আছ, কাঠ আছে, আগুন জ্বালাতে পারবে। এখানে এই খোলা মাঠে থাকবে কোথায় ?

কিছু কাজ হয়। নাথুরাম ঠাকুর মাথা নাড়ে। নিজেদের ভাষায় কি যেন বলে ওদের। কিন্তু ওরা তার সঙ্গে একমত হয় না।

আমি আবার বলি—জানি তোমাদের খুবই কষ্ট হয়েছে সারাদিন। কিন্তু এখানে থাকলে সে সারারাতও কষ্ট করতে হবে। শোবে কোথায়, আগুন জ্বালাবে কেমন করে ? তোমরা সবাই এপথে এসেছো, তোমরা তো সবাই জানো দোবাতি কেমন সুন্দর জায়গা ' আর জায়গাটাও এখান থেকে সামান্যই দূরে। তাই বলছিলাম, আরেকটু কষ্ট করে চলো। আমি কথা দিচ্ছি, ওখানে পৌঁছলেই গরম গরম চা খাওয়াবো।

ঠাকুব আবার আমাদের পক্ষ নেয়। এবং এবারে হিন্দীতেই সঙ্গীদের বলে—সাব্ ঠিকই বলেছেন, দোবাতি এখান থেকে সামান্যই দূর, সামনের ঐ জঙ্গলটাতেই দোবাতি। ওখানে গুহা আছে, জ্বালানী আছে। এখানে থাকবি কোথায় ?

—ঠিক হ্যায়, মেটসাব্‌কো আনে দেও। মধ্যবয়সী মালবাহক বসের বলে। ওর বক্তব্য, যদি যেতে হয়, মেটকে জিজ্ঞেস করে তবে রওনা হবে।

আমি অনুরোধ করি—তোমরা তো জানো, লীডারসাবের পায়ে চোট। সে জোরে হাঁটতে পারে না। তাই মেটসাব তাকে নিয়ে আসছে। ওদের দেরি হবে। তখন তোমাদের আরও অসুবিধে হবে। তাই বলছিলাম, এখনও দিনের আলো রয়েছে। এক্ষুনি এগিয়ে যাওয়া ভাল। দোবাতি পৌঁছে আরাম করতে পারবে।

এবারেও ঠাকুর ছাড়া সবাই নীরব থাকে। কেবল ঠাকুর নিজেদের ভাষায় কি যেন বোঝাচ্ছে। বোধকরি আমাদের জন্য ওকালতি করছে।

আমি আবার বলতে থাকি—তোমরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে ছোট, তোমরা পাহাড়ী মানুষ আর আমি কলকাতার লোক। অবশ্য তোমরা বলতে পারো, তোমাদের পিঠে বোঝা। কিন্তু আমিও তো এই বয়সে রুক্‌স্যাক্ বইছি। আমি বুড়োমানুষ হয়ে যেতে চাইছি, আর তোমরা পাহাড়ী নওজোয়ান হয়ে ভয় পেয়ে গেলে ! তোমাদের সরম লাগা উচিত।

কথাটা প্রৌঢ় মালবাহক নাথুরাম ঠাকুরকে উত্তেজিত কবে তোলে। সে উঠে দাঁড়ায়। মাল পিঠে তুলে বলে—চলিয়ে সাব্ ! হাম জায়েগা আপকো সাথ।

যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে তার সিদ্ধান্ত। আকবর আবদুল ও আনোয়ার উঠে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের ভাষায় অন্যদের কি যেন বলে।

একে অপরের দিকে তাকায়। এবং একটু বাদে সবাই পিঠে মাল নেয়। বিজয়ী বীরের মতো নাথুরাম ঠাকুর বলে—চলিয়ে সাব !

আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

আবার শুরু হল পাথর। এবং সেগুলো এক সমতলে নয়। ক্রমেই ওপরে উঠেছে। আমরা সেই পাথর বেয়ে ওপরে উঠছি। উঠছি তো উঠছিই। সামনের বনভূমি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কাছে। ওখানেই কি দোবাতি ? তাহলে তো ওরা এতক্ষণে তাঁবু

টাঙ্গিয়ে ফেলেছে। ভাবতেও ভাল লাগছে।

কিন্তু তাঁবু দেখতে পাবার আগে ভরসা নেই। কে জানে দোবাতি আর কতদূর। সেই সকাল ন'টায় সোন্দার থেকে হাঁটা শুরু করেছি। এখন ছ'টা বেজে গেছে। পথে সব মিলিয়ে বড়জোর ঘন্টাখানেক ঠিকমত বিশ্রাম করেছি। তার মানে আটঘন্টার মতো এই দুর্গম পথে পদচারণা করছি। এ পথের শেষ কোথায় ?

পাথুরে প্রান্তর শেষ হয়ে গেল। উঠে এলাম বনভূমিতে। ঘন বন। দুপুরেই বোধকরি সামান্য সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে পারে। এখন প্রায় অন্ধকার। কেনই বা হবে না। সাড়ে ছ'টা বাজে। সন্ধ্যা সমাগত।

আমরা কিবারের তীরভূমি থেকে অনেকটা বাঁয়ে সরে এসেছি। কিবার আমাদের ডাইনে। এখানে অবশ্য তার সামান্য গর্জন ভেসে আসছে।

এ বনটাও একটা পাহাড়ের মাথায়। তবে এখানে পাথর কম, মাটি বেশি। নরম ও সংকীর্ণ স্যাঁতস্যাঁতে পথ। সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জনহীন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা কয়েকজন ছন্নছাড়া ভবঘুরে মানুষ পথ চলেছি। শব্দহীনা নীরব প্রকৃতি। কেবল আমাদের জুতো আর আইস এ্যাক্‌স-য়ের শব্দ এই অসাড় ও অসীম নীরবতার নিদ্রাভঙ্গ করছে।

সহসা শৈলেশ কথা বলে—এবারে আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

—কেন বল্ তো ? জয় জিজ্ঞেস করে।

শৈলেশ উত্তর দেয়—আজ এখন পর্যন্ত বৃষ্টি পাইনি, কিন্তু এখানে আজও বৃষ্টি হয়েছে। দেখছিস না পথে কেমন জল জমে আছে। জুতোর ছাপও দেখতে পাচ্ছি।

—গৌতমদের পায়ের ছাপ। টুলটুল যোগ করে।

পিচ্ছিল পথ, আলো আরও কমে এসেছে, দেখে চলতে হচ্ছে। তাই কেউ আর কথা বলছে না। সবাই নীরবে পথ চলেছে।

সেকি ! অবেলায় আবার রোদ উঠল নাকি ? আলো বেড়ে গেল কেন ? তাড়াতাড়ি ওপরে তাকাই। ওখানে দেখছি বনের মাঝে খানিকটা জায়গায় বড়গাছ নেই।

সহসা শৈলেশ চেচিয়ে ওঠে—ব্রহ্মাজী !

—কোথায় ? আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করি।

—ঐ তো, আমাদের সামনে, আকাশে !

সত্যই তাই। যাঁকে দেখার জন্য এই বয়সে পর্বতাভিযানে এসেছি, তিনদিন ধরে এই দুর্গম পাহাড়ী পথ ভাঙ্গছি, তিনি আমার সামনে, প্রায় মাথার ওপরে। তাড়াতাড়ি দুহাত কপালে ঠেকিয়ে পিতামহ প্রজাপতিকে প্রণাম করি। বলি—হে স্বয়ম্ভু, আমরা তোমাকে দর্শন করতে এসেছি, তোমার পূজা দিতে এসেছি। তুমি দয়া করে গ্রহণ করো, আমাদের জীবন ধন্য করো।

রঞ্জু আর চুপ করে থাকতে পারে না, সে চিৎকার করে ওঠে—বলো ব্রহ্মজীকি...

—জয় !

—জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাজীকি...

—জয় !

—চতুরানন ব্রহ্মাজীকি...

—জয় !

আমাদের জয়ধ্বনি শেষ হয়, কিন্তু মিলিয়ে যায় না। ওপর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তারাও জয়ধ্বনি করছে। নিজেদের নয়, ব্রহ্মাজীর।

এখানে এখন আমরা ছাড়া আর কারা ব্রহ্মাজীর জয়গান গাইবে? গৌতমরাই ব্রহ্মাজীর জয়ধ্বনি করে আমাদের কাছে ডাকছে। এতক্ষণে ওরা বোধহয় তাঁবু টাঙ্গিয়ে চায়ের জল গরম করে ফেলেছে।

দেহের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মরীয়া হয়ে ছুটতে শুরু করি। জানি না কতদূর ছুটতে হবে?

বেশিদূর ছুটতে হয় না। মিনিট পাঁচেক পরেই তাঁবু দেখতে পাই। গৌতম কৃষ্ণ জগদীশ ও শিবু তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ঘড়িতে এখন সন্ধ্যা সাতটা। তার মানে সোন্দার থেকে এই দশ মাইল পথ আসতে ঠিক দশঘন্টা সময় লেগেছে। কমই লেগেছে বলতে হবে, কারণ আমরা আজ পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছি। দোবাতির উচ্চতা ১০,৫০০ ফুট অর্থাৎ ৩২০০ মিটার। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আজকের পদযাত্রার যতি পড়ল। এবং এবারে সত্যি সত্যি আমার ক্লান্ত চরণযুগল বিশ্রাম লাভ করতে পারবে।

॥ নয় ॥

ঘুম ভেঙে যায়। ভোর হয়েছে। তাঁবুর ভেতরে প্রচুর আলো। বোধহয় অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। গতকাল সারাদিন শরীরের ওপর খুবই ধকল গেছে। দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পেরিয়ে সোন্দার থেকে দোবাতি এসেছি। তাই সকালে ঘুম ভাঙ্গে নি আমাদের। সবাই এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

স্লীপিং-ব্যাগের জীপ খুলে হাত বের করি। টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখি।

সেকি, সাড়ে তিনটে! ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি কানের কাছে হাত আনি।

না। ঘড়ি চলছে। তাহলে রাত সাড়ে তিনটেয় ঘুম ভেঙেছে আমার।

কিন্তু বাইরে এতো আলো কেন? মালবাহকরা আগুন জ্বালিয়েছে নিশ্চয়। কি করবে, বেচারীদের গরম জামা-কাপড় নেই। তাই বনের কাঠ জ্বালিয়ে শরীর গরম রাখছে।

আচ্ছা, একটা কথা বুঝতে পারছি না, ঘুম ভাঙল কেন? আমার যে চিরকাল একঘুমে রাত ফুরিয়ে যায়। তাহলে কি 'অল্‌টিচ্যুড সিকনেস'? উচ্চতাজনিত রোগের মধ্যে অনিদ্রার স্থান প্রথম সারিতে।

তাই বলে মাত্র সাড়ে দশ হাজার ফুটে অলটিচ্যুড সিকনেস! কি জানি হতেও বা পারে। বয়স হচ্ছে, চার বছর পরে এত উঁচুতে এলাম। তাছাড়া গতকাল দশ মাইলের মধ্যে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি। সোন্দার ৫,৫০০ ফুট উঁচু আর দোবাতি ১০,৫০০ ফুট।

রাতে ঘুম ভাঙ্গলেই আমাকে একবার বাইরে যেতে হয়। এই সাড়ে দশ হাজার ফুট উঁচুতে রাত সাড়ে তিনটের সময় স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে তাঁবুর বাইরে যাওয়া

খুবই কষ্টকর। উপায় কি? ঘুম যখন ভেঙে গেছে, তখন আমাকে একবার বাইরে যেতেই হবে।

উঠে বসি। স্লীপিং ব্যাগের বাইরে আসি। প্রচণ্ড শীত। তাড়াতাড়ি বালিশের পাশ থেকে সোয়েটার নিয়ে গায়ে চাপাই, বালাক্লাবা টুপি দিয়ে মাথা ও কান ঢাকি। তারপরে সন্তর্পণে টর্চ জ্বালিয়ে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে চলি।

চলা কি যায়? একটা মেস টেন্টে আমরা বারোজন। তাঁবু আরও আছে, তবে ছোট। কে এই আড্ডা ফেলে অন্য তাঁবুতে গিয়ে শোবে?

তার ওপরে দুদিন বাদেই তো ছাড়াছাড়ি হবে, পর্বতারোহী সদস্যরা মূল-শিবির ছেড়ে ওপর চলে যাবে। তাই যে ক'দিন পারা যায় আমরা একসঙ্গে থাকব ঠিক করেছি।

কারও ম্যাট্রেসের পাশ দিয়ে, কাউকে ডিঙ্গিয়ে কোনমতে এসে পৌঁছই তাঁবুর দরজায়। জুতো খুঁজে পেতে সময় লাগল না। জুতো পরে তাঁবুর 'চেন' খুলে বাইরে আসি।

আর এসেই ভুল বুঝতে পারি। সূর্য নয়, আগুন নয়, চাঁদ। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। সেই স্নিগ্ধ ও মধুর হাসিতে দোবাতির বনে আর ঘাসে, পাহাড়ে আর নদীতে আলোর বান ডেকেছে। মনে হচ্ছে অতর্কিতে আমি যেন এক আশ্চর্য-সুন্দর মায়াময় স্বপ্নলোকের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমার দেহ ও মন এক বিচিত্র-সুন্দর আনন্দের শিহরণে পুলকিত হয়ে উঠল। সেই 'সিনিয়লচু' অভিযান থেকে ফিরে আসার পরে গত ছ'বছরে হিমালয়ের এমন শান্ত সুন্দর সমাহিত রূপ আমার আর দেখা হয় নি। (বিশ্বের সুন্দরতম শৃঙ্গ সিকিমের সিনিয়লচু (২২,৬২০´)। লেখকের 'সুন্দরের অভিসারে' দ্রষ্টব্য।)

আকাশের দিকে তাকাই। নির্মল নীলাকাশ চর্তুদশীর শারদীয়া চাঁদ। সেই চাঁদের আলোয় দোবাতি এমন মায়াময় স্বপ্নলোক। কিন্তু আমার দোবাতির চেয়ে ভাল লাগছে দূরের ঐ ব্রহ্মা পর্বতকে। সে যেন এই সবুজ আর কালোর জগতে আলোর দিশারী। নীলাকাশে হেলান দিয়ে আমাকে কাছে ডাকছে।

আমি আসছি। ওগো হিরণ্যগর্ভ লোকপিতামহ, আমি যে আজ বিকেলেই তোমার পায়ের তলায় আশ্রয় নেব। আমি ভাগ্যবান, আজ সকালেই তোমারই মুখ দেখে ঘুম ভাঙল আমার। তুমি আশীর্বাদ ক'রো, দিনটি যেন ভাল কাটে আমাদের। আমরা যেন নিরাপদে তোমার পদতলে পৌঁছতে পারি।

সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে কতক্ষণ চাঁদের আলোয় হিমালয়কে দেখেছি, তার হিসেব করি নি। তবে বেশ কিছুক্ষণ পরে পরিতৃপ্ত অন্তরে ফিরে এসেছিলাম শিবিরে। শুয়ে পড়েছিলাম। তারপরে সেই মায়াময় স্বপ্নলোকের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আবার আমার দু-চোখে ঘুম নেমে এসেছিল।

ঘুম ভাঙল বড-রসিদের ডাকে—সাব্ চায়!

তাড়াতাড়ি স্লীপিং ব্যাগের জীপ খুলে হাত বের করি। ঘড়ি দেখি। সেকি! এযে দেখছি সাড়ে ছ'টা বাজে। ছি ছি! রোজ সকালে আমি ওদের ডেকে তুলি। আজ নিজেই এত বেলা অবধি ঘুমিয়ে রয়েছি।

উঠে বসি। রসিদের হাত থেকে মগটা হাতে নিই।

অমূল্য রঞ্জু আর জয় ছাড়া সবাই উঠে বসে চা খাচ্ছে। সবাই সমস্বরে সুপ্রভাত জানায়। আমিও তাই করি।

চা খেয়ে বাইরে আসি। রোদ ওঠে নি। এখানে রোদ আসতে দেরি আছে। তবে রোদ পড়েছে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণীর মাথায়। রোদ, না রোদ নয়। বিশ্বকর্মা বুঝি-বা সোনা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে ওঁদের গায়ে। কাল রাতে চাঁদের আলোয় আমি ওঁদের স্নিগ্ধ রূপ দেখেছি, আজ সকালে সোনালী রোদে দেখছি সম্ভ্রান্ত রূপ। দুটিই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো। কাল দেখেছি, আজও দেখি। শুধু আজ নয়, আগামী কাল নয়, তারপরে আরও অনেকদিন ধরে আমি সকালে দুপুরে বিকেলে, সন্ধ্যায় ও রাতে—সদা সর্বদা ওঁদের দেখতে পারব। আরও কাছের থেকে, একেবারে পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে।

ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণীকে ভাল লাগলেও, দোবাতিকে কিন্তু কাল রাতের মতো অমন মায়াময় আর স্বপ্নমধুর মনে হচ্ছে না এখন।

তাহলেও বলব এই পাথর আর অবিন্যস্ত বনের জগতে দোবাতি সত্যি সুন্দর। বিচিত্রও বটে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একফালি প্রায় সমতল সবুজ মাঠ। নরম মাটি। ঘাসে ছাওয়া, বুনো ফুল দিয়ে সাজানো। চারিদিকে গাছ, পাহাড়ের দিকে আর সামনে ও পেছনে তো বটেই, এমনকি কিবারের দিকেও। কিন্তু এই জায়গাটুকুতে কোন বড়গাছ নেই।

শুধু সমতল নয়, পাশের পাথুরে পাহাড়টাও অদ্ভুত। তার গা থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর 'ব্যাল্‌কনী'-র মতো ঝুলে আছে। তার তলায় অনেকখানি জায়গা। যাতায়াতের পথে ভেড়াওয়ালারা আশ্রয় নেয়। কাল রাতে মালবাহকরা ঠাঁই নিয়েছে।

এখন তাঁরা রান্না করছে। এখানে কাঠের অভাব নেই। আমরা অবশ্য এখনও কাঠের উনুন জ্বালাই নি, স্টোভেই রান্না করছি। মূল-শিবিরে কাঠের দরকার হবে। সে তখন দেখা যাবে। এখন শুধু সুজি ও চা করা হচ্ছে। হালুয়া আর বিস্কুট দিয়ে ব্রেক্‌ফাস্ট সেরে আজ আমরা পদযাত্রা শুরু করছি। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। বেশি রান্নার সময় কোথায় ? তাছাড়া মেট বলেছে, সোনামার্গী অর্থাৎ মূল-শিবিরে পৌঁছতে আমাদের নাকি বড় জোর ঘন্টা চারেক হাঁটতে হবে।

ওর চারঘণ্টা যে আমাদের চারঘণ্টা নয়, তা জানি। তবু ধরে নিয়েছি ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যে আমরা ব্রহ্মলোক পৌঁছতে পারব। এবং তাহলে সেখানে গিয়েই লাঞ্চ করা যাবে, একেবারে হট্‌-লাঞ্চ। নেতা অবশ্য বলেছে, পথে যথারীতি ছাতু ও চিড়ে পাওয়া যাবে।

বিস্কুট ও হালুয়া দিয়ে দ্বিতীয়বার চা খেয়ে নিতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তারপরেই ম্যাট্রেস আর স্লীপিং ব্যাগ গুটিয়ে রুক্‌স্যাক্‌ নিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। শেরপা ও হ্যাপ্‌রা তাঁবু খুলে ফেলল। মেস-টেন্ট ছাড়া আরও দুটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল গতকাল। একটায় 'হ্যাপ' ও শেরপারা শুয়েছে, আরেকটায় মেট ও রসিদ ব্রাদার্স। তাছাড়া পাথর আর গাছের ডালের সাহায্যে ত্রিপল টাঙ্গিয়ে ছোট একটি রান্নাঘরও বানানো হয়েছিল। সবই খুলে ফেলা হল। পর্বতাভিযান মানেই শিবির গড়া আর ভাঙা। গতকাল যা গড়া হয়েছিল, আজ তা ভেঙে ফেলা হল। আবার গড়তে হবে। ভাঙা আর গড়া নিয়েই জীবন। পর্বতাভিযান জীবনের প্রতিচ্ছবি।

ব্রেক্‌ফাস্ট শেষ হবার পরে অমূল্য বলে—গৌতম আর শিবু 'মার্কিং ফ্ল্যাগ' নিয়ে

এগিয়ে যাও। তোমরা 'ক্যাম্প সাইট সিলেক্ট' করে অপেক্ষা করবে। জগদীশ তপন গোরা ও টুলটুল এখানে থেকে যাও। মেটও তোমাদের সঙ্গে থাকুক। তোমরা মালপত্র গুছিয়ে 'পোর্টার'-দের রওনা করে দিয়ে মেটকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাবে। আটটা বাজে, শঙ্কুদা শৈলেশ রঞ্জু জয় ও কৃষ্ণকে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি।

পিঠে বুক্‌স্যাক্‌ তুলে নিই। যাবার পথে আজই আমার শেষ পদযাত্রা। আজ বিকেলেই আমরা ব্রহ্মলোকের বাসিন্দা হতে পারব।

জগদীশ গোরা তপন ও টুলটুলের সঙ্গে করমর্দন করি। তারপরে নেতা ও সহনেতার সঙ্গে চলা শুরু করি। নেমে আসি পথে, কিবারের কাছে। শিবু শৈলেশ রঞ্জু জয় ও কৃষ্ণ আমাদের অনুসরণ করে।

আগেই বলেছি, দোবাতি জায়গাটি কেবল বনমুক্ত সবুজ আর সমতল নয়। চারিপাশের চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু, যেন একটা প্রশস্ত মাটির ঢিবি।

মাটি বলছি কাল থেকেই। কিন্তু মাটি হলেও শুধু মাটি নয়। পাথরও রয়েছে। পাথর আছে মাটিতে মিশে আর পড়ে আছে এখানে-ওখানে। কয়েকটা পাথরের সঙ্গে আমরা তাঁবুর দড়ি বেঁধেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, ভাগ্যিস পাথরগুলো ছিল।

যাক্‌ গে, দোবাতি কথা। তার চেয়ে পথের কথা বলা যাক, ব্রহ্মলোকের পথ।

কিবারের তীরে তীরে পথ। জলের ধারা অবশ্য অনেক নিচে। তাহলেও তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে কিবারের ডানতীর ধরে আমরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি।

চলতে চলতে কেবলি ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাণীকে দেখছি। এখনও তাদের মাথায় সোনার মুকুট। ভাবতে ভাল লাগছে আজ থেকে বহুদিন ধরে আমি ব্রহ্মলোকে বসে ব্রহ্মাজীকে দর্শন করতে পারব।

কিন্তু আকাশের দিকে আর নয়, এবারে পায়ের দিকে তাকাতে হচ্ছে। না তাকিয়ে যে উপায় নেই! মাঝে মাঝেই ঝরণা। বাঁদিকের পাহাড় থেকে নেমে এসে পথের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ডানদিকের কিবারে মিশেছে। কোথাও পাথরের ওপরে পা দিয়ে দিয়ে ঝরণা পেরোতে হচ্ছে, কোথাও বা লাফ দিয়ে পার হতে হচ্ছে।

তবে পথচলার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ব্রহ্মা আর কিবারকে দেখে নিচ্ছি। কিবার তো নদী নয়, যেন স্বর্গধারা। সুপ্রশস্ত নদীখাতের ভেতরে সামান্য কিছুটা জায়গা জুড়ে তার প্রবাহ। কিন্তু সে প্রবল। প্রচণ্ড গর্জনে চারিদিক সচকিত করে ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যলোকে ধেয়ে চলেছে।

কিবারের ওপারেও পাহাড়, বনময় খাড়া পাহাড়। সে বনে পাইন গাছই বেশি। আর এপারের বনে ভূজগাছের ছড়াছড়ি। বিচিত্র প্রকৃতি।

নেতা বলে দিয়েছিল, পথে রোদ পাবার আগে কেউ বসতে পারব না। এতক্ষণে সেই রোদ পাওয়া গেল। এখন সকাল সাড়ে ন'টা। তার মানে একটানা দেড়ঘণ্টা হাঁটার পরে একটু বসার সুযোগ পেলাম। জায়গাটাও বসবার মতই বটে। ঘাস আর কাঁটাগাছে ছাওয়া একফালি সমতল। পাশেই একটি ঝরণা যাচ্ছে বয়ে। বুক্‌স্যাক্‌ নামিয়ে জল খেয়ে নিই। বড্ড পিপাসা পেয়েছিল। তারপরে বসে পড়ি। সোয়েটার ও মাফলার খুলে বুক্‌স্যাকে ভরে নিই। রীতিমত গরম লাগছিল।

মিনিট কয়েক বিশ্রামের পরেই আবার চলা শুরু করতে হল। কিছুক্ষণ হেঁটে একটা

বনময় পাহাড়। ছায়াশীতল পথ। চলতে আরাম লাগছে। তাই বলে পথ কিন্তু সমতল নয়। চড়াই ভেঙে এগোতে হচ্ছে।

চড়াই শেষে আবার বনহীন পাথুরে প্রান্তর। পাশেই একটা ঝরণা। তারই তীরে বসে আছে নেতা ও মেট। বহুক্ষণ আগেই মেট ধরে ফেলেছিল আমাদের। তারপরে সে নেতাকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

আমাদের বসতে বলে অমূল্য। একটু বাদে আবার বলে—জগদীশ তপন গোরা আর টুলটুল পথের খাবার নিয়ে এগিয়ে যাও। মালবাহকরা এগিয়ে গেছে। তোমরা তাঁবু টাঙ্গিয়েই রান্না চড়িয়ে দেবে, আজ কিন্তু হট্ লাঞ্চ চাই।

—ও. কে. লীডার! ওরা উঠে দাঁড়ায়। বুক্স্যাক্ পিঠে তুলে হাঁটতে শুরু করে।

—আজ কি লাঞ্চের আগেই আমরা মূল-শিবিরে পৌঁছে যাচ্ছি? অমূল্যকে জিজ্ঞেস করি।

সে উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই। তবে দুটোর আগে লাঞ্চ্ পাবে না। কারণ তার আগে আমরা পৌঁছতেই পারব না।

—আমিও কি ওদের সঙ্গে চলে যাবো লীডার? কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করে।

নেতা রাজী হয় না। বলে—না। আমরা কেউ পথ জানি না। হিমবাহে পথ হারালে ভারী দুর্দশা হয়। তাই পথ জানে, এমন একজন সদস্য সঙ্গে থাকা ভাল। তাছাড়া একটা জিনিস কখনই ভুলে যেও না, তোমরা এবারে একজন Lame Leader নিয়ে পর্বতাভিযানে এসেছো।

আবার একটা বনময় পাহাড় পার হয়ে এলাম। এই পাহাড়গুলোকেই গতকাল দূর থেকে সবুজ দ্বীপের মতো দেখাচ্ছিল।

পাহাড় থেকে বেশ খানিকটা নিচে নেমে এসে একটা নালা পেরোতে হল। তারপরে উঠে আসি পাথুরে প্রান্তরে। আবার অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট বিরাট পাথর। পাথর শুধুই পাথর। পাথরের পরে পাথর পেরিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলি।

সাড়ে দশটা বাজে। রোদের তেজ বেড়েই চলেছে। সকালে যে রোদের আশায় পথ চলছিলাম, এখন সেই রোদ পথ-চলার প্রায় অন্তরায় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এই উচ্চতায় এমন পাথর ডিঙ্গিয়ে পথচলা। একটুতেই হাঁফিয়ে উঠছি।

—একটু বসে নেবেন নাকি? শৈলেশ বুঝতে পেরেছে আমার অবস্থা।

তাড়াতাড়ি বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ি। ওরাও বসে—জয় রঞ্জু আর শৈলেশ।

এতক্ষণ নিজের পায়ের দিকে নজর রাখতে গিয়ে আর কোন দিকে তাকাতে পারি নি। এবারে চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। কিবারকে দেখি। নদী তো নয়, স্বর্গধারা। এখানে সে কয়েকটি সংকীর্ণ ধারায় বিভক্ত হয়ে সাদা নদীখাতের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে বয়ে চলেছে। কিবারের ওপারে তেমনি একটা খাড়া পাথুরে পাহাড়। কেবল তার খানিকটা জায়গা জুড়ে কিছু গাছপালা। নানা রঙের পাথরে তৈরি সেই পাহাড়টার পেছন থেকে 'ফ্ল্যাগ টপ' এবং 'ক্রুকেড ফিঙ্গার' শৃঙ্গদুটি উকি দিচ্ছে। ধনুকের মতো বাঁকা একটা গিরিশিরা দুটি শৃঙ্গকে যুক্ত করেছে। তার তলায় একটা ঝুলন্ত তুষারপ্রপাত।

এপারে আমাদের বাঁদিকে এখন তেমনি পাথুরে পাহাড়, তবে ওপারের মতো অমন খাড়া নয়। তারও গায়ে নানা রঙের পাথর। আর তার পেছনে ব্রহ্মাণীকে পাশে নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছেন ব্রহ্মা। আমরা তারই কাছে চলেছি। প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। ব্রহ্মালোকে।

নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মেট এসে হাজির হল।

নেতা কিন্তু আর বসতে দিল না। তার তাড়ায় আবার উঠে দাঁড়াতে হয়।

পাথুরে প্রান্তরটা পেরিয়ে আবার একটা জঙ্গলে উঠে এলাম। গতকালও মাঝে মাঝে উৎরাই পেয়েছি। কিন্তু আজ কেবলি চড়াই। উঠেই চলেছি। একে অনভ্যাস তার ওপরে বয়স হয়েছে। এই উচ্চতায় এত চড়াই ভাঙ্গতে কষ্ট তো হবেই। কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি। ব্রহ্মালোক এসে গিয়েছে ভাবতেই শ্রান্ত শরীরে শক্তি ফিরে আসছে।

এ জঙ্গলটাও তেমনি একটা পাহাড়ের উপরিভাগ। কেবল এখানে পাইনগাছ প্রায় নেই বললেই চলে। পাইনের জায়গা দখল করেছে ভূর্জ। তার মানে আমরা বোধকরি বারো হাজার ফুটে উঠে এসেছি।

বনগুলির দুরবস্থা দেখে ক'দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলাম। এখানে এসে সেই কষ্ট আরও বাড়ল। এমন অমূল্য ঐশ্বর্য আমরা কি ভাবে নষ্ট করে ফেলছি। বহু গাছ মাটিতে পড়ে আছে। ঝড়ে পড়েছে কিংবা মরে গেছে। এখন পচে যাচ্ছে। দেখার মানুষ নেই। থাকলেই বা কি হ'ত ? নদী এখানে কয়েকটি সংকীর্ণ ধারায় বিভক্ত। সে কাঠ পরিবহনের উপযুক্ত নয়। আর পথ ? সেকথা না বলাই ভাল। যে পথে মানুষ চলতে পারে না, সে পথ দিয়ে কাঠ নিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

ভূর্জবন শেষ হয়ে গেল। এখন বেলা এগারোটা। আবার পাথর। তবে তারা আকারে কিছু ছোট আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ঝোপঝাড় রয়েছে। প্রতি ঝোপে ফুল ফুটেছে। নানা রঙের ফুল। লাল হলুদ বেগুনী, আরও কত রঙ।

--সেকি ! এখানে একটা ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে !

সত্যই তাই। বেশ স্বাস্থ্যবান একটা লাল রঙের ঘোড়া ঘুরে ঘুরে গাছপালা খাচ্ছে।

জয় বলে—ঘোড়াটাকে ধরে লীডারকে চড়িয়ে দিলে হয়।

কৃষ্ণ প্রতিবাদ করে—তোর যেমন কথা। ঘোড়া পেলেই কি ঘোড়সওয়ার হওয়া যায় ? লাগাম লাগবে না, জিন লাগবে না ?

—এগুলো কোন সমস্যাই নয়। শৈলেশ জয়ের পক্ষ নেয়—একটা স্লীপিং ব্যাগ কিংবা একখানি কম্বল আর একটুকরো নাইলনের দড়ি হলেই জিন আর লাগামের কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

—তাহলে আয়, এখানে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ঘোড়াটার দিকে নজর রাখা যাক। লীডার এসে পৌঁছক।

--কিন্তু লীডার কি ঘোড়ায় চড়তে চাইবে ? কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করে ?

—চাইবে না কেন ? জয় পাল্টা প্রশ্ন করে। বলে—এ ঘোড়ার জন্য তো ভাড়া দিতে হবে না। তাছাড়া এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে ঘোড়া পেয়ে তার পিঠে সওয়ার হবার মধ্যে একটা 'থ্রিল' রয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেট ও নেতা এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ গিয়ে ঘোড়াটার ঝুঁটি ধরে ফেলে। মৃদু আপত্তির পর নেতা সওয়ার হতে সম্মত হয়।

মেট তার হ্যাভারস্যাক্ থেকে একখানি কম্বল ও দড়ি বের করে। জিন ও লাগাম তৈরি হয়। নেতা ঘোড়ায় ওঠে। ঘোড়া চলতে শুরু করে। ঘোড়ার লেজ ধরে মেট নেতার সঙ্গে এগিয়ে চলে। রঞ্জু ছবি নেয়।

জানি না এ ব্যবস্থায় আমাদের খঞ্জ নেতার কোন সুবিধে হল কিনা ? তবে তার অশ্বারোহণ নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ মজা লোটার সুযোগ পেলাম।

ঘোড়ার পিঠে বসে অমূল্য এখন কি করছে জানি না, তবে আমাদের পাথরের পর পাথর পেরিয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে। সাড়ে এগারোটা বাজে, মাথা ফাটানো রোদ। এটাকে গ্রাবরেখা অঞ্চল বলা যেতে পারে। এখন পাথর। কিন্তু শীতকালে সব কিছু তুষারে তলিয়ে যায়। বর্ষাকালে বরফ গলে যাবার পরে এখন ওপরে মাটি আর পাথর। যতই উঁচু হোক, এসব জায়গায় রোদ উঠলে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়। আমাদেরও গরম লাগছে, প্রচণ্ড গরম।

তবে তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছি না! মাঝে মাঝেই জলের ধারা রয়েছে। বাঁদিকের পাহাড থেকে নেমে আসা হিমবাহ বিগলিত ধারা গিয়ে ডানদিকের কিবারে মিলিত হচ্ছে।

আমরা ধারার পরে ধারা পেরিয়ে পথ চলেছি। কোনটি লাফ দিয়ে পার হওয়া যাচ্ছে, কোনটি বা জুতো ভিজিয়ে পেরোতে হচ্ছে।

গাছের সীমারেখা কিন্তু শেষ হয় নি এখনও। ছোট-ছোট ঝোপঝাড তো রয়েছেই। এখানে দেখছি আবার গুটিকয়েক বড়গাছ। আর তা শুধু ভূজ নয়, সেই সঙ্গে পাইন। বিচিত্র প্রকৃতি। এ উচ্চতায় পাইনগাছ জন্মায় না বলেই জানতাম। আমার সেই জানা আজ মিথ্যে হয়ে গেল।

রোদে গরম লাগছে, আর ছায়ায় বসলে শীত শীত করছে। তাই গাছের ছায়ায় বেশিক্ষণ বসা গেল না। কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়েই আবার পথচলা শুরু করা গেল। না করেই বা উপায় কি ? মেট বলেছিল সোনামার্গী পৌঁছতে চারঘণ্টা লাগবে। সেই চারঘণ্টা অতিক্রান্ত। এখন বেলা বারোটা। অথচ সোনামার্গী এখনও দূরে রয়েছে। কতদূরে, কৃষ্ণ ঠিক বলতে পারছে না।

আবার পাথর পেরিয়ে পথ। পাথর হলেও একটা পায়েচলা পথরেখা রয়েছে—ভেড়াওয়ালাদের পদচিহ্ন।

বড় গাছ না থাকলেও ঝোপঝাড় ও ফুল রয়েছে। নানা রঙের গাছ ও ফুল। দেখতে দেখতে চলেছি, কিন্তু কেউ কোনটিতে হাত দিচ্ছি না। আজ রওনা হবার সময় মেট বলে দিয়েছে, এ অঞ্চলে নাকি এমন একরকম গাছ আছে, যা থেকে সর্বদা বিষবাষ্প বের হয়। সেইসব গাছ কিংবা ফুলের গন্ধ শুকলে অথবা তাদের কাছে মাথা নিয়ে গেলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়।

শুধু গাছ আর ফুল নয়, কিছু কিছু সচল প্রাণও রয়েছে এই নিষ্প্রাণ প্রান্তরে। রয়েছে পিশুজাতীয় ছোট-ছোট পোকা আর নানা রঙের ছোট-ছোট গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপ। তারা আমাদের শব্দ শুনে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু পোকাগুলি চোখ কান ও নাকে মুখে ঢুকে আমাদের অস্থির করে তুলছে।

আমরা এখনও কিবারের তীর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূবে চলেছি। কিবার বইছে পূব থেকে পশ্চিমে। আর ব্রহ্মাণীকে পাশে নিয়ে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের বাঁয়ে অর্থাৎ উত্তরে।

—লীডার দেখছি ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়েছে!

জয় ঠিকই বলেছে। একটা ঘোড়া দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। কিন্তু এটা কি সেই ঘোড়া ?

—তাই তো মনে হচ্ছে। রঞ্জু বলে।

শৈলেশও সমর্থন করে তাকে। আমি কৃষ্ণের দিকে তাকাই। এখন আমাদের দলে সে-ই একমাত্র পর্বতারোহী। পাহাড়ে ঘোড়া, অতএব সে ভাল বুঝবে।

—আমারও তো তাই মনে হচ্ছে। কৃষ্ণ রায় দেয়।

জয় বলে—এটা কোন গুর্জরদলের ঘোড়া। কোন কারণে ঘোড়াটাকে না নিয়েই তারা নিচে নেমে গিয়েছে।

—কিন্তু শীত আসছে। এখানে থাকলে তো ঘোড়াটা মরে যাবে। বরফ পড়া শুরু হয়ে গেলে ও আর পালাবার পথ পাবে না।

—তার আগেই ও নিচে নেবে যাবে।

—তাছাড়া, তারাও খুঁজতে আসবে, পাহাড়ীদের কাছে একটা ঘোড়া আর আমাদের কাছে একখানি মোটরগাড়ি প্রায় সমান। ওরা এসে নিশ্চয়ই ওকে ধরে নিয়ে যাবে।

আবার তেমনি পাথরের প্রবাহ। ক্রমেই ওপরে উঠেছে। আমরা তারই ওপর দিয়ে ধুকতে ধুকতে পথ চলেছি।

পথ ? হ্যাঁ পথই বটে, ব্রহ্মলোকের পথ। মনে পড়ছে তিরিশ বছর আগের কথা। সেই ভরা যৌবনে সেদিন চিরবাসা থেকে গোমুখীর পথকে দুর্গম ও দুস্তর বলে মনে হয়েছিল। 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'য় সেই কথাই বলেছি বার বার। কিন্তু আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে দেখতে পাচ্ছি, সেদিনের সেপথ এ পথের তুলনায় নিতান্তই সহজ ও সুগম ছিল। আজ বুঝতে পারছি অভিজ্ঞতার অভাবে সেদিন মিথ্যে সংবাদ পরিবেশন করেছি পাঠক-পাঠিকার কাছে। ভরসা করি, তাঁরা অমাকে মার্জনা করবেন।

—আচ্ছা, হিমালয়ে কত পাথর আছে ?

গোমুখীর কথা যায় হারিয়ে। শৈলেশের প্রশ্ন শুনে হাসি পায় আমার।

সে নিজেও হাসছে। কারণ সে-ও জানে এ প্রশ্নের উত্তর হয না। পাথর পেরোতে পেরোতে বিরক্ত হয়ে হয়ে বেচারী প্রশ্নটা করে ফেলেছে।

আমরা চুপ করে থাকলেও রঞ্জু ছেড়ে দেয় না। সে গম্ভীর স্বরে বলে—প্রশান্ত মহাসাগরের বালুকাবেলায় যত বালুকণা আছে, তার চাইতে সামান্য কয়েকটুকরো কম।

আবার হো হো করে হেসে উঠি সবাই। এবং শৈলেশও হাস্যরোলে গলা মেলায়। তারপরে হাসি থামিয়ে বলে—সত্যি বলছি, সেই সকাল থেকে শুধু পাথর আর পাথর। পা দুটো বিষের টুকরো হয়ে গেছে।

—ঐ দেখ্ সামনে পাথর নেই। কৃষ্ণ হঠাৎ বলে ওঠে।

তাকিয়ে দেখি শুধু সমতল নয়, সেই সঙ্গে 'প্রি-লাণ্ড'। টিলার মতো পাথুরে স্তূপগুলোর মাঝে একফালি প্রায় সমতল।

তার বুক বেয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা। আর সেই ঝরণার তীরে বসে আছে রসিদ ব্রাদার্স। তারা আগুন জ্বালিয়ে চা গরম রাখছে।

বোধকরি গৌতমরা এখানে এসে ছাতু মেখেছে, চা বানিয়েছে। নিজেরা খেয়ে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছে। সেই থেকে দু-ভাই জুনিপার জ্বালিয়ে আমাদের চা গরম করে চলেছে। এখানে প্রচুর জুনিপার রয়েছে। এগুলো কাচাই জ্বলে।

কাছে আসতেই ওরা সেলাম করে। রুক্স্যাক্ নামাই। ছোট-রসিদ থালা ও মগ বের করে। ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসে। ঠাণ্ডা ও মিঠে জল। তেষ্টা দূর হয়। বড়-রসিদ খাবার ও চা পরিবেশন করে।

খেতে খেতে চারিদিকে তাকাই। আরে তাই তো। আমি যে ব্রহ্মলোকে পৌঁছে গিয়েছি। সামনেই ব্রহ্মা হিমবাহের নাসিকা, গ্লেশিয়ার স্নাউট তথা কিবারের উৎসমুখ। এখানেই ব্রহ্মা হিমবাহ গলে গলে সৃষ্ট হচ্ছে ব্রহ্মবারি, পরমাত্মার চরণামৃত। সেই স্বর্গীয় শান্তিজল নিয়ে কিবার ধেয়ে চলেছে মর্তলোকে, মর্ত্যজনকে ত্রাণ করতে।

উৎসমুখটি অবশ্য গোমুখীর মতো বিশাল কিংবা বৈচিত্র্যময় নয়। নিতান্তই একটি সাধারণ হিমবাহ-নাসিকা। এমন স্নাউট হিমালয়ের প্রায় সব হিমবাহে দেখতে পাওয়া যায়। তবু দেখি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বকর্মার বিচিত্র সৃষ্টিকে আরেকবার দেখি। আর মনে মনে জীবন-দেবতাকে বলি- তোমাকে প্রণাম, তুমি আবার আমাকে এই অপরূপ রূপ দর্শনের সুযোগ দান করলে।

স্নাউট ছাড়িয়েই শুরু হল গ্রাবরেখা। তার মানে বহ্মা হিমবাহের শেষাংশ। ওপরের বরফ গিয়েছে গলে. পড়ে আছে পাথর আর মাটি। গজিয়েছে ছোট ছোট গাছ আর ঘাস। এই তৃণভূমির জন্যই ভেড়াওয়ালারা উচ্চহিমালয়ে পশুচারণে আসে।

কিবারের কলরব আর শুনতে পারছি না। পাবো কেমন করে ? আমরা যে তার উৎসমুখ ছাড়িয়ে এসেছি। সে ব্রহ্মবারি বয়ে নিয়ে যায়, তবু তাব ব্রহ্মলোকে প্রবেশাধিকার নেই।

মনে পড়ছে চন্দ্রভাগা মারু-চেনাব আর কিবারের কথা। সেদিন বাটোট থেকে সঙ্গী হয়েছিল চন্দ্রভাগা। তারপর থেকে গত ছ'দিন ধরে দিবারাত্র নদীর শব্দ শুনে আসছিলাম। এই মাত্র সেই শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত সাঙ্গ হ'ল!

তাই তো হবে। এই প্রণবধ্বনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে ব্রহ্মলোকে। এখন তো তার আর প্রয়োজন নেই। ঐ তো ওখানে সবার ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তাঁকে দর্শন করতে করতে এখন আমরা তাঁর পদতলে পৌঁছতে পারব।

সেই পাথর আর মাটির পথ। সেই কালো পাহাড়ের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ। সেই পথ বেয়ে আমরা গুটিকয়েক অকাজের মানুষ অকারণের পথ চলেছি। সত্যই কি তাই ? কোন কাজ নেই বলেই কি আমরা এইসব অকারণের পথে আসি ? সবাই বলে।

বলুক গে। তবু আমরা আসব। হিমালয় যে কাছে ডাকেন আমাদের। ব্রহ্মাজী যে ডাক দিয়েছেন এবারে। তাইতো আমরা আজ ব্রহ্মলোকে।

রোদ রয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে ফুরফুরে হাওয়া বইছে। এখন আর আগের মতো গরম লাগছে না। লাগবে কেমন করে ? ব্রহ্মাজী যে ক্রমেই কাছে আসছেন। আর কি তিনি দূরে থাকতে পারেন ? তিনি আমাদের দেহ মনের সব উত্তাপ ঘুচিয়ে দেবেন, সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন।

বাঁদিকের যে পাথুরে পাহাড়গুলো সেই সকাল থেকে সমানে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে, তারাও ব্রহ্মাজীর পায়ের কাছে পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে। আর ব্রহ্মাণী ? তাঁকেও তো দেখছি না! তিনি কোথায় গেলেন ? তাঁকেও ব্রহ্মাজী আড়াল করে দিয়েছেন। ভালই হয়েছে। এখন আর আমাদের সামনে ব্রহ্মা ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্মা, শুধুই ব্রহ্মা। আমরা যে ব্রহ্মলোকে এসেছি।

চলতে চলতে আবার তাঁকে দেখি, ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরকে। নিচের দিকে তার

পর্বতগাত্রে কালো কঠিন পাথরের দেওয়াল। ওপরের দিকে মাঝে মাঝে বরফ মেশানো কয়েকটি পাথরের ঢেউ খেলানো গিরিশিরা। আর সবার ওপরে ত্রিভুজাকৃতি তুষারাবৃত পর্বতশিখর। ওখানে উপস্থিত হয়ে পিতামহের পূজার্চনা করতে পারলে আমাদের এই যাত্রা সার্থক হবে।

কিন্তু সেসব কথা থাক। আমি আবার তাঁর দিকে তাকাই, তাঁকে দেখি আর দেখি। এদিক থেকে অবশ্য তাঁর গায়ে, কিছু কালো পাথর দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ডানদিকে অর্থাৎ পুবে ব্রহ্মা হিমবাহের দিকে শুধু সাদা, কেবলি বরফ। ওদিক থেকেই ক্রিস্ বনিংটন শিখরে আরোহণ করেছেন, আমাদেরও তাই করতে হবে।

হিমবাহের ওপারে, উত্তর-পূবে খানিকটা জায়গা জুড়ে তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণ বলছে, ফ্ল্যাট টপ। ওরই পেছনে এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সিক্‌ল মুন লুকিয়ে রয়েছে। থাকগে, ফ্ল্যাট টপ্-কে তো দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্মালোকে বসে বসে তার মাথায়ও মেঘ আর রোদের খেলা দেখা যাবে।

সিক্‌ল মুন-এর জন্য মন খারাপ না হলেও ব্রহ্মাণীর জন্য মায়া হচ্ছে। কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মা যদি ব্রহ্মাণীকে আড়াল করে রাখেন, তাহলে আমরা আর মা-সরস্বতীকে দর্শন করব কেমন করে? ব্রহ্মালোকে বসেও ভারতীয় আরতি করতে পারলাম না।

কিন্তু ব্রহ্মা তো রয়েছেন সামনে। তিনি সর্বদা জেগে রইবেন আমার শিয়রে। তাঁরই জন্য তো এই দুর্গম পথ পেরিয়ে আজ আমরা এসেছি ব্রহ্মালোকে। আমি তাঁকে এত কাছে পেলাম। আমার সকল শ্রম সার্থক হল।

আমরা পৌঁছে গিয়েছি। ঐ তো তাঁবু দেখা যাচ্ছে, আমাদের মূল-শিবির। এখন বেলা দুটো। দোবাতি থেকে এই ৮ কিলোমিটার পথ আসতে সত্যি ছ'ঘণ্টাই লাগল। কিবারের উৎস ছাড়িয়ে প্রায় এক কিলোমিটার এগিয়ে ব্রহ্মা পর্বতের পাদদেশে ১৩,৫০০ ফুট উঁচু অসিত কাননে প্রতিষ্ঠিত হল আমাদের মূল-শিবির। কলকাতা থেকে ব্রহ্মালোকে আসতে আটদিন সময় লাগল। আজ ১৭ই সেপ্টেম্বর।

॥ দশ ॥

স্থানীয় নাম সোনামার্গী। নামের অর্থ এবং কারণ কিছুই জানি না। কেবল বলতে পারি কাশ্মীরের সোনামার্গের সঙ্গে কিশ্‌তোয়ারের সোনামার্গীর কোন মিল নেই। সেখানে সবুজ এখানে কালো, সেখানে মাটি এখানে পাথর, সেখানে হাজার হাজার মানুষের মেলা, এখানে আমরা ছাড়া আর কোন মানুষ নেই।

আমরা কিন্তু আমাদের মূল-শিবিরকে সোনামার্গী বলছি না, বলছি অসিত কানন। প্রয়াত পর্বতারোহী অসিত মৈত্রের নামে নেতা এই নাম রেখেছে। আর তাই আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই অসিতের কথা মনে পড়ে গেল। বড়-রসিদের হাত থেকে চায়ের মগটা হাতে নিয়ে তার কথাই ভাবতে থাকি, অসিতের কথা—

হিমালয়ের নেশা যদি একটা পাগলামো হয়, তাহলে অসিত বেশ বড় পাগল ছিল। এবং তাই বোধকরি সে আর হিমালয় থেকে ঘরে ফিরল না, চিরকালের মতো এখানেই রয়ে গেল।

অসিতকে নিয়ে আমরা হারালাম অনেককেই। ভারতের কথা বাদই দিলাম। যতদূর জানি, বিগত পঁচিশ বছরে কেবল পশ্চিমবঙ্গই হিমালয়কে বিশটি প্রাণ ডালি দিয়েছে। আজ অসিত কাননে বসে তাঁদের নামগুলি একবার স্মরণ করা যাক। তারা হলেন—এন. চক্রবর্তী, অনিমা সেনগুপ্তা, গৌরাঙ্গ সুন্দর চৌধুরী, অমর রায়, সুজয়া গুহ, কমলা সাহা, শ্রীলা কুণ্ডু, কৃষ্ণচন্দ্র দে, প্রদীপ দাস, সত্যজিৎ দে, বাদল দত্তগুপ্ত, অমলেশ সেনগুপ্ত, সুখেন্দু মুখার্জি, অরুণ ঘোষ, প্রবীর সাহা, রণজিৎ লাহিড়ী, কানাই ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, গৌতম চক্রবর্তী ও অসিত মৈত্র।

আগে এক একটি আত্মদানের জন্য আমরা অনেক চোখের জল ফেলতাম। এখন মৃত্যু প্রায় বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। তাই বোধকরি হিমালয়-প্রেমিকদের চোখের জল গিয়েছে শুকিয়ে। সত্যি, বলতে কি আজকাল আমি আর স্মৃতিচারণও বড় একটা করি না।

কিন্তু অসিত যে আমাকে বড়ই ভালোবাসত। শিখর বিজয়ী কিংবা নেতা অসিতকুমার মৈত্র নয়, আমার অনুজপ্রতিম অসিতই আজ আমাকে ব্যথিত করে তুলছে।

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। আর সে পরিচয় করে দিয়েছে অমূল্য। অসিত ছিল তার মন্ত্রশিষ্য। তাই অসিতের স্মৃতিচারণ করতে অমূল্যের একটি লেখার কথাই মনে পড়ছে। রুক্‌স্যাক্ থেকে স্মারক স্মৃতি পত্রখানি টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করি। অমূল্য লিখেছে—

অসিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সালটা ১৯৭০। শ্রাবণ মাসের এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা। ভবানীপুরের 'দৃতাগার' ক্লাবের ছোট্ট ঘরে বসে আমরা কয়েকজন গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনার মূল-বিষয় হিমালয়ের যোগীন পর্বতশ্রেণী, বিশেষ করে যোগীনের দু-নম্বর শিখর (২০,৮০৫ ফুট)। 'দৃতাগার' ক্লাবের উৎসাহী সভ্যদের প্রথম পর্বতাভিযানের লক্ষ্য যোগীনের ঐ দু-নম্বর শিখর। ক্লাব কর্তৃপক্ষ অভিযানের নেতৃত্বভার আমার উপর দেওয়ায় চিন্তায় পড়েছি সবচেয়ে বেশী আমি।

আলোচনায় ছেদ পড়ল অভিযানের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ শঙ্কর নারায়ণ চৌধুরী ঘরে ঢোকায়; পেছন পেছন এসে ঢুকল তেইশ চব্বিশ বছরের এক অচেনা ছেলে। দোহারা চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, আচরণে সপ্রতিভ। মুখে ফৌজী গোঁফের মানানসই অবস্থান। সবদিক থেকে বলা যায় স্মার্ট ছেলে।

ডাক্তার চৌধুরী বলল, 'লীডার দেখ, এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি। আমার আত্মীয়। মানালীর মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌সটিটিউট থেকে বেসিক আর অ্যাডভান্স কোর্স করে এসেছে। পর্বতারোহণ সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী।"

ছেলেটিকে হেসে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। বলল—অসিত মৈত্র।

নামটা খুবই পরিচিত ঠেকল। কোথায় যেন শুনেছি। হ্যাঁ এতক্ষণে মনে পড়েছে। ওয়েষ্টার্ন হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌সটিটিউটের ডিরেক্টার হরনাম সিং-এর মুখে ওর নাম শুনেছি। হরনাম বলেছিল, "অমূল্য, তোমাদের বেঙ্গল থেকে একটি ছেলে আমার ইন্‌সটিটিউটে ট্রেনিং নিয়েছে। ছেলেটি খুবই টাফ এবং পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রচণ্ড ঝোঁক আছে।"

সেই আমার অসিতের সাথে প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় পরবর্তীকালে আরো

ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল। অদৃশ্যভাবে হৃদয়ের টান অনুভব করতাম ওর জন্য।

সেবার আমরা পারলাম না। যোগীনের নির্দিষ্ট শিখরে উঠে আমাদের বিজয় পতাকা ওড়াতে। কয়েকদিন ধরে এক নাগাড়ে বয়ে যাওয়া তুষার ঝড় বিশ হাজার ফুট উঁচুতে ছোট্ট তাঁবুগুলিতে প্রায় একরকম বন্দী করে রেখেছিল আমাদের। পালিয়ে চলে এসেছিলাম কোনমতে। মনে পড়ছে, সেই অভিযানে আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল! সারারাত যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারি নি। অসিতও ছিল সেই রাতের নিদ্রাহীন সাথী। প্রতিটি কাজে অসিতের এই শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব, ও ভ্রাতৃত্ববোধ আমাকে বিমুগ্ধ করত।

যোগীন অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। অসিতের খুবই মন খারাপ। ওকে হতাশ দেখে বললাম, "মন খারাপ করার-কি আছে। তোমার তো এটা প্রথম অভিযান। দেখলে তো কি পরিস্থিতিতে আমরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। যোগীন তো আর চলে যাবেনা। আবার না হয় কোনদিন আসব। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল--যার কোন মানে হয় না।"

ফিরে এলাম কলকাতায়।

অসিতের সাথে তারপর প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগল। দেখা হলেই বলত, "অমূল্যদা, চল আবার যোগীনে যাই।" একই শিখরে পরপর দুবার অভিযানের পিছনে কিছু অসুবিধা আছে। প্রধান অসুবিধা অর্থকরী দিকটা। কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা জনসাধারণকে একই শিখরে পরপর দুবার অভিযানে উপুর হস্ত হতে রাজি করানো মুশকিল।

ব্যাপারটা অসিতকে ভেঙে বললাম। কিন্তু সে ছেলে নাছোড়বান্দা। যোগীনে যাওয়ার জন্য তার প্রাণ নাকি আঁকুপাঁকু করছে। শেষ পর্যন্ত দূতাগার রাজী হল আবার যোগীন অভিযানের আয়োজন করতে। মুশকিল আসান হিসাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

১৯৭১সাল। আমরা আবার চললাম গঙ্গোত্রীর পথে, কুমারী যোগীন-এর দু-নম্বর শিখর অভিযানে। এই অভিযানে অসিত আর একটি ছেলেকে নিয়ে এল। বয়সে অসিতের চেয়ে ছোট। সেই ছেলেটিই আজকের প্রখ্যাত পর্বতারোহী এবং হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌সটিটিউটের প্রাক্তন প্রথম ভাইস প্রিন্সিপাল সুভাষ রায়।

এবারেও প্রথম আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। মাত্র চারশ ফুট নিচ থেকে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু অসিত দমবার পাত্র নয়। ওর চোখেমুখে তখন শিখর জয়ের দৃঢ় প্রত্যয়, অনমনীয় সংকল্প। দুদিন পরে—তাই দ্বিতীয় শিখর আরোহণকারীদের দলে ওকে আবার রেখেছিলাম। হ্যাঁ, এবারে অসিত পেরেছিল। ঝকঝকে একমুখ হাসি নিয়ে আর তিন-জনের সাথে প্রথম মানুষ হিসাবে অসিত উদ্ধত কুমারী যোগীনের গলায় মালা পড়িয়ে দিল। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের এই সাফল্যের পিছনে ওর অবদান ছিল সবচাইতে বেশী।

১৯৪১ সালে যোগীন শিখর জয়ের পর থেকেই শুরু হল অসিতের পর্বতারোহী জীবনের গৌরবময় ঝলমলে অধ্যায়। একের পর এক অভিযানের নেতৃত্ব দিতে লাগল সে। সাংগঠনিক প্রতিভাবলে অন্যান্যদের সাথে প্রতিষ্ঠা করল ইন্‌সটিটিউট অব এক্সপ্লোরেশন এবং পরে এ্যাড-ভেঞ্চারার ক্লাব।

ওর অভিযানের যাবার সময় প্রতিবারই হাওড়া স্টেশনে শুভেচ্ছা জানাতে যেতাম।

মাঝে মাঝে গোঁফের আড়ালে মুচকি হেসে বলত "অমূল্যদা অভিযানে সংখ্যার দিক দিয়ে তোমাকেও ছাড়িয়ে যাব।"

ভাল লাগত ওর প্রাণশক্তি দেখে। কিন্তু যোগীনের পরে অনেকদিন একসাথে দুর্গম পাহাড়ী পথে হাঁটা হল না। অসিতের খেদ তাতে। প্রায়ই বলত, "তোমার সাথে কোন অভিযানে আর যাওয়াই হচ্ছে না। চল না একসঙ্গে দুজনে কোন অভিযানে বেড়িয়ে পড়ি।"

শেষপর্যন্ত সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। ১৯৪০ সালের সিনিয়লচু (২২,৬২০) অভিযানে। বলা বাহুল্য অসিতই প্রধান হোতা। ওর প্রচেষ্টাতেই অভিযান পরিকল্পনা স্পষ্ট রূপ পেল; অভিযানের শেষপর্বে নেতৃত্বের ভার বলতে গেলে ওর উপরই ছিল। অভিযানের সেই দিনগুলিতে ওর দাঁতে দাঁত চেপে সংগ্রামের কাহিনী অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। কাছাকাছি থেকে ওকে যতই দেখেছি, ততই অবাক হয়েছি। ভোলা যায় না সেসব কথা।

অনেকে বলে, অসিতের প্রতি আমার নাকি একটু বেশি দুর্বলতা ছিল। জানিনা কথাটা সত্যি কিনা। তবে ওর মিষ্টি ব্যবহার, অদম্য সাহস, চিত্তের দৃঢ়তা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রথম থেকে আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল। সিনিয়র পর্বতারোহীদের ওর মতো সম্মান করতে কাউকে আমি দেখিনি।

সিনিয়লচু-র কয়েকমাস পরেই ও আবার সফল ব্ল্যাক পিক্ (২০,৯৫৬ ফুট) অভিযানের নেতৃত্ব দিল। অভিযানেব নেশা যেন ওর রক্তে। তাই প্রতিবছরই ছুটে যেতে হত কতকগুলি দামাল ছেলের সঙ্গে। শিখর জয়ের সফল ও সার্থক নেতা অসিত।

গতবছর হঠাৎ একদিন আমায় এসে বলল, "অমূল্যদা, এবার একটা বেশ মজা হয়েছে। দুটি অভিযান একই এলাকায় হচ্ছে। মোটামুটি একই সময়ে।" একটু থেমে গোঁফের ফাঁকে লাজুক হাসি হেসে বলল, "জান, এই দুটি অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি।"

ছেলেটা বলে কি! অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, "যাচ্ছ ভাল কথা কিন্তু স্ট্রেইন পড়বে খুব।"

—"আসলে দুটো দলের কাউকেই না করতে পারছি না। ভেবে রেখেছি প্রথম অভিযানটার পর গঙ্গোত্রী ফিরে আসব। তারপর ওখানেই আবার দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটার সঙ্গে যোগ দেব।"

"একটা কথা, সফল হও বা না হও, সবাইকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে এস।"

অসিত আমার কথায় আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল। বলল, "তবে এবারেই শেষ অমূল্যদা! আর অভিযান-টভিযানে যাচ্ছি না।"

অসিত যাবে না অভিযানে! উড়িয়ে দেবার মতো কথাই বটে। বললাম, "এই শেষ আর যাব না, এসব বলে লাভ নেই। আমি জানি, তুমি থেমে যাবার ছেলে নও।"

"না, সত্যি বলছি অমূল্যদা! একজনকে কথা দিয়েছি আর অভিযানে যাব না। তবে তোমার সাথে যদি কখনও যাইতো আলাদা কথা।"

ওর মতো পাহাড়ীর মুখে নেতিবাচক কথাবার্তা শুনে অবাক হবারই কথা আমার। তবু আমল দিতে চাই না। আমরা যারা পাহাড়ে যাই তারা মাঝে মধ্যে এমন ধারা কথা বলে থাকি। তাই ওর কথার গুরুত্ব দিলাম না।

চব্বিশে আগস্ট ১৯৪৫। 'হিমালয়ান ফোরাম' চলেছে আপার গঙ্গোত্রী এক্সপিডিশনে। হাওড়া স্টেশনে অনেকেই অভিযাত্রীদের সম্বর্ধনা জানাতে এসেছেন—আমিও আছি তার মধ্যে। ভিড়ের মধ্যে অসিতকে খুঁজেই পাচ্ছি না। হঠাৎ পেছন থেকে কে এসে জড়িয়ে ধরল। ফিরে দেখি অসিত—পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবী। অসিতকে ঐ পোশাকে আমি কোনদিন দেখি নি, তাই স্বভাবতই অবাক হয়ে বললাম, "কি ব্যাপার ? দেখে মনে হচ্ছে বরযাত্রী যাচ্ছ !"

ওর দুরন্ত হাসিখানা সমস্ত মুখে ছড়িয়ে দিয়ে অসিত বলল, "বরযাত্রী... ! ফিরে আসি, তোমাকেই বরযাত্রী যেতে হবে।"

"সত্যি !"

"হ্যানড্রেড পার্সেন্ট সত্যি।"

এতক্ষণে 'এই অভিযানই শেষ অভিযান' কথাটার ইঙ্গিত ধরতে পারা গেল। ভাবতে ভাল লাগল যে দামাল ছেলেটা এবার কারও শাসনে আটকে পড়বে !

অসিতের সাথে সেই আমার শেষ দেখা।

প্রথম অভিযান চলাকালীন ওর শেষ চিঠি পেয়েছিলাম ২/৯/৮৫ তারিখে। পঞ্চানন ভট্টাচার্য, তরুণ চক্রবর্তী, শংকর দে-র সাথে সুন্দরবন বেসক্যাম্প থেকে অসিত ওর শেষ চিঠিটা আমাকে পাঠিয়েছিল। চিঠিতে লিখেছিল—"প্রিয় অমূল্যদা, রাস্তায় অনেক আলোচনা তোমাকে কেন্দ্র করে করেছি। কারণ হিমালয় আর অমূল্যদা আমার কাছে অভিন্ন। তোমার অকৃত্রিম আন্তরিক শুভেচ্ছা আমাদের পাথেয়।..."

তারপর নানাভাবে জানতে পেরেছিলাম ওর প্রথম অভিযানের কথা। জীবন আর মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে করতে সবাই কিভাবে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্যামবরণ অভিযাত্রীদলের সাথে ওর যোগ দেবার খবরও পেয়ে গিয়েছিলাম।

তিরিশে সেপ্টেম্বর রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎ আমার বাড়ীর ফোনটা বেজে উঠল। ফোন এসেছে সুভাষ রায়ের বাড়ী থেকে। অসিতের দুর্ঘটনার খবর শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। দুরুদুরু বুকে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছি—'নিশ্চয় অসিত বেঁচে আছে।'

রাত দুটোয় আবার ফোন। সুভাষ রায়ের কান্নায় ভেঙে পড়া গলা—"অসিতদা আর নেই। ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্যামবরণ হিমবাহের ২০,১২৫ ফুট অনামী শিখরে আরোহণের পর, নামার পথে প্রায় দুহাজার ফুট নিচে পড়ে গিয়ে...।"

দুঃসংবাদের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

তবু বলি, একদিক থেকে অসিত ভাগ্যবান। হিমালয়ের শিখরে শিখরে আরোহণের সময় কোন পর্বতারোহীর মৃত্যু হলে তার নশ্বর দেহের শেষকৃত্য সেখানেই করা হয়ে থাকে। নিচে মৃতদেহ আনার অসুবিধার জন্যই ঐ ব্যবস্থা। কিন্তু আশিস রায়ের তত্ত্বাবধানে শ্যামবরণ অভিযানের সদস্যরা যেভাবে অসিতের মৃতদেহ ঐ দুর্গম অঞ্চল থেকে গঙ্গোত্রীতে নিয়ে এসে তড়িঘড়ি অসিতের আত্মীয়-স্বজনদের খবরটা পৌঁছে দিতে পেরেছিল, তাতে অসিতকে ভাগ্যবানই বলো চলে। পর্বতারোহণের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা বিরল।

গঙ্গোত্রী ভগীরথের তপভূমি, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর পদরেণুধন্য। এই গঙ্গোত্রী থেকেই শুরু হয়েছিল অসিতের প্রথম পর্বতাভিযান। আর এই গঙ্গোত্রীতেই বিগলিত করুণা ভাগীরথীর তীরে স্রোতের মূর্ছনা আর পাহাড়ী গাছের আকুল নিঃশ্বাসের শব্দের মধ্যে

অভিযাত্রী বন্ধু ও সহোদর ভাইদের চোখের জলের ধারায় অসিতের দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল।

হিমালয়প্রেমিক অসিতের ভস্মীভূত শরীরের অণু পরমাণু মিশে গেল তুষারমৌলী হিমালয়ের আবহমণ্ডলে।

কিন্তু শরীর হারিয়ে গেলেও, আমার মন থেকে অসিত হারিয়ে যাবে না। যেমন ছিল তেমনই থাকবে। থাকবে চিরকাল।

ভবিষ্যতে যখনই হিমালয়ে যাব, যখনই অভিযানের কথা ভাবব, তখনই অসিত আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। হয়ত বলবে, "চল না একসঙ্গে যাই অমূল্যদা...।"

মৃত্যুহীন-প্রাণ অসিত আমৃত্যু আমার জীবনে, আমার কর্মে ভাস্বর হয়ে থাকবে।'

কিন্তু কাজটা ঠিক করছি কি ? ব্রহ্মালোকে আজ প্রথম প্রভাত। অথচ সকাল থেকে বসে বসে শুধু আমার হারিয়ে যাওয়া হিমালয়সঙ্গীর স্মৃতিচারণ করছি।

হ্যাঁ, ঠিকই করছি। অসিত আমাদের সঙ্গে নেই। কারণ সে আমাদের আগেই ব্রহ্মালোকে স্থায়ী হবার গৌরব অর্জন করেছে। আর তাই তো ব্রহ্মালোকে বসে আমরা তাঁর স্মৃতিতর্পণ করছি।

কিন্তু থাক্ এখন আর অসিতের কথা নয়, এবার একটু নিজেদের কথা ভেবে নেওয়া যাক, আমাদের এই মূল-শিবিরের কথা।

কিবার নালার উৎসমুখ থেকে আরও এক কিলোমিটারের মতো উত্তর-পূর্বে এগিয়ে ব্রহ্মা হিমবাহের দক্ষিণ তীরে ১৩,৫০০ ফুট অর্থাৎ ৪১১৫ মিটার উঁচুতে আমরা এই মূল-শিবির স্থাপন করেছি। জায়গাটা প্রায় সমতল এবং পাথরমুক্ত, এটি ব্রহ্মা-১ শৃঙ্গের দক্ষিণ পাদদেশ এবং ব্রহ্মা হিমবাহের পশ্চিমতীর।

খুবই নিরাপদ জায়গা। পাথর পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য আমাদের সামনেই হিমবাহের একটা ছোট স্লাউট রয়েছে। সেখানে মাঝে মাঝেই ধস নামছে। টন টন বরফ মাটি আর পাথর পড়ছে। কিন্তু ওখান থেকে আমরা বেশ খানিকটা দূরে রয়েছি।

প্রায় পাথরমুক্ত এই সমতলটি মোটেই বড় জায়গা নয়। তিনটি তাঁবু ও মালবাহকদের ত্রিপল টাঙাবার পরে সামান্য জায়গাই খালি রয়েছে। সেখানেও আবার একটা বড় পাথরের সঙ্গে ত্রিপল ঝুলিয়ে রান্নাঘর তৈরি করা হয়েছে।

জল ? হ্যাঁ, জল রয়েছে বৈকি। জল না থাকলে কি সেখানে মূল-শিবির করা যায় ? পশ্চিমের সেই কালো পাহাড়টার গায়ে একটা ছোট জলপ্রপাত রয়েছে। সেই জল ঝরণা হয়ে প্রান্তরের বুক বেয়ে বেয়ে চলেছে। গতকাল নালা কেটে তার একটি ধারা নিয়ে আসা হয়েছে রান্নাঘরের সামনে। কাল রাতে সেই ক্ষুদ্র ঝরণার কুলকুল শব্দ শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি।

আজ ঘুম ভাঙার পরে কিন্তু আর সে শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। বোধকরি রাতের ঠাণ্ডায় ধারাটি জমে গিয়েছে। রোদ উঠলেই বরফ গলবে, ঝরণা আবার নাচতে নাচতে নেমে আসবে আমার কাছে।

কিন্তু থাকগে, এসব ভাবনা। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। কাজগুলো করে ফেলতে হবে। গতকাল সন্ধ্যার পরে অবশ্য একটা কাজ করে রেখেছি। মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার

সংবাদ দিয়ে টেলিগ্রামগুলি সব লিখে ফেলেছি। একটা টেলিগ্রাম যাচ্ছে দিল্লীতে, ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশানে। আরও তিনটি টেলিগ্রাম যাচ্ছে কলকাতায়—পি. টি. আই. এবং মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীর কাছে। আগেই বলেছি, হিমালয়-প্রেমিক সুভাষবাবুর সক্রিয় সাহায্য না পেলে আমরা এ অভিযানের আয়োজন করতে পারতাম না।

আমাদের মালবাহকরা কিছুক্ষণ বাদেই বাড়ি রওনা হবে। তারাই নিয়ে যাবে টেলিগ্রাম। ওরা আজই সোন্দার পৌঁছে যাবে। পিঠে মাল নিয়ে চড়াই ভেঙে যেপথ আসতে দুদিন লেগেছে, খালি হাত-পায়ে উৎরাই ভেঙে সেই পথটুকু পার হতে ওদের একদিন লাগবে। ওরা আজ বিকেলেই ঘরে ফিরবে।

আগামীকাল ওরা টেলিগ্রামগুলো সুয়েদ ডাকঘরের পোস্টমাস্টারসাবকে দিয়ে দেবে। তিনি সেগুলো রাণারের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন কিশ্‌তোয়ার। সেখান থেকে শর্মাজী বার্তাগুলো ফোনে জানিয়ে দেবেন বাটোট। বাটোট থেকে জম্মু হয়ে দিল্লী, দিল্লী থেকে কলকাতা। কবে পৌঁছুবে, তা কেবল ব্রহ্মাজী বলতে পারেন।

সংবাদ পাঠাবার পরেও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। যাঁদের সক্রিয় সাহায্য ও শুভেচ্ছায় আমরা আজ ব্রহ্মালোকে, তাঁদের সবাইকে মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাঠাতে হবে। ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরের 'পিক্‌চার পোস্টকার্ড' ছাপিয়ে নিয়ে এসেছি। সেগুলিতে সুন্দর করে লিখতে হবে—

চন্দ্রভাগার তীরে তীরে ভয়ঙ্কর ও সুন্দর পথ পেরিয়ে পৌঁচেছি ব্রহ্মা পর্বতের পাদদেশে অসিত কাননে। তুষারশীতল মূল-শিবিরে বসে আমরা আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করি।

কাজটা সহজ নয় কারণ আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ী এবং ভারতের সমস্ত পর্বতারোহণ সংস্থাকে চিঠি পাঠাতে হবে। অন্তত শ'চারেক চিঠি লেখা, নেতার সই করা, ঠিকানা লিখে ডাকটিকেট লাগানো—সব মিলে রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞ। তাও মাত্র দিন দুয়েকের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে ঠিক হয়েছে পরশু সকালে বড়-রসিদ চিঠি নিয়ে সুয়েদ রওনা হবে।

নেতা নির্দেশ দিয়েছে শৈলেশ রঞ্জু ও আমাকে এই কাজটি করতে হবে, সে এবং জয় আমাদের সঙ্গে থাকবে। তার মধ্যে আবার রঞ্জুর ওষুধ গোছানো রয়েছে।

নেতা গতকালই সবার 'ডিউটি' ভাগ করে দিয়েছে। গোরা রসিদ ব্রাদার্সকে নিয়ে রান্না করবে। আজ পেটভরা ভাল খাবার চাই। কারণ গত চারদিন ঠিকমত খাওয়া হয় নি।

গৌতম শিবু জগদীশ ও টুলটুল পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ গোছগাছ করবে। দুজন 'হ্যাপ' তাদের সঙ্গে থাকবে। এর ওপরে ক্রিস বনিংটন মাত্র দুটি শিবির করে ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। অবরোহণের পথে, তাঁরা উন্মুক্ত আকাশতলে

বরফের ওপরে রাত্রিবাস বা bivouac করেছেন। আবার জাপানী অভিযাত্রীরা মূল-শিবিরের ওপরে চারটি শিবির স্থাপন করে শিখরে আরোহণ করেছেন। এর কোনটাই সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। আমাদের দলে যেমন ক্রিস বনিংটনের মতো পর্বতারোহী নেই, তেমনি আমরা জাপানীদের মতো অঢেল সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ নিয়ে আসি নি।

অতএব আমাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। আমরা ষোলো থেকে বিশ হাজার ফুটের মধ্যে তিনটি শিবির স্থাপন করব। তাই প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ পৃথক পৃথক ভাবে 'প্যাক' করে শিবিরের নাম লিখে ফেলতে হবে। ঠিক হয়েছে আগামীকাল থেকে ওপরে মাল পাঠানো শুরু করা হবে।

তপন ও কৃষ্ণ শেরপা পল্‌দিন ও নিমাকে নিয়ে এক নম্বর শিবিরের পথ আর জায়গা দেখতে বের হচ্ছে। গতকাল বিকেলেই লাল কাপড়ে কেটে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে বেশ কিছু মার্কিং ফ্ল্যাগ তৈরি করে ফেলা হয়েছে। ওরা সেই নিশান দিয়ে পথ চিহ্নিত করতে করতে এগিয়ে যাবে। যাতে পরে পথ ভুল না হয়। হিমালয় পথভোলা পথিকের জন্য নয়।

তপন ও গৌতম মালবাহকদের পাওনা মিটিয়ে দিল। ওরা বিদায় নিচ্ছে। বিদায় সর্বদা বেদনাদায়ক। দুটি দিন ধরে ওরা সবাই সর্বশক্তি দিয়ে সেবা করেছে আমাদের। তাই সবার জন্যই খারাপ লাগছে। তাহলেও বেশি কষ্ট হচ্ছে মেট ও ঠাকুরজীর জন্য।

পরশু দোবাতি পৌঁছবার কিছু আগে ক্লান্ত-মালবাহকরা সেই পাথুরে প্রান্তরে বসে পড়েছিল। আর এগোতে চাইছিল না। তখন ঠাকুরজী তাদের বুঝিযে-সুঝিয়ে দোবাতি নিয়ে এসেছে।

আর মেটসাব ? তার তুলনা সে নিজেই। এমন শান্ত ধীর-স্থির ও সদাহাস্যময় মানুষ সংসারে খুব কমই পাওয়া যায়। গত দুটি দিন আমরা যে যখন যা বলেছি, মানুষটি সাধ্যমত তা করার চেষ্টা করেছে। সর্বদা আমাদের পথ চলায় উৎসাহ দিয়েছে আর অমূল্যকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে।

এই মানুযগুলো এখন চলে যাচ্ছে আমাদের ছেড়ে। পর্বতাভিযানের তাই নিয়ম। যারা জীবন বিপন্ন করে আমাদের জীবন রক্ষা করে, এমনি করে তাদের দিতে হয় বিদায়। তাও তো এরা মাত্র দুদিনের সঙ্গী। যারা অনেকদিন ধরে আমাদের সেবা করবে, সেই পল্‌দিন নিমা রাম পেয়ার আর রসিদদের কাছ থেকেও একদিন এমনি অতর্কিতে নিতে হবে বিদায়। আর তখুনি প্রথম বুঝতে পারব, আজকের এই আপনজনেরা কেউ আমার আপন নয়।

করমর্দন করে, জড়িয়ে ধরে, সাফল্য কামনা করে ওরা বিদায় নিল। আমরা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম ঘরমুখো মানুষগুলোর দিকে। বার বার ওরা পেছন ফিরে হাত নাড়ছে, আমরাও হাত নাড়ছি। একসময় ওরা গ্রাবরেখার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওদের বিদায় দেবার ব্যস্ততায় এতক্ষণ ভাল করে ব্রহ্মাজীর দিকে তাকাবার অবকাশ পাই নি। এবারে তাঁর দিকে তাকাই। তাঁর গায়ে এখনো সোনালী চাদর। তিনি প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন। আশীর্বাদ করছেন কি ?

নিশ্চয়ই। নইলে তিনি এমন শান্ত থাকবেন কেন ? গতকাল বিকেল থেকে আমরা একটা তুষার ধসের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই নি।

আগেই বলেছি এখানে নদী নেই. খানিকটা দূরে একটা ছোট জলপ্রপাত রয়েছে।

তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভাল লাগছে। অথচ শব্দ সভ্যতার অভিশাপ। যন্ত্রসভ্যতার সকল দূষণের মধ্যে শব্দ-দূষণ বোধকরি মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। তবু অন্তহীন নৈঃশব্দ্য মানুষকে অস্থির করে তোলে। শব্দ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। শব্দহীন জগৎকে মৃত্যুপুরী বলে মনে হয়। তাই ঐ জলের শব্দটাকে জীবনের স্পন্দন বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া ঐ জল তো যেমন-তেমন জল নয়। ঐ জলধারা যে সৃষ্টিকর্তার কমণ্ডলু নিঃসৃত ব্রহ্মবারি।

কৃষ্ণ তপন পল্‌দিন ও নিমা একেবারে তৈরি হয়ে কিচেনের সামনে এসে হাজির হল। আজ ওরা মাল বইছে না। তবে সবাই বুক্‌স্যাক্ পিঠে নিয়েছে। ওতে আছে খাবার ও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম। খাবার বলতে কিছু বিস্কুট চকোলেট আর ফলের রস। সাজ-সরঞ্জাম মানে ক্লাইম্বিং-গীয়ার—রোপ, ক্যারাবিনার, পিটন, ক্র্যাম্পন, জুমার, টর্চ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা ইত্যাদি। আর নিয়েছে মার্কিং ফ্ল্যাগ। ওরা সকলেই ক্লাইম্বিং বুট পরে নিয়েছে।

পরোটা তরকারী ও হালুয়া দিয়ে ব্রেকফাস্ট করা হবে আজ। রাম সেই খাবারই ওদের দেয়। খেতে খেতে ওরা কাজের কথা বলে।

সব শুনে নেতা নির্দেশ দেয়—কাজ শেষ করে বেলা একটার মধ্যে এখানে ফিরে আসবে। সবাই একসঙ্গে লাঞ্চ করব।

পল্‌দিন বলে—আমরা চেষ্টা করব। তবে যদি কোন কারণে দেরি হয়ে যায়, চিন্তা করবেন না। আপনারা খেয়ে নেবেন। আমরা এসে লাঞ্চ্ করে নেব।

—কিন্তু তোমরা চেষ্টা করবে একটার মধ্যে ফিরে আসার।

চারজনেই মাথা নাড়ে। পেয়ার ওদের মগে চা ঢেলে দেয়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ওরা আবার ম্যাপ খুলে অমূল্য ও গৌতমের সঙ্গে আরেকবার আলোচনা করে নেয়।

তারপরে একে একে আমাদের সবার সঙ্গে করমর্দন করে। ওপরদিকে তাকিয়ে ব্রহ্মাজীকে প্রণাম করে। আমরাও প্রণাম করি তাঁকে। তাঁর কাছে ওদের কুশল কামনা করি।

অবশেষে চার পর্বতারোহী এগিয়ে চলে ব্রহ্মা পর্বতের দিকে। রঞ্জু চিৎকার করে ওঠে—ব্রহ্মাজীকি...

—জয়! আমরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিই। ওরাও আমাদের সঙ্গে গলা মেলায়।

ওরা এগিয়ে চলে, আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। কয়েক মিনিট বাদে ওরা ব্রহ্মা হিমবাহে মিলিয়ে যায়।

আমরা ফিরে আসি কিচেনের সামনে। ব্রেকফাস্ট করি।

কলকাতা ছাড়ার পরে এত ভাল জলখাবার জোটে নি। কিন্তু তাও কি ধীরে সুস্থে খাবার উপায় আছে? নেতা তাগিদ লাগায়—তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে যে যার কাজে লেগে যাও। নটা বেজে গেছে, বহুকাজ পড়ে আছে। অযথা সময় নষ্ট ক'রো না।

অতএব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শৈলেশ ও রঞ্জুর সঙ্গে তাঁবুর ভেতরে আসি। কিন্তু একি কাণ্ড! এসে দেখছি রীতিমত গরম। এখুনি এই, দুপুরে কি হবে? অথচ তাঁবু ছাড়া তো আর ছায়া নেই এই বৃক্ষহীন পাথুরে প্রান্তরে।

নেতা বাইরে দাঁড়িয়ে সাজ-সরঞ্জাম দেখছে। আমাদের কথাবার্তা তার কানে গেছে। সে বলে—তাঁবুর দুটো দরজাই সম্পূর্ণ খুলে দাও। দেখবে হাওয়া আসবে। বাইরে বেশ হাওয়া আছে।

তাই করি। রঞ্জু ওষুধ নিয়ে বসে, আমি ও শৈলেশ কার্ড লিখতে শুরু করি।

ওদের কথাবার্তাও আমাদের কানে আসছে। ওরা খুবই মুশকিলে পড়েছে। এত ছুটোছুটি করে এতগুলো টাকা ভাড়া দিয়ে সাজ-সরঞ্জাম আনা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দিয়ে আমাদের কতটা কাজ হবে, তা বোধকরি ব্রহ্মাজীও বলতে পারেন না। বুটগুলো লোহার মতো শক্ত, বেশ কয়েকটার 'সোল্' ফেটে গিয়েছে। অধিকাংশ বুটে ক্র্যাম্পন 'ফিট' করা যাচ্ছে না, সাইজের গোলমাল।

বাধ্য হয়ে নেতা বলছে—খুঁজে-পেতে নিজের জুতো বেছে নিয়ে আজই ভাল করে grease মাখিয়ে রাখো, কাল সকালে খানিকটা নরম হয়ে যাবে।

কিন্তু কেবল তো জুতো-সমস্যা নয়, সমস্ত সাজ-সরঞ্জামই প্রায় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। স্লীপিং ব্যাগের পালক জায়গায় জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলছে না, ফুটো হয়ে গেছে। ক্র্যাম্পনের সাইজ ঠিক নেই। উইণ্ড-প্রুফ, ফেদার-জ্যাকেট, গ্লাভস কোনটাই অক্ষত নয়। পিটনগুলো দিয়ে কতটা কাজ হবে বোঝা যাচ্ছে না। আরও অনেক সমস্যা।

তাহলেও বেলা একটার মধ্যে ওদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। রঞ্জুও শিবির এবং সদস্যদের সংখ্যা অনুযায়ী ওষুধ-পত্র গুছিয়ে ফেলেছে। শেষদিকে জয় ও টুলটুল ওকে সাহায্য করেছে। কেবল বাকি রয়ে গেল আমাদের কাজ। থাকবারই কথা। চার শ' চিঠি কি চার ঘন্টায় লেখা যায়? খেয়ে নিয়ে আবার বসতে হবে। শুধু আমাদের দুজনের দ্বারা সম্ভব নয়, আরও কয়েকজনের সাহায্য দরকার। তা নেওয়া যাবে, এখন তো খেয়ে নেওয়া যাক। একটা বেজে গেজে। গোরা তাগিদ দিচ্ছে।

কিন্তু ওরা ফিরে এলো না যে!

—চার ঘন্টার মধ্যে ওরা ফিরে আসতে পারবে না আমি জানতাম। পাছে বেশি দেরি করে, তাই আমি একটার মধ্যে ফিরে আসার কথা বলেছি।

এতক্ষণে অমূল্য মনের কথা প্রকাশ করে। গৌতম বলে—তাহলে আমরা খেয়ে নিই, কি বল লীডার?

—নিশ্চয়ই। গোরা বলছে, আজ নাকি একেবারে থ্রি-কোর্স লাঞ্চ্, ভাত ডাল শাকের তরকারী ও ডিমের ঝোল।

—আরও আছে, পাঁপড় ও আচার। ম্যানেজার যোগ করে—অতএব আর দেরি নয়।

কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। তখন ঠিকই ভেবেছিলাম। ঝরণায় জল এসে গিয়েছে। কিচেনের সামনে বসে সেই জলে ছোট-রসিদ থালা—মগ ধুয়ে নিচ্ছে।

হ্যাঁ, আজ আমরা সত্যই হট্-লাঞ্চ্ খাচ্ছি। গোরা রেঁধেছেও চমৎকার। বিশেষ করে সোনামুগের ডালটা!

খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেল। আবার ঘুম না পেয়ে যায়। একে তো অনেক কাজ পড়ে আছে, তার ওপরে দুপুরে ঘুমোলে রাতে বিপদে পড়ে যাবো।

উচ্চ-হিমালয়ে এসে প্রায় প্রত্যেকের ঘুম কমে যায়। অথচ এখানে রাত বড়ই দীর্ঘ। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সবাই তাঁবুতে ঢুকে স্লীপিং ব্যাগে আশ্রয় নেয়। পরদিন রোদ ওঠার আগে সে আশ্রয় ত্যাগ করতে মন চায় না। অর্থাৎ সন্ধ্যে

আটটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে হয়। অথচ অতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব নয়। তার ওপরে যদি আবার দিবানিদ্রা দেওয়া যায়। তাহলে, বলা বাহুল্য, নিদ্রাহীন রাত অতিবাহিত করতে হবে।

কৃষ্ণ তপন ও শেরপাদের খাবার রেখে দিয়ে হ্যাপ্ ও ল্যাপ্‌রা খেয়ে নিল। হ্যাপ্‌রা গিয়ে তাঁবুতে ঢুকল আর ল্যাপ্‌রা বাসনপত্র পরিষ্কার করতে লেগে গেল। বড়-রসিদ গোরাকে বলে—সাব্, আপনি এখন তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, ওপর থেকে সাব্‌রা এলে, আমি তাদের খাবার গরম করে দেব।

তা না হয় দেবে। কিন্তু ওদের এত দেরি হচ্ছে কেন ? বেলা আড়াইটে বেজে গেছে। ওরা মাল নিয়ে যায় নি। জায়গাটা খুব দূরেও নাকি নয়। শুনেছি ব্রহ্মা হিমবাহ ধরে খানিকটা উত্তর-পূর্বে এগিয়ে ব্রহ্মা পর্বতের গা বেয়ে হাজার দুয়েক ফুট ওপরে উঠতে হবে। তাছাড়া পথে বোধকরি বরফ নেই। তাহলে ওদের এত দেরি হচ্ছে কেন ?

পর্বতাভিযানে আসার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা এই দুশ্চিন্তা। বিশেষ করে আমার মতো মূল-শিবিরবাসীদের। ওপরে যারা যায়, তারা জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে চলে। তারা সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে, সারারাত তুষারঝড়ে কাটায়। দুঃসহ শীত, অনাহার আর অনিদ্রা তাদের নিত্যসাথী। কিন্তু তাদের কর্মময় জীবনে দুশ্চিন্তার অবকাশ থাকে না। আর আমাদের, আমরা যারা মূল-শিবিরে থাকি, সহযাত্রীদের জন্য দুশ্চিন্তা করাই আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। ওদের অগ্রগতি, ওদের স্বাস্থ্য, ওদের নিরাপত্তা আর ওপরের আবহাওয়া—আরও কত চিন্তা।

কিন্তু কি করব ? জীবনদেবতা যার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন। কেদারনাথ পর্বতাভিযানে (২২,৭৭০) গিয়ে কেবল উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে তুষারাবৃত এক নম্বর শিবিরে কয়েকজন পর্বতারোহী সদস্যের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাতে পেরেছিলাম। কিন্তু তারপর থেকে যতবার এসেছি, মূল-শিবিব আর অগ্রবর্তী মূল-শিবিরেই অভিযানের দিনগুলো কেবল দুশ্চিন্তা করে কেটে গিয়েছে। আর এবারে ? এবারে তো বয়স আরও বেড়েছে ' তার ওপরে নেতার পায়ে চোট। এবারে ওপরে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অতএব দুশ্চিন্তার তো সবে শুরু।

তাই বলে আমরা বসে থাকি না। পর্বতাভিযানে সময় নষ্ট করবার সময় নেই। কাজ চলতে থাকে। আমরা চিঠি লিখছি, ওরা সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করছে।

খাবার পর থেকে রঞ্জু জয় ও গৌতম আমাদের সাহায্য করছে। অমূল্য এসে তাঁবুতে বসেছে। সে চিঠি সই করছে। আর মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে দরজা দিয়ে হিমবাহের দিকে তাকাচ্ছে। মুখে যাই বলুক, ওর চাইতে বেশি চিন্তা কেউ করছে না। করার কথাও নয়। কারণ সে নেতা।

মনে যা-ই থাক, আমিও কিন্তু মুখে কিছু বলছি না। নিজের কাজ করে চলেছি। তবে ঘড়ি দেখছি।

না, আর শান্ত থাকা সম্ভব নয়। চারটে বাজে। যাদের একটার মধ্যে আসতে বলা হয়েছে, তারা চারটেয় না এলে কলকাতায় পর্যন্ত চিন্তা হয়। আর এখানে, এই অচেনা দুর্গম ও ভয়ঙ্কর পথে! তাহলে কি কোন দুর্ঘটনা, কিংবা পথ ভুল হয়েছে ?

হতে পারে। আরও অনেক কিছুই হতে পারে।

আর চুপ করে থাকা গেল না। আমি বলি—চা-বিস্কুট টর্চ এবং ফার্স্ট-এড্ বক্স

দিয়ে দুজনকে ওপরে পাঠালে হত না?

অমূল্য আমার কথা শোনে। কিন্তু বলে না কিছু। সে গৌতমের দিকে তাকায়। গৌতম আপত্তি করে। বলে—না, না, তুমি অযথা চিন্তা করছ শঙ্কুদা! পথ ভাল, আবহাওয়া ভাল। 'রেসকিউ পার্টি' পাঠাবার কোন দরকার নেই। ওরা এখুনি এসে যাবে। তবে সাড়ে চারটে বাজে, এবারে চায়ের জল চড়ানো যেতে পারে। আমাদেরও চায়ের সময় হয়ে গেছে।

—সাবাস ডেপুটি! নেতা সহনেতাকে তারিখ করে। তারপরে ডাক দেয়—গোরা, দি হেড-কুক, টী প্লীজ।

গোরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। নেতার ডাকে তার ঘুম ভেঙে যায়। সে উত্তর দেয়—সরি লীডার!

—মানে? নেতার স্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

—মানে খুব সহজ। আমি চা বানাতে পারব না।

—পারবে না মানে। তুমি হেড-কুক্ নও?

—হেড-কুক্ কখনও চা বানায় না।

—কে বানায় তাহলে?

কিন্তু গোরা সে প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই শিবু ডাক দেয়—রাম সিং!

জগদীশ হাঁক দেয়—রসিদ!

শিবু আবার বলে—রাম সিং চায় বানাও!

জগদীশ যোগ করে—জল্দি।

কয়েক মিনিট বাদে স্টোভের শব্দ কানে আসে। আমরাও বেরিয়ে আসি বাইরে।

পাঁচটা বাজে। কিন্তু এখনও চারিদিকে ঝকঝকে রোদ। গৌতম বলে—এ রকম আবহাওয়া পেলে দশদিনের মধ্যে ক্লাইম্ব্ হয়ে যাবে।

—নিশ্চয়ই। জগদীশ ও শিবু সমর্থন করে তাকে।

ওরা পর্বতারোহী তাই পর্বতারোহণের কথা বলছে। আমি ব্রহ্মলোকের পথিক। আমি ব্রহ্মাজীর দিকে তাকাই। তিনি তেমনি শান্ত, তেমনি সৌম্য, তেমনি সুন্দর। করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন আমাদের দিকে। আশীর্বাদ করছেন কি? নিশ্চয়ই। আমরা যে ব্রহ্মলোকে এসেছি। তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছি। কৃষ্ণ তপন ও শেরপারা নিশ্চয়ই ভাল আছে। এখুনি ফিরে আসবে।

চা হয়ে যায়। ছোট-রসিদ মগ নিয়ে আসে, বড়-রসিদ পরিবেশন করে। আমরা চায়ে চুমুক দিতে দিতে হিমবাহের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

—এসে গেছে, ওরা এসে গেছে।

তাঁবুর ভেতর থেকে সহসা জয়ের চিৎকার ভেসে আসে! তাড়াতাড়ি হিমবাহের দিকে তাকাই। না। কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো!

জয় বেরিয়ে এসেছে। তার হাতে বাইনোকুলার। এতক্ষণে ওর চিৎকারের কারণ বুঝতে পারি। আমরা বেরিয়ে আসার পর থেকেই সে তাঁবুতে এসে বাইনোকুলার দিয়ে হিমবাহের দিকে নজর রেখেছিল ইচ্ছে করেই বাইরে বের হয় নি। আমরা দুটি বাইনোকুলার নিয়ে এসেছি। তার একটা কৃষ্ণ নিয়ে গেছে। ওটা নিয়ে বাইরে এলেই কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো।

তাই পড়ে গেল। বাইনোকুলার নিয়ে জয় বাইরে আসতেই গৌতম হাত বাড়ালো। বলল—বড়দা, দে তো আমাকে। একবার দেখি।

একে ছোটভাই, তার ওপরে সহনেতা। জয় দূরবীণটা গৌতমের হাতে দিয়ে বলে—ঐ যে প্রকাণ্ড পাথরটা দাঁড়িয়ে আছে। ওটার বাঁদিকে দেখ, ওরা নেমে আসছে।

গৌতম চোখে দূরবীণ লাগায়। আমরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু বাদে গৌতম বলে ওঠে—হ্যাঁ, বড়দা ঠিকই দেখেছে লীডার! ওরা আসছে।

—দেখি, দেখি, আমাকে একটু দে তো! মুখে বললেও দেবার অপেক্ষা করে না রঞ্জু। সে গৌতমের হাত থেকে বাইনোকুলারটা প্রায় কেড়ে নিয়ে নিজের চোখে লাগায়।

তারপরে একে একে শিবু শৈলেশ জয় জগদীশ গোরা ও টুলটুল হয়ে দূরবীণটা নেতার হাতে এলো। কিন্তু নেতা সেটা চোখে না লাগিয়ে জয়ের হাতে ফিরিয়ে দিল। বলল—আমার আর বাইনোকুলারের দরকার নেই, কারণ আমি ওদের খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

সত্যই তাই। আমিও দেখতে পাচ্ছি। শুধু আমি নই, আমরা সবাই।

ওরা আসছে। প্রথমে পল্‌দিন, তারপরে কৃষ্ণ আর তপন। সবার শেষে নিমা।

আমরা সমস্বরে চিৎকার করে ওদের স্বাগত জানাই। ওরাও হাত নাড়ে।

ওরা কাছে আসে, রুক্‌স্যাক্ নামায়। ছোট-রসিদ ওদের চা দেয়। অমূল্য জিজ্ঞেস করে, ভাত খাবে তো? গরম করে দেবে।

তাই তো ভাল। কৃষ্ণ বলে। সে তপনের দিকে তাকায়।

তপন শুধু বলে—বড্ড খিদে পেয়েছে!

—তা তো পাবেই, সারাদিন না খাওয়া। গৌতম বলে।

খেতে খেতে ওরা কাজের কথা বলে। অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ দেয়। শুধু এক নম্বর নয়, ওরা দু নম্বর শিবিরের জায়গাও দেখে এসেছে।

—সাবাস পল্‌দিন, সাবাস নিমা! নেতা প্রথমে শেরপাদের বাহবা দেয়। তাই নিয়ম। তারপরে কৃষ্ণ ও তপনকে বলে—তোমরা প্যাক্-লাঞ্চ্ নিয়ে গেলেই ভাল করতে।

—আমরা কি আগের থেকে জানতাম যে একদিনে এতটা পারব? তপন বলে।

—তবে পল্‌দিনের উৎসাহেই সম্ভব হয়েছে। কৃষ্ণ যোগ করে।

—কেয়া পল্‌দিন, কেয়া কিয়া তুমনে? তুম তো কামাল কর্ দিয়া ভাই!

নেতার প্রশংসায় যেন একটু লজ্জা পায় পল্‌দিন। মাথা নত করে কোনমতে বলে—কেয়া কিয়া সাব, জায়দা কুছ নহী কিয়া। সাব্‌লোগ ভি বহত অচ্ছা চলতে।

—দেখলেন। নেতার দিকে তাকিয়ে তপন বলতে থাকে—আপনি তো বলেন, আমি ইনস্ট্রাক্টরদের ঘুষ দিয়ে মাউন্টেনীয়ারিং ট্রেনিং-য়ের সার্টিফিকেট যোগাড় করেছি। শুনুন, আপনার শেরপা সর্দার কি বলছে?

—শুনেছি। কিন্তু পল্‌দিন তোমার কথা বলছে না, বলছে কৃষ্ণের কথা। অমূল্য গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়।

আমরাও গম্ভীর থাকার চেষ্টা করি।

তপন প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—কখ্‌খনো নয়, পল্‌দিন আমাদের দুজনের কথাই বলেছে। একবার থামে সে। তারপরে পল্‌দিনের কাছে এগিয়ে এসে অনুরোধ করে—পল্‌দিন, ভাইয়া, বোলো হাম ক্যাঁয়সে চলা?

পল্‌দিন চালাক ছেলে। সে বুঝতে পারে, নেতা তপনের সঙ্গে ঠাট্টা করছে। তাই সে অন্য কথা বলে—অভি খানা তো খা লেও সাব!

—না, তুম বাতাও, হামনে ক্যাঁয়সে চলা?

—বহত অচ্ছা। নিমা পাশ থেকে বলে ওঠে। সে পল্‌দিনের চেয়ে বয়সে বড়। সোজা-সরল মানুষ। সে নেতার মতলব বুঝতে পারে নি।

তাই ওর কথা শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি। নেতাও সে হাসিতে যোগ দেয়। তার মতলব মাঠে মারা গেছে।

ওদের খাওয়া হতেই রোদ মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ওপারের পাহাড় আর হিমবাহের ওপর থেকে, মিলিয়ে গেল আমাদের শিবির থেকে, এককথায় ব্রহ্মলোকের বুক থেকে। সন্ধ্যা নেমে আসছে ব্রহ্মলোকে। এখুনি সে আঁধারে বিলীন হবে।

জানি সে আঁধার ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ বাদেই চাঁদ উঠবে। মুহূর্তে ব্রহ্মলোক রূপান্তরিত হবে অমৃতলোকে। তখন আবার আসা যাবে বাইরে। এখন বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে গিয়ে গরম-পোশাক পরে নেওয়া যাক। এই এক বিচিত্র ব্যাপার হিমবাহ অঞ্চলে। যতক্ষণ রোদ ততক্ষণ জীবন। রোদ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুপুরী।

তাঁবুতে এসে তাড়াতাড়ি মোজা, সোয়েটার, উইণ্ড-প্রুফ আর টুপি পরে নিয়ে ম্যাট্রেসের ওপর এসে বসি। শুধু আমি নই, সবাই তাই করে। কি করবে, ব্রহ্মলোকে দ্বিতীয় রাত সমাগত।

একটু বাদে বড-রসিদ পেট্রোম্যাক্স ধরিয়ে নিয়ে আসে। তাঁবু আলো ঝলমল হয়ে ওঠে। নেতা রসিদকে বলে—চায় বানাও!

সহনেতা যোগ করে—চানাচুর নিকালো!

নেতা আবার বলে—চায় কি বাদ শেরপালোগ আউর হ্যাপ্‌-লোগকো ভি ইধার বোলাও। তোম দোনো ভি আ যাও। গানা হোগী।

আগামী কাল খুব সকালেই পর্বতারোহী ও শেরপারা স্থায়ীভাবে ওপরে চলে যাবে। গোরা টুলটুল হ্যাপ্‌ এবং ল্যাপরাও ওদের সঙ্গে মাল নিয়ে ওপরে যাবে। কিন্তু মাল ফেলে তারা আবার নেমে আসবে। পরশু হ্যাপরা ওপরে চলে যাবে আর বড়-রসিদ ডাক নিয়ে সুয়েদ যাবে। সুতরাং অভিযানের প্রথম পর্বে আজই আমাদের শেষ মিলনসন্ধ্যা। তাই নেতা আজকের সন্ধ্যাটিকে গানের ডালি দিয়ে সাজিয়ে তুলতে চাইছে।

নেতার ইচ্ছা পূর্ণ হল। চা ও চানাচুর পরিবেশনের পরে শুরু হল গান। প্রথমে পল্‌দিন নেপালী গান গাইল। তারপরে পেয়ার সিং গাড়োয়ালী ও বড়-রসিদ কিশ্‌তোয়ারী লোকসঙ্গীত। ওদের পরে রঞ্জুও গাইল একটা ইংরেজী গান। তারপরে শুরু হল শৈলেশের ভজন। ওর গানের গলাটি বড়ই মিঠে। তার ওপরে টুলটুল সসপ্যান ও জয় মগ বাজিয়ে বেশ ভাল সঙ্গত করছে। ব্রহ্মলোক মুখরিত হয়ে উঠেছে দামাল যুবকদের ভক্তিসঙ্গীতে।

অবশেষে শুরু হয় ক্লাবের সমবেত সঙ্গীত। ব্রহ্মলোকে বসে আমরা ব্রহ্মাজীকে গান গেয়ে শোনাই, জীবনের জয়গান—

ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক—

ভয় যারা পায়, তাদের ছায়া দূর মিলাক,

আমরা অগ্নিদহনে দীপ্ত দহনে
জীবন করেছি জয়,
আর শত নিষেধের বাধা বন্ধনে
দুঃখ করেছি ক্ষয়।
এবার নয় কাঁদন, ক্ষয় বাঁধন, সামনে দিন—
আজ দুঃখ শেষ, স্বপ্নাবেশ দূর পালাক্।
ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু.....ছায়া দূর মিলাক্ ॥
আমরা জয় করেছি দুঃখকষ্ট
জয় করেছি ভয়,
আর জেনেছি এবার মোদের
মৃত্যু হবার নয়।
তাই ব্যর্থ নয়, ব্যর্থ নয় এই চলা ;
আজ শঙ্কাহীন মৃত্যুহীন পথ চলা ;
ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু.......ছায়া দূর মিলাক।

॥ এগারো ॥

আজ সকালে ঠিকসময়ে ঘুম ভেঙে গেল। তাহলে কি উচ্চতার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছি ? আমার শরীর ও মন কি এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ?

থাক্ গে আমার কথা, অভিযানের কথা ভাবা যাক্। আজ গৌতম শিবু জগদীশ কৃষ্ণ ও তপন শেরপাদের নিয়ে এক নম্বর শিবিরে চলে যাবে। গোরা ও টুলটুল হ্যাপ্ এবং ল্যাপ্‌দের নিয়ে ওদের সঙ্গে যাবে। ওরা এক নম্বরে মাল ফেরী করবে।

আজ তাই সকালে ঘুম থেকে ওঠার দরকার ছিল। ভালই হল, আমার ঘুম ভেঙে গেছে। এবারে চায়ের বন্দোবস্ত করা দরকার। গরম চায়ের মগ হাতে না ধরিয়ে দিলে বাবুরা কেউ স্লীপিং ব্যাগের মায়া ছাড়বেন না।

উঠে বসি। সোয়েটার ও উইণ্ডপ্রুফ গায়ে চাপাই। জুতো পরে বাইরে আসি।

হ্যাঁ, চারিদিক ফর্সা হয়ে গেছে। কেনই বা হবে না। পৌনে ছ'টা বাজে।

নালায় জল নেই। কিন্তু কাল রাতে রসিদ কিচেনের সামনে দু বালতি জল ধরে রেখেছে। তাই দিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে নিই। জল তো নয়, বরফ। হাত জমে যেতে চাইছে।

রুমালে হাত মুছে দুহাত ঘষতে ঘষতে হ্যাপ্‌দের তাঁবুর সামনে আসি। রাম ও পেয়ারকে ডাকি। সাড়া পাইনে। ওরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘুমাক। ল্যাপদের ডাকা যাক। ওদের তাঁবুর সামনে এসে ডাক দিই—রসিদ।

—জী সাব্।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাই। ওদের চা বানাতে বলি। তারপরে ফিরে আসি তাঁবুতে।

কিছুক্ষণ বাদে বড়-রসিদ তাঁবুতে ঢুকে বলে—গুড মর্নিং সাব্, বেড টি।

—গুড মর্নিং।

—গুড মর্নিং।...

সদস্যরা একে একে মুখ বের করে। রসিদ তাদের হাতে চায়ের মগ ধরিয়ে দেয়। .কে একে সদস্যরা উঠে বসে। সবাই সুপ্রভাত জানায়।

পাঁচ পর্বতারোহী আজ ওপরে চলে যাবে। তারা গতকালই রুক্‌স্যাক্ গুছিয়ে রেখেছে। এমন কি ক্যামেরা ও বাইনোকুলার পর্যন্ত ভরে রেখেছে। শেরপারাও আজ এক নম্বর শিবিরে চলে যাচ্ছে। তারাও নিজেদের মালপত্র ঠিক করে রেখেছে।

গোরা ও টুলটুল হ্যাপ্ ও ল্যাপ্‌দের নিয়ে ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ওরা মাল পৌঁছে দিয়ে বিকেলে ফিরে আসবে। তারা কে কোন্ মাল নিয়ে যাবে, তাও কাল ঠিক করে রাখা হয়েছে।

আজ আমাদের সমস্যা একটাই। কে রান্না করবে? হেড-কুক্ গোরাকে আজ হাইঅলটিচ্যুড পোর্টারের কাজ করতে হবে। শিবু আর জগদীশও আজ ওপরে চলে যাচ্ছে। রাঁধুনী তো হতে চাইলেই হওয়া যায় না, রান্না করতে জানা চাই।

বেশ কয়েক মিনিট আলোচনার পরে সাব্যস্ত হল, আজ জয় ও শৈলেশ রান্নার দায়িত্ব নেবে। রঞ্জু অদের সাহায্য করবে। এবং রাঁধুনীরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য ঘোষণা করে—আজ Maggi ও কফি দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট হবে আর অভিযাত্রীরা পরোটা ও আলুর তরকারী প্যাক-লাঞ্চ্ নিয়ে যাবে।

—সাবাস্! এই না হলে ম্যানেজার। নেতা জয়কে বাহব্বা দেয়। তারপরেই গৌতমকে তাগিদ লাগায়—তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ওবাও কিচেনে চলে যাক। সাতটা বাজে। গোরাদের ফিরে আসতে হবে।

পর্বতারোহীরা তৈরি হবার আগেই কিচেন থেকে 'ব্রেক-ফাস্ট রেডী' চিৎকার ভেসে এলো।

বাইরে এসে দেখি ম্যাগী তৈরি হয়ে গেছে। দুটো স্টোভ জ্বলছে। একটায় কফির জল ফুটছে, আরেকটায় ওদের প্যাক্-লাঞ্চের পরোটা হচ্ছে।

নেতা আসতেই ম্যানেজার প্রস্তাব দেয়—তোমরাও ওদের সঙ্গে ব্রেক্-ফাস্ট করে নাও, নইলে কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। খাবার মধ্যে ওদের প্যাক্-লাঞ্চ্ তৈরি হয়ে যাবে।

পর্বতাভিযাত্রীকে যে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ পর্যন্ত--সবই জানতে হয়, জয় ও রঞ্জু তার প্রমাণ দিয়ে দিল। ম্যাগী এবং কফি দুটোই বেশ ভাল হয়েছে।

পর্বতারোহীরা পিঠে রুক্‌স্যাক্ নিল। মুহূর্তে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল! ওরা চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে অচেনা ও অজনা পথে। যাচ্ছে দুর্গম ও ভয়ঙ্করের মাঝে। মনে পড়ছে পঁচাত্তর সালের জাপানী অভিযানে সহনেতা সাতোরু তাকাচি এবং আঙ ছাতারের কথা, মনে পড়ছে আটাত্তর সালের বৃটিশ অভিযানের জন এবং ডানকানের কথা। তাঁরাও একদিন এইভাবে রুক্‌স্যাক্ পিঠে তুলে নিয়েছেন। সতীর্থদের কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন ব্রহ্মা—১ শিখরের দিকে। সে বিদায় শেষ বিদায় হয়েছে। তাঁরা আর ফিরে আসেন নি।

এরাও বিদায় চাইছে। জানি না, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে? মনটা তাই অজানা আশঙ্কায় বার বার দুলে উঠছে। আশ্চর্য! মাত্র একমাস আগেও আমি গৌতম শিবু কৃষ্ণ তপন আর জগদীশকে চিনতাম না। অথচ আজ তারা আমার অনুজপ্রতিম প্রিয়। তাদের বিদায় দিতে তাই মন আমার এমন উতলা হয়ে উঠেছে।

তাহলেও আমি আকুলতা প্রকাশ করতে পারব না। উতলা মনকে সংযত করতে হবে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সেই চেষ্টাই করতে থাকি। কিন্তু ওদের দিকে চোখ পড়লেই আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে যেতে চাইছে। তাড়াতাড়ি পেছিয়ে আসি খানিকটা। ওদের থেকে দূরে থাকতে চাই।

পারি না। ওরাই কাছে আসে আমার। গৌতম প্রণাম করে। আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। ওকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠি।

গৌতম সান্ত্বনা দেয়—তোমার কোন ভয় নেই শঙ্কুদা? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমাদের জন্য জয়মাল্য নিয়ে আসতে পারব কিনা কথা দিতে পারছি না। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি সবাইকে নিয়ে সুস্থ শরীরে তোমার কাছে ফিরে আসব।

—তাই আসিস ভাই! তোর কাছে আমার আর কোন দাবী নেই।

—আপনার এ দাবীর কথা আমরা সব সময় মনে রাখব শঙ্কুদা! আমরা সবাই ফিরে আসব আপনার কাছে। কৃষ্ণ তপন আর শিবুও আশ্বাস দেয় আমাকে।

ভরসা দেয় জগদীশ—আমরা কোন বাড়তি ঝুঁকি নেব না শঙ্কুদা, সবাই সুস্থ শরীরে ফিরে আসব।

বিদায়ের পালা শেষ হয়। ওরা চলতে শুরু করে। আমরা ওদের অনুসরণ করি। পাথর ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলি। প্রান্তরের প্রান্তে পৌঁছই। সামনেই হিমবাহ।

গৌতম বলে—এবাবে তোমরা এসো লীডার! আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

—আসি শঙ্কুদা, আসি লীডার! জগদীশ কৃষ্ণ আর তপন বলে। শিবুও বিদায় চায়। বলে—এবারে আমাদের বিদায় দিন।

তাই দিই। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। ওরা এগিয়ে চলে। চেয়ে চেয়ে ওদের দেখি। দেখতে দেখতে একসময় দেখা শেষ হয়। গ্রাবরেখার পাথুরে পথে ওরা যায় হারিয়ে।

ওরা আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছে। কিন্তু ব্রহ্মাজী দেখতে পাচ্ছেন ওদের। ওরা যে তাঁরই কাছে চলেছে। তাই তাঁকে প্রণাম করে বলি—হে জগৎস্রষ্টা চতুরানন, তুমি ওদের দেখো। ওরা সৃষ্টিছাড়া হলেও তোমারই সৃষ্টি। তুমি ওদের রক্ষা ক'রো।

ধীর পদক্ষেপে ফিরে আসি শিবিরে। কর্মমুখর প্রাণচঞ্চল অসিত কানন এখন বড় শান্ত, বড়ই ফাঁকা। তাতো হবেই। আঠারোজন মানুষের তেরোজনই চলে গেল।

কিন্তু আমরা পর্বতাভিযানে এসেছি। মূল-শিবির হল পর্বতাভিযানের প্রাণ-ভোমরা। আমাদের তৎপরতার ওপরে সারা অভিযানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বিদায় ব্যথায় মুষড়ে পড়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। অতএব কিছুমাত্র দেরি না করে কাজ শুরু করে দিতে হবে।

তাই করি। জয় ও রঞ্জু কিচেনে চলে যায়। আমাদের জন্য লাঞ্চ আর গোরা ও টুলটুলের জন্য বিকেলের জলখাবার করে রাখতে হবে। ওরা ফিরে এসে খাবে।

আমি ও শৈলেশ চিঠি লিখতে বসে যাই। আগামীকাল বড়-রসিদ ডাক নিয়ে সুযেদ যাবে।

রান্না-খাওয়া আর লেখা-লেখি করতেই সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। পাঁচটায় ফিরে এলো গোরা ও টুলটুল। ওদের সঙ্গে রসিদ ব্রাদার্স ও রাম সিং। পেয়ার সিং আসে নি। সে নাকি থেকে গিয়েছে।

কাজটা ঠিক করে নি। পর্বতারোহণে পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়া এক পা-ও এগোনো ঠিক নয়। ঠিক ছিল পেয়ার আজ ফিরে আসবে। সে তার নিজের রুক্‌স্যাক রেখে গিয়েছে। নিয়ে গেছে টিন ফুডের একটা কিট। ম্যাট্রেস ও স্লীপিংব্যাগ ছাড়া সে রাত কাটাবে কেমন করে ? আগামীকাল তার রুক্‌স্যাক্ পাঠাবার জন্য আমাদের একজন বাড়তি মালবাহক চাই। তার ওপরে আজ ওর থাকার জায়গারও অভাব পড়বে। ওপরে আমরা আজ মোটে তিনটি তাঁবু পাঠিয়েছি, দুটো সদস্যদের একটা শেরপাদের।

মনে মনে যা-ই ভাবুক, নেতা মুখে কিছু বলে না। চা-জলখাবার খাবার পরে টুলটুলকে বলে—এবারে জোরে জোরে গৌতমের চিঠিটা পড়ে শোনাও। সবাই মিলে শোনা যাক।

১৯শে সেপ্টেম্বর

তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা ব্রহ্মা হিমবাহের সেই পাথর বোঝাই গ্রাবরেখা ধরে ঘণ্টাখানেক প্রায় সোজা পূবে এগিয়ে এসেছি। পথটি যেন গ্রাবরেখার পেট চিড়ে এগিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য খুবই ধীরে ধীরে পথ চলতে হয়েছে।

তারপরে আমরা ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণে বাঁক নিয়েছি। পথের পাথর কমে দেখা দিয়েছে ছাই মাটি বালি আর বরফ। বেশ কয়েকটা চওড়া ফাটল মাঝে মাঝে আমাদের পথরোধ করেছে। অনেকটা করে ঘুরে ঘুরে সেগুলোকে পার হতে হয়েছে। তবে রাস্তা চিনতে অসুবিধে হয় নি। একে তো কৃষ্ণ তপন পল্‌দিন আর নিমা সঙ্গে ছিল। তার ওপরে গতকাল ওরা মার্কিং ফ্ল্যাগ লাগিয়ে পথ চিহ্নিত করে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে আমরা এখন ব্রহ্মালোকের লোকেশ্বর।

আও আধঘণ্টা পথচলার পরে আমরা বাঁয়ে অর্থাৎ উত্তরে বাঁক ফিরেছি। এগিয়ে চলেছি উত্তর-পূবে। হাঁটতে হাঁটতে ব্রহ্মা হিমবাহের উত্তরতীরে চলে এসেছি। চলতে চলতে পৌঁছে গিয়েছি ব্রহ্মা পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্বতগাত্রে। পাথর নয়, মাটি নয় তৃণাচ্ছাদিত পর্বতপাত্র। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছে ব্রহ্মাজী একখানি সবুজ চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছেন।

তৃণাচ্ছাদিত হলেও পর্বতগাত্রটি কিন্তু মোটেই সমতল নয়। খাড়া উঠে গিয়েছে ওপরে। গিয়ে মিশেছে ব্রহ্মা-১ শিখরে দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরায়। এই গিরিশিরা ধরে তিয়াত্তর, আটাত্তর ও উনআশি সালের সফলকাম অভিযাত্রীরা শিখরে আরোহণ করেছেন।

কিন্তু আগেই লিখেছি, সবুজ পর্বতগাত্রটি খাড়া উঠে গেছে ওপরে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এত খাড়া যে পিঠে রুক্‌স্যাক্ নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চতুষ্পদ প্রাণীর মতো ওপরে উঠতে হয়েছে। কাজটা কঠিন। কারণ আজ আমাদের রুক্‌স্যাক্ খুবই ভারী। কম করেও পঁচিশ কিলো পিঠে চাপিয়ে সেই চড়াই পার হয়ে এসছি। তবে ঘাস থাকার জন্য পথটি বেশ নিরাপদ। পড়ে যাবার কোন ভয় নেই।

তাহলেও জায়গাটি পার হবার সময় বার বার মনে হয়েছে, এই মসৃণ পথের চেয়ে এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ অনেক ভাল ছিল। কিন্তু কি করব ? আমাদের সুবিধে হবে

বলে ব্রহ্মাজী কি সহজ সরল সমতল রাস্তা বানিয়ে রাখবেন? আর তা যদি সত্যিই রাখতেন, তাহলে কি আমরা ব্রহ্মালোকে আসতাম?

যাই হক আরও ঘণ্টাখানেক চলার পরে থামতে হল। সামনে একটা খাড়া পাথরের দেওয়াল। খুবই খাড়া। নতিমাত্রা বোধকরি ৮০ ডিগ্রি হবে। নিরেট পাথরের দেওয়াল, ফাঁক ফোকড় ফাটল কিছুই চোখে পড়ছে না। ক্লান্ত দেহ, পিঠে ভারী রুক্‌স্যাক্‌ এ অবস্থায় ফিক্‌সড রোপ ছাড়া এই দেওয়াল বেয়ে ওঠা খুব কষ্টকর।

তাহলেও সেই কষ্টকর কাজটাই করতে হল। আমরা সাবধানে ও ধীরে ধীরে সেই দেওয়াল বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। পৌঁছলাম ব্রহ্মা-১ পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরার ওপরে। তারপরে সেই গিরিশিরা ধরে কিছুটা উত্তরে এগিয়েই শিবিরে জায়গা পেয়ে গেলাম। মূল-শিবির থেকে এক নম্বর শিবিরে আসতে আমাদের প্রায় পাঁচঘণ্টা লাগল। দূরত্ব বোধকরি চার-পাঁচ কিলোমিটারের মতো। জায়গাটার উচ্চতা ১৬,৮০০ ফুট তার মানে ৫১২১ মিটার।

এখানেও বরফ নেই। বরং কিছু ঘাস আর ঝোপঝাড় রয়েছে আর রয়েছে পাথর। কেবল মাটিতে নয়, চারিদিকে, প্রায় প্রাচীরের মতো। ছোট-ছোট টিলার মতো নিরেট পাথরের স্তূপ। তারই ভেতর দিয়ে উত্তরে তুষারাবৃত ব্রহ্মা-১ শিখরকে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মা হিমবাহকে। প্রায় হাজার দুয়েক ফুট নিচে। দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। হিমবাহের ওপারে অর্থাৎ পুবে দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মালোকের উচ্চতম শৃঙ্গ সিক্‌ল মুন। দেখতে পাচ্ছি ফ্ল্যাট টপ আরও কয়েকটি তুষারাবৃত পর্বতশিখর।...

কিন্তু লীডার, আজ আর আমাদের কথা থাক। গোরা টুলটুল রাম আর রসিদদের খাওয়া হয়ে গেছে। ওদের দিনের আলো থাকতে থাকতে মূল-শিবিরে নেমে যেতে হবে। আর দেরি করা উচিত হবে না। যেতে অবশ্য ওদের তিন ঘণ্টার বেশি লাগবে না। কিন্তু যে কোন সময় আবহাওয়া খারাপ হতে পারে।

আরেকটা কথা পেয়ার সিং ফিরে যেতে চাইছে না। ও নিজের রুক্‌স্যাক্‌ নিয়ে আসে নি, তবু বলছে থাকবে। রাতে অসুবিধে হবে। অথচ ওকে রেখে দিতে হল।

এই সঙ্গে একটা ফর্দ পাঠালাম। আগামীকাল এই মালগুলো পাঠিয়ে দিও। কাল আমরা দু নম্বর শিবিরের পথ তৈরি এবং মাল ফেরী করব। সময় পেলে একবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসব।

প্রকৃতি সহায় হলে তোমাদের জন্য জয়মাল্য নিয়ে আসতে পারব। আমাদের জন্য চিন্তা ক'রো না, আমরা ভাল আছি ভাল থাকব।

গতকাল সাতটার পরেও রোদ ছিল। আর আজ ছটার আগেই রোদ মিলিয়ে গেল। বৈকালী চা খেয়ে নিয়েই তাঁবুতে চলে এলাম। রাম ও রসিদরা বলেছে, ওরাই রাতের রান্না করবে। 'ডাল রোটি আউর ভাজি' খাওয়া হবে।

অমূল্য তাঁবুতে এসে গৌতমের ফর্দ দেখে। বলে—পেয়ারের রুক্‌স্যাক্‌ নিয়ে আগামীকাল অন্তত ছ'বোঝা মাল ওপরে পাঠাতে হবে।

—অত লোক কোথায়? গোরা জিজ্ঞেস করে।

টুলটুল বলে—মানুষ তো আমরা তিনজন, আমি গোরা আর ছোট-রসিদ। রাম তার

নিজের রুক্‌স্যাক্‌ নিয়ে যাবে।

—কালও বড়-রসিদ ওপরে যাবে, শৈলেশ আর জয়ও মাল ফেরী করবে। রঞ্জু আর আমি শঙ্কুদাকে চিঠি লেখায় সাহায্য করব।

—আপনাদের রান্না-খাওয়া ? শৈলেশ প্রশ্ন করে।

—তাও আমরাই করে নেবো। সকালে ব্রেক-ফাস্ট বানাতে তোমরা আমাদের একটু সাহায্য ক'রো।

—নিশ্চয়ই। টুলটুল বলে।

—তাহলে কাল ডাক যাচ্ছে না ? আমি জিজ্ঞেস করি।

অমূল্য উত্তর দেয়—না ! কাল বড-রসিদ ওপরে মাল নিয়ে যাচ্ছে। পরশু সকালে সে ডাক নিয়ে সুয়েদ যাবে।

মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়ে পাঠানো টেলিগ্রাম আশা করি দু-তিন দিনের মধ্যে দিল্লী ও কলকাতায় পৌঁছে যাবে। কাগজে খবর বের হলে সবাই জানতে পারবে। কাজেই চিঠিগুলো আরেকদিন পরে গেলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া আরেকদিন পরে গেলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া আরেকটা দিন হাতে পেলে বাকি চিঠিগুলো লিখে ফেলা যাবে। অবশ্য কাল শৈলেশ থাকছে না। তাকেও মাল ফেরী করতে হবে। আগেই বলেছি ওর হাতের লেখাটি ভারী সুন্দর। লিখতেও পারে বেশ তাডাতাড়ি। অধিকাংশ চিঠি সে-ই লিখেছে। কিন্তু কাল সে থাকছে না। বাকি চিঠিগুলো আমাদেরই লিখে ফেলতে হবে।

—আরেকটা কথা...। অমূল্য কথা বলে—পরশু ওরা দু নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু সেদিন এখান থেকে কেউ ওপরে যাবে না। তরশু ছোট-রসিদ এক নম্বরে যাবে। যদি তখন ওরা কেউ শিবিরে না থাকতে পারে, তাহলে যেন একটা চিঠি লিখে তাঁবুর ভেতরে পাথর চাপা দিয়ে যায়। ছোট-রসিদ সেটা নিয়ে আসবে।

টুলটুল ও জয় মাথা নাড়ে।

অমূল্য আবার বলে—আমি গৌতমকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু তোমরাও মুখে সব বুঝিয়ে ব'লো।

—বলব। নিশ্চয়ই বলব। শৈলেশ বলে—কিন্তু তাই বলে কি আজ সন্ধ্যায় চা-চানাচুর পাওয়া যাবে না ?

—চা পাবি কিন্তু চানাচুর নয়। ম্যানেজার জয় ফরমান দেয়।

—সেকি ! টুলটুল বলে ওঠে—তাহলে এত কষ্ট করে মাল পৌঁছে দিয়ে এলাম কেন ?

—আবার কালও নাকি যেতে হবে। গোরা যোগ করে।

—শুধু চা দিয়ে মূল-শিবিরের সান্ধ্য আড্ডা ? টুলটুল রীতিমত বিস্মিত।

মুচকি হেসে রঞ্জু বলে—শুধু চা কেন ? চানাচুর ছাড়া বুঝি আর কিছু আনি নি আমরা ?

—কি পাওয়া যাবে রে ? গোরা জিজ্ঞেস করে।

—বাদাম দিয়ে চিঁড়ে ভাজা। জয় উত্তর দেয়।

—রিয়েলী ? আমি বলে উঠি।

ম্যানেজার মাথা নাড়ে। বলে—দুপুরেই চিঁড়েভাজা ও বাদাম বের করে রেখেছি।

এখন শুধু একটু গরম করে নিতে হবে। আমি আর রঞ্জু কিচেনে যাচ্ছি।

—থ্রি চীয়ার্স ফর আওয়ার মার্ভেলাস ম্যানেজার এ্যাণ্ড মেডিক্যাল অফিসার.....

—হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ.........

মানুষের জয়ধ্বনিতে ব্রহ্মলোক মুখরিত হয়ে ওঠে।

॥ বারো ॥

গতকাল অসিত কাননে তবু আমরা পাঁচজন ছিলাম। আর আজ মাত্র তিনটি প্রাণী সারাদিন কাটিয়েছি—নেতা রঞ্জু ও আমি। আজ ওরা ওপরে চলে যাবার পরে আমরা রান্নার বেশি হাঙ্গামা করি নি। চাল-ডাল ধুয়ে প্রেসার কুকারে বসিয়ে দিয়েছি। রঞ্জু কয়েকটা আলু ও পেয়াজ কেটে দিয়েছে। পরে নুন ও কারি-মিক্সচার মিশিয়ে নামিয়ে নিয়েছে। ভারী উপাদেয় খিচুরি হয়েছে। আচার সহযোগে তাই দিয়ে তিনজনে ভরপেট হট-লাঞ্চ্ সেরেছি। বাকিটা রেখে দিয়েছি। ওরা ফিরে এলে গরম করে দেব।

শিবির যতই নিস্তব্ধ হোক, মন যতই ভারাক্রান্ত হোক, আমরা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকি নি। সারাদিন খেটে বাকি চিঠিগুলো লিখে ফেলেছি। সব মিলে চারশ'একখানি চিঠি হয়েছে। সুয়েদ ডাকঘরের মাষ্টারজীকেও নেতা একখানি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েছে।

শুধু পিক্চার পোস্টকার্ড নয়, সেই সঙ্গে সদস্যদের পারিবারিক চিঠি ও কয়েকখানি টেলিগ্রামও যাচ্ছে। এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা ও দু নম্বরের স্থান নির্বাচনের সংবাদ যাচ্ছে দিল্লী ও কলকাতায়। অর্থাৎ তিন সদস্যের শিবিরে আজ কাজ কিছু কম হয় নি।

আজও বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওরা ফিরে এলো। গিয়েছে সাতজন কিন্তু ফিরে এসেছে ছ'জন। রাম সিং আসে নি, এক নম্বরে থেকে গিয়েছে। তাই কথা ছিল।

আজও সহনেতা একখানি চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে—

এক নম্বর শিবির (১৬,৮০০)

প্রিয় লীডার, ২০শে সেপ্টেম্বর

মালপত্র পেলাম। রাম সিং-ও এসে গেছে। আগামীকাল লোক পাঠাবার দরকার নেই, পরশু কাউকে পাঠিও। তার কাছে সব খবর দিয়ে দেব। কোন কিছুর দরকার পড়লে, তাও জানিয়ে দেব।

গতকাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি। আগেই জানিয়েছি, আমাদের পাশে ব্রহ্মা-১ ও ব্রহ্মাণী আর হিমবাহের ওপারে রয়েছে ব্রহ্মা-২, ক্রুকেড ফিঙ্গার, আইগার, ফ্ল্যাট-টপ্, সিক্ল মুন প্রভৃতি তুষারাবৃত শিখর। কোনটি দেখা যাচ্ছে, কোনটি দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি যে তাদের প্রায় প্রত্যেকটি থেকে পালা করে হিমানীসম্প্রপাত বা 'avalanche' হয়েই চলেছে এবং তার প্রচণ্ড শব্দে ব্রহ্মলোক অবিরত কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমাদের শিবিরটা অবশ্য এইসব হিমানী-সম্প্রপাতের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। কিন্তু শব্দের জন্য আমরা কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি।

সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে শুনতে একসময় রাত ফুরিয়েছে। তাঁবুর বাইরে এসেছি।

ভোরের আলোয় চারিদিকের দৃশ্য আমাদের অনিদ্রার দুঃখ দূর করে দিয়েছে। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখেছি।

গতকাল সন্ধ্যার কিছু আগে ব্রহ্মাজী মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ছিলেন। আজ সকালে আবার তিনি দর্শন দিলেন। শুধু তাই নয়, আজ মনে হচ্ছে তিনি যেন আমাদের মাথার ওপরে।

আজ ব্রহ্মা-১ পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব শিখর শিরাটিকে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি। ঐ শিখরশিরার দিকে লক্ষ্য রেখে এখন দক্ষিণ-পূর্ব গাত্রে আমাদের পথ তৈরি করতে হবে। বাইনোকুলার দিয়ে শিখরের সম্ভাব্য পথটিকে ভাল করে দেখে নিয়েছি। তোমাকে কথা দিচ্ছি লীডার, প্রকৃতি সহায় হলে এবং ব্রহ্মাজী কিঞ্চিৎ কৃপা করলে, আমরা শিখরপূজা সমাধা করতে পারব।

কিন্তু এসব হল পরের কথা। তার চেয়ে তোমাকে আজকের কথা বলি। আজ সকালেই দুজন শেরপাকে নিয়ে জগদীশ বেরিয়ে গেছে। দু নম্বর শিবিরের নির্বাচিত স্থান থেকে ওরা পথ তৈরি শুরু করবে।

সম্ভব হলে ওরা তিন নম্বর তথা শিখর-শিবিরের স্থান নির্বাচন করে আসবে। বাইনোকুলার দিয়ে দেখে মনে হচ্ছে বেশ কিছুটা ফিক্‌সড রোপ করতে হবে।

ওরা চলে যাবার পরে আমরা ব্রেক-ফার্স্ট করে নিলাম। তারপরে হিসেব করে মালপত্র দিয়ে কৃষ্ণ শিবু ও পেয়ারকে পাঠিয়ে দিলাম। ওরা দু নম্বর শিবিরের নির্বাচিত স্থানে মাল রেখে আসবে। কৃষ্ণদের চলে যাবার পরে আমি ও তপন সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিলাম। মুশকিল হয়েছে ক্র্যাম্পন নিয়ে। এত করে বলার পরেও ইন্‌স্টিটিউট ঠিক সাইজের ক্র্যাম্পন দেয় নি। অথচ ক্র্যাম্পন ছাড়া দু নম্বরেই যাওয়া যাবে না। কারণ পথে প্রচুর বরফ রয়েছে।

যাক্ গে, দেখি কি করতে পারি। তুমি জেনে খুশি হবে লীডার, এ পর্যন্ত আমরা তোমার সময়সূচী অনুযায়ী চলেছি। আশা করছি আগামীকাল দু নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

আমরা সবাই সুস্থ ও সতেজ রয়েছি। তোমার প্রতিটি নির্দেশ পালন করে সাবধানে ও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। আমাদের জন্য কোন দুশ্চিন্তা করো না। তোমরা সর্বদা সাবধানে থেকো।

চিঠি পড়তে পড়তেই দিনের আলো মিলিয়ে গেল। এতো যেমন তেমন চিঠি নয়, ওপরের চিঠি। আমার অনুজপ্রতিম পর্বতারোহীরা জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তারই বিবরণ। এ কথা কি একবার পড়লে আশা মেটে। তাই বার বার পড়া হল। আর পড়তে পড়তেই দিনের আলো গেল মিলিয়ে। ব্রহ্মালোকে নেমে এলো আঁধার, ছুটে এলো মৃত্যুশীতল হিমেল হাওয়া। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে চলে আসি। গরম পোশাক পরে নিয়ে যে যার জায়গায় বসি।

এখন তাঁবুতে অনেক জায়গা। বারোজন যে তাঁবুতে থেকেছি, সেই তাঁবুতে আমরা মাত্র সাতজন। অবশ্য ওদের বাড়তি মালপত্র ওরা সবই রেখে গিয়েছে। তাহলেও তাঁবুটাকে বড্ড বেশি ফাঁকা মনে হচ্ছে। কবে কিভাবে আবার এই ফাঁক ভরাট হবে,

তা শুধু ব্রহ্মাজীই বলতে পারেন। আমরা কেবল সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করব, আমার দুঃসাহসী ভাইদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে রইব।

বড়-রসিদ আজও পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে নিয়ে এলো। নেতা তাকে জিজ্ঞেস করে—রসিদভাই, আজ কে রান্না করবে?

—কেন সাব্, আমরা করব।

—কিন্তু তোমরা যে আজ বড়ই ক্লান্ত, সারাদিন মাল বয়েছো, চড়াই-উৎরাই করেছো।

—তাতে কি হয়েছে সাব্? আমরা পাহাড়ীমানুষ, এসব আমাদের অভ্যেস আছে।

—কি খানা বানাবে রসিদ? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—দাল চাপাতি আউর সবজি।

গোরা বলে—এক কাজ করো।

—কেয়া কাম সাব্?

—তোমরা রুটি বানিয়ে ফেলো। এখন দরকার নেই, আটটা নাগাদ আরম্ভ করলেই চলবে। রোটি হয়ে গেলে আমাকে ডাক দিও। আমি একটা মাংসের টিন কেটে ঝোল করে নেবো।

—লেকিন.......। ঠিক হ্যায় সাব্।

কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না রসিদ।

শৈলেশ জিজ্ঞেস করে—কি হল রসিদ?

কিন্তু রসিদ কোন উত্তর দেয় না। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। টুলটুল জিজ্ঞেস করে—কি বলতে চাইছ, বলো।

—সাব্ আমরা আজ মাংস খাবো না।

মাংস খাবে না! কি বলছে ছেলেটা? মুসলমানের ছেলে হয়ে মাংস খাবে না!

—তোমরা মাংস খাও না? জয় জিজ্ঞেস করে।

—খাই সাব্। তবে শুধুই রবিবার। আজ আমরা মাংস খাবো না। ঠিক আছে, আপনারা রোটি-মাংস খাবেন। আমরা চিনি দিয়ে চাপাতি খেয়ে নেব।

—তোমরা শুধু রবিবার মাংস খাও? নেতা জিজ্ঞেস করে।

—জী, সাব্!

—আজ কি বার? টুলটুল প্রশ্ন করে।

খুবই স্বাভাবিক হিমালয়ের অন্তরলোকে এলে দিন তারিখ ঠিক থাকে না।

—শনিবার। সঙ্গে সঙ্গে রসিদ উত্তর দেয়।

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে রুকস্যাক্ থেকে ডায়েরী বের করে দেখি। তারপরে বলি—হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে। আজ শনিবার।

—তাহলে আজ আর মাংসের টিন কেটো না। আজ অন্য কিছু রান্না করে নাও। আগামীকাল মাংস হবে। সবাই মিলে খাওয়া যাবে।

—কিন্তু কাল তো রসিদ থাকবে না। সে সকালেই চিঠি নিয়ে সুয়েদ রওনা হবে। টুলটুল মনে করিয়ে দেয়। তবু নেতা বলে—তাহলেও আজ মাংস থাক। আমরা রুটি-মাংস খাবো আর ওরা চিনি দিয়ে রুটি গিলবে, এটা অন্যায়।

—ঠিক আছে রসিদ! গোরা বলে—চাপাতি হয়ে গেলে আমাকে ব'লো, আমি এসে

ডাল আলুভাজা করে নেবো।

—ঠিক হ্যাঁয় সাব্! সে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

নেতা বাধা দেয়—আরেকটা কথা!

—বলুন সাব্!

—বুটি বানাবার আগে যে আরেরকবার চা বানাতে হবে।

—ঠিক হ্যাঁয় সাব্! যেন একটা দারুণ ভুল করে ফেলেছে এইভাবে সে তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে বেড়িয়ে যায়।

—আজ কিন্তু চায়ের সঙ্গে চানাচুর কিংবা চিঁড়েভাজা হবে না। ম্যানেজার ঘোষণী করে।

—কি হবে তাহলে? শৈলেশ প্রশ্ন করে।

—ভাঙা বিস্কুট।

—ও. কে. বস্। সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং। রঞ্জু আমাদের মুখপাত্র হয়ে মনের কথাটি বলে দেয়।

কিছুক্ষণ বাদে রসিদ ব্রাদার্স কেটলি ও মগ নিয়ে তাঁবুতে আসে। জয় টিন খুলে কিছু ভাঙা বিস্কুট বের করে একখানি থালায় রাখে। আমরা চা-বিস্কুট খেতে শুরু করি। রসিদ ব্রাদার্স ওদের চা-বিস্কুট নিয়ে কিচেনে চলে যায়।

সহসা শৈলেশ বলে ওঠে—শঙ্কুদা, আপনি কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে আছেন।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি—কি কাণ্ড?

—আপনি পথে আসতে আসতে আমাদের কাছে ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আরোহণের কাহিনী বলেছেন। ১৯৪০ সালে ফরাসী অভিযাত্রীদের চতুর্থবার আরোহণের কথাও আমরা জানি। কিন্তু যাঁর প্রথম আরোহণের কথা শুনে আমরা ব্রহ্মা পর্বতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, আপনি ক্রিস বনিংটনের সেই আরোহণের কথাই বাদ দিয়ে গিয়েছেন।

একটু হেসে বলি—বাদ দিয়েছি কারণ তোমরা সবাই ১৯৪৩ সালের সেই বিস্ময়কর আরোহণের কথা জানো।

—না, না। আমরা জানি না। টুলটুল বলে ওঠে।

—আমরা কেবল শুনেছি বনিংটন ফিক্সড-রোপ না করে মাত্র দশ দিনের মধ্যে এই দুর্গম শিখরে আরোহণ করেছেন। রঞ্জু যোগ করে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার। ওরা জোট বেঁধে আমাকে বকবক করাতে বদ্ধপরিকর।

অতএব শুরু করতে হয়—একালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী ক্রিস বনিংটন।। শুধু দুঃসাহসিক আরোহণের জন্য নয়, সেই সঙ্গে পর্বতারোহণে নব-নব পদ্ধতির প্রচলন, অভিনব সাজ-সরঞ্জামের আবিষ্কার ও নানা অবিশ্বাস্য পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। লেখক হিসেবেও তাঁর অবদান কিছু কম নয়।

অমূল্য মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি—কিন্তু বনিংটনের ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে আরোহণের বিস্তৃত বিবরণ জানা নেই আমার। শুনেছি একখানি বইতে তিনি এই বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু বইখানি পড়া হয় নি। আসার আগে গৌতমকে বৃটিশ কাউন্সিলে

পাঠিয়েও বইখানি যোগাড় করতে পারি নি। তবে ১৯৪৩ সালের এইচ. এম. আই. জার্নালে বনিংটন সেই আরোহণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তোমরা শুনতে চাইলে সেটি শোনোতে পারি।

—শুনব। আমরা তাই শুনব। সহযাত্রীরা প্রায় সমস্বরে বলে ওঠে।

অতএব শুরু করি—সেবারে ক্রিস তাঁর পর্বতারোহী বন্ধু নিক্ এস্‌ট্‌কোর্ট-কে নিয়ে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মাত্র মাসখানেক সময় হাতে ছিল, তাও আবার অগাস্ট মাসে, যখন হিমালয়ের অধিকাংশ অঞ্চল বর্ষার জন্য অগম্য হয়ে ওঠে। ক্রিস্ দুটি কারণে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। প্রথমতঃ চার্লস ক্লার্ক-এর বিবরণ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, দ্বিতীয়তঃ তাঁর ধারণা ছিল কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত পশ্চিম-হিমালয়ের এই অংশটিতে অগাস্ট মাসেও ভাল আবহাওয়া পাওয়া যাবে।

—পেয়েছিলেন ? শৈলেশের প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে '

উত্তর দিই—না। মোটেই ভাল আবহাওয়া পান নি তাঁরা।

—আবহাওয়ার কথা যথাসময়ে হবে। এখন আপনি অভিযানের কথা বলুন। টুলটুল তাগিদ দেয় আমাকে।

আমি বলতে থাকি—বনিংটনের উদ্দেশ্য ছিল কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের একটি অপরাজিত শিখরে এ্যাল্‌পাইন পদ্ধতিতে আরোহণ করবেন। তিনি ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরটিকে পছন্দ করেছিলেন কারণ ক্লার্ক বহুচেষ্টা করেও এই শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি এবং এটি কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের দুর্গমতম শিখর। হিমালয়ে মাত্র তিন সপ্তাহ সময় হাতে নিয়ে এই আরোহণের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অতিশয় উচ্চাশা। তিনি নিজেও বলেছেন 'Ambitious plan indeed..'

তাঁরা ২রা অগাস্ট (১৯৪৩) লন্ডন থেকে রওনা হয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে দিল্লী আসেন। দার্জিলিঙের শেরপা ছেওয়া তাসি ও উত্তর কাশীর ইনস্টাক্টর উজাগর সিং তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন।....

—উজাগর সিং! মানে ১৯৪৮ সালে চতুরঙ্গী অভিযানের অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে যার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল ?

অমূল্যের প্রশ্নের থামতে হয় আমাকে। উত্তর দিই—সম্ভবতঃ সেই একই লোক।

—যাক্ গে, তুমি ক্রিস বনিংটনের কথা বলো।

আমি বলতে থাকি—দুদিন দিল্লীতে কাটিয়ে তারা রেলে জম্মু আসেন। সেখান থেকে বাসে কিশ্‌তোয়ার। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য তাঁদের তিনদিন কিশ্‌তোয়ার বিশ্রামভবনের বন্দী থাকতে হয়।

১১ই অগাস্ট শুরু হয় তাঁদের পদযাত্রা। ১৫ই অগাস্ট কিবার নালার উৎসের কাছে তৃণাচ্ছাদিত একটি প্রান্তরে তাঁদের মূল-শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়।

—তার মানে, তারা আমাদের পেছনে মূল-শিবির করেছিলেন ? টুলটুল প্রশ্ন করে।

আমি মাথা নাড়ি। কিন্তু কথা বলতে পারি না। তার আগেই শৈলেশ বলে—তাহলে

কিশ্‌তোয়ার থেকে পায়ে হেঁটে ব্রহ্মা হিমবাহে পৌঁছতে তাঁদের মাত্র পাঁচদিন লেগেছে ?

—হ্যাঁ। অথচ পথে তিনদিনই বৃষ্টি পেয়েছেন। খুবই তাড়াতাড়ি পথ চলেছিলেন। তাঁরা।

একবার থেমে আমি আবার বলতে থাকি—আমি আগেই বলেছি চার্লস ক্লার্ক-এর বিবরণ পাঠ করে উদ্বুদ্ধ হয়েই ক্রিস্ কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে এসেছিলেন। ক্লার্ক বলেছেন, ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে আরোহণের একমাত্র সম্ভাব্য পথ দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই ক্রিস্ মূল-শিবির থেকে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির জন্য তাঁদের খুবই অসুবিধে হচ্ছিল।

১৭ই অগাস্ট তাসি ও উজাগরের সহায়তায় ব্রহ্মা-১ শিখরের দক্ষিণ পাদদেশে স্থায়ী তুষাররেখার ঠিক নিচে আনুমানিক ১৫,০০০ ফুটে তাঁরা এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। বৃষ্টির মধ্যে তাঁদের একাজ করতে হয়েছে। তাই সেদিন তাঁরা ব্রহ্মাজীকে দর্শন করতে পারেন নি। তিনি মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

বৃষ্টির জন্য পরের দিনটি তাঁদের তাঁবুতে বন্দী থাকতে হল। তাঁর পরদিন অর্থাৎ ১৯শে অগাস্ট অকস্মাৎ প্রকৃতি করুণা করলেন। মেঘ মিলিয়ে গেল। ঝলমঝে রোদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্রহ্মা হিমবাহ। আর সেদিনই কাশ্মীর পর্বতারোহণ সংস্থার লেঃ কঃ বলবন্ত সান্ধু, ফু দোরজি এবং বাজওয়া এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

পরদিন তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরায় উপস্থিত হলেন। এবং ১৭,৫০০ ফুট উঁচুতে দু নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচিত কবলেন। তার পরদিন অর্থাৎ ২০শে অগাস্ট নিক্, তাসি ও উজাগরকে নিয়ে বনিংটন দু নম্বরে চলে গেলেন।

২১শে অগাস্ট রাত সাড়ে তিনটায় চার পর্বতারোহী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা দুটি দড়িতে অগ্রসর হলেন। প্রথম দড়িতে ক্রিস্ ও নিক্, দ্বিতীয় দড়িতে তাসি ও উজাগর। আকাশে তখন একফালি বাঁকা চাঁদ। তাঁরই স্তিমিত আলোতে পথ দেখে তাঁরা সাবধানে অগ্রসর হতে থাকলেন। কঠিন বরফের ওপরে রাতের ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া তুষারের ক্ষীণ আস্তরণের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। আকাশে চাঁদ উঠলেও আকাশ কিন্তু মেঘমুক্ত নয়। দূরের আকাশে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

শিখরশিবার ওপরে উঠে তাসি বলল, তার ক্র্যাম্পন ভেঙে গিয়েছে। তার মানে তাকে ফিরে যেতে হবে। তারপরে ওঁরা থাকবেন তিনজন। একই দড়িতে অগ্রসর হতে হবে। এক দড়িতে তিনজন খুব বাজে সংখ্যা। কারণ প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে।

কিন্তু উপায় কি ? তাসিকে ফিরে যেতে বলে ক্রিস উজাগরকে নিজেদের দড়িতে নিয়ে নিলেন। তারপরে চাঁদের আলোয় পথ দেখে দেখে তাঁরা সেই ভাঙাচোড়া পাথুরে শিখরশিরার ওপর দিয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে থাকলেন।

ভোরবেলা তাঁরা উনিশ হাজার ফুটে উপস্থিত হলেন। দেখতে পেলেন একসারি অতিকায় Gendarmes শিখরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।...

—Gendarmes কি শঙ্কুদা ? জয় জিজ্ঞেস করে।

—Isolated pinacle on a redge forming obstacle to climbers. অমূল্য বলে ওঠে।

—বুঝেছি। জয় খুশি হয়ে উত্তর দেয়।

আমি আবার শুরু করি—এখানে বনিংটন একটা ভুল করে বসলেন। তিনি সেই

'জেণ্ডারমেস'-গুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেন। ভাঙাচোড়া গিরিশিরার ঝুরো পাথরগুলোর ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলেন। একটু বাদেই আলগা পাথরে বোঝাই একটা মারাত্মক জায়গায় উপস্থিত হলেন। তাঁদের চলার গতি আরও কমে গেল।

সকাল সাড়ে দশটার সময় তাঁরা বহুকষ্টে আবার শিখরশিরার ওপরে ফিরে এলেন। ভাল করে লক্ষ্য করে ক্রিস্ বুঝতে পারলেন ঐ 'জেণ্ডারমেস'-গুলোই শিখরের পথে শেষ বাধা। তারই একটা মসৃণ জেণ্ডারমেস-এর সঙ্গে দড়ি লাগানো রয়েছে। নিক্ জিজ্ঞেস করলেন—কারা ফেলে গিয়েছেন, চার্লস ক্লার্ক কিংবা জাপানী অভিযাত্রীদল ? জায়গাটার উচ্চতা বিবেচনা করে ক্রিস উত্তর দিলেন—ক্লার্ক। একাত্তর সালে তিনি এখান থেকে ফিরে গিয়েছেন।

বনিংটন বুঝতে পারলেন, তাঁকেও সেই একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা কি করবেন ? ফিরে যাবেন অথবা শিখরে আরোহণ করবেন ? তিনি ভাবলেন, শিখর এখনও অনেক দূরে এবং পথ অতিশয় দুর্গম ও বিপজ্জনক। ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরের মতো দুর্গম শৃঙ্গে আরোহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁরা সেদিন শিবির থেকে বের হন নি। কিন্তু আজ আবহাওয়া ভাল। শিখরে আরোহণের এমন সুযোগ হয়তো তিনি আর নাও পেতে পারেন।

তবু তিনি ফিরে আসার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন। কারণ ১৭,৫০০ ফুটে অবস্থিত শিবির থেকে একদিকে শৃঙ্গে আরোহণ সম্ভব নয়। ফেরার পথে আকাশতলে রাত্রি যাপন বা bivouac করতেই হবে। উজাগরের সঙ্গে কোন bivouac equipment নেই।

শিবিরে ফিরে এসে দেখতে পেলেন, সান্ধু ও দোরজি সেখানে চলে এসেছেন। আলোচনার পরে সাব্যস্ত হল ক্লান্ত উজাগর নিচে চলে যাবে। পরদিন সকলেই বিশ্রাম নেবেন। তার পরদিন ক্রিস্ এবং নিক্ প্রথম প্রচেষ্টায় চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। তারপবে সান্ধু এবং দোরজি দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় শিখরাভিযানে যাবেন। সেদিন রাতে আকাশ হঠাৎ খুব পরিষ্কার হয়ে গেল। আকাশের তারা তাঁদের মনের আকাশকেও উজ্জ্বল করে তুলল।

পরদিন উজাগর নিচে নেমে গেল। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল তুষারঝড়। তাছাড়া গতকাল আলোচনার সময়ে তাঁরা রসদের হিসেব করেন নি। হিসেব করে দেখলেন, শিখর শিবিরে চারজন মানুষ থাকলে মাত্র দুটি দিন চলতে পারে। অথচ নিচের থেকে খাবার আনিয়ে নেবারও সময় নেই। কারণ ক্রিসা্ এবং নিকের হাতে আর মাত্র তিনদিন সময় রয়েছে। তৃতীয়দিন সন্ধ্যার মধ্যে তাঁদের মূল-শিবিরে ফিরতেই হবে। একদিকে অস্থির আবহাওয়া, আরেকদিকে সময় ও রসদের অভাব। ক্রিস্ খুবই মনমরা হয়ে পড়লেন।

সান্ধু আর দোরজিও বুঝতে পারলেন, এই অনিশ্চিত আবহাওয়ায় দ্বিতীয় প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের এখানে বসে খাবারটুকু ফুরিয়ে ফেলা উচিত হবে না। তাছাড়া ক্রিস্ ও নিক্ অনেক আশা করে বিলেত থেকে এখানে ছুটে এসেছেন। তাই তাঁদের শেষ সুযোগ দেবার জন্য সান্ধু ও দোরজি সেই তুষারঝড় মাথায় করেই নেমে চললেন নিচে। বিদায় বেলায় তাঁরা ক্রিস ও নিকের সাফল্য কামনা করে ব্রহ্মাজীর কাছে প্রার্থনা পেশ করলেন।

অস্থির প্রকৃতি। সেদিনই বিকেলের দিকে আবার মেঘ সরে যেতে শুরু করল। সন্ধ্যের আগেই আকাশ মেঘমুক্ত হল। তারার দেওয়ালী শুরু হয়ে গেল।

সেদিনও রাত সাড়ে তিনটায় ক্রিস্ এবং নিক্ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, চাঁদ উঠেছে, তেমনি একফালি বাঁকা চাঁদ। চাঁদের আলোয় পথ দেখে তাঁরা সেই ছুড়ির ফলার মতো সংকীর্ণ গিরিশিরা ধরে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। ভোরের দিকে রীতিমত ঝড় শুরু হয়ে গেল। ঝড়ের মধ্যেই সকাল হল, ২৪শে অগাস্টের সকাল। কিন্তু সে প্রভাতকে তখন সুপ্রভাত বলে স্বাগত জানাতে পারেন নি ক্রিস্ বনিংটন।

ঝড় বেড়েই চলল। এক সময় এমন অবস্থা হল যে মাউন্ট এভারেস্ট (২৯,০২৮) অভিযানের নেতা এবং অন্নপূর্ণা (২৬,৫০৪) বিজয়ী ক্রিস্ বনিংটন পর্যন্ত ফিরে যাবার কথা ভাবতে বাধ্য হলেন।

যাক্ গে, শেষ পর্যন্ত তিনি সে ভাবনাকে কার্যকরী করলেন না। এবং দুর্জয় সাহসে বুক ভরে নিয়ে এগিয়ে চললেন। তবে তাঁর মতো পর্বতারোহীকেও পরে স্বীকার করতে হয়েছে—"We knew now, all too well, just how serious climbing on Brammah could be."

এই আরোহণের বিবরণ দিতে গিয়ে ক্রিস্ বনিংটন লিখেছেন—"The rocks below the gendarmes were extremely loose and dangerous, a rubble of huge boulders piled one on top of the other. Then above this were the gendarmes themselves, giving difficult technical climbing and beyond them, the great summit cone of Brammah--at least a thousand feet of steep snow on ice."

তবু তিনি এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সকাল সাড়ে আটটার সময় তাঁরা আগের দিনের জায়গায় পৌঁছে গেলেন। বলা বাহুল্য তাঁরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সকাল সাড়ে দশটার সময় তাঁরা সেই summit cone বা শিখরের তলদেশে মোচাকৃতি সমতলে পৌঁছলেন। সেখান থেকে শুরু হয়েছে স্থায়ী ও কঠিন বরফের ওপরে অস্থায়ী কোমল তুষারের আস্তরণ। সেই পিচ্ছিল ও খাড়া পর্বতপাত্র বেয়ে প্রায় হাজারখানেক ফুট আরোহণ করতে হবে। ফিক্সড-রোপ ছাড়া এসব জায়গায় আরোহণ করা যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপজ্জনক। কিন্তু তিনি যে আর কেউ নন, ক্রিস বনিংটন। সুতরাং সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলবার জন্য এগিয়ে চললেন।

লাথি মেরে মেরে ধাপ তৈরি করে একপা একপা করে তাঁদের ওপরে উঠতে হচ্ছিল। বনিংটনের মতো পর্বতোরোহীও প্রতি আট-দশ পা ওঠার পরে কিছুক্ষণ করে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কঠিন বরফের ওপরে কোমল তুষার আস্তরণটি এতই পাতলা ছিল যে যেকোন সময় তুষারধস নামতে পারল। কিন্তু তাঁদের ভাগ্য ভাল। সেই ক্ষীণ আস্তরণ তাঁদের ওজন সইতে পারল। এবং অবশেষে বেলা সাড়ে বারোটার সময় তাঁরা ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে উপস্থিত হলেন। পিতামহ ব্রহ্মা বীর বৃটিশ পর্বতারোহীযুগলকে জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন।

শিখরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বনিংটন বলেছেন—"a sharply and very steep pyramid of snow."

সেখান থেকে তারা মেঘের ফাঁক দিয়ে নিচের সবুজ উপত্যকা আর অনতিদূরের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার মনোহর রূপ দর্শন করলেন। তাঁদের দুজনের মনেই তখন পরম

আত্মতৃপ্তি। তাঁরা এই কষ্টকর ও বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে সাফল্যের শিখরে এসে পৌঁছতে পেরেছেন। ন'ঘন্টায় সাড়ে তিন হাজার ফুট আরোহণ করেছেন।

অবরোহণের পথে প্রায় বিশ হাজার ফুটে তাঁরা 'bivouac' করলেন। বরফের ওপর শুয়ে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটালেন। এই রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্রিস্ লিখেছেন—"it was a cold but incredibly beautiful night, with one of the most magnificent sunsets that either of us had ever seen."

সেদিন রাতে কিন্তু আস্তে আস্তে আবহাওয়া ভাল হয়ে গেল। আর তাঁরা স্লীপিং ব্যাগে শুয়েই আকাশের তারা চাঁদ আর হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখে নিদ্রাহীন রাতটি অতিবাহিত করে দিতে পারলেন। তাঁদের আর 'bivvy sack'-এ ঢোকার দরকার পড়ল না।

এই রাতের বিবরণ দিতে গিয়ে ক্রিস্ আরও লিখেছেন—'Cramped but warm, we were able to watch the transition of light to dark, with the myriad stars and the beauty of the mountain scene around us.'

একটু থেকে আবার বলি—উচ্চতার বিচারে ব্রহ্মা-১ হিমালয়ের একটি অতি তুচ্ছ পর্বতশিখর। কিন্তু বাধা বিপত্তি কাঠিন্য ও বিপদের দিক থেকে ব্রহ্মা হিমালয়ের যেকোন দুর্গম শৃঙ্গের সমকক্ষ। আর ক্রিস্ বনিংটন-ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেকথা স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়—'Climbing without fixed ropes and with a long summit push had in some ways, been more committing than what we had experienced on Everest the previous Autumn.'

আমি থামতেই অমূল্য বলে ওঠে—তাহলে তুমি বলছ, আমাদের শিখর নির্বাচনে কোন ভুল হয় নি?

—ভুল? ভুল হবে কেন? বরং বলব, তোর যোগ্য নির্বাচন হয়েছে। শস্তায় বাজি মাৎ করার চেষ্টা না করে তোরা যে ব্রহ্মাশিখরে আরোহণের চেষ্টা করছিস, এজন্য সবাই তোদের ধন্যবাদ জানাবে।

—শিখরে আরোহণ করতে না পারলেও?

মাঝখান থেকে টুলটুল প্রশ্ন করে। আমি উত্তর দিই—নিশ্চয়ই! দুবার এভারেস্ট শিখরে আরোহণ করার পরেও নওয়াং গম্বু 'গ্যারান্টি' দিতে পারেন না যে তিনি একটি বিশ হাজার ফুট উঁচু শিখরে আরোহণ করতে পারবেন। গৌরবময় অনিশ্চয়তা পর্বতারোহণের প্রধান আকর্ষণ। তাই সাফল্য নয়, প্রচেষ্টাই পর্বতাভিযানের মূল লক্ষ্য।

আমি চুপ করি। কিন্তু ওরা কেউ কোন কথা বলছে না দেখে আবার বলি—যাক্ গে, আমাদের কথা, বনিংটনের বিস্ময়কর অভিযানের শেষ অধ্যায়টি শুনে নাও।

—বলুন। শৈলেশ বলে।

—সেই বিশহাজার ফুট উঁচু তুষারক্ষেত্র থেকে পরদিন সকালে অবরোহণ শুরু করে সন্ধ্যার আগেই তাঁরা মূল-শিবিরে ফিরে এলেন।

—মূল-শিবিরে!

—হ্যাঁ। তেরো হাজার ফুটে। আর সেজন্য বোধকরি তাঁদের প্রাণ হাতে করে ১০/১২ কিলোমিটার উৎরাই ভাঙতে হয়েছিল। অবশেষে পাঁচদিনের মধ্যে দিল্লী ফিরে গিয়ে ক্রিস্ তাঁর সময়সূচী অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর বিপজ্জনক ও বিস্ময়কর আরোহণের মালায় আরেকটি পারিজাত যুক্ত করেছেন।

॥ তেরো ॥

আজ ২১শে সেপ্টেম্বর। আজ সকালে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে প্রতিদিনের মতো ব্রহ্মাজীকে দর্শন করতে পারি নি। তাঁর মাথায় মেঘের চাদর। ব্রহ্মলোকে আসার পর এমনটি আর হয় নি। রোজ সকালে লোকপিতামহের মুখ দেখে দিন শুরু হয় আমাদের। কিন্তু আজ একি কাণ্ড! আজ যে ভোর না হ'তেই দাদু নাতিদের সঙ্গে লুকোচুরি শুরু করে দিলেন!

মনটা খারাপ হয়ে যায়। ব্রহ্মালোকে আসার পর থেকে সকালে ব্রহ্মাজীকে প্রণাম করা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ তার ব্যতিক্রম হল।

না। ব্যতিক্রম হবে কেন? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তিনি আছেন। আমি দেখতে না পেলেও তিনি আমাকে দেখছেন। আমি তাই তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। করজোড়ে বলি—হে জগৎস্রষ্টা চতুরানন, তুমি আমার ভাইদের দেখো। তাদের কৃপা ক'রো। তারা যেন তোমার শিখরপুজো সেরে নিরাপদে ফিরে আসে আমার কাছে।

আজ আরেক বিপদ হয়েছে। আজ আমরা বেকার, কোন কাজ নেই। সকালে বড়-রসিদ ডাক নিয়ে সুয়েদ যাবে আর ছোট-রসিদ কাঠ আনতে নিচের জঙ্গলে যাব। তাদের পাঠিয়ে দেবার পরে রান্না-খাওয়া ছাড়া আমাদের সাতটি প্রাণীর অন্য কোন কাজ থাকবে না। মানুষ কাজ থাকলে বিরক্ত হয়। তখন ভুলে যায় যে কাজ না থাকা আরও বেশি বিরক্তিকর।

খেয়ে ও খাবার নিয়ে বড়-রসিদ রওনা হয়ে গেল। ওকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজমা চিনি বিড়ি ও কিছু সবুজ সবজি নিয়ে আসবে। আর আনবে ডাকটিকেট। ডাকটিকেট সবই ফুরিয়ে গেছে।

কত আর থাকবে? চারশ'র ওপরে চিঠি পাঠানো হল।

আমরা ভেবেছিলাম বড়-রসিদ পরশু দুপুর নাগাদ ফিরে আসবে। কিন্তু সে নাকি কালই ফিরতে পারবে। আজ সে সুয়েদ গিয়ে কাজ সেরে সোন্দার চলে আসবে। কাল সকালে সোন্দার থেকে রওনা হয়ে বিকেলে অসিত কানন পৌঁছে যাবে। কেমন করে, তা সে-ই জানে। তাছাড়া আজ রবিবার। আজ কি পোস্টাপিসের কাজ করতে পারবে? সে বলেছে, মাস্টারসাবের সঙ্গে দেখা করলেই সব কাজ হয়ে যাবে।

যাক্ গে, কাল সে ফিরে আসতে পারলে আমাদেরই ভাল। পরশু ওকে এক নম্বরে পাঠানো যাবে। মাত্র দুজন মালবাহক মূল-শিবিরে রেখে আমরা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।

বড়-রসিদ রওনা হয়ে যাবার পরে ছোট-রসিদের সাহায্যে গোরা ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ফেলল। খাবার পরে ছোট-রসিদ দড়ি ও কাটারী নিয়ে নিচে চলে গেল। সেদিন আসার পথে মালবাহকরা যে কাঠ নিয়ে এসেছিল, তা দিয়েই এ-ক'দিন চালিয়ে দেওয়া গেল। কাঠ ছাড়া রুটি বানানো যায় না। আজ তাই ওকে দু'বোঝা কাঠ আনতে বলেছি।

কাজ না থাকলেও সময় বয়ে চলে। কিন্তু সূর্যের দেখা নেই। ব্রহ্মাজীকেও দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না ফ্ল্যাট টপ্ ও অন্যান্য তুষারাবৃত শৃঙ্গমালাকে। অসিত কাননের উত্তর ও পূর্বদিক পুরো সাদা হয়ে আছে। মনটা আশঙ্কায় দুলে উঠছে বার বার। পর্বতাভিযানে আবহাওয়া সাফল্যের প্রথম সোপান।

রোদ না ওঠায় আজ আর বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়ানো গেল না। হাওয়া দিচ্ছে হাড় কাঁপানো হিমেল হাওয়া। আমরা তাই তাঁবুতে চলে এলাম। শুরু হল আড্ডা। চলতে

থাকল গল্প। নানা গল্প। বলা বাহুল্য সব গল্পেরই বিষয়বস্তু হিমালয়, বিরাট ব্যাপক বিচিত্র-সুন্দর ও সুমহান হিমালয়।

অমূল্য বলছে—আসার পথে শঙ্কুদা তোমাদের কাছে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের কথা বলেছে। কিন্তু তোমরা মনে করো না, সেই ক'টি অভিযান ছাড়া আর কোন শিখরাভিযান কিংবা সমীক্ষাভিযান আয়োজিত হয় নি এ অঞ্চলে। ভারতীয় পর্বতারোহীরা নজর না দিলেও কিশ্‌তোয়ার-হিমালয় বিদেশী পর্বতারোহীদের কাছে খুবই প্রিয়। ১৯৪৫ সালে চার্লস ক্লার্ক-য়ের প্রথম অভিযানের পর থেকে বিগত বিশ বছরে আমার হিসেবেই কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে অন্তত ছেষট্টিটি শিখরাভিযান ও সমীক্ষাভিযান আয়োজিত হয়েছে।

—এর মধ্যে ক'টি ভারতীয় অভিযান ? অমূল্য থামতেই টুলটুল প্রশ্ন করে।

—দশটি। আমি উত্তর দিই।

—কবে কারা এসেছেন ?

—এ অঞ্চলে প্রথম ভারতীয় অভিযান হয়েছে ১৯৪৫ সালে। কর্ণেল ডি.এন. টঙ্কার-এর নেতৃত্বে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের সর্বোচ্চ দুটি অভিযান। মেজর এ. জি. রায়ের নেতৃত্বে প্রথম ঘারোল শৃঙ্গে আরোহণ এবং অসিতকুমার চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'দিগন্ত' পর্বতারোহণ সংস্থার সংস্থার সদস্যদের সমীক্ষাভিযান। ১৯৪১ সালেও দুটি ভারতীয় অভিযান হয়েছে। অনাথ নাথ অধিকারীর নেতৃত্বে হাইকার্স এ্যাণ্ড এক্‌সপ্লোরার্স ক্লাবের সদস্যরা ব্রহ্মা হিমবাহ অঞ্চলে সমীক্ষা অভিযান করেন এবং অধ্যাপক বিবেকরঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে ক্লাইম্বার্স সার্কেলের সদস্যরা কিয়ার উপত্যকায় সমীক্ষা করেছেন। এই অভিযাত্রীদলের সহনেতা বনভূষণ নায়কের সঙ্গে প্রাণেশ একদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাঁর কাছে আমি ব্রহ্মালোকের অনেক কথা শুনেছি।

একবার থেমে আবার বলতে থাকি—

—কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে দ্বিতীয় সফলকাম ভারতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ১৯৮৩ সালে। অভিযাত্রীরা ব্রহ্মা-২ পর্বতশিখরে আরোহণ করেন। এটি ঐ শৃঙ্গে তৃতীয় আরোহণ। বি. দাশ সেই অভিযানে নেতৃত্ব করেছেন। এই বছরেই কলকাতার ট্রেকারস গিল্ড্‌ ব্রহ্মা হিমবাহে এক সমীক্ষা অভিযান পরিচালনা করেন।

—একি ! থামলেন কেন ? দশটি ভারতীয় অভিযানের মধ্যে তো মাত্র সাতটির কথা বললেন !

আমাকে থামতে দেখেই শৈলেশ বলে ওঠে। হেসে বলি—বাকি তিনটি অভিযানের কথা তোমরা সবাই জানো। কারণ সে তিনটি হল তোমাদের আশি সালের ব্রহ্মা হিমবাহ অভিযান, গত বছরের সমীক্ষা এবং এই অভিযান।

আমি চুপ করি। কিন্তু অমূল্য আমাকে থামতে দিতে চায় না। সে বলে—কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে পর্বতাভিযানের কথা তুমিই বলো না শঙ্কুদা। সে তার ডায়েরী বন্ধ করে।

হেসে বলি—তাহলে যে আমাকে ডায়েরী বের করতে হবে।

—তাই ক'রো। তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে।

উপায় নেই। পর্বতাভিযানে এসেছি। নেতার আদেশ অমান্য করা যাবে না।

অতএব বুকস্যাক্ থেকে ডায়েরী বের করে বলতে শুরু করি—১৯৪৫ সালে চার্লস ক্লার্ক প্রথম এ অঞ্চলে আসেন। তিনি ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু ·স্ব·স্বা হিমবাহ সমীক্ষা করতে পারেন।

—আমরা শুনেছি সেকথা। আপনি সেদিন বলেছেন। রঞ্জু মাথা নাড়ে।

আমি শুরু করি—তারপরে তিন বছর কিশ্তোয়ার-হিমালয়ে আর কোন অভিযাত্রীদল এসেছে বলে জানা নেই আমার। ১৯৪৯ সালে চার্লস ক্লার্ক আবার এলেন এবং ৫৬৩০ মিটার মানে ১৭,১৬০ ফুট উঁচু ক্রুকেড ফিঙ্গার শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

—একথাও আপনার কাছে আমরা শুনেছি শঙ্কুদা! জয় জানায়।

আমি মাথা নেড়ে বলতে থাকি—১৯৭০ সালেও এ অঞ্চলে একটি বৃটিশ পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে। এই অভিযানের নেতা ছিলেন এন. ক্লাফ্। তাঁরা কোন শৃঙ্গে আরোহণ করেন নি। শুধুই সমীক্ষা করেছেন।

১৯৭১ সালে আবার চার্লস ক্লার্ক আসেন, এলেন এক জাপানী অভিযাত্রীদল। তাঁরা ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু সেকথাও তোমরা সবাই শুনেছো।

ওরা মাথা নাড়ে। টুলটুল বলে—তারপরেই বোধহয় তিয়াত্তর সালে ক্রিস বনিংটনের ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ?

—হ্যাঁ। আমি উত্তর দিই। বলি—তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালেও কিশ্তোয়ার-হিমালয়ে কোন পর্বতাভিযান আয়োজিত হয় নি। কিন্তু পঁচাত্তর সালে চারটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। একটি বৃটিশ, দুটি জাপানী ও একটি ভারতীয়। বৃটিশ অভিযাত্রীরা আর. কলিস্টর-এর নেতৃত্বে ব্রহ্মা-২ শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টায় বিফল হয়ে 'কনসোলেসন' শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

—সেটা কি তাঁদের সান্ত্বনা পুরস্কার? আমি থামতেই গোরা জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—তা হতে পারে। মূল-অভিযানে ব্যর্থ হয়ে পাশের অনামী শৃঙ্গে আরোহণ করে নাম রেখেছেন Consolation peak.

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম, কে. কিরিয়ো স্যাপ্পোরো-র নেতৃত্বে একদল জাপানী অভিযাত্রী ব্রহ্মা-২ (১৯,৬৯২') শিখরে প্রথম আরোহণের গৌবব অর্জন করেন। কিন্তু এফ. য়ুকি-র নেতৃত্বে অপর জাপানী অভিযাত্রীদল সিক্‌ল মুন আরোহণ করতে গিয়ে দুজন অভিযাত্রীকে হারান। একথাও আমি তোমাদের বলেছি।

ওরা মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি—ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে কিশ্তোয়ার-হিমালয় অধ্যায়ে সবচেয়ে গৌরবময় কাহিনীটি রচিত হয়েছে এই ১৯৭৫ সালে। কর্ণেল ডি. এন. টঙ্কার-এর নেতৃত্বে সিক্‌ল মুন (২১,৮৮৬') শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত হয়।

১৯৭৬ সালে কিশ্তোয়ার-হিমালয়ে ছ'টি পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে।...

—ছ'টি! সবিস্ময়ে শৈলেশ ওঠে।

উত্তর দিই—হ্যাঁ। এর আগে কোন বছরে এতগুলো অভিযান হয় নি। ছ'টি অভিযানের তিনটি বৃটিশ ও তিনটি জাপানী। তিনটি বৃটিশ অভিযানই ব্যর্থ হয়েছে। এর একটি অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন ক্রিস্ বনিংটন। দুদল জাপানী অভিযাত্রী দুটি অনামী শৃঙ্গে আরোহণ করেন কিন্তু অপর দলের সিক্‌ল মুন আরোহণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৭৭ সালে পাঁচটি অভিযান হয়েছে, তিনটি বৃটিশ ও দুটি ভারতীয়। একটি বৃটিশ

অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন কেল্‌ভিন টোর‍্যান্‌স। তাঁরা 'আইগার' ও 'ক্যাথিড্রেল' শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁদের কথাও আমি তোমাদের বলেছি।

ওরা মাথা নাড়ে। আমি আবার বলতে থাকি—আরেকটি অভিযানে বৃটিশ অভিযাত্রীরা ৫৬০০ মিটার অর্থাৎ ১৮,৩৭৩ ফুট 'ভিউপয়েন্ট' শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

—ভিউপয়েন্ট শৃঙ্গ থেকে নিশ্চয় কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের দৃশ্য খুব ভাল দেখা যায়। জয় মাঝখানে প্রশ্ন করে বসে।

উত্তর দিই—নামকরণ থেকে তো তাই মনে হয়। কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়, সিকিম ভুটান আসাম গাড়োয়াল কুমায়ন কাশ্মীর কিংবা হিমাচলের মতো নয়। ওখানে যেমন সুপ্রাচীন কাল থেকেই অধিকাংশ পর্বতশৃঙ্গগুলির স্থানীয় নাম ছিল, এখানে তেমন নয়। তাই বিদেশী অভিযাত্রীরা অনামী শৃঙ্গগুলির পছন্দমত নামকরণ করেছেন। যাক্‌গে, যেকথা বলেছিলাম, ১৯৪৭ সালের ভারতীয় অভিযান দুটির নেতা ছিলেন মেজর এ. জি. রায় এবং অসিত কুমার চক্রবর্তী। প্রথম দল ঘারোল শৃঙ্গে আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয় দল আঞ্চলিক সমীক্ষা করেন।

ওরা মাথা নাড়ে কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি একথা বলেছি। আমি বলতে থাকি—১৯৪৮ সালের চারটি অভিযানেরই আয়োজন করেন বৃটিশ পর্বতারোহীরা। একটি অভিযানের নেতৃত্ব করেন এ. হুইটেন।...

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সহসা শৈলেশ বলতে শুরু করে—এ্যান্টনি হুইটেন। তারা ১৫ই অগাস্ট ব্রহ্মা-১ পর্বত শিখরে আরোহণ করেন। কিন্তু চারজন পর্বতারোহীর দুজন চিরকালের মতো হারিয়ে যান।

মাথা নেড়ে বলি—তোর স্মরণশক্তির জন্য ধন্যবাদ। এবারে উনআশি সালের কথা বলছি।

—বলুন। রঞ্জু তাগিদ দেয়।

আমি শুরু করি—১৯৪৯ সালে সাতটি পর্বতাভিযান হয়েছে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে, তিনটি বৃটিশ, তিনটি পোলিশ ও একটি জাপানী। জাপানী অভিযানের নেতা ছিলেন, কে. ডেণ্ডা।...

—তাঁরা সিক্‌ল মুন ও ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেছেন। রঞ্জু বলে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে বলি—হ্যাঁ। তিনটি বৃটিশ অভিযানের একটির নেতৃত্ব করেন হুইটেন। তাঁরা ব্রহ্মাণী শিখরে আরোহণ করেন।

—আশ্চর্য ! আগের বছর দুজন সঙ্গীকে হারিয়ে হুইটেন আবার পরের বছরই ব্রহ্মা হিমবাহে এলেন ? টুলটুল প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই—হ্যাঁ। ওঁরা যে বৃটিশ। ওঁরা কোনদিন দুর্গম ও ভয়ঙ্করের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। আর করেন না বলেই আজ আমরা এখানে। ব্রহ্মলোকের সঙ্গে ওঁরাই আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

যাক্ গে, আপনি অভিযানগুলির কথা বলুন। গোরা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করাতে চায়।

আমি আবার শুরু করি—এই বছর দু-দল পোলিশ অভিযাত্রীও ব্রহ্মাণী শিখরে আরোহণ করেন। একদল বৃটিশ পর্বতারোহী ব্রহ্মা-২ ও ফ্ল্যাট টপ শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অপর দুটি অভিযানে বৃটিশ ও পোলিশ অভিযাত্রীরা দুটি দূরবর্তী শিখরে আরাহণ করেন।

তারপরে ১৯৪০ সাল। সে বছর কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে দশটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি তোমাদের ব্রহ্মা হিমবাহ অভিযান, আরেকটি ফরাসী ব্রহ্মা-১ পর্বতাভিযান। ই. শমুৎজ (Schmutz) সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তাঁরা উত্তর শিখরশিরা ধরে ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেন। এটি ব্রহ্মা-১ শিখরে চতুর্থ আরোহণ।

—তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। গোরা বলে।

আমি মাথা নেড়ে বলতে থাকি--বাকি আটটি অভিযানের পাঁচটি বৃটিশ আর একটি করে জাপানী পোলিশ ও ইতালীয় অভিযান। মেজর আর. উইলসন-এর নেতৃত্বে এক বৃটিশ অভিযাত্রীদল প্রথম ৬১০৩ মিটার মানে ২০,০২২ ফুট উঁচু ফ্ল্যাট টপ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এ ক'দিন আমরা সামনে তাকালেই শৃঙ্গটিকে দেখতে পেয়েছি।

ওরা মাথা নাড়ে, আমি বলতে থাকি—আর. রুটল্যাণ্ড নামে আরেক বৃটিশ পর্বতারোহীর নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী সিক্‌ল মুন শিখরে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অপর তিন বৃটিশ অভিযাত্রীদল এবং জাপানী পোলিশ ও ইতালীয়রা যেসব শিখরে অভিযান করেছেন, সেগুলির কোনটাই ব্রহ্মা হিমবাহ অঞ্চলের শৃঙ্গ নয়।...

আর কিছু বলার সুযোগ পাই না। তার আগেই বৃষ্টির শব্দে চমকে উঠি। তাঁবুর ওপরে সশব্দে বৃষ্টি পড়ছে। আজ সকাল থেকেই ব্রহ্মলোকে মেঘের সমারোহ দেখেছি। ঘুম থেকে উঠে ব্রহ্মাজীর মুখ দেখতে পাই নি। রোদ ওঠে নি বলেই অন্যদিনের মতো বাইরে না বসে তাঁবুর ভেতরে এসে গল্প করছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামবে বুঝতে পারি নি। পারলে তখুনি রান্নার ব্যবস্থায় লেগে যাওয়া যেত। এখন বৃষ্টিতে ভিজে কিচেনে যাওয়া আর বৃষ্টি মাথায় করে রান্না করা খুবই অসুবিধে।

তাহলেও করতে হবে। তাই উইণ্ডচীটার গায়ে চাপিয়ে গোরা ও টুলটুল তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

রসিদের ভাগ্য ভাল। এক বোঝা কাঠ নিয়ে কিছুক্ষণ আগে সে ফিরে এসেছে। এখন সে বোধহয় কিচেনে বসে সবজি কাটছে। অতটুকু জায়গায় তিনটে মানুষ বসে কাজ করবে কেমন করে?

আজ এখনও নালায় জল আসে নি। আসবে কেমন করে? আজ কি রোদ উঠেছে যে বরফ গলবে। তবে এ রকম বৃষ্টি হলে কিছুক্ষণের মধ্যে জল চলে আসবে, বৃষ্টির জল। কিন্তু সে জল খাওয়া চলবে না। খাবার জল আনতে হবে ওপরের ঝরণা থেকে। বৃষ্টিতে ভিজে পাথর পেরিয়ে অতটা পথ ভেঙে জল বয়ে আনা খুবই কষ্টকর। কিন্তু রসিদ হাসিমুখে জল এনে দেবে। জল না আনলে যে গোরা রান্না চড়াতে পারবে না।

না, খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। আমাদের তাঁবুর দুটি ফ্ল্যাপ (Flap), একটি 'আউটার' একটি 'ইনার'। আউটারটি ওয়াটার প্রুফ। মনে হচ্ছে সেটি বহু জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া জায়গা দিয়ে জল এসে ইনার-টিকে ভিজিয়ে দিয়েছে। ফলে টপ টপ করে জল পড়ছে।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। এভাবে বেশিক্ষণ বৃষ্টি হলে আরেক বিপদ ঘটবে। আমরা তাঁবুর চারিদিকে নালা কেটে দিই নি। তাঁবুর জায়গাটায় ঢাল আছে। ওপরের জল তাঁবুর ভেতর দিয়ে সোজাসুজি নিচে নামবে। আমাদের কারও এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলছে না। সুতরাং জল বইলে স্লীপিং ব্যাগ রুক্‌স্যাক্ সহ সবকিছু ভিজে যাবে।

যিনি স্রষ্টা তিনিই রক্ষক। ব্রহ্মাজী রক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থেমে গেল।

তবে এসব অঞ্চলে যা হয়, তা হল না। রোদ উঠল না। তার মানে আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। তা হোক্ গে। আমরা জুতো ও উইণ্ড প্রুফ পরে বেরিয়ে আসি বাইরে। জয় রঞ্জু ও শৈলেশ আইস অ্যাক্‌স নিয়ে তাঁবুর চারিদিকে নালা কাটতে লেগে যায়। আমি আর অমূল্য এসে দাঁড়াই কিচেনের সামনে।

অমূল্য হাঁক দেয়—হেড কুক!

—কি বলছেন লীডার! গোরা সাড়া দেয়।

—খানা রেডী?

—ইয়েস লীডার!

—থ্যাঙ্ক ইউ।

গোরা এবারে রসিদকে বলে—সাব লোগোকো থালা মগ লেকে আও! খানা দেও!

—ঠিক হ্যাঁয় সাব্! রসিদ হাত ধুয়ে তাঁবুতে চলে যায়। কিন্তু সে বেরিয়ে আসার আগেই আমরা দেখতে পাই ওদের। চমকে উঠি! ওরা কারা! গোরা ও টুলটুল বেরিয়ে আসে বাইরে। শৈলেশ জয় আর রঞ্জু নালা কাটা বন্ধ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। এত দূর থেকে কেউ বুঝতে পারছি না, কারা আসছে? যারাই আসুক, তারা আমাদেরই লোক। আমরা ছাড়া আর কে আছে এই ব্রহ্মলোকে?

কিন্তু কেন? কেন নেমে আসছে ওরা? আজ দু নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা হবে। আজ তো ওপর থেকে কারও আসার কথা নয়!

তাহলেও আসছে। ওরা তিনজন। জয় বাইনোকুলারে চোখ রেখে বলে ওঠে—রাম সিং, পেয়ার সিং আর তপন।

ঠিকই বলেছে সে। একটু বাদে আমরাও চিনতে পারি। ওরা আসে, কাছে আসে। তপনের চোখে জল। কিন্তু কেন? তপন কাঁদছে কেন? কি হয়েছে ওর? ওপরে কারও কোন বিপদ, কোন দুর্ঘটনা? বুকটা কেঁপে ওঠে আমার।

সে কাছে এসেই জড়িয়ে ধরে আমাকে। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তপন বলে ওঠে—শঙ্কুদা, ব্রহ্মাজীকে পুজো দেওয়া আমার অদৃষ্টে লেখা নেই।

—কেন কি হয়েছে?

—অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমার সাইজের কোন ক্র্যাম্পন পাওয়া গেল না।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। তাহলে কারও কোন বিপদ হয় নি, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। ক্র্যাম্পন পাওয়া যায় নি বলে তপন এক নম্বর শিবির থেকে আর ওপরে যেতে পারে নি। গৌতম তাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। ঠিকই করেছে, ওপরের তাঁবুতে বসে অন্ন ধ্বংস করা পর্বতারোহণে অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু তপনের পায়ের মাপে ক্র্যাম্পন পাওয়া গেল না কেন? সার-সরঞ্জাম আনতে সে নিজে দার্জিলিং গিয়েছে। নিশ্চয়ই সে তার পায়ের মাপও দিয়েছে। তবু কর্তৃপক্ষ ঠিক সাইজের ক্র্যাম্পন দেন নি। ফলে একটি ছেলের দু বছরের স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেল।

তবু আমরা ওকে সান্ত্বনা দিই। বলি—তুই যেতে না পারলেও গৌতম জগদীশ কৃষ্ণ ও শিবু রয়েছে। ওরা যাবে। ওরা শিখরপূজা করতে পারলে, আমাদের সবারই পুজো দেওয়া হবে।

আমি একা নই। জয় রঞ্জু টুলটুল শৈলেশ গোরা ও অমূল্য, সবাই মিলে ওকে সান্ত্বনা দেয়।

একটু বাদে তপন শান্ত হয়। সে চোখ মোছে। তারপরে জিজ্ঞেস করে—রান্না হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ। ভাত বসিয়েছি, হয়ে এলো বলে। গোরা উত্তর দেয়। জিজ্ঞেস করে—তোর খুব খিদে পেয়েছে বুঝি ?

—তা পেয়েছে। কিন্তু আমার জন্য জিজ্ঞেস করছি না।

—তাহলে।

—রাম ও পেয়ার এখুনি খেয়ে ওপরে চলে যাবে। ওদের সঙ্গে কিছু জিনিসও দিয়ে দিতে হবে। তাই ওরা খালি রুক্‌স্যাক্‌ নিয়ে এসেছে।

—বেশ তো তোরা জিনিসগুলো গুছিয়ে দে, ভাতটা হয়ে গেলেই আমি ওদের খেতে দিচ্ছি। গোরা রান্নাঘরে চলে যায়।

তপন পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে নেতার হাতে দেয়। বলে—গৌতম দিয়েছে।

নেতা জোরে জোরে চিঠিখানি পড়তে শুরু করে—

'গতকাল শেরপাদের নিয়ে জগদীশ দু নম্বরের জায়গা দেখে এসেছে। সেদিন কৃষ্ণরা যেখানে দেখে গিয়েছিল, জায়গাটা তার চেয়ে কিছু ওপরে। উচ্চতা বোধকরি ১৮,৫০০ ফুটের মতো হবে। আমরা আজ সবাই দু নম্বরে চলে যাচ্ছি।

রাম ও পেয়ার আজই এক নম্বরে ফিরে আসবে। ওদের খাইয়ে দিও। দেখেশুনে আরও দু-জোড়া ক্লাইম্বিং বুট, একটা টু-মেন টেন্ট, ও কিছু টিন ফুড দিয়ে দিও। ওরা আজকের রাত এক নম্বরে কাটিয়ে আগামীকাল মাল নিয়ে ওপরে চলে আসবে।

আমরা সবাই সুস্থ। আনন্দে আছি। তবে আবহাওয়া একটু ভাবিয়ে তুলছে। রোজই বিকেলের দিকে তুষারঝড় হচ্ছে। তাই ঠিক করেছি, ক্রিস্‌ বনিংটনের মতো আমরাও শেষরাতে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। কিন্তু তার আগে তিন নম্বরের জায়গা পাওয়া দরকার।

আগামীকাল ও পরশু অর্থাৎ ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের তিন নম্বর প্রতিষ্ঠা করতে হবেই। ২৪শে শিখরাভিযাত্রী সদস্যরা তিন নম্বর শিবিরে চলে যাবে। আমরা ২৫ তারিখে শিখরে আরোহণ করতে চাই। সেদিন দুজন ল্যাপ্‌-কে এক নম্বরে পাঠিয়ে দেবে।...'

ভাত-ডাল ডিমের ঝোল দিয়ে ভরপেট খেয়ে নিল রাম ও পেয়ার। তারপরে রুক্‌স্যাকে মালপত্র ভরে নিয়ে ওপরে রওনা হয়ে গেল।

তপন ঘড়ি দেখে বলে—একটা বাজে। ওরা পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যাবে।

—কিন্তু পাঁচ ঘণ্টা লাগে শুনেছি। রঞ্জু বলে।

—হ্যাঁ। আমাদের তাই লাগে কিন্তু ওরা চার ঘণ্টায় চলে যাবে।

ওরা চলে যাবার পরে আমরাও খেয়ে নিলাম। রসিদকে বললাম—নালায় জল এসে গেছে। বাসন-পত্র ধুয়ে তাঁবুতে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। আজ আর কাঠ আনতে যেও না। যে কোন সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

—লেকিন সাব, কাল উপার যানা পড়েগা তো!

অর্থাৎ কাল তাকে ওপরে যেতে হলে, সে কাঠ আনার সুযোগ পাবে না।

আমি বলি—ঠিক আছে। ওপরে গেলে কাল কাঠ আনবে না। পরশু দু-ভাই গিয়ে কাঁঠ নিয়ে আসবে।

—নহী চলেগা যাব্। এক বোঝ লকরিসে দো রোজ নহী চলতে।

—না চলে, স্টোভ আছে, রুটি না খেয়ে পরোটা খাওয়া যাবে। গোরা বলে।

কিন্তু কাকে এসব কথা বলা? সে বলে—সাব্ আপ ফিকর মাত কিজীয়ে। বর্তন সাফা করকে ম্যাঁয় তুড়ন্ত লকরি লে আয়েগা। উসকো বাদ আপকো চায় পীলায়গা।

আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যে কোন সময় আবার বৃষ্টি আসতে পারে। নেতা ওকে আবার মনে করিয়ে দেয়।

—আনে দেও সাব্! ম্যাঁয় পাহাড়ী আদমী, পানিসে হমারা কুছ নহী হোতী।

অতএব আর বাক্য ব্যয় বৃথা। বরং তাতে ওর দেরি হয়ে যাবে। তার চাইতে ওর কাজ ওকে করতে দেওয়াই ভাল। আমরা তাঁবুতে চলে আসি।

তপন ভেতরে এসে এয়ার-ম্যাট্রেস বিছিয়ে নিজের জায়গা ঠিক করে নিল। 'লেফট-লাগেজ' থেকে চটি ও পায়জামা বের করে পোশাক পালটে নিল। অর্থাৎ আমাদের দলে নাম লেখালো। ছেলেটার সত্যি দুর্ভাগ্য। ক্লাইম্বিং মেম্বার হয়েও নন-ক্লাইম্বারদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হল।

কথাটা আর সবাই ভুলে গেলেও শৈলেশ ভোলে নি। সে সহসা বলে ওঠে—এবারে তাহলে ১৯৪১ সাল থেকে আবার শুরু করুন শঙ্কুদা!

—কি শুরু করবেন? তপন বুঝতে পারে না শৈলেশের কথা।

রঞ্জু বুঝিয়ে দেয়—শঙ্কুদা আমাদের কাছে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে পর্বতারোহণের কথা বলছিলেন। তুই আসার আগে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বলা হয়েছে।

—আমার শোনা হল না। যাকগে, আপনি একাশি থেকেই শুরু করুন। তাই শোনা যাক। তপন যোগ করে।

অতএব আবার ডায়েরী খুলে শুরু করি—১৯৪১ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে ছ'টি অভিযান হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই বলব কলকাতার হাইকার্স এ্যাণ্ড এক্সপ্লোরার্স এবং ক্লাইম্বার্স সার্কেলের অভিযানের কথা। প্রথম দল জুন-জুলাই মাসে অনাথ নাথ অধিকারীর নেতৃত্বে ব্রহ্মা ও কিরলসর হিমবাহ সমীক্ষা করেন। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, গৌতম মুখার্জি, অশোক মুখার্জি ও বিকাশ দাস। তাঁরা নাম্ভ নালার পথে গিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় দল বি. আর. সরকারের নেতৃত্বে কিয়ার উপত্যকায় ৫৫৯৪ মিটার (১৮,৩৫২') উঁচু একটি অনামী শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেন।

বাকি চারটি অভিযানের আয়োজন করেছিলেন বৃটিশ পোলিশ ডাচ্ ও ইতালীয় অভিযাত্রীরা। ডাচ্ অভিযানটির নেতা ছিলেন M. C. Boerlage. তারা নতুন পথে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম গিরিশিরা ধরে ব্রহ্মা-২ শিখরে আরোহণ করেন। এটি এই শৃঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ।

অপর তিনটি অভিযান যেসব শৃঙ্গে পরিচালিত হয়েছে, তার কোনটাই ব্রহ্মা হিমবাহ অঞ্চলে অবস্থিত নয়।

১৯৪২ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে মাত্র একটি অভিযান হয়েছে। কয়েকজন তুষার-প্রেমিক 'স্কি' করতে এসে 'কন্‌সোলেশন' শৃঙ্গে আরোহণ করেন। আর. কলিস্টার ছিলেন তাঁদের নেতা।

১৯৪৩ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে আবার ন'টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। চারটি বৃটিশ এবং একটি করে জাপানী আমেরিকান পোলিশ ফরাসী ও ভারতীয় অভিযান।

বি. দাশের নেতৃত্বে ভারতীয় অভিযাত্রীরা ব্রহ্মা-২ শিখরে আরোহণ করেন। এটি এই শৃঙ্গে তৃতীয়বার আরোহণ।

আমেরিকান অভিযাত্রীরা ব্রহ্মা-১ এবং জাপানী অভিযাত্রীরা আইগার শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেন। বাকি ছ'টি অভিযান যেসব শৃঙ্গে পরিচালিত হয়েছে, সেগুলি সবই এখান থেকে বহুদূরে অবস্থিত। তাহলেও একটি অভিযানের উল্লেখ না করে পারছি না। সেটি হল এস. ভেনাবল্‌স-এর নেতৃত্বে প্রথম কিশ্‌তোয়ার-শিবলিঙ্গ শিখরে আরোহণ।*

আমি থামতেই শৈলেশ বলে ওঠে—২১,৪৬৬ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ তো গাড়োয়ালে, গোমুখীর ওপরে। কিশ্‌তোয়ার-শিবলিঙ্গ নামে আবার কোন শৃঙ্গ আছে নাকি!

—আছে। অমূল্য উত্তর দেয়। বলে—৬০০০ মিটার অর্থাৎ ১৯,৬৮৫ ফুট উঁচু এই শৃঙ্গটির আকৃতি অনেকটা শিবলিঙ্গের মতো বলে এর নাম কিশ্‌তোয়ার-শিবলিঙ্গ। অবশ্য শৃঙ্গটি কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ লাদাখ সীমান্তে অবস্থিত।

থামে অমূল্য, আমি বলতে থাকি—১৯৪৪ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে দুটি পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে। একটি বৃটিশ ও একটি আইরিশ। পঁচাশি সালেও দুটি অভিযান হয়েছে, একটি বৃটিশ ও একটি আমেরিকান। এই চারটি অভিযানের কোনটিতেই ব্রহ্মা-হিমাঙ্গনের কোন শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করা হয় নি।

একবার একটু থেমে আবার বলি—এই হোল কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে পর্বতারোহণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

—হয়ে গেল? আমি থামতেই গোরা প্রশ্ন করে।

একটু হেসে বলি—হ্যাঁ।

—এ বছরের কথা বলবেন না?

—এ বছর তো এখনও শেষ হয় নি। তাছাড়া তুমিও জানো, এ বছর এ পর্যন্ত দুটি ব্রহ্মা-১ অভিযান আয়োজিত, একটি জাপানীদের ও একটি আমাদের।

—সেই কথাটা বলেই আপনার বিবরণ শেষ করুন। গোরা হাসতে হাসতে বলে।

এতক্ষণে আমি ওর প্রশ্নটার কারণ বুঝতে পারি। কিন্তু সেকথা বলতে পারার আগেই জয় বলে ওঠে—হাসি-গল্প অনেক হল, আর নয়। তাঁবুর চারিদিকে নালা কাটা শেষ হয় নি তখন, এসো এখন সেটা কেটে ফেলা যাক। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যে কোন সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

—জয় ঠিকই বলেছে। আয় সবাই মিলে নালাটা কেটে দিই। গোরা উঠে দাঁড়ায়।

নেতা বাধা দেয়। বলে—নো। হেড-কুক মাটি কাটার কাজে হাত দেবে না, সে তার নিজের কাজ করবে।

—কি কাজ ?

—তুমি হেড্-কুক, তোমাকে বলতে হবে কেন যে টী-টাইম হয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু আমি তো সেদিন বলে দিয়েছি লীডার, হেড্-কুক চা বানায় না।

—না বানালেও তাকেই ব্যবস্থা করতে হয়।

—যো হুকুম লীডার ! গোরা হাসতে হাসতে দোরের দিকে এগিয়ে যায়। আমরাও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।